চিরঞ্জীব বনৌষধি

চিরঞ্জীব বনৌষধি

আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় খণ্ড

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

অলংকরণ : বিপুল গুহ

প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা ১৩৮৪

মূল্য : ২৫·০০

উৎসর্গ

আয়ুর্বেদ-বিদ্যার সুপ্তধারার পুনরুন্নেতা

মাধব-চক্রপাণি-শিবদাসের উত্তরসূরী

শ্রীমদ্ গঙ্গাধর রায়

ও

অনুচরিত-অন্তিক বৈদ্যবৃন্দের পবিত্র স্মৃতি-তর্পণে

গ্রন্থকার

এই গ্রন্থের মহনীয় বৈদিক তথ্যের সংযোজনায় ও সংহিতা

সূত্রের সৌকর্য্যে আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ বেদজ্ঞপণ্ডিত

আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর, শাস্ত্রী

কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, ন্যায়-

শাস্ত্রীজীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা-প্রীতির

অভিজ্ঞান অর্পণ করি।

গ্রন্থকার

লেখকের কথা

বিনীত শ্রদ্ধা নিয়ে ও সভয়ে সেদিন উপস্থিত হয়েছিলাম হিন্দুস্থান রোডের "সুধর্মায়"। সঙ্গী ছিলেন বাংলার পুরাকীর্তি সমীক্ষক শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হওয়ার পর প্রণাম ক'রতে যেতেই বাধা পেলাম, বুকে জড়িয়ে ধ'রে পর পর তিনটি ধাক্কা; হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন—এতদিন কোথায় ছিলেন? আসেননি কেন? সবিনয়ে বলি—পাহাড়ের সামনে উইয়ের ঢিপি দাঁড়াবে কোন্ সাহসে? একই কণ্ঠে সুনীতিকুমার বললেন—উইয়ের ঢিপি না অন্য কিছু সেটা ঠিক ক'রে নেওয়ার জন্যেও তো আসতে পারতেন, আনন্দবাজারে যখন আপনার লেখা পড়ি—মনে মনে পোষণ করেছি আপনার সাক্ষাৎ। তারপর তাঁকে অর্পণ করলাম 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'।

এরপরে আরও অনেক কথা। মাসখানেক পরে তাঁর কাছ থেকে পেলাম আশীর্বাদ। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত-প্রবরের প্রশংসায় অভিষিক্ত হ'লো চিরঞ্জীব বনৌষধির প্রথম খণ্ড। গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পক্ষে এ এক দুর্লভ সম্মান। তাঁর সেই প্রশংসাসিক্ত এবং অন্তর-নিঃসৃত আশীর্বাণীই আজ দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা হিসাবে প্রকাশ ক'রে ধন্য হলাম। (রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে।)

আমার প্রতি তাঁর একটি আদেশ ছিল বিছুটি (বৃশ্চিকালী) সম্পর্কে একটা নিবন্ধ লেখার। এই দ্বিতীয় খণ্ডে সেটা লিখেছিও, কিন্তু তাঁকে আর সেটা শোনানো হ'ল না। ইতি—

বিনীত

গ্রন্থকার

ভূমিকা

'আনন্দবাজার পত্রিকায়' কিছুকাল যাবৎ শিবকালী ভট্টাচার্য মহাশয় ধারাবাহিকভাবে ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে এবং ব্যবহারিক আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে কতগুলি অতি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছেন। সেগুলির মধ্যে দুই-চারিটির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিয়াছিল এবং এই প্রবন্ধগুলিকে একদিকে বৈজ্ঞানিকের সত্যদিদৃক্ষা ও তথ্যনিষ্ঠা এবং অন্যদিকে বৈজ্ঞানিকের পক্ষে যাহা সহজলভ্য নহে এমন সাহিত্য-রসিকের রস-সর্জনা, এই উভয় গুণ উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হই। আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নিতান্ত দুর্লভ, সহজভাবে জীবনের বিভিন্ন প্রকাশকে আমরা সাধারণত গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত নহি। নিসর্গের সৃষ্টি এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ সম্বন্ধে জানিতে আমাদের কতটুকু আগ্রহ দেখা যায়? নিজ নিজ আলোচ্য সংকীর্ণ শাস্ত্র বা বিদ্যার গণ্ডীর বাইরে নেত্রপাত করিবার জন্য না আছে আমাদের ইচ্ছা বা আগ্রহ, না আছে সে বিষয়ে অভিনিবেশ, সুতরাং সেদিকে সময়ও আমরা দিতে পারি না। তথাপি আমাদের মধ্যে কাহাকেও বা ক্বচিৎ এই গ্রহ-নক্ষত্র-খচিত সৌর-জগৎ, নানা প্রকারের উদ্ভিদ দ্বারা পরিশোভিত এবং মানুষের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত লতাগুল্ম-বৃক্ষ জগৎ, অনুরূপ জান্তব-জগৎ, ভৌগোলিক জগৎ প্রভৃতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নানা প্রকাশের মধ্যে এক বা একাধিক প্রকাশ আমাদের চিত্ত ও চিন্তাকে অভিভূত করে, মথিত করে, সেই প্রকাশ সম্বন্ধে যথাশক্তি তথ্য আহরণের জন্য ও তত্ত্ব বুঝিবার জন্য আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলে। চোখ দিয়া সবকিছু দেখিবার ও কান দিয়া সবকিছুর সম্বন্ধে শুনিবার অপ্রকট বা স্বল্প-প্রকট ইচ্ছাও এই প্রকাশ-বৈচিত্র্যের প্রভাবের ফলেও জাগরিত হয়। দর্শন, শ্রবণ, মনন, আহরণ দ্বারা মানুষের বিধিদত্ত ধী-শক্তির উদ্বোধন-ই প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই উদ্বোধনটুকু

যাঁহার হাতে, তাঁহার শ্রোতাদের মধ্যে যত অধিক পরিমাণে এবং স্বল্প পরিশ্রমে সম্ভবপর হয়, তিনিই তত কৃতকর্মা লব্ধকাম শিক্ষক। যেমন ভারতীয় উদ্ভিদ্ বিদ্যা সম্বন্ধে, আমার মনে হয়, কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজের কৃতী অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ স্বর্গত গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয় বাংলাদেশের তথা ভারতের ছাত্রদের যত সহজে সচেতন করিতে পারিয়াছেন, তেমনটি আর কেহ পারেন নাই—কারণ, ভারতের সুপরিচিত বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদিরই কথা বলিয়া, তাহাদের বৈজ্ঞানিক বর্গীকরণ করিয়া এই বিদ্যাকে সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছেন, অজ্ঞাত বৈদেশিক ইউরোপীয় বৃক্ষলতাদির অপরিচিত নাম আওড়াইয়া বিষয়টিকে জটিল করেন নাই।

শ্রীযুক্ত শিবকালী ভট্টাচার্য মহাশয়ের চিরঞ্জীব বনৌষধি একখানি অতি উপাদেয় পুস্তক, একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তথ্য ও তত্ত্ব বিচারের সম্পুট। এক সদ্ বস্তুর মধ্যে বিশ্বের সবকিছু অবস্থিত—সেই 'তৎসৎ' ছাড়া আর কিছুই নাই—ইহাই ভারতের প্রাচীন দার্শনিক চিন্তার এবং ভারতের বাইরের সমস্ত চিন্তাশীল মানব সমাজেরও বটে—পরম ও চরম কথা। আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য আলবেয়ার্ট আইনষ্টাইনও এই ধারণায় আসিয়া পহুঁছিয়াছেন। এই একেরই মধ্যে সবকিছু, সুতরাং সবকিছুর মধ্যেও পারস্পরিক যোগ একটা আছে—ভৌতিক জগৎ বা প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে, গ্রহ-নক্ষত্র ও মানবের মধ্যে, জান্তব-জগৎ ও মানবের মধ্যে, উদ্ভিদ্ জগৎ ও মানবের মধ্যে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র যাঁহার আলোচ্য ও উপজীব্য, তাঁহার কাছে ভৌতিক জগতের যাহা কিছু মানব জীবনের, মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ও তাহার পরিপূর্ণতার জন্য আবশ্যক, যাহা কিছু সহায়ক, তাহার সমস্তটার বিচারের উপযোগিতা আছে। মানুষের স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, কেবল তাঁহাদের জন্যই এ আবশ্যকতা নহে, সুধী ও সাধারণ জ্ঞান-সম্পন্ন মানুষের কাছেও ইহার মূল্য আছে।

বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান লইয়া শ্রীযুক্ত শিবকালী ভট্টাচার্য মহাশয় এই কার্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিশ্বের উদ্ভিদ্-জগৎ অপার। লক্ষ লক্ষ প্রকারের উদ্ভিদ্ বিদ্যমান। প্রত্যেকটির সঙ্গে মানব-জীবনের কোনও না কোনও যোগ থাকা সম্ভব—অজ্ঞাত জগতে কি আছে, কি নাই, সে বিষয়ে দৃঢ় মত ব্যক্ত করিবার অধিকার কাহারও নাই। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের এক আচার্য সম্বন্ধে, বোধহয় বুদ্ধদেবের সমসাময়িক রাজগৃহনিবাসী বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক জীবক সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে। জীবক মগধ রাজগৃহ হইতে গান্ধার তক্ষশিলায় আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিতে যান। তাঁহার গুরু, শিষ্যের শিক্ষা-সমাপনান্তে তাঁহাকে বলিলেন—এইবার তুমি যাও, নগরের বাহিরে পার্বত্য অঞ্চলে যেসব গাছ-গাছড়া পাওয়া যায়, মানুষের উপকারে যেগুলি না লাগে, সেগুলির একটি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইস। সারাদিন এই প্রকারের গাছের সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া ক্লান্ত দেহ ও মন লইয়া খালি হাতে শিষ্য গুরুর নিকটে আসিয়া নিবেদন করিলেন—বহু প্রকারের বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-ক্ষুপ-পুষ্প-ফল-কন্দ-মূল তো আছে, কিন্তু এমন একটিও দেখিলাম না, যেটি মানুষের কোনও না কোন কাজে লাগে না। উপাখ্যানটির অন্তর্নিহিত ভাব প্রণিধান করিয়া গ্রহণযোগ্য।

এই অনন্ত উদ্ভিদ্ ভাণ্ডার হইতে চিরঞ্জীব বনৌষধি গ্রন্থে মাত্র কিঞ্চিদধিক ৬২টি উদ্ভিদের বিচার করা হইয়াছে, যেগুলি মানুষের খাদ্য ও ঔষধ উভয়ের জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং ভারতীয় জনগণের দৈহিক পুষ্টি এবং নিরাময়তার জন্য সর্বজন-বিদিত প্রমাণিত নৈসর্গিক দান। এই বইয়ে আলোচিত বনৌষধি ও খাদ্যশস্যের সংখ্যা অল্প, কিন্তু প্রত্যেকটি আলোচনা নিবন্ধ বিচারের ও জ্ঞানের বিশেষ মূল্যবান ভাণ্ডার, উপরন্তু সাহিত্যিক প্রসাদগুণে পরিপূর্ণ, সুপাঠ্য,

বহুস্থলে লেখকের অনাবিল পরিহাস-রসিকতা তাঁহার বক্তব্যকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করিয়াছে। প্রাচীনের উপরেই আধুনিক প্রতিষ্ঠিত, একথা সকলে ভুলিয়া যায়। কিন্তু এই বইয়ে আয়ুর্বেদাচার্য মহাশয় দেখাইয়াছেন—প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই এইসব ওষধি বৈদিক যুগ হইতেই আমাদের আর্য-পিতামহগণের প্রচলিত ছিল। তাঁহারা এগুলির গুণবত্তা কিভাবে ধরিতে পারিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালেও এগুলির সম্বন্ধে কি গুণগ্রাহিতা জনসাধারণের মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকে—ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ হইতে ও অন্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে আয়ুর্বেদাচার্য মহাশয় মহীধর ও অন্য টীকাকৃতের ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সহ বহু ঋক্ বা যজু সূক্তকে উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, যেগুলির মূল্য অপরিসীম। বনৌষধিগুলির সংস্কৃত নাম ও সেগুলির প্রচলিত বাংলা নামও দিয়াছেন এবং বহুস্থানে সেগুলির নিরুক্তিও দিবার সার্থক প্রয়াস করিয়াছেন। নামের ইতিহাসের মধ্যে নিহিত ভাষাতাত্ত্বিক রহস্যের অবতারণা করিয়া তিনি উপরন্তু কৌতুকময় দৃষ্টি-ভঙ্গীও আনিয়াছেন। প্রত্যেকটি বনৌষধির—প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল, পরাগ প্রভৃতির সুন্দর আলোকচিত্র দিয়াছেন, ইহাতে বইখানির উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান-বিষয়ক সার্থকতা আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

আমি আয়ুর্বেদজ্ঞও নই, চিকিৎসকও নই। সাধারণ বাঙ্গালী শিক্ষিত জন মাত্র, যে জানা বিষয়ে, ভৌতিক ও মানবিকী উভয় প্রকারের জ্ঞান বা তথ্য বা বিদ্যা সম্বন্ধে সভ্য মানুষের উচিত কৌতূহল পোষণ করে মাত্র। আমার কাছে সু-পাঠ্যতা, সহজ-বোধ্যতা প্রভৃতি কতকগুলি সদ্-সদ্‌গুণের জন্য এই বইখানির অন্তরঙ্গ আবেদন। বইখানি নাড়িয়া-চাড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি, উপকৃত হইয়াছি। বঙ্গভাষী পাঠক-মাত্রেই উপকৃত হইবেন। মাতৃভাষার সাহিত্যিক সম্পদ এইভাবে তিনি বাড়াইয়া দিলেন। আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীযুক্ত শিবকালী ভট্টাচার্যকে সেইহেতু আন্তরিক সাধুবাদ দিতেছি।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আয়ুর্বেদের ধারাবাহিকতা (Chronology)

যার কোন কিছুতে ঐকান্তিক নিশ্চয়তায় মন নেই, সে যদি বিচারক হয়, তাহ'লে প্রথমে তার মনে এ প্রশ্ন জাগবে যে, ভরদ্বাজ স্বর্গের ইন্দ্রের কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষা ক'রে এসে মর্তে তাকে প্রচার ক'রেছিলেন; আচ্ছা, স্বর্গ তো অমরপুরী, অর্থাৎ মৃত্যুহীন পুরী, সেখানে আয়ুর্বেদ থাকে কি ক'রে? মরণধর্মী মানব যেখানে বাস করে, সেই যখন মর্ত, সেখানেই তো রোগ হয়। অমরদের কি রোগ হয়? আর রোগের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গেই তো চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে।

এখানে এই প্রশ্নমূলক তথ্যকে যদি সামলাতে হয়, তাহ'লে এই কথাই ব'লতে হবে, পাছে লোকে এই আয়ুর্বেদকে পৌরুষেয় গ্রন্থ ভাবেন, এমনি শঙ্কাকে নির্মূল করার জন্যই এই কাহিনীর সমাবেশ।

সত্য কথা ব'লতে কি—এ যেন কত শিশুবয়সে দেখা একটি মেয়েকে দীর্ঘদিন পরে দেখতে পাওয়ার মধ্যে যদি সেই মেয়েটি আত্মপরিচয় না দিতো তবে অতগুলি সন্তানের মা সেই মেয়েটিকে তার নাতি-নাতনীর মধ্যে চেনাই যেতো না; কারণ ও এখন প্রায় পিতামহী এবং মাতামহী; এমনি উপমার মাধ্যমে যদি আয়ুর্বেদের বর্তমান গ্রন্থাবলীকে আলোচনা ক'রতে যাওয়া যায়, তবে অমনিভাবেই বলা যায়—উঃ সে কতদিনের কথা—যেদিন আর্য সভ্যতার প্রথম বিকাশ, সেইদিন ছিল পক্তিদেশের ভূখণ্ড, পরে যেটি ব্রহ্মাবর্ত দেশ (মনু, প্রথম অধ্যায়), তারপর সেই আর্যগোষ্ঠী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে বিশাল ভুখণ্ডের স্তরে স্তরে নামতে নামতে আমাদের সুপরিচিত বিন্ধ্যগিরির উত্তর ভূখণ্ডে এসে উপনীত হ'লেন।

তারপর তাঁদের এই ক্রমোত্তীর্ণ এবং ফেলে আসা সমাজের অখণ্ড কালকে আজ আমরা ঋক্, যজু, অথর্বের কাল ব'লে কল্পনা ক'রে নিয়েছি—এরই মধ্যে আয়ুর্বেদেরও

উদ্ভব ও বিকাশ ঘ'টেছে; তাই যেটা ছিলো ঋকে সঙ্কেত, যজুতে এসে সেটা অনেকটা রূপ নিয়েছে; তারপর অথর্ববেদের কালে এসে সেগুলি আরও অনুশীলিত হ'য়েছে।

পণ্ডিতগণ বহু অঙ্ক ক'ষে দেখেছেন, আজ থেকে অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব সাড়ে তিন থেকে চার হাজার বৎসর পূর্বেই অথর্ববেদের কাল অতিক্রান্ত হ'য়ে গিয়েছে; কিন্তু সেই উত্তরণ কালের বৈদিক আর্যগোষ্ঠীর মধ্যে আরও একটি লক্ষণীয় ব্যাপার উল্লেখ-যোগ্য হ'য়ে ওঠে যে, এই বিশাল ভূখণ্ডে প্রতিপক্ষের সঙ্গে তাঁদের সংগ্রামও ঘ'টেছিলো, এবং সেই সংগ্রামের মধ্যে আর্য ও প্রাক্-আর্যদেরই আত্মবিস্তার এবং আত্মপরাভব।

ক্রমোত্তীর্ণকালে আর্যদের বিস্তৃতির ফলে ভারতে ঘ'টেছিল আরণ্যক সভ্যতার অবদান; সেই নগর-সভ্যতাই আবার আর্যবংশীয়দের উত্তরসূরিদের একাধারে আকৃষ্টও করে আবার সেই সভ্যতাকে জীর্ণ করার প্রবৃত্তিও জাগে।

এইভাবে আকর্ষণ ও সংঘাতের মধ্য দিয়েই তাঁদের জৈব ও অজৈব পদার্থরাজির জ্ঞান ও মনোজগতের বিশ্লেষণও গড়ে উঠেছিল। সেই বিশ্লেষণই কিন্তু একটি গোষ্ঠীর কুটির নির্মাণ ক'রে বসবাস এবং অপর গোষ্ঠীর মধ্যে অনন্তকালের জ্ঞান আহরণের ধারা।

যেটি দ্বিতীয় গোষ্ঠী সেইটিই হ'য়েছিলো চরকীয় রীতিতে, অর্থাৎ ভ্রমণ করতে করতেই তাঁরা নিজেদের শিষ্যদের এবং অপরের শরীর, মন ও সমাজের অবস্থা বিশ্লেষণ ক'রেছেন। এই যে ভ্রমণশালী অথবা চরকীয় বৈদিক সভ্যতার যাঁরা যাজক, তাঁরা প্রধানভাবে সমৃদ্ধ হ'য়েছেন অথর্ববেদের ভৈষজ্যকল্পের ভেষজানুশীলিত ইঙ্গিত থেকে।

এইটাকেই বুঝতে গেলে চরক সংহিতাকে মাঝখানে রেখে আমাকে অগ্রসর হ'তে হবে।

প্রথমতঃ বক্তব্য হ'লো—চরক কোন একক ব্যক্তি নন। ওটি একটি সুপ্রাচীন ভ্রমণরত সম্প্রদায়েরই নাম। তাঁরা ছিলেন চারণবৈদ্য, তাঁদের আহৃত তথ্যগুলির সংকলিত গ্রন্থের পরবর্তীকালে সম্পুটিত গ্রন্থ হ'লো চরকসংহিতা। এ নাম অগ্রজ-সূরিগণের অনুবর্তী-বৃন্দের দ্বারা সংস্কৃত।

প্রথমে এটি ছিল অগ্নিবেশ সংহিতা, সেই সময়ে আরও কয়েকটি সংহিতাও রচিত হ'য়েছিলো—যেমন আত্রেয় ও ভেল সংহিতা। ঠিক এমনি ধারায় আবার বাস্তু ও গৃহ-বিদ্যায় সংকলিত নাম বোধায়ন সংহিতা, আশ্বলায়ন সংহিতা, তাছাড়া ভাস্কর্য বিষয়ে দ্রুহি সংহিতা প্রভৃতি; এ ভিন্ন আরও বহু সংহিতার নাম পাওয়া যায়। অতএব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, মানবের মেধায় যখন সেই শ্রুতি পারম্পর্যের বিদ্যাটি স্থিতি লাভই ক'রছে না, তখনই সেই বহুজন মেধার শ্রুতিকেই একত্র গ্রথিত করার প্রেরণা আসে, যাকে বলা যায় কম্‌পাইলেশন্ করার যুগ, যিনি যতখানি শ্রুতিতে রক্ষা ক'রেছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে সেগুলি সংগ্রহ ক'রে একত্র করার ক্ষেত্র; এইটিই সংহিতা শব্দের অর্থ এবং কালেরও স্মৃতি গ্রন্থিত যুগ। সেই চরকীয় সম্প্রদায় ভিন্ন সেই কালের সমসাময়িক অথবা তার কিছুকাল পূর্বে আর একটি সম্প্রদায়েরও ছাপ আমরা পাই, সেটা হ'লো সৌশ্রুতী বিদ্যা, যার মধ্যে মানবদেহের তথা অখিল প্রাণীর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিটি স্তরের বিশ্লেষণ, এই উভয় ধারার মিলনেই আয়ুর্বেদের পূর্ণতা। আজ সেই আয়ুর্বেদসেবিগণের উত্তরাধিকারী যাঁরা, তাঁরা বিস্মিতচিত্তে দৃষ্টিপাত ক'রেছেন, অপর একটি নবপ্রতিভাদীপ্ত শল্যবিদ্যার অগ্রগতি দেখে, যা আজ ঈশ্বর প্রতিনিধির মত এবং যা প্রত্যক্ষ। এঁ'রা আজ মানুষের তথা যেকোন প্রাণীর হৃদয় বিনিময়ের কর্মেও দক্ষতা অর্জন করেছেন, এটা অবক্তব্য রাখলেও গুণিজনের সপ্রশ্ন দৃষ্টি—কোথায় আমাদের সেই সৌশ্রুতীবিদ্যার অবক্ষয়ের হেতু? তীক্ষ্ম প্রশ্ন এলেও এটির কারণগত সমীক্ষায় আজ

আর আমাদের মধ্যে সেই পূর্বগৌরবের অধিকারী হওয়া সম্ভব হবে না; তবুও আমাদের সেই আয়ুর্বেদ পেটিকার অভ্যন্তরে যে কোন নূতনের সন্ধান পাওয়া যায়, সে গবেষণার দ্বারও যে রুদ্ধ কপাট নয়, তাই বা বলি কি করে?

যাক্, আমি আবার চরক প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়ার পূর্বে একটা কথা বলি—আমাদের প্রাপ্তব্য এই বহু মেধায় সমৃদ্ধ এবং লৌকিক চরকসংহিতা গ্রন্থটির মধ্যে যেসব মিলিত ভেষজের সন্ধান লাভ করি, প্রকৃতপক্ষে এগুলির মৌল উৎস কিন্তু অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পে একক ভেষজের অনুশীলিত তথ্যগুলিকেই উপজীব্য ক'রে এবং কালের পরিণতিতে অনিবার্য ব্যাধি-সাঙ্কর্য দেখেই যে ভেষজের অংশাংশ যোগকল্পনার এটি সম্পুট, তা নিঃসন্দেহ; কারণ ব্যাধির বহুনামিত্ব এবং উপসর্গ বাহুল্যটি পূর্বকালের নয়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা ব'লে রাখি—এই চরক সংহিতাটি যেকালে রচিত হ'য়েছে, সে কালটি কিন্তু পরিপূর্ণ বৌদ্ধ সংস্কৃতির অবচরিত কাল, সেটা নিঃসন্দেহ, কারণ বৌদ্ধদেরই পারিভাষিক শব্দ "খুড্ডাক", যেটাকে বলা যেতে পারে ক্ষুদ্রক, তারপর জনপদধ্বংসনীয় শব্দটিও বৌদ্ধদের ষোড়শ জনপদের। তাছাড়া "চৈত্যপূজা" "ধ্বজপূজা", "চৈত্যবৃক্ষ" (অশ্বত্থ বৃক্ষ), "জেন্তাকস্বেদ" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা আমরা জানতে পারি সেই বৌদ্ধ আমলেই রচিত এই সংহিতা এবং ঐ কালেই রচিত হয়েছে আরও সংহিতা গ্রন্থ; তবে এইটুকু বলা যায়—বৈদিক রীতিতে ভেষজগুলিকে সংঘবদ্ধ ক'রে বৈদিক চিন্তার অনুসরণই প্রধান বক্তব্য ছিল, তাই আমরা একাধারে বৈদিক ভৈষজ্য রীতি ও তার সঙ্গে বৌদ্ধ চিকিৎসা পদ্ধতি এবং লৌকিক যোগ সংগ্রহ এই তিনেরই সমাবেশ দেখতে পাই।

তবে বর্তমানে আমাদের কায়চিকিৎসা বিষয়ক যে চরক সংহিতাটি পাই, সেই গ্রন্থের কোন কোন অংশ যে সর্বশেষ সংযোজিত হ'য়েছে এবং সেটি যে ৬ষ্ঠ শতকেই যোজিত তা অবিতর্কিত। সেটি ক'রেছেন দৃঢ়বলাচার্য; ইনি ছিলেন কাশ্মীরবাসী; সুতরাং সুপ্রাচীন অগ্নিবেশ সংহিতাটি আয়ুর্বেদীয় কায়চিকিৎসার আদি সংহিতা হ'লেও তা স্মৃতি মাত্রই, সেটিতে কি ছিল তা আজ আমরা আর জ্ঞাত নই। এতেও কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশও পাই।

অতএব আমাদের নিকট খুব সুস্পষ্ট যে ভারতীয় আয়ুর্বেদবিদগণ কায়চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে বৃক্ষলতাদির দ্বারা ভেষজ নির্মাণ ক'রতেন, সেইটাই তাঁদের নিজস্ব অনু-শীলন; কিন্তু তাঁরা ভেষজদ্রব্যগুলির মৌল সূত্রের যতটুকু সন্ধান লাভ ক'রতেন সেটা বৃক্ষায়ুর্বেদে বিশেষজ্ঞ উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের জ্ঞানসূত্র থেকে। তাই আমাদের দুটি প্রখ্যাত সংহিতাগ্রন্থ চরক ও সুশ্রুতে যতটা পাই, তার দ্বারা উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের ঔৎসুক্য মিটানো যায় না।

তারপর আর একটি দিক—যেটা চরক সুশ্রুতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়েই দ্রব্যের বিচার করা হ'য়েছে, কারণ চরকের ধারা দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সুস্থতার বিঘাতক যে ব্যাধি তাকে দূর করাই মুখ্য বক্তব্য, আর সৌশ্রুতীয় ধারাতেও দ্রব্যের সঙ্গে আয়ুর্বেদের মৌল সিদ্ধান্ত যে বায়ু, পিত্ত, কফ—এই তিনটি তত্ত্বকে ভিত্তি ক'রে সংকলিত হ'য়েছে।

এখানে আমি আর একটি তথ্য পরিবেশন ক'রে চরকীয় ধারার বক্তব্য শেষ ক'রবো।

আমাদের প্রচলিত চরকের সূত্রস্থানের ২৯ অধ্যায়টিতে একটি অপূর্ব চিন্তাধারার সন্নিবেশ করা হয়েছে, যেটি পাশ্চাত্য চিকিৎসার ধারায় এখনও প্রচলিত। সেটা হ'লো রোগানুযায়ী ভেষজের classification. এগুলিকে বলা হয়েছে কষায় কল্পনা—যেমন

জীবনীয় অর্থাৎ জীবন বর্ধক কি কি ভেষজ, বৃংহনীয় অর্থাৎ পুষ্টি ও স্থূলতা-কারক, লেখনীয় কৃশতাকারক, ভেদনীয় (মলভেদকারক), দীপনীয় ক্ষুধাকারক; এই রকম এক একটি গ্রুপ্ করা হয়েছে, আবার সেখানেই বলা হ'লো বল্য (বলকারক), বর্ণ্য (বর্ণকারক), কণ্ঠ্য (স্বরের উৎকর্ষকারক) এবং হৃদ্য (হৃদয়ের হিতকর), এখানে উল্লেখ্য যে কেবলমাত্র হৃদ্‌যন্ত্রই বক্তব্য নয়, এখানে বক্তব্য প্রাণের দশটি আয়তন, আবার আরও গ্রুপ আছে—যেমন তৃপ্তিনাশক অর্থাৎ না খেয়েও খাওয়ার ন্যায় বোধ, এ ভিন্ন অর্শোনাশক, কুষ্ঠনাশক, কণ্ডূনাশক, ক্রিমিনাশক ও বিষনাশক আরও ছয় প্রকার কষায়-কল্পনা। আরও একটি গ্রুপ স্তন্য শোধন, স্তন্য বর্ধন, শুক্র জনন, শুক্র শোধন প্রভৃতি; এমন রোগ নেই, এমন ক্ষেত্র নেই যার ভেষজ কল্পনা করা নেই। এই পদ্ধতিতে ষষ্ঠ কি সপ্তম শতক পর্যন্তও এই চরকীয় ধারার চিকিৎসার একটা রেশ ছিল।

এদিকে দক্ষিণ ভারতের নাগার্জুন সম্প্রদায়ের চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে তখন জনগণকে চমক লাগাতে সুরু করেছে, সেটা হ'লো রসতান্ত্রিকদের চিকিৎসা পদ্ধতি; তাঁদের চিকিৎসার একটা সুবিধে হ'লো—আজ অসুখ হ'লেই এখন থেকেই ঔষধের ব্যবস্থা করা।

তাই তাঁরা ব'লেছেন—

> ন দেশানাং ন দোষানাং নৈব কালানুসারিণাং,
> অপেক্ষা নাস্তি বৈদ্যস্য রসতন্ত্র চিকিৎসিতে।

এই রসতান্ত্রিকদের ধারার মত হ'লো দেশ, দোষের ও কালের অপেক্ষা ক'রতে হয় না। ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রলে দেখা যাচ্ছে, একাদশ খৃষ্টাব্দের পর জনগণ পুরোপুরি রসতান্ত্রিকদের চিকিৎসাপদ্ধতি মেনে নিলেন। এ ধারা চরকীয় ভেষজ আর নাগার্জুনের ধাতব রসতান্ত্রিক বিজ্ঞানের সম্মিলিত চিকিৎসাপদ্ধতি এবং ভৈষজ্য পদ্ধতিও।

এই পদ্ধতিটির মৌল ধারায় বৈদিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও ভৈষজ্য বিদ্যা এত দূরে প'ড়ে রইলো যে আজ আর তাকে পৃথক ক'রে দেখানো যায় না। আর রসতান্ত্রিক ধারা আমাদের এত কাছে এসেছে যে, তাকে অবৈদিক ব'লে দূরেও সরানো যায় না। কারণ তান্ত্রিকদের অনুভূত যোগাবলী আমাদের দেহে পুরুষানুক্রমে সহস্র বৎসর যাবৎ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় স্বতন্ত্র একটি ক্রিয়াশালী শক্তি গ'ড়ে উঠেছে। আমরা ব'লতে পারি সেইটাই হ'লো বৈদিক ও রসতান্ত্রিক ভেষজ মিশ্রণে উদ্ভাবিত এণ্টিবায়োটিক কেন—সেটাই যেন ব্রডস্পেক্ট্রাম্-এর যুগারম্ভ।

সর্বশেষে এইটুকু ব'লে আমি আমার বক্তব্যের ইতি ক'রতে চাই যে—বৈদিকযুগের ভৈষজ্য ইঙ্গিত, সংহিতা যুগের অনুশীলন, আর বর্তমান যুগের ব্যবহার বিজ্ঞানের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের ভেষজবিজ্ঞানের দিক সমীক্ষা—এই ত্র্যম্বকীয় সমন্বয় এই গ্রন্থের মুখ্য সম্পর্ক। এ বোধহয় সেই পৌরাণিক উপাখ্যানের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একত্র সমাবেশ।

শর্মিত

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পরিবেশে

আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় পত্রে ভারতীয় বনৌষধি নিয়ে সুদীর্ঘ দিন ধারাবাহিক বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হ'য়েছে।

প্রথম প্রথম কেমন একটা শঙ্কা সন্দেহই পোষণ ক'রতাম, কারণ ভারতীয় বনজ সম্পদকে যে আমাদের বেদ-উপবেদের বক্তারা কত গভীরভাবে তাদের রস, গুণ, বী নিয়ে সমীক্ষণ ক'রেছেন, সে সিদ্ধান্তগুলি নিয়েই তো আমাদের আয়ুর্বেদের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু কালের চক্রনেমির অরাতলে তা কবেই যেন অন্তঃপিষ্ট হ'য়ে অবলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে, সেই বহু পুরাতন চিন্তাধারাকে আমরা একরকম উপেক্ষাই ক'রেছি কতকাল থেকে, তথাপি আমাদের সৌভাগ্য যে বিংশ শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী নবোন্মেষিত ভৈষজ্য বিজ্ঞান আমাদেরই সম্পদগুলি পুনরুদ্ধৃত ক'রেই বহু মহৌষধির অমোঘ শক্তিতে আমাদের দেহমনের ব্যাধিগুলিকে পরম আশ্চর্যের সঙ্গে নিরাময় ক'রেছেন। যেমন জটামাংসী, সুনিষন্নক (সুষুণী), করবী, সর্পগন্ধা, নিগুণ্ডী (নিসিন্দা) প্রভৃতি।

বৈজ্ঞানিকদের এই উদার চিন্তাধারার অনুপ্রেরণাতেই আমার নিবন্ধ রচনার প্রয়াস। তারপর একটির পর একটি করে আনন্দবাজারে সেগুলি ছবিসহ প্রকাশিত হ'তে লাগলো, এবং এইভাবে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কেটে গেল। বহু পাঠকের কাছ থেকে অনুরোধ আসতে থাকে এই নিবন্ধগুলিকে সংযোজিত ক'রে একখানি গ্রন্থ রচনা করা হোক।

সেই পরিকল্পনায় বিজ্ঞাপনও দেওয়া হ'লো; অচিরেই এই গ্রন্থ মুদ্রিত হ'চ্ছে—কার প্রয়োজন আছে সেটা জানাতে। সমগ্র দেশ থেকে (অবশ্য বাংলা যাঁরা প'ড়তে পারেন) চিঠি এ'লো অন্যূন আট হাজার। একটু আশ্চর্যই লাগে—কারণ এ জীর্ণ-শীর্ণ সম্প্রদায়কে আজও দেশের মানুষ এত ভালবাসেন? তাতেই আরও উৎসাহিত হলাম।

এই বৈজ্ঞানিক যুগেও এদেশে যে এখনও গাছ-গাছড়ার যোগ দিয়ে চিকিৎসা করাতে চান এবং সেটা শুধু বিশ্বাসের বশেই তাঁরা তা চান তা নয়, এটা আমাদের ভারতেরই নিজস্ব বিজ্ঞান সম্পদ এ ধারণা অহেতুকও নয়। তবুও এতদিন যে তাঁদের এ সম্পর্কে অমনোযোগিতা ছিল, তার কারণ হয়তো তাঁরা তেমন নির্ভরশীল পথ-প্রদর্শক দেখতে পাননি, তাই এই শাস্ত্রের উপরও তাঁদের আস্থা শিথিল হ'য়েছে।

যা হোক, ১৩৮৩ সালের পয়লা বৈশাখ "চিরঞ্জীব বনৌষধি" নামে বই বেরুলো। সকলের কাছ থেকে আনুকূল্য ও সহযোগিতাও প্রচুর পেলাম।

আমার সাধনা ও শ্রম যে সার্থক হ'য়েছে, সেটা বিদগ্ধ গুণিজনের বাণীই তার সাক্ষ্য দেয়।

চিরঞ্জীবের প্রথম খণ্ডে ৬২টি গাছের বর্ণনা গুণ ও প্রয়োগবিধি লেখা হ'য়েছিলো।

যাঁরা চিরঞ্জীব বনৌষধি কিনেছেন বা প'ড়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে পুনরায় তাগিদ আসতে লাগলো যে, বহু সাধারণ গাছ সম্বন্ধে এখনও লেখা হয়নি; সেগুলিকে নিয়ে আরও একখানি খণ্ড যেন প্রকাশ করি।

তার সঙ্গে আর একটি প্রশ্নও তুলে তাঁরা অনুরোধ ক'রেছেন যে ভেষজগুলির যথার্থ প্রয়োগক্ষেত্র এবং তাদের ব্যবহারের মাত্রা সম্পর্কে যেন আরও একটু বিশদ ক'রে লিখি।

তাছাড়া কেহ কেহ এ প্রশ্ন ক'রেছেন যে ঔষধগুলির ব্যবহারকাল কতদিন? সেটাও যেন এর সঙ্গে নির্দেশ থাকে।

এ'দের এইসব অভিমতের উত্তর দিয়ে চিরঞ্জীবের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হ'লো; অনেকের জ্ঞাতব্য প্রশ্ন—ভেষজটি কতদিন ব্যবহার করতে হবে, তার সময় নির্ধারণ ক'রে দেওয়া। এখন রোগের ভোগকাল কতদিন ধ'রে চ'লছে সেটা না জেনে তার সময়-সীমা নির্ধারণ করা কি সম্ভব? তবে এটাও ঠিক যে রোগের উপশম বা নিরাময় হ'লেই তো ওষুধের প্রয়োজন থাকে না, অর্থাৎ গীতার সেই কথা নীরুজস্য কিমৌষধম্?

আর একটা কথা—এই দ্বিতীয় খণ্ডে আমার সতীর্থ বৈদ্যবন্ধুদের সুবিধার্থে "বৈদ্যকের নথি" নামে পৃথক স্তম্ভের দ্বারা চিকিৎসকদেরই বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশ করা হ'য়েছে। এভিন্ন এই খণ্ডে চরক-সুশ্রুতে জ্যোতিষীর পন্থা বা জ্যোতিষী-পন্থা নামে পরিশিষ্টাংশে আরও একটি অধ্যায়ের সংযোজন করা হ'য়েছে। সনাতন ধর্মের অচলায়তন প্রতিষ্ঠার মত ধারণা আছে—নাড়ী দেখেই রোগ নির্ণয় করাটা আয়ুর্বিজ্ঞানের মৌল পরিচয়। তারই দ্বারা বায়ু, পিত্ত, কফের গতি বিচার করে রোগ নির্বাচন করা হ'তো। এ তথ্যটা কিন্তু চরক, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভট এই বৃদ্ধত্রয়ী সংহিতাগ্রন্থের কোন অধ্যায়েই পাওয়া যায় না; এটা পরবর্তীযুগে তান্ত্রিক বা আরবীয়দের সমীক্ষালব্ধ অনুভূতি মাত্র।

তবে চরক-সুশ্রুতে এটা আছে যে ব্যক্তির প্রকৃতি, দেহের গঠন এবং তার আহার্যের পরিপাক শক্তি দেখেই তার রোগ নির্বাচন করার নির্দেশ।

সেইটাই এবার এই খণ্ডের পরিশিষ্টাংশে নূতন সংযোজন।

এই গ্রন্থের উল্লেখিত যোগগুলির অধিকাংশই ঋষিপ্রতিভ কবিরাজ গঙ্গাধরের আমল থেকে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যগণ কর্তৃক পরীক্ষিত সিদ্ধ যোগাবলী, যেগুলিকে যক্ষের ধন বা গুহ্যমন্ত্রের মত আঁকড়ে ধ'রে রেখেছিলেন তাঁর উত্তরসূরিগণ; সেগুলির অংশ বিশেষ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হ'য়েছে।

এই সংগ্রহকার্যে সাহায্য ক'রেছেন আমার পরম সুহৃদ আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী মহাশয়। তাছাড়া তাঁর পিতৃব্য স্বর্গত বারাণসীনাথ গুপ্ত

বৈদ্যরত্ন মহাশয়ের ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ সিদ্ধযোগগুলিও যাতে জনকল্যাণের কাজে লাগে সেজন্য সেগুলিকেও এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে।

সর্বশেষে জানাই যে—এই দ্বিতীয় খন্ডের সংকলনটি যাঁদের সৌহৃদ্য-সহযোগিতায় পূর্ণ হ'লো তাঁদের মধ্যে ডঃ এস. আর. দাস, এম্, এস্-সি, পি-এইচ ডি, দেখেছেন বোটানীর অংশটি। ডঃ দেবাশিস মালাকার, এম্, এস্-সি, পি-এইচ ডি, সংকলন ক'রেছেন Chemical composition অংশটি, ডাঃ চিন্ময় ভট্টাচার্য এম, এ, বেদান্ত-তীর্থ, এম, বি, বি, এস (কলি) এল, টি, এম, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী মহাশয় দেখেছেন পাশ্চাত্য চিকিৎসা সম্পর্কীয় তথ্যগুলি, আর লোকায়তিক কিছু কিছু যোগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন কবিরাজ শ্রীমান্ সুবলকুমার মাইতি আয়ুর্বেদতীর্থ। এ'রা ছাড়া আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শ্রীসুধেন্দুকুমার গুহ মহাশয়কে—যিনি ধৈর্য নিয়ে আমার এই সমগ্র গ্রন্থটির প্রুফ সংশোধন ক'রে এটিকে নির্ভুল করার জন্য নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

এই দ্বিতীয় খন্ডের ভেষজগুলি আর্তজনের রোগোপশমে ব্যবহৃত হ'লে আমার শ্রম সার্থক হবে ব'লে মনে করি।   ইতি—

বিনীত

গ্রন্থকার

কবিরাজ শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য কর্তৃক লিখিত 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র ২য় খণ্ড প্রকাশিত হ'চ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। এরূপ একটি বইয়ের যে সত্যি প্রয়োজন ছিল— তা বইটির ২য় খণ্ডের আত্মপ্রকাশ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, বইটি প্রথম খণ্ডের মতোই সর্বাঙ্গসুন্দর হবে এবং পূর্বের ন্যায় এই খণ্ডটিও যে সুধীমহলে সমাদর লাভ ক'রবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

বলা বাহুল্য যে শ্রীভট্টাচার্য নিজে এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ব'লে স্বীকৃত। স্বভাবতঃই সুলিখিত আহরণ ছাড়াও তাঁর নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে তিনি গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ বিশ্লেষণ ক'রেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি দ্রব্যগুলির রাসায়নিক তথ্যগুলিও সুচারুরূপে সংগ্রহ ক'রেছেন। প্রথম খণ্ডের মত এই খণ্ডেও প্রতিটি গাছের বৈজ্ঞানিক (বোটানিকাল্) নামগুলি দিয়েছেন।

সুরচিত এই পুস্তকের কেবলমাত্র চিকিৎসক, গবেষক বা ছাত্রসমাজ কেন, সাধারণ গৃহস্থ ও বিশেষ ক'রে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে বিশেষ সমাদৃত হবে।

রাসায়নিক যে তথ্যগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি আমারই ছাত্র ডঃ দেবাশিস মালাকার কর্তৃক সংকলিত। এই পুস্তকটি উদ্ভিদ্-বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাকার্যে বিশেষ সহায়ক হবে।

অসীমা চট্টোপাধ্যায়

২৭-৬-৭৭

ডিন্, বিভাগীয় প্রধান ও খয়রা অধ্যাপক (রসায়ন),
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

"চিরঞ্জীব বনৌষধি" পুস্তকখানি অতিশয় যত্ন সহকারে লিখিত হয়েছে, কয়েক পৃষ্ঠা পড়লেই এই ধারণাটি জন্মে। প্রতি ছত্রে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার পরিচয় লাভ করা যায়। পুস্তকখানি প্রকৃতরূপে কার্যকরী ও ব্যবহারোপযোগী ক'রতে গ্রন্থকারের সর্বপ্রকার প্রয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার প্রশংসার যোগ্য।

প্রত্যেক ওষধির জন্যে আয়ুর্বেদ, পৌরাণিক সাহিত্য, প্রচলিত প্রবাদ উদ্ধৃত করে ইহার ব্যাপক ও বিশিষ্ট ব্যবহারাদি দেখানো হয়েছে। ইহা ব্যতীত প্রতিটি ওষধির বিভিন্ন নাম, প্রাপ্তিস্থান, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির সঙ্গে সুচারুরূপে পাঠককে পরিচিত করা হ'য়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে তাদের গুণাগুণ বিচার এবং আধুনিক রাসায়নিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে তাদের উপাদান ও সংগঠন সাহায্যে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা প্রাধান্য লাভ ক'রেছে।

কী কী রোগে কীভাবে ওষধিগুলি প্রযোজ্য, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাঠে সাধারণ পাঠকও উপকৃত হবে, এবং অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবে। যেমন জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচিত হ'য়েছে, তেমনই ভবিষ্যৎ গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কেও গবেষকদের সচেতন করা হয়েছে।

কেবলমাত্র ঔষধই যে রোগ প্রতিকারের ক্ষমতা রাখে না, বরং পথ্য ও খাদ্যের উপরও বহুলাংশে রোগোপশম নির্ভর করে, সেই দিকে গ্রন্থকার সুস্পষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন। পথ্য ও খাদ্য নির্বাচনে তিনি স্থানীয় ও সহজলভ্য সামগ্রীর উপর অধিকতর আস্থা প্রকাশ ক'রেছেন। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে টোট্‌কা ঔষধাদি কেবলমাত্র কুসংস্কারজাত নয়, তাদেরও অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা সম্ভব। পুস্তকখানির বহুল প্রচার ও ব্যবহার অতিশয় বাঞ্ছনীয়।

সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়
২৪/৫/৭৭

উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মান্যবর আয়ুর্বেদাচার্য মহাশয়,

আপনার 'চিরঞ্জীব বনৌষধি' চিরজীবী হবে, আমি বিশেষভাবে আশা করি। বইখানি আমি তিন-চার বার পড়েছি এবং পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। ইতিমধ্যে কয়েকজনকে আপনার এই বই-এর কথা বলেছি।

একটি বিষয়ে আমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হ'য়েছি। আপনার এই মূল্যবান বইটিতে একাধারে ভেষজ বিজ্ঞান ও ভেষজ সাহিত্য দুইটি বিষয়ই পরিস্ফুট হয়েছে।

আপনার লেখা এর আগে বাংলা সংবাদপত্রে পড়েছি কিন্তু একত্রে এতগুলি গাছের বিষয়ে বিশদ বিবরণ সম্বলিত এই বইটি চিত্তাকর্ষক হ'য়েছে।

এই বই লেখার বিষয়ে আপনাকে কি কঠোর পরিশ্রম ক'রতে হ'য়েছে তাহা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। বহুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের একাংশ এই পুস্তকাকারে দেখে আমি বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। আমি মনে করি, ভেষজ বিজ্ঞানের ছাত্র শিক্ষক গবেষক সকলেরই বইখানি বিশেষ উপকারে লাগবে। গাছের ছবিগুলি দেখলে আপনার বহুদিনের ও বহুপরিশ্রমের অর্জিত সংগ্রহের কথা মনে পড়ে। গাছের এই স্বাভাবিক ছবিগুলি গাছ চিনবার কাজে বিশেষ সুবিধাজনক। জ্ঞানের জন্য ও স্বাস্থ্যের জন্য সাধারণ বাঙ্গালীর ঘরেও এই বইয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে আমি মনে করি। সর্বোপরি আমি মনে করি এই বইখানির সাহিত্যিক মূল্য উচ্চস্তরের। সেই কারণে আমার মনে হয় মাঝে মাঝে ইংরাজীতে গাছের বিজ্ঞানসম্মত যে নামগুলি আছে ঐগুলি একটি বিশেষ তালিকা আকারে বইখানির পরিশিষ্টাংশে মুদ্রিত করলে হয়তো বৈজ্ঞানিকদের আরও সুবিধা হ'ত। এই বইখানির জন্য আপনি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানবেন। ইতি—

শ্রীরামনারায়ণ চক্রবর্তী

ডিরেক্টর, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ এক্সপেরিমেণ্টাল্ মেডিসিন
(অবসরপ্রাপ্ত)

Dr. A. C. Kar, M.B.B.S., D.I.H. (Cal.)
Director, Drugs Control, West Bengal
College Square West, Calcutta-7

Dated, the 25. 6. 1977.

I have gone through the book 'CHIRANJIB BANOUSHADI' written by Ayurvedacharya Sri Shivakali Bhattacharya. Sri Bhattacharya is one of the internationally renowned expert in the indigenous system of medicine. This book will go a long way to place the ayurvedic system of medicine on the scientific footing. The manufacturers of ayurvedic medicine will be immensely benefited by this book.

ACKar. 25.6.78.
(DR. A.C.KAR)

সূচীপত্র

চরক-সুশ্রুতে জ্যোতিষী-পন্থার সূচী

কলা বউ (নবপত্রিকা)

কথাটা এসেছে আবক্ষ অবগুণ্ঠনের (ঘোমটা) অন্তরালে একখানি মুখের সঙ্গে তুলনামূলক একটি ছবির সৃষ্টিতে, তাও সেটি বনজ বিভূতিকে ঢেকে। এটি বহুদিন থেকে প্রচলিত হ'লেও সম্বৎসরে আমরা দুইবার তাকে বাস্তবে দেখতে পাই—বাসন্তী পূজা ও দুর্গাপূজার মণ্ডপে। ইনি রূপপরিগ্রহ করেন নয়টি উদ্ভিদের (গাছের) সমষ্টিতে, তাদের বন্ধনরজ্জু অপরাজিতা লতা এবং তার অঙ্গ সৌষ্ঠবে দুটি স্তনের প্রতীকরূপে সংযোজিত হ'য়ে থাকে যুগ্ম বিল্বফল (জোড়া বেল), আর পরিধেয় ক'রে দেওয়া হয় রক্তরেখা পাড়ের শাড়ী, ইনি হ'চ্ছেন কলাবউরূপী নবপত্রিকা। বাসন্তী ও দুর্গা পূজা উৎসব দুইটির প্রারম্ভিক ক্রিয়ায় নবপত্রিকার স্নান সমাপনান্তে মণ্ডপে প্রবেশ। যে কয়টি গাছের সমষ্টিকে বধূ করা হয়, তাদের নাম শ্লোকাকারে লেখা হ'য়েছে, যথা—

"রম্ভা কচ্চী হরিদ্রাচ জয়ন্তী বিল্ব দাড়িমৌ।
অশোক মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা॥"

এগুলি হ'চ্ছে (১) কলাগাছ (২) কালো কচুগাছ (৩) হলুদগাছ (৪) জয়ন্তীর শাখা (৫) বিল্বশাখা (৬) দাড়িমশাখা (৭) অশোকের শাখা (৮) মানকচুর গাছ ও (৯) ধানগাছ। এইগুলিকে গ্রহণ ক'রে অপরাজিতা লতা দিয়ে বাঁধা হয়; এই গাছ নয়টির মধ্যে কলাগাছটিকে সর্বাকারে বৃহৎ ক'রে বধূ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত ক'রে তারই নামের সঙ্গে প্রাধান্য দিয়ে কলাবউ ব'লে থাকি।

এই নয়টি গাছের প্রত্যেকের আবার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। তাঁরা হ'চ্ছেন—কদলীর ব্রাহ্মণী, কচ্চীর কালিকা, হরিদ্রার দুর্গা, জয়ন্তীর কার্তিকী, বিল্বের শিবা,

দাড়িমের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা, মানবৃক্ষের চামুণ্ডা এবং ধান্যের লক্ষ্মী। এ'রাই আবার নবদুর্গা (প্রাণীর দুর্গতিনাশিনী) রূপে কীর্তিতা হন। অপর দিক থেকে এটি যে এককালের কৃষিলক্ষ্মীকে "বনদুর্গা" ব'লে পূজা করার রীতি, তারই এটি ঐতিহ্য মূর্তি। পরে তান্ত্রিকরা গ্রহণ করেছেন।

বর্তমান বস্তুনিষ্ঠ যুগে দশ বৎসর বয়সের বালকেরও জিজ্ঞাস্য থাকে—কেন এই গাছগুলিকে পূজা করা হয়, কেনই বা বধূরূপে তাকে মণ্ডপে গণেশের পাশে স্থান দেওয়া হয়েছে?

আস্তিক হ'য়েও নাস্তিকের মন দিয়ে বিচার ক'রলে দেখা যায় যে, বাংলার সুপ্রাচীন কৃষিতন্ত্রটিকেই ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরোহিততন্ত্রে রূপান্তরিত ক'রে সমাজনিয়ন্তৃগণ কৃষি-জীবনের সংস্কারটিকে মূর্তি কল্পনা ক'রে কৃষিপ্রধান সমাজেরই জনকল্যাণকর দ্রব্য-গুলিকে নিত্য বা নৈমিত্তিক পূজার উপচার সৃষ্টি ক'রে জনপদে তাদের অবলুপ্তি না হয়, তার ব্যবস্থা দিয়েছেন। এই রকম আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে একমাত্র শারদোৎ-

সবের ক্ষেত্রে সহস্রাধিক দ্রব্যের সমাবেশের প্রয়োজন হ'য়ে থাকে—যেমন পঞ্চপল্লব, পঞ্চশস্য, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, পঞ্চকষায়, সর্বৌষধি, মহৌষধি, ফুল, বিল্বপত্র, দূর্বা, তুলসী, চন্দন প্রভৃতি। এ ভিন্ন খুঁটিনাটি বহু দ্রব্য তো আছেই, সবই ভৌম, আপ্য ও বনজ সম্পদ। তারপর তন্ত্রারাধ্যা মায়ের মহাস্নানে সমুদ্রগত সপ্তনদীর জল থেকে শিশিরকণা পর্যন্ত ব্যবহার করা হ'য়েছে। যখন জলমিশ্রিত মৃত্তিকাস্নানের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, তখন দেবদ্বারের মৃত্তিকা থেকে আরম্ভ ক'রে বারবনিতার দ্বারের মৃত্তিকা পর্যন্ত বাদ পড়েনি। অর্থাৎ কৃষিমাতৃক সম্পদের সঙ্গে জানপদিক প্রাণীর সার্বিক আরাধনা।

এখন এ-প্রশ্ন মনে আসা অস্বাভাবিক নয় যে, দেবীর স্নানে এই বারবনিতার দ্বারের মৃত্তিকা ব্যবহারের সার্থকতা বা কি?

সমাজের ক্ষতশোধক স্বরূপ হ'লেও এই শ্রেণীটিকে আমরা সাধারণভাবে অবজ্ঞা-মিশ্রিত হীনচক্ষে দেখলেও, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সমাজকল্যাণকামী মনীষীগণ তাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রেছিলেন; কারণ সর্বকালের হিতাহিত বা সুরাসুর মনোবৃত্তির লোক থাকবেই। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সমাজশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এরূপ একটি গবাক্ষ পথকে উন্মুক্ত রাখা; সুতরাং এটিও তাঁদের দৃষ্টিতে উপেক্ষণীয় ছিল না—এইটাই মনে হয়। পক্ষান্তরে এটাও ভাবি যে, সেই রাজতান্ত্রিক দেবযুগেও ইন্দ্রের স্বর্গে বারবনিতা অপ্সরার কাহিনী, তেমনি সমাজের শৃঙ্খলারক্ষায় এই শ্রেণীকে বাদ দিয়েও সুরক্ষিত সেনানী রক্ষা সম্ভব নয়, তাই তারও স্থান দেওয়ার প্রবণতা এটির মধ্যে প্রভাবিত।

তা যাক—এই নবপত্রিকার নয়টি উদ্ভিদকে জনপদে কল্যাণের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার ক'রে পূজা ক'রেছেন। যদিও প্রতিটি দ্রব্যেরই সমাজে উপযোগিতা আছে, তথাপি বিশেষ গুণান্বিত সর্বদা প্রয়োজনীয় এই উদ্ভিদগুলিকে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হ'য়েছে; তবে একথা স্বীকার্য যে, এই ধরনের কৃষিলক্ষ্মীর পূজাটি বিচ্ছিন্ন হ'য়েই সর্বভারতে ছড়িয়ে আছে; যদিও এটা প্রাক্-আর্য সভ্যতার নিদর্শন।

প্রথম কদলী বৃক্ষের (Musa Sapientum) কথাই ধরা যাক—আহার্যের পাত্র-রূপে এর পত্র ধনী-দরিদ্রের নিত্যসঙ্গী। শ্রাদ্ধাদি পার্বণ পূজায় গাছের খোলা (পেটো) বিশুদ্ধ পাত্ররূপে ব্যবহারের বিধি আছে, যদিও দাক্ষিণাত্যে ও বাংলায় তার প্রচলন, এবং কারণও এইসব ভূমি ছাড়া কদলী বৃক্ষ ভাল জন্মে না, পাকা কলা উৎকৃষ্ট সুমিষ্ট ভোগ্যদ্রব্যের মধ্যে।

এখন দ্রব্যগুণের কথাই বলি—এই বৃক্ষটির এমন কোন অঙ্গ নেই, যেটিতে রোগ নিরাময় হয় না। যেমন কন্দোদ্ভবের জলে অর্থাৎ এ'টের জলে অসাধ্য হিক্কা, শিকড়ে রক্তবিকৃতি, পাত্রদন্ড রসে কর্ণশূল, ভস্মোৎপন্ন ক্ষারে সিধ্ম (ছুলি), অপক্ক কদলী ফলে অতিসার, প্রদর প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

এ ভিন্ন এর বহু অংশও আমাদের নিত্য আহার্যের উপকরণস্বরূপ, তা ছাড়া বিভিন্ন রোগেও এই গাছটির বহুলাংশ পথ্য হিসেবে ব্যবহারের অন্ত নেই।

(২) হরিদ্রা—(Curcuma domestica) সম্পর্কে ব'লতে গেলে এই কথাই ব'লতে হয়—জন্মের পর থেকে আমৃত্যু এটি আমাদের সঙ্গী হয়ে আছে। রোগজীবাণু ও ত্বক্ রোগ নষ্ট করতে এর সমতুল্য ওষধি নেই বললেই চলে। কাটা, ছেঁড়া, মচকানো বা সংক্রামক ব্যাধি সর্বক্ষেত্রেই হরিদ্রার প্রয়োজন। প্রাচীনকালের ফার্স্ট-এড্ বক্সই এই হরিদ্রা। এটি anti-allergicও বটে। এ ভিন্ন আরও বহু রোগের ক্ষেত্রে এটির ব্যবহার হয়ে থাকে।

তারপর অশোকের (Saraca indica) কথা বলি—নারীদের মাসিক ঋতু-বিপর্যয় রোধের জন্য যেকোন স্ত্রীরোগে আজও সে শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে বসে আছে। বাসন্তী-ষষ্ঠী তিথিকে অশোক-ষষ্ঠী বলা হয়।

এইদিনে এদেশে সন্তানবতী নারীকে অশোকের ৬টি ফুলের কুঁড়ি খেতে হয়; আর এই সময়ই অশোকের ফুলও হয়। স্ত্রীরোগের এই অমোঘ বনৌষধিকে জনপদের সর্বত্র অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই মনে হয় পূজোয় নবপত্রিকার অঙ্গস্বরূপ ক'রে নেওয়া হয়েছিল।

বিল্ববৃক্ষ (Aegle marmelos)—এটি মহেশ্বরের প্রিয় ব'লে কথিত। এর কোন অংশই অকেজো নয়। এই গাছের বিভিন্ন অংশে নিহিত আছে জীবকল্যাণকর উপাদান। এই বিল্বপত্র ব্রহ্মচারীদের একটি বন্ধুস্বরূপ; যৌবনের প্রারম্ভে স্বতঃপ্রবৃত্ত কামপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য এই পত্ররস খেয়ে থাকেন যুবক ও যতি সম্প্রদায়। এই পত্ররস কফবৃদ্ধি-জনিত সর্বরোগ হরণ করে, আর বিল্বফল আজীবন ঔষধ ও পথ্যরূপে আমাদের উপকারে আসে।

জয়ন্তী (Sesbania Sesban)—নামটিও রোগপ্রতিকারের সাক্ষ্য রেখে যায়। জ্বরে, ইক্ষুমেহে, মসূরিকা (বসন্ত) রোগ প্রথমাবির্ভাবকালে, প্রতিশ্যায়ে, শ্বিত্রে (শ্বেতী), বাতে গাছটির বিভিন্ন অংশ তো ব্যবহার হয়ই, অধিকন্তু কত প্রকার রোগে যে ব্যবহার হয়, তার সীমা-পরিসীমা নেই। একটি কথা বিশেষ উল্লেখ্য যে, 'গর্ভধারণ বারণায় জয়ন্তী কুসুমম্' এটা লেখা দেখি।

নবপত্রিকার একটি অঙ্গ 'মান' (মানকচু)—Alocasia indica. মানের গুণে মুগ্ধ হয়ে পূজার প্রার্থনা মন্ত্রে বলা হয়েছে—'হে মান, তুমি সুর (দেবতা) ও অসুর-গণের মাননীয়—'। আমরা দেখি রোগ-প্রতিকারে ও খাদ্য হিসেবে সে অদ্বিতীয়। এভিন্ন পত্রিকার আর একটি অঙ্গ ধান্যকে (Oriza Sativa) বলা হয়েছে—'প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী', অর্থাৎ প্রাণীগণের প্রাণদাত্রী তুমি। এভিন্ন আরও দুটি গাছকে নেওয়া হয়, একটি দাড়িম (Punica granatum) ও দ্বিতীয়টি কালো কচু। এই নয়টি গাছকে বাঁধবার জন্য রজ্জু হিসেবে যে অপরাজিতা লতার (Clitoria ternatea) ব্যবহার, সেটি শুক্ল যজুর্বেদে অপরাজিতা একটি বিদ্যার নাম এবং ঐখানেই (ঐ সূক্তে) এই অপরাজিতা যে একটি ওষধির নাম সেটাও বলা হ'য়েছে।

ভাষ্যকার মহীধর এই সূক্তটির আলোচনাকালে দুটি ইঙ্গিত দিয়েছেন—একটি তার স্মৃতি ও মেধাবর্ধনকারী শক্তির, আর দ্বিতীয়টি হ'লো অপস্মার রোগে তার কার্য-কারিতা। মনে করা যায় এই লতাকে রজ্জুস্বরূপ ব্যবহার করার মধ্যে ঐ দুটি ক্ষেত্রেরই একত্র ইঙ্গিত।

অনেকে মনে করেন—এই কলাবউ গণেশের স্ত্রী। সেই জন্যই এক গলা ঘোমটা দিয়ে দাঁড় করানো হ'য়েছে গণেশের পাশে (কিন্তু বামে নয়, ডান দিকে; বিবাহের অনুষ্ঠানের শেষে প্রথমে বধূকে দক্ষিণ পার্শ্বেই বসানো হয়, তারপর বামে)। গণেশের পাশে তাঁকে এখানে স্থাপন করা হ'য়েছে, গণ ব'ললেই কেবল মানুষ নয়, প্রাণিকুল, তাদেরই প্রতীক গণেশ, এর অর্থই হ'চ্ছে—গণেশ হ'চ্ছেন গণদেবতা অর্থাৎ জনগণের সহাবস্থানের ঐক্য-প্রতীক। তাই কোন দেবতার পূজা করার পূর্বেই ঐক্য-মূর্তি কল্পনা ক'রে প্রথমেই তাঁর পূজো আজও আমাদের ক'রতে হয়; কারণ গণদেবতা আগে, তারপর গণসমাজ।

অথর্ববেদিক এই দৃষ্টিটিকে ধর্মের অনুশাসন দিয়ে চিরন্তনী সৃষ্টি ক'রে কলাবউ

সৃষ্টিটি ছিল সমাজকল্যাণের ধারাবাহিকতার সনাতন পথ, তাকে রক্ষার জন্য সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী।

এই নবপত্রিকা বা কলাবউ-এর সৃষ্টি ও অর্চনা আমাদের ঐহিক সম্পদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।

আলোচ্য বিষয়বস্তুতে মত বা পথের পার্থক্য থাকা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হ'লেও বলা যায়—গণ ও জনের কল্যাণের পথটি আমাদের পার্থিব সম্পদের পূর্ণতা রক্ষা। জানি না এটা আমার পূর্ব-সংস্কারের রূপরেখা অথবা অথর্ববিদ্যার বৈদ্যের বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গী?

অর্ক (আকন্দ)

নদী, বৃক্ষ, পর্বত এরা মানবসভ্যতার নীরব সাক্ষী, কালের বিবর্তনে এদেরও বিবর্তন ঘটে, কিন্তু তারা মূক, তবুও মানব-মস্তিষ্কে তার রূপরেখা টানা থাকে ভাষায়, সে ভাষা যত পুরাতন ততই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির মান্যতা, তাই আমরা দেখছি অথর্ব বেদের ঋষিও তখন বৃদ্ধকাল উপস্থিত, পূর্বের ঋক্, যজুর বৈদিক সভ্যতাও তখন অনেক পিছু হ'টে চ'লেছে, জেঁকে ব'সেছে প্রাক্-আর্য সংকর সভ্যতা, তার সম্প্রসারণ সুরু হ'য়েছে, তাই শিবও তখন আর্য বংশীয়দের ধ্যান-ধারণার প্রতীক, আর পূজাও পাচ্ছেন আর্য বংশীয়দের কাছ থেকে; কিন্তু তার বনানী উপচারের পূজার্ঘ বিল্বপত্র, বিল্ব, অর্কপুষ্প, ধুস্তুর ফল ও ফুল; এগুলি কিরাতদেরই বন্য উপচারের অঙ্গ।

তা হ'লে এখন দেখা যাক অথর্ববেদ তাকে কোন্ চোখে দেখেছেন।

অর্ক স্তিগ্মেন শোচিষা যাসম্বিশ্বং ন্যাব্রিণম্।
অগ্নিস্তে ব্রণং বনতে রয়িং শোফং অপানং বরি বোদাঃ॥
(অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ১১৭।৮।১৪)

এই সূক্তটির উবট্ ভাষ্য ক'রেছেন—

অর্কঃ অর্চ্=আধারে কুত্বং (যাস্কঃ) রবিরিব=অর্কঃ অতস্ত্বং তিগ্মেন শোচিষা=তীক্ষ্ণেণ তেজসা ন্যাব্রিণং=নিতরাং অব্রিণং রাক্ষসং উপক্ষয়েণ শোফং অপানং ভক্ষয়তি তং ক্ষীণং করোতু ত্বং বরিবোদঃ =বলং দদাসি, যতঃ তব তে অগ্নিঃ ব্রণংরয়িং বনতে॥

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—অর্ক অর্চ্ ধাতু আধার অর্থে কুত্ব প্রত্যয়, বৈদিক অভিধান যাস্কের এই ব্যাখ্যা—

ওহে অর্ক! তোমার তীক্ষ্ণ তেজের দ্বারা দেহের ক্ষয়কারক, ব্রণকারক, শোথকারক রাক্ষসকে ক্ষয় কর। তুমি তোমার অগ্নির দ্বারা বল দিয়ে দেহকে ব্রণমুক্ত কর।

বৈদিক ভাষ্যে দেখা যাচ্ছে তার শক্তি তীক্ষ্ণ, এই তীক্ষ্ণত্ব পিত্তকারী, তাই তার তুলনা করা হ'য়েছে সূর্যের সঙ্গে, তার মৌল গঠনে আছে পার্থিব ও অপের প্রাধান্য, তাই তাকে বলা হ'লো আধার।

বৈদ্যকের নথি
(বেদোত্তর কালে)

অথর্ববেদোক্ত অর্ক বা আকন্দের মূল, ডাঁটা, পাতা নিয়ে পরবর্তী সংহিতাগুলির মধ্যে আমরা চরক ও সুশ্রুত অথবা আত্রেয় ও ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের দুটি চিকিৎসাগ্রন্থের মধ্যেই দেখি প্রকৃতপক্ষে এর নির্যাস বা ক্ষীর দিয়ে বাহ্য রোগের উপশমের ক্ষেত্রে যত ব্যবহার, আভ্যন্তরিক রোগের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সে হিসেবে অনেক কম; তবে এটি অগ্নিধর্মী দ্রব্য বলেই কি? চরকের প্রধান প্রধান উল্লেখ্যস্থল কুষ্ঠ (চিকিৎসিতস্থান ৭ম/৬৬ শ্লোক) এবং অপস্মারে (চিঃ ১৫/২৫), শোথে (চিঃ ১৭/৫২) এই অর্কের রস ব্যবহার করার উপদেশ।

সুশ্রুতের বৈশিষ্ট্য—অর্কের আভ্যন্তরিক ব্যবহার যেমন শ্বাসরোগে, সেক্ষেত্রে অর্কপত্র এবং পুষ্পের ব্যবহার, কিন্তু তাঁরা যে পদ্ধতিতে ব্যবহার করেছেন তার পরেই বা হবে—এর ক্বাথে ভাজা ও নিস্তুষ যবে অর্থাৎ খোসাবিহীন যবকে সাতবার নিষিক্ত ক'রে ঐ ক্বাথেই মেড়ে ওটাকে রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে শ্বাসরোগের ক্ষেত্রে মধু সহ খাওয়ানোর উপদেশ দিয়েছেন। এখানে একটা কথা ব'লে রাখি যে, এক্ষেত্রে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সম্ভব হয়নি, তাই এর মাত্রা জানানো সম্ভব হ'লো না; উত্তরসূরীদের অবগতির জন্য এটা জানিয়ে গেলাম।

পরিচিতি

চরক সংহিতায় অর্কের কোনও ভেদ আছে ব'লে বর্ণনা করা হয়নি, কিন্তু সুশ্রুত সংহিতায় শ্বেত ও রক্তবর্ণের পুষ্পের উল্লেখ দেখা যায়, আর অপেক্ষাকৃত নবীন বনৌষধির নিঘণ্টু গ্রন্থ রাজনিঘণ্টুতে চার প্রকার অর্কের উল্লেখ দেখা যায়। বর্তমানে যেটা প্রচলিত, সেটাই এখানে লিখছি—অর্কের বাংলায় প্রচলিত নাম আকন্দ, গাছ ৮।১০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হ'তে দেখা যায়, পতিত নীরস জমিতেও তার বাড়বাড়ন্ত কম হয় না, গাছে দুধের মত আঠা (ক্ষীর) আছে। দু' রকম রংয়ের ফুল আমরা দেখতে পাই, সাদা ও অল্প বেগুনী; সাদা ফুলের গাছকে বলা হয় অলর্ক, যেটাকে আমরা বলি শ্বেত আকন্দ, হিন্দিভাষী অঞ্চলে বলেন 'সফেদ্ আক্' এবং 'মন্দার'ও ব'লে থাকেন। বৎসরের প্রায় সব মাসেই ফুল দেখা গেলেও ফুলের প্রকৃত সময় ফাল্গুন-চৈত্র মাস। এর ফলগুলি শিমুল গাছের ফলের মত আর টিয়া পাখীর ঠোঁটের মত বাঁকা, ভিতরে তুলোও থাকে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে এর তুলো কলকাতায় আমদানি হয়, এর তুলোয় বালিশ তৈরী হয়। পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের মতে এর দুটি প্রজাতি—একটি হলো Calotropis gigantia R.Br. আর দ্বিতীয়টি হ'লো Calotropis Procera R. Br., এদের ফ্যামিলি Asclepiadaceae. এই গণের ৩টি মাত্র প্রজাতি। সেটা সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকায় পাওয়া যায়।

লোকায়তিক ব্যবহার

১। **হাঁপানি রোগেঃ—** ১৪টি আকন্দ ফুলের (সাদা হ'লে ভাল হয়) মাঝখানের চৌকো মুণ্ডিত অংশটি নিতে হয়, তার সঙ্গে ২১টি গোলমরিচ দিয়ে একসঙ্গে বেটে ২১টি গুলি (বড়ি) ক'রে শুকিয়ে নিতে হয়। প্রত্যহ সকালে একটি ক'রে বড়ি জল

সহ খেতে হয়, খানিকক্ষণ বাদে একটু দুধ খেতে হয়, আর পথ্য হিসেবে এই ২১দিন শুধু দুধ-ভাত বা দুধ-রুটি খেয়ে থাকতে হয়, এটাতে অনেকের উপশম হ'য়ে যায়, তবে এটা কতটা বৈজ্ঞানিক সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে; তা ছাড়া হাঁপানি ও তার সঙ্গে হৃদ্‌যন্ত্রের দৌর্বল্য এসেছে বা আছে অথবা কার্ডিয়াক্ এ্যাজ্‌মা (Cardiac asthma) আছে, তাঁদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সমীচীন হবে না ব'লে মনে করি; তবে এটাও ঠিক, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হ'তে থাকলেই যে হাঁপানি হ'য়েছে, এটা মনে করা ঠিক হবে না; যদি দেখা যায় কফের প্রবণতার সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হ'তেই থাকে, তখনই চিন্তার ক্ষেত্র হয় এটা শ্বাসরোগ কিনা।

২। **অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও অম্লরোগেঃ—** আকন্দের পাতা অর্ধশুষ্ক ক'রে তার সঙ্গে সমান পরিমাণ সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে, তবে এই মাত্রাটা অনেকটা ঠিক হবে, যদি কাঁচা পাতার ৮ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ কাঁচা ওজনের ১/৮ ওজন সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে (এটা আসল হওয়া চাই, কারণ এখন প্রায় সব সৈন্ধবই নকল বিক্রি হ'চ্ছে) হাঁড়ির মধ্যে পুরে, মুখটা সরা দিয়ে বন্ধ ক'রে মাটি লেপে, শুকিয়ে, ঘুঁটের আগুনে পোড়া দেওয়া হয়, তারপর ঐ কাল দ্রব্যটি বের ক'রে একসঙ্গে গুঁড়ো ক'রে নিতে হয় (একেই বলে অন্তর্ধূমে পোড়ানো)। এই চূর্ণ আধ গ্রাম মাত্রায় আহারান্তে জল দিয়ে খেতে হয়। এককালে এটা ছিল আমাদের গুপ্ত।

বাহ্য প্রয়োগের (External application) **কয়েকটি যোগ।**

৩। **হাঁপানিতেঃ—** আকন্দগাছের মূলের ছাল শুকিয়ে চূর্ণ ক'রে আকন্দের আঠা দিয়ে মেড়ে শুকিয়ে নিয়ে এটাকে বিড়ির পাতায় মুড়ে বিড়ি তৈরী ক'রে সেটাকে ধরিয়ে তার ধোঁয়া টানলে হাঁপের টানের লাঘব হয়।

৪। **অর্শের বলিঃ—** যাঁদের অর্শের বলি বাইরে বেরিয়ে রয়েছে, তাঁরা ঐ পাতার চূর্ণ আগুনে দিয়ে সেই ধূম লাগালে কয়েকদিনের মধ্যেই চুপসে যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে খসেও যায়। এ ব্যবস্থাটা আছে চরক সংহিতায়।

৫। **ব্রণ ফাটাতেঃ—** আকন্দের পাতা দিয়ে ব্রণ চেপে বেঁধে রাখার উপদেশ, এ কথাটার উল্লেখ কিন্তু অথর্ববেদেই আছে।

৬। **বিছে কামড়ের জ্বালায়ঃ—** দষ্টস্থানে এর আঠা লাগালে যন্ত্রণার উপশম হয়, এমন কি পাতা বেটে লাগালেও কমে যায়।

৭। **উরুস্তম্ভ রোগেঃ—** জলে অল্প তেল মিশিয়ে একটি পাতা সিদ্ধ ক'রে, সেই জল ছেঁকে নিয়ে সেই ক্বাথ ২/৩ বারে একটু একটু ক'রে খেলে উরুস্তম্ভ ধীরে ধীরে চুপসে যায়, আর ফোলে না বা পাকে না।

৮। **দূষিত ক্ষতেঃ—** একটি আকন্দ পাতা জলে সিদ্ধ ক'রে ঐ ক্বাথ দিয়ে ধুতে হয়, এটাতে পুঁজ সৃষ্টির উৎস রুদ্ধ করে।

৯। **কুষ্ঠের প্রথমাবস্থায়ঃ—** আকন্দের পাতা শুকিয়ে নিয়ে তার ৩ গ্রাম, ছাতিম (Alstonia Scholaris) ছাল ৫ গ্রাম একসঙ্গে ৫০০ মিলিলিটার জলে (আধ সের আন্দাজ) সিদ্ধ ক'রে ১২৫ মিলিলিটার অর্থাৎ চতুর্থাংশ থাকতে নামিয়ে পুরু ন্যাকড়ায় ছেঁকে নিয়ে দুধের সঙ্গে খেলে (১ দিন অন্তর খেতে হয়) এবং দুধ মিশানো জলে ধুতে হয়। এর দ্বারা কিছুদিনের মধ্যে রোগমুক্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়।

১০। **বুকে সর্দি বসায়ঃ—** হাঁসফাঁস ক'রতে হ'চ্ছে, সে ক্ষেত্রে বুকে পুরনো ঘি মালিশ ক'রে, আকন্দ পাতা গরম ক'রে, সেই পাতা দিয়ে সেক দিলে সর্দি উঠে যায়।

১১। **হেঁড়ে মাথাঃ—** অনেক সময় দেখা যায় শিশুর মাথাটা অস্বাভাবিক বড়, সে ক্ষেত্রে আকন্দ তুলোর বালিশ ক'রে শোয়ালে মাথাটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যায়। এটা সাধারণতঃ এক বৎসরের মধ্যে ব্যবহার করা উচিত।

১২। **সান্নিপাতিক দোষেঃ—** কানে পুঁজ, মাথা ভার, কান দিয়ে জল গড়ানো, এক্ষেত্রে প্রাচীন মত হ'লো উর্ধ্ব জত্রুতে শ্লেষ্মার আধিক্য আর সেখানকার অগ্নিবল কম থাকা, এখানে ঐ আকন্দের তুলোর বালিশে শোয়ালে ঐ দোষটা আস্তে আস্তে চলে যায়।

১৩। **খোস ও একজিমায়ঃ—** সরষের তেল আগুনে চড়িয়ে নিষ্ফেন হ'লে, আকন্দের আঠা তেলের সিকি ভাগ দিয়ে পাক করতে হয়, তারপর নামাবার সময় একটু কাঁচা হলুদের রস দিয়ে নামাতে হয়। ঐ তেল লাগালে ঐ ধরনের রোগগুলি সেরে যায়।

এই নিবন্ধের শেষে একটা কথা মনে হ'চ্ছে—প্রকৃতিই তো বস্তুসত্ত্বার স্রষ্ট্রী, আর শিব তো স্বয়ং চেতন স্বরূপের প্রতীক, তা হ'লে প্রকৃতিসত্ত্বার জড় বস্তুগুলিই যদি তাঁর অঙ্গভূষণ হয়, আর যত অবহেলিত জিনিসকেই যেন প্রাধান্য দিয়ে তিনি নিজের ভূষণ ক'রেছেন, যেমন বিল্বপত্র, রুদ্রাক্ষ, এই রকম অর্কও তো তাদের একটি। এই দ্রব্যটির কাজ তার বীর্যবত্তায়, তাই কি এটি তাঁর প্রিয় দ্রব্য হিসেবে তাকে দেহে ধারণ ক'রেছিলেন? সে ইঙ্গিত কিন্তু আমরা আজ আর পূর্বসূরিগণের সূত্র থেকে খুঁজে পাচ্ছি না, তাই আজ এই দ্বিধা-চিন্তায় ভারাক্রান্ত।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Akundarin, calotropin, uscharin, calotoxin, calactin, β-calotropeol, β-amyrin, calcium oxalate, gigantin, glutathione, giganteol, iso-giganteol. (b) A proteoclastic enzyme similar to papain. (c) Crystalline alcohols, long chain fatty acids. (d) Tetracyclic terpenes, esters of waxy acids and alcohols.

হিলমোচিকা

গল্প শুধু গল্প হ'লেই কি ভাল? তার মধ্যে যদি স্বল্পও সংগতি থাকে তবেই না সে গল্প।

আজকের যুগের গল্পে আর সে-যুগের গল্পে ব্যতিক্রম এইখানেই।

নিবন্ধটা লিখতে ব'সে ভাবছি, সে গল্পের সমীক্ষায় কি ছিল, তারই একটা ইঙ্গিতে কি এইটাই পাওয়া যায় যে, এই ভেষজটির নাম তার আঙ্গিক বিচারে না গুণ বিচারে? তাও বিচার্য।

তা সে যা হোক, নামের উৎসটাই আগে দেখা যাক।

এখানে একটা কথা আগেই মনে পড়ে যায়, দ্বাদশ শতকের মহাকবি শ্রীহর্ষ তাঁর নৈষধ চরিত উপাখ্যানের নায়িকা দময়ন্তীর নলের প্রতি পূর্বরাগ বর্ণনায় তিনি চক্রাঙ্গকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন নলের কাছে; কিন্তু সেই চক্রাঙ্গ বুঝতে ষষ্ঠ শতকের অমরকোষের সাহায্যেই বোঝা গেল যে, এই চক্রাঙ্গ হলো হংস, আবার সেই চক্রাঙ্গের আর একটি পর্যায় শব্দও হিলমোচিকা; এদিকে ভেষজ হিলমোচিকার নামটি যখন চক্রাঙ্গীতে পাওয়া গেল, তখন নৈষধের চক্রাঙ্গকে এখানে উপস্থাপিত করা সমীচীন হবে না; তাহলে এখন নামটির মধ্যে আরও অন্য কোন অর্থকে উপজীব্য ক'রে এগিয়ে দেখাই সমীচীন।

অথর্ববেদিক উপবর্হণ সংহিতায় ৫।৪১।২২৭ সূক্তে উল্লেখ আছে—

> অবসৃষ্টা পরাপত চক্রাঙ্গে ব্রহ্ম সংশিতে।
> গচ্ছামিত্রান্ প্রপদ্য স্ব মামীষাং কং চ নোচ্ছিষ॥

এই সূক্তটির উবট্ ভাষ্য ক'রেছেন—

ব্রহ্মণা মন্ত্রেণ সংশিতা তীক্ষ্ণীকৃতা চক্রাঙ্গা ত্বং বিষঘ্নী।
ত্বম্ অবসৃষ্টা অস্মাভির্মুক্তা পরাপত শরীরে পতিতা ভব।
চক্রং=রুচিকরং অঙ্গং অস্যা ইতি চক্রাঙ্গা। সাতু হিলমোচিকা।
অমিত্রান্ শত্রূন্ গচ্ছ প্রাপ্নুহি অমীষাং শত্রূণাং=জীবশোণিত
শত্রূণাং মধ্যে কং চ ন উচ্ছিষ=সর্ব্বান্ ভেদয়।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—ব্রহ্মার মন্ত্রের দ্বারা তোমার তীক্ষ্ণতা সাধিত। তাই তুমি চক্রাঙ্গা, তুমি বিষঘ্নী, তুমি আমাদের দ্বারা অবসৃষ্ট হয়ে (নিক্ষিপ্ত হয়ে) শত্রুর শরীরে প্রবেশ কর। রুচিকর অঙ্গ, তাই তোমার নাম চক্রাঙ্গা; এখানে এই চক্রাঙ্গাকে বৈদিক অভিধানে যাস্ক ব'লেছেন হিলমোচিকা। উপবর্হণ সংহিতার ভাষ্যকার উবট্ও চক্রাঙ্গাকে হিলমোচিকা ব'লেছেন।

যাস্কের ব্যাখ্যায় দেখা যায় হিল শব্দটি রতিকে, মৌল শক্তি বা ধাতুকে বোঝায়

এবং সেটিকে মোচিকা অর্থাৎ যে মুক্ত করে সেইটি হিলমোচিকা অর্থাৎ মালিন্যকে দূর করে। এখানে জলজ এই ভেষজ লতাটি হিলমোচিকা। অন্যত্র এই হিলমোচিকা শব্দটির প্রয়োগও হ'তে পারে, তবে এখানে এটি একটি ভেষজ।

উবট ব'লেছেন, এই ভেষজটিকে ঋষি ব'লেছেন তুমি আমাদের দ্বারা অবসৃষ্টা হ'য়ে জীবশোণিতের যে শত্রু, তার মধ্যে প্রবেশ কর, তাকে ভেদ কর।

বৈদ্যকের নথি

(নাম ও ভাষ্যের অনুশীলন)

(১) এই নামকরণ এবং তার তাৎপর্য বিচার ক'রেই মনীষীগণ যেটি নিরূপণ ক'রেছেন সেইটাই ব্রহ্মোক্তি নামে বর্ণিত করা; এতে ইঙ্গিতই বহন ক'রে, আজ আমাদের হিলমোচিকা নামটিও সেই রকম। এই নামটি তার গুণবাচী অর্থাৎ সে জীবশোণিতের ঔজ্জ্বল্যনাশক দোষকে নষ্ট করে, তাই সে হিলমোচিকা—এই শব্দটি সার্বজনিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হ'লেও তার বিশেষ শক্তি এইটাই ব'লে এই নামে তার প্রসিদ্ধি।

(২) **তুমি বিষঘ্নী**—এটিও তার গুণবাচক প্রতিধ্বনি।

(৩) তুমি অবসৃষ্টা হয়ে শত্রুর শরীরে প্রবেশ কর, এখানে শরীরের মলাংশকে ভেদ করাই ধ্বনিত হয়েছে।

(৪) **চক্রাঙ্গী**—এখানে চক্র শব্দের অর্থ ঔজ্জ্বল্যকারক, তাই সে চক্রাঙ্গী।

(৫) আর একটা কথা—নৈষধের চক্রাঙ্গ হংস হ'লেও তার দেহের চিক্কণতা এই ভেষজের গুণবত্তায় যে পাওয়া গেল না তা নয়, সুতরাং রূপগত সমীক্ষায় হংস শব্দটিও এক্ষেত্রে নিরর্থক নয়।

এখানে বৈদিক সূক্তের লক্ষ্য চক্রাঙ্গ শব্দটির অর্থ দীপ্তিকর এবং ভাষ্যকর সে অর্থটিকে আরও পরিস্ফুট ক'রেছেন হিলমোচিকার নামে। দেহের রতি বা কান্তি যদি নিষ্প্রভ হয়ে যায়, তার সঙ্গে আরও আনুষঙ্গিক কারণ থেকে যায়—সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের কর্তব্য, যে ভেষজের দ্বারা তার মালিন্য দূর করা যায়।

এখানে প্রশ্ন ওঠে, দেহের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য কার দ্বারা সৃষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে চরক-সুশ্রুতের বক্তব্য—আমাদের ত্রিধাতু (বায়ু, পিত্ত ও কফ) বিজ্ঞানের অন্যতম মৌল পদার্থ পিত্ত, এই ধাতুটি স্বভাবে থাকলেই দেহের ঔজ্জ্বল্য থাকে, আর বিকৃত হ'লেই মলিনতা সৃষ্টি করে।

কথাটা খুলে বলি—পিত্ত উষ্ণগুণসম্পন্ন দ্রব্য, তীক্ষ্ণধর্মী, দ্রব, অম্ল এবং কটু, এটি স্বভাবে থাকলেই অগ্নিবল ক্লেশসহিষ্ণুতা, পরাক্রমশালিতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকার লাভ করা, আর দেহটি হয় ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী, এটি বিকৃত হ'লেই বিপরীত।

এই বিকারের একটা বিশেষ আগন্তুক উপসর্গ হ'লো রক্তকণিকার স্বল্পতা বা হ্রাস ও শ্বেতকণিকার বৃদ্ধি।

এক্ষেত্রে যে ভেষজে তিক্তরসের প্রাধান্য এবং কষায় রস তার অনুষঙ্গী থাকে, সেই ভেষজ এক্ষেত্রে উপযোগী, তাই হিলমোচিকার (হিঞ্চের) ব্যবহার। সংক্ষেপে এইটাই সিদ্ধান্ত যে, যেখানে কফ এবং পিত্তদোষে রোগ সৃষ্টি হবে সেখানেই হিলমোচিকা কার্যকরী হবে, সে যে রোগই হোক। তাই বৈদ্যক সম্প্রদায় এই ক্ষেত্রগুলিতে হিঞ্চের ব্যবহার ক'রে আসছেন।

প্রথমেই এই ভেষজটির পরিচিতি সম্পর্কে একটু জানিয়ে রাখি—

এটি জলজ শাক। আসাম, উড়িষ্যা, বিহারে জন্মালেও বাংলাদেশের যত্রতত্র বিলে, খালে ও পুকুরে জন্মে এবং জলের সন্নিকটস্থ কিনারায় হতে দেখা যায়, তবে লবণাক্ত জলে হয় না; বাংলায় এটি সহজপ্রাপ্য। শাকটি স্বাদে তিক্ত কষায়, এর চলতি নাম হিঞ্চে বা হেলেঞ্চা, উড়িষ্যার অঞ্চলবিশেষে একে বলে হিড়ুমিচি। হিন্দিতে বলে হুরহুল্। এটির বোটানিক্যাল্ নাম Enhydra fluctuance Lour., ফ্যামিলি Compositae.

লোকায়তিক ব্যবহার

১। **শরীরের ভারবোধেঃ—** আপনি রোগা না মোটা সে কথা নয়, যেন নিজের শরীরটা নিজের নয়। এই ক্ষেত্রে হিঞ্চে শাকের রস ২ চা-চামচ একটু গরম ক'রে সকালে ও বৈকালে দু'বার খেতে হয়, এর দ্বারা এই অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

২। **খোস চুলকানিতেঃ—** যাঁদের বর্ষা বা শীতে এই উপসর্গটি জোটে, তাঁরা ২/৩ চা-চামচ হিঞ্চের রস একটু গরম করে সকালের দিকে খাবেন. এটা থেকে রেহাই পাবেন।

৩। **অপরিপাক দাস্তেঃ—** যাকে বলা হয় 'ভস্কা' এরূপ মল, তার সঙ্গে উৎকট গন্ধ থাকলে সেক্ষেত্রে হিঞ্চের রস ১ চা-চামচ গরম ক'রে সকালে অথবা বৈকালে খাওয়া ভাল। বালকদের ক্ষেত্রে ৩০ ফোঁটা। এর দ্বারা ঐ দোষটা চ'লে যাবে।

৪। **অকারণে অগ্নিমান্দ্যঃ—** হ্যাঁ, কারণ না থাকলে তো হবে না, কিন্তু কারণটা ধরা প'ড়ছে না, সেটা হ'লো বিকৃত শ্লেষ্মার ছোঁয়াচ তাতে থাকবেই, যার জন্যে পিত্ত সেখানে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে না অথবা করে না। এ অসুবিধেটা দূর ক'রতে পারে হিঞ্চের রস, খেতে হবে ১ চা-চামচ একটু গরম ক'রে।

৫। **বিস্বাদেঃ—** জিভে একটা সর প'ড়ে আছে, মুখে কিছু ভাল লাগে না, সবেতেই অরুচি, এক্ষেত্রে ২ চা-চামচ হিঞ্চের রস গরম ক'রে কয়েক দিন খেলেই ঐ অসুবিধেটা চলে যাবে।

৬। **বাতের ভীতিতেঃ—** বাত হওয়ার তো কথা নয় কিন্তু কোমরের নিচের অংশটা আড়ষ্ট, ব্যথা এবং কোন কোন সময় রাত্রের দিকে পায়ের পেশীতে খি'চে ধরা, এগুলি কিন্তু বিকৃত কফের ক্রিয়া; এক্ষেত্রে হিঞ্চের রস ২ চা-চামচ একটু গরম ক'রে সকালের দিকে খেতে হবে।

৭। **হাত-পা জ্বালায়ঃ—** এর সঙ্গে মুখেও গরম ভাপ্ বেরোয়, চোখও জ্বালা ক'রছে (অবশ্য এটা বর্ষা এবং শরৎকালেই বেশী দেখা দেয়), এক্ষেত্রে ২ চা-চামচ রস গরম না ক'রে কাঁচা দুধ মিশিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ অসুবিধেগুলি চ'লে যাবে।

৮। **খোস পাঁচড়াঃ—** সারছে না, এমন কি কোন জায়গায় ছড়ে গেলেই ঘা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সারতে চায় না, সেক্ষেত্রে হিঞ্চের রস ২ চা-চামচ একটু গরম ক'রে দু'বার খেতে হয়।

৯। **নিম্নাঙ্গের শোথেঃ—** দেখা যাচ্ছে কোমর ও পা দুটো রোজ ফুলে যায়,

বিশ্রাম করলে কমে, এক্ষেত্রে কফাশ্রিত বায়ুই এর কারণ (অবশ্য হৃদ্‌রোগেও অনেক সময় পায়ে ফুলো দেখা যায়, সেক্ষেত্রে এটি ব্যবহার্য নয়)। উপরিউক্ত ক্ষেত্রে হিঞ্চের শাক বেটে পায়ে বা কোমরে প্রলেপ দিলে ওটা কমে যায়।

১০। **ঘামাচিতে:—** দেশগাঁয়ে একটা কথা আছে—

শীতকালে জাড় কাঁটা গ্রীষ্মকালে ঘামাচি।
কোন্ কালে ছিলি রে তুই পরম রূপসী॥

এই যে জাড়-কাঁটা অর্থাৎ শীতকালে ছোট-ছোট কাঁটার মত গায়ে একরকম চর্মরোগ হয়, তাকেই জাড়-কাঁটা বলে, 'জাড়' অর্থে শীত; এক্ষেত্রেও ঘামাচিতে হিঞ্চে বেটে গায়ে মাখলে এ দুটি রোগ সেরে যায়।

এভিন্ন আমার অনেক অজানা তো রয়ে গেছে; এ অসমাপ্তি তো চিরকালই আছে ও থাকবেও, তাই উত্তরসাধকদের উদ্দেশ্যে বলে গেলাম।

এই হিঞ্চে সম্পর্কে এ পর্যন্ত যতদূর আমার জানা আছে সেটা আপনাদের কাছে নিবেদন ক'রেছি, এখন একটা নতুন কথা মনে এসেছে—আমরা তো বেদ ভুলে হয়েছি বেদে, তাই ভানুমতীর বাচ্চা থলের ভিতর থেকে বার ক'রছি; আচ্ছা আপনি বলুন তো, রূপ যদি না থাকে, রূপক কল্পনা করা এটা কি কম গুণের কথা? তবে এটা আপনি ব'লতে পারেন, বেদে কি এই রকম উপাখ্যান সৃষ্টি করা হয়নি, এইসব ভেষজকে নিয়ে? হ্যাঁ, হ'য়েছে বৈকি, তবে সে এতটা হালকা কি ছিল? তাঁরা কি কোথাও স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করার পদ্ধতি দিয়ে গেছেন? মনে হয় তা দেন নি, তাই বৈদিক তথ্যের বাস্তবটাকে দর্পণে প্রতিফলিত করেছেন মাত্র, তাই আমরাও আজ পৌরাণিক তথ্যের আফিংখোর, ঘুমিওপ্যাথির ব্যবস্থা করে চলেছি। এই জলজ ভেষজ যে চক্রাঙ্গ (হিঞ্চে) পাঁকে (পঙ্কে) জন্মে আর জলে থাকে, সে যেন সানের পাথর। আমাদের শরীরের শ্রেষ্ঠধাতু যে শুক্র, এই চক্র তাকে সান্ দিয়ে উজ্জ্বল ক'রে দেয়, সেই জন্যেই তার নাম দেওয়া হয়েছে চক্রাঙ্গী?

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Diterpenoids, viz., hydroxykauranoic acid, kauran-16-01, kaur-16-en-19-oic acid, (-) 16-alphahydroxykauran-19-oic acid, (-) kaur-16-en-19-oic acid, (-) 16-alphahydroxy (-) kauran-19-oic acid. (b) Fatty alcohol, viz., myricyl alcohol. (c) Sterol, viz., stigmasterol.

সপ্তপর্ণী (ছাতিম)

[সাংকরী সপ্তপর্ণী]

আমরা কখনও কখনও তিরস্কার ক'রে বলি "তোমার ণত্ব ষত্ব জ্ঞান লোপ পেয়েছে", এটা সাধারণতঃ টোলের পণ্ডিত মহাশয়দের কাছ থেকেই, কারণ শব্দবিন্যাসের ক্ষেত্রে ন, ণ ও শ, ষ, স কোন্ শব্দে কোন্‌টি ব'সবে এ কথাটা বৈয়াকরণিকের এক্তিয়ারে, অর্থাৎ কিছুটা ব্যাকরণের সূত্রজ্ঞান থাকা চাই, তাই ঠিকমত না ব'সলেই তাঁরা বাক্য-বিন্যাসের বিপর্যয় দেখেন; এই যেমন শংকর, সংকর দুটি শব্দের শ্রুতিসাম্য থাকলেও আপনার মন ও কলম দ্বিধাগ্রস্ত হবে শব্দের আদি অক্ষর বসাবার সময়, আর পাঠকের কাছে হবে ধ্যান-ধারণারও ফারাক।

এই সংকর শব্দটির ভাব নিয়ে, তাকে বিশেষণ করে সাংকরী, তারপর এই সংকর শব্দটির ভাবার্থ নিয়ে দুটি মিলনের দ্যোতক—যেমন বর্ণসংকর, ঋতুসংকর, প্রাণীসংকর ও রোগসংকর। এই সংকর ক্ষেত্রটাই বড়—দুই-এর স্বভাব বর্তায় কি চরিত্রে কি কালে কি জন্মসূত্রে, তাই প্রাণীজগতের একটি সংকর জীবকে আমরা উপমার ক্ষেত্রে কথায় কথায় হাজির করি আমাদের দৈনন্দিন চলাফেরার সময়।

এই বনৌষধিটির চারিত্রিক ক্ষেত্রেও একটি বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত আছে, তাই এই নিবন্ধোক্ত শিরোনামে সাংকরী বিশেষণটা দেওয়া হলো।

বক্তব্যের অন্তরালে

অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ১৬৭।৩।২২ সূক্তে ধ্বনিত হ'য়েছে—

যস্তে রসঃ সম্ভৃতঃ ওষধীষু শুষ্মঃ সপ্তচ্ছদ মদেন
ঋতুজ্ঞা স্তে নো অবন্তু ঋতুথেন্দ্রো বনস্পতিঃ।

এই সূক্তের মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> সপ্তপর্ণং সপ্তচ্ছদং অধিকৃত্য ব্যাকুর্ব্বন্তি ঋতুজ্ঞা অশ্বিনৌ চ, তে রসঃ য সম্ভূতঃ ভবতি ওষধীষু সপ্তচ্ছদঃ তস্য মদেন=রসেন ঋতুজ্ঞাঃ নো অবন্তু=রক্ষন্তু, ঋতুথা=প্রতি প্রতি ঋতুং বনস্পতির্হি ইন্দ্রোহিত্বম্ ।

এই সূক্তটি সপ্তপর্ণ বা সপ্তচ্ছদকে অধিকার ক'রে ভিষক্ অশ্বিনীযুগল এবং ঋতুজ্ঞগণ সপ্তচ্ছদের রস সংগ্রহ করেন, এটি সম্ভৃত হলে সেই রসের দ্বারা আমরা ঋতুগত রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবো, ইন্দ্র যেমন সকলের মাননীয়, বনস্পতি সপ্তচ্ছদও আমাদের মাননীয় রক্ষক।

বৈদ্যকের নথি

বৈদিক তথ্যে লিখিত "সম্ভৃত" শব্দটিতে দুটি ইঙ্গিত বহন করে—একটি হ'লো বৃক্ষ-ত্বকে তার গুণ, বীর্য সংহত হওয়া আর দ্বিতীয় অর্থ করা যায় ঋতুজ্ঞগণ কর্তৃক সেটিকে সংগৃহীত করা। প্রথমোক্ত বক্তব্যটি এখানকার বক্তব্য বলে মনে করা যায়।

বৈদ্যকের সিঁদকাঠি প্রবেশ ক'রেছে এই বৈদিক সূক্তটির মধ্যে; কিন্তু আপাতঃ চিন্তায় আসে না যে এর মধ্যে ওষধীর কোন বিশেষ ইঙ্গিত আছে, তা সত্ত্বেও সুপ্রাচীন ঋষি বৈদ্যগণ এরই মধ্য থেকে বৈদ্যক বিদ্যার সূত্র খুঁজে পেয়েছেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৈদ্যক সংহিতা গ্রন্থগুলিতে, বিশেষতঃ চরক সংহিতায়, সেটা আছে বিমান স্থানের অষ্টম অধ্যায়ে, তিক্তক স্কন্ধে, শিরোবিরেচনের দ্রব্য সম্ভারের মধ্যে এবং সূত্রস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ের উদর্দ ও কুষ্ঠের প্রশমনে, তাছাড়া সিদ্ধি ও কল্পস্থানে বমনোপগের ভেষজ কল্পনায়। এটা কেবল চরকে কেন, সুশ্রুতেও, তাৎকালিক অন্যান্য সংহিতাগ্রন্থেও আছে।

স্পেশাল বেঞ্চের জুরিগণ যেমন সাত দিনের সাওয়ালের মধ্যে দুই-একটা কথার সূত্র খুঁজে বের করেন, সেই রকম সপ্তপর্ণের প্রসঙ্গটি। বৈদিকসূক্ত থেকে ঋষি বৈদ্যগণ যে ইঙ্গিত পেয়েছিলেন—সেটি হ'লো ঋতু বিবর্তনের ওলটপালটে প্রকৃতিবিকার-জনিত আয়ুর্বিনাশী রোগ প্রতিষেধ ও প্রতিরোধের অন্তর্নিহিত শক্তি র'য়েছে এই বৃক্ষটির মধ্যে।

কালাকাল প্রসঙ্গ

বর্ষ সংক্রমণে প্রধানভাবে তিনটি ঋতুরই মুখ্য অস্তিত্ব আমাদের কাছে জাগ্রত। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এরাই মুখ্য ঋতু, আর এদের আসা-যাওয়ার মাঝখানে যাদের অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করি, তারা হ'লো প্রাবৃট্, শরৎ আর বসন্তকাল এই সংজ্ঞায়। কিন্তু এই তিনটিই সঙ্কর ঋতু। এই সময়ে প্রকৃতিও বিকারগ্রস্তা, সেই বিকারে আমাদেরও প্রভাবিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই যেমন সকালে গরম, রাত্রে ঠান্ডা, তারও আসা-যাওয়ার মাঝখানে প্রকৃতিবিকারের অসমতা, যাকে বলা যায় বিকৃতি-বিকার। এ যেন ভেজালেরও ভেজাল। আমাদের শরীর ঐ বিকৃতি-বিকারজনিত রোগেই দুষ্ট হয়ে থাকে। কালজ রোগের প্রকৃতিটি কিন্তু এমন গুরুতর হয় না, অর্থাৎ শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে যে রোগ জন্মে সেইটাকেই বলা হয় কালজ রোগ। এই সব কালজ রোগের প্রাবল্য ঋতুর অবসানে হ্রাস পায়। কিন্তু ঋতু সঙ্করের ((প্রাবৃট্, শরৎ ও বসন্তকালের) রোগগুলি একটু গোলমেলে হয়ে থাকে; অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন দোষের সঙ্করবিকার হয়; এই যেমন, এই সময় হয়তো জ্বর হলো, দেখা গেল তার সঙ্গে অতিসার (পেটের দোষ) এসে জুটলো, তাই তাকে সামলাতে চিকিৎসকও হিমসিম, আর রোগীও আধমরা।

প্রথমে বলে রাখি এই সপ্তপর্ণ ত্বক্ (ছাল) তিক্ত কষায় রস। এই তিক্ত রসের ভৌতিক উপাদান বায়ু ও আকাশের প্রকৃতি নিয়ে সৃষ্ট। পাঞ্চভৌতিক এই দুই মৌল উপাদান কফের (পাঞ্চভৌতিক অপ্ ও ক্ষিতি) বিপরীতধর্মী, অর্থাৎ যাকে বলা যায় ওলে যেমন তেঁতুল। তাই বিকারগ্রস্ত কফের দ্বারা সৃষ্ট রোগ ক্লেদাত্মক হ'লেও সে তো কাজ করেই, তারপর সেটাতে যদি কোন ব্যাক্‌টিরিয়া বা কীট সৃষ্টি হয়, (এটা কিন্তু সেই বিকৃতিবিকারজনিত ক্ষেত্র) কারণ প্রথমে ক্লেদ, তারপরে সৃষ্ট হয় কীট, সেইখানেই তার অমোঘ কাজ, আবার তার সঙ্গে ওর রসে কষায় ধর্মিত্ব আছে

বলেই, সে সঙ্কোচক, কারণ কষায় রসের মৌল উপাদান হ'লো পৃথ্বী ও বায়ু এই দুই ভৌতিক উপাদান। এই গেল তার প্রকৃতিগত গুণ বিচার।

বৃক্ষ পরিচিতি

বৃহৎ ও চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত গাছগুলি ৪০/৫০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। গাছের পুরু ছালের ভিতরটা সাদা ও দানাযুক্ত কিন্তু উপরটা খসখসে, গাছের সমগ্রাংশে সাদা দুধের মত আঠা (ক্ষীর) আছে, পাতাগুলির আকার অনেকটা মনসা পাতার মত। যার সংস্কৃত নাম স্নুহী, বোটানিকাল্ নাম Euphorbia nerifolia. প্রায় সব শাখারই অগ্রভাগ ছত্রাকার ও ৭টি পাতা সাজানো থাকে; আবার কোন কোন শাখাগ্রে ৫/৭/৮টি পাতাও দেখা যায়, তবে সেটা খুবই কম, তাই এই গাছটির একটি নাম 'সপ্তচ্ছদ'। ছদ অর্থে পত্র (পাতা) অথবা 'সপ্তপর্ণা' বা 'সপ্তপর্ণী', হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলে একে বলা হয় ছাতিয়ান বা ছাতিবন্, আর বাংলার চলতি নাম ছাতিম। বিদ্বজ্জন এই নামটির সঙ্গে সুপরিচিত। তার প্রধান কারণ বিশ্ববরেণ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর প্রমাণপত্রের প্রতীক স্বরূপ দেওয়া হয় এই সপ্তপর্ণীর পত্র।

এই গাছ জন্মে সমগ্র বাংলা, দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচুতেও। শরৎকালে ফুল ও শীতকালে সরু বরবটীর শিম্বির মত ফল হয়। এর ফুলের উৎকৃষ্ট গন্ধ থাকলেও সেটি তীব্র। এই গাছটির বোটানিকাল্ নাম— Alstonia Scholaris R. Br., ফ্যামিলি Apocynaceae.

ঔষধার্থে ব্যবহার হয়—ত্বক্ (ছাল), পাতা, ফুল ও ক্ষীর (আঠা)। মাত্রা—ছালচূর্ণ দেড় থেকে দু'গ্রাম, ফুলচূর্ণ আধ গ্রাম থেকে দু'গ্রাম, ক্ষীর সিকি গ্রাম থেকে আধ গ্রাম।

রোগ প্রতিকারে

এটি প্রধানভাবে কাজ করে রসবহ ও রক্তবহ স্রোতের উপর।

১। **কুষ্ঠে:—** কোন জায়গায় লাল বা কাল দাগ দেখা দিচ্ছে, সে জায়গাটা একটু উঁচু এবং অসাড়তা আসছে, সেক্ষেত্রে ছাতিম ছালচূর্ণ এক গ্রাম মাত্রায় এক চা-চামচ গুলঞ্চের রস মিশিয়ে খাওয়া, আর ১০/১২ গ্রাম ছাল ৩ কাপ জলে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে ঐ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা। অথবা ৪০/৪৫ গ্রাম ছালকে থেঁতো ক'রে আধ সের জলে খানিকসময় সিদ্ধ ক'রে, ছেঁকে সেই জল স্নানের জলে মিশিয়ে স্নান করা। এটি চরক সংহিতার ব্যবস্থা।

২। **জ্বরে (পুরানো):—** জ্বর প্রায় মাঝে মাঝে হচ্ছে, মুখে অরুচি, দাস্ত পরিষ্কার হয় না, যকৃত প্লীহায় ব্যথা, আস্তে আস্তে চেহারা ফ্যাকাশে হ'য়ে যাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে ১০/১২ গ্রাম ছাতিমছাল ৩/৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে (শুষ্ক হ'লে ৫/৬ গ্রাম), ছেঁকে নিয়ে সেই জলটা দু'বেলায় ভাগ করে খেতে হয়, এর দ্বারা দুই-এক দিনের মধ্যেই জ্বর ছেড়ে যাবে। এর সঙ্গে নাটা করঞ্জের (Caesalpinia bonducella) বীজের শাঁস ২ বা ৩ গ্রেণ (১৫০—২০০ মিলি গ্রাম) মাত্রায় ঐ ক্বাথের সঙ্গে খেয়ে থাকেন।

৩। **সান্দ্রমেহে :—** প্রস্রাবের সঙ্গে কফের মত ধাতু বেরোয় এবং চেহারাটা ঢিলে-ঢালা, তাঁরাই সান্দ্রমেহ রোগগ্রস্ত। এক্ষেত্রে ছাতিমছাল ৫ থেকে ১০ গ্রাম পর্যন্ত ৩ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, ঈষদুষ্ণ দুধে মিশিয়ে (দুধ সিকি কাপ) দুইবারে ঐ ক্বাথটা খেতে হয়। অবশ্য বলে রাখা ভাল যে, যাঁদের অগ্নিবল কমে গিয়েছে অর্থাৎ হজমশক্তি ক'মে গিয়েছে, তাঁরা এই যোগটি ব্যবহার করবেন না।

৪। **হিক্কাশ্বাসে :—** (পিত্তানুগত হিক্কাশ্বাসে) এক্ষেত্রে কফের আধিক্য থাকবেই, কিন্তু পিত্তের লক্ষণও থাকবে, সেক্ষেত্রে ছাতিম ছালের রস আধ চা-চামচ (৩০/৪০ ফোঁটা) সিকি কাপ দুধে মিশিয়ে (৭/৮ চা-চামচের কম না হয়) খেতে হয়। ছাল কাঁচা সংগ্রহ না হলে ছালচূর্ণ দেড়/দুই গ্রাম দুধ ও পিপুল চূর্ণ মধু মিশিয়ে খেতে হয়। পিপুল চূর্ণ ২/৩ রতি (১৫০—২০০ মিলিগ্রাম) নিলেই হবে।

৫। **দন্তক্রিমিতে :—** দাঁতের পোকার যন্ত্রণায় ছাতিমের আঠা (ক্ষীর) ঐ পোকা-লাগা দাঁতের ছিদ্রে দিয়ে দিতে হয়। এগুলি আয়ুর্বেদের প্রাচীনগ্রন্থ বাগ্‌ভটে বলা আছে।

৬। **হাঁপানিতে :—** (শ্বাসকাসে) যেখানে দেখা যাচ্ছে বিশেষ সর্দির প্রকোপ নেই অথচ হাঁপের টান বেশী, সেখানে ছাতিমের ফুল চূর্ণ এক বা দেড় গ্রাম, তার সঙ্গে পিপুল চূর্ণ ৩/৪ গ্রেণ (২০০/২৫০ মিলিগ্রাম) মাত্রায় মিশিয়ে দই-এর মাতের সঙ্গে খেতে হয়। এটা সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রের ব্যবস্থা।

৭। **স্তন্যদুগ্ধের স্বল্পতায় :—** বুকের দুধ ক'মে গিয়েছে, অথবা ভাল হয়নি, সেক্ষেত্রে ৫/৬ গ্রাম ছাতিম ছাল থে'তো ক'রে, ২ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আধ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, সেই জলের সঙ্গে আধ কাপ দুধ মিশিয়ে খেতে হয়। এর দ্বারা বুকের দুধ বেড়ে যায়। এভিন্ন স্তনের দুধ আঠার মত হ'লে এই ক্বাথে জল মিশিয়ে খেলে ঐ দোষটা নষ্ট হবে।

৮। **গাঁটের ব্যথায় :—** বাতের জন্য যাঁদের ব্যথা হয়, তাঁরা ৭/৮ গ্রাম ছালকে ৩ কাপ জলে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, ঐ ক্বাথটা খাবেন, এর দ্বারা ঐ ব্যথার উপশম হবে।

৯। **সর্দি বসায় :—** বুকে শ্লেষ্মা বসে গিয়েছে, সেক্ষেত্রে দুধে জল মিশিয়ে সেই দুধজলে ১ গ্রাম ছাতিমছাল চূর্ণ দিয়ে অল্প খানিকক্ষণ ফুটিয়ে সেইটা খেতে হবে অথবা ঐ চূর্ণ ঐ ঈষদুষ্ণ জল মিশানো দুধ দিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা বুকের সর্দিটা সরল হ'য়ে উঠে যাবে।

১০। **অগ্নিমান্দ্যে :—** আমপ্রধান অগ্নিমান্দ্যে যাঁরা ভুগছেন, তাঁরা ছাতিমছাল অথবা ফুল চূর্ণ আধ গ্রাম (৫০০ মিলিগ্রাম) মাত্রায় ঈষদুষ্ণ জল সহ দু'বেলা খাবেন।

১১। **শ্বাসকষ্টে :—** শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে (হাঁপানিজনিত), ছাতিম ফুল চূর্ণ (মিহি) আধ বা ১ গ্রাম মাত্রায় ২/৩ গ্রেণ (২০০ মিলিগ্রাম) লবণ মিশিয়ে অল্প গরম জল সহ খেতে হয়, এর দ্বারা শ্বাসকষ্টের উপশম হয়।

১২। **রক্তগুল্মে :—** গর্ভের সব লক্ষণ, কেবল বুকে দুধ আসে না, আর পেটে কুন্‌কুন্‌ ক'রে ব্যথা ধরে, এটা গুল্মের লক্ষণ, এক্ষেত্রে কয়েকদিন দু'বেলা ২/৩ গ্রাম

মাত্রায় খেতে হয়, এর দ্বারা ঐ রক্তগুল্মটা ভেঙ্গে গিয়ে স্রাব হ'য়ে যাবে, অথচ যন্ত্রণা হবে না, আর বায়ু জন্য গুল্ম হ'লে সেটা কয়েকদিনেই চুপসে যাবে।

১৩। **দুষ্ট ব্রণে:—** যে ব্রণের ক্ষত কিছুতেই পুরে উঠতে চায় না, সেক্ষেত্রে ছাতিমের আঠা (ক্ষীর) শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে ক্ষতের উপর ছিটিয়ে দিলে ওটা পুরে ওঠে।

১৪। **পাইয়োরিয়ায়:—** ছাতিমের আঠা ৫/১০ ফোঁটা গরম জলে মিশিয়ে সেই জলে গার্গেল্ (gargle) করলে, যদি সম্ভব হয় ২/৫ মিনিট ঐ জলটা মুখে পুরে রেখে তারপর ফেলে দিতে হয়—এইভাবে একদিন অন্তর এই প্রক্রিয়াটা ক'রলে পাইয়োরিয়া সেরে যায়।

সর্বশেষে জানাই যে, দেহের গঠন সাতটি ধাতুতে (রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র) আর এই বৃক্ষটি যেন সপ্ত সংখ্যার প্রতীকরূপে সাতটি চ্ছদ অর্থাৎ পত্র তাকে ছাউনি দিয়ে রাখে, না সাত দিকের ছদ্ অর্থাৎ ছাউনি দিয়ে তাকে রক্ষে ক'রে আছে?

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Alkaloids, viz., echitamine, echitamidine, echiteninederivative.
(b) Lactones, sterols.

ক্ষুরক (কুলেখাড়া)

সনাতনপন্থীরা শব্দস্তোমের মহাসাগর থেকে যেসব শব্দরত্ন আহরণ করেছিলেন, তাদেরই এক একটির যোগ-বিয়োগে কত ব্যঞ্জনাই না সাহিত্যিকের মনে জাগে; এই যেমন ক্ষুর শব্দটি—এর আগু-পিছু কোন শব্দের যোগ-বিয়োগ করলো ভিন্ন অর্থ বহন করে সত্যি, কিন্তু তার মৌলিক ক্রিয়াকারিত্বের স্বভাবটা বদলায় না, তবে রকমফের হয়।

উপরিউক্ত শিরোনামের সৃষ্টি কিন্তু ক্ষুর শব্দ থেকে; আমরা যেমন বলে থাকি—আহাঃ, মেয়েটির মুখ নয় তো, যেন 'ক্ষুরের ধার'; সেইরকম বুদ্ধিটার ক্ষেত্রেও বিশেষিত করে বলা হয় "ক্ষুরধার বুদ্ধি"। আবার ক্ষুর শব্দটি ভ্রষ্ট হয়েই খেউড়ে এসেছে।

এই যে আমরা বলে থাকি, লোকটা খেউড় কবি, সেইটাই আরও সহজিয়া হ'য়ে 'খেড় কবি' হয়ে গিয়েছে। আসলে এই ক্ষুর শব্দটির অর্থ 'বিলেখন', অর্থাৎ আঁচড়ে দেওয়া। উপরিউক্ত বনৌষধিটির এই ক্ষুরক নামকরণের দ্বারাই তার ক্রিয়াকারিত্বকে চিহ্নিত করা হ'য়েছে, আর তার সেই দ্রব্যশক্তির ইঙ্গিতটা অথর্ববেদেই দেওয়া হ'য়েছে বৈদ্যককল্পের ৩৭।৩১১।৫ সূক্তে—

> মলিম্লুঞ্জন্ দ্রংষ্ট্রৈস্তৈস্তস্করা উতহন্ত্যাং দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ।
> তারিষ উর্জ্জং দ্বিপদে চতুষ্পদে নো ধেহি।

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> ত্বং ক্ষুরোঽসি। ক্ষুরকোঽসি বা। ক্ষুর=বিলেখনে। ক্ষুর্+অ। ত্বাং মলিমুঞ্জন্ দ্রংষ্ট্রৈস্তৈঃ=যে দ্রংষ্ট্রিনঃ তেভ্যঃ মলিমুঞ্জনাৎ=নিঃ-

শেষণাৎ রক্ষণাদ্ বা ক্ষুরোঽসি=বিলেখকোঽসি কণ্টকাঙ্গঃ নিশি-তস্করাঃ চৌর্য্যায় অসমর্থাঃ। উতবা হনুভ্যাং তেষাং দ্রংষ্ট্রৈস্তৈঃ= তব দেহৈঃ। স ত্বং শুষ্মিণঃ শুষ্মমিতি বলং বিদ্যতে ত্বয়ি। দ্বিপদে মনুষ্যে চতুষ্পদে উর্জ্জং ইবস্য=শুক্রস্য তারিষ বিসর্গরোধং করোতি যঃ সঃ ত্বং ধেহি ধারয়।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—তুমি ক্ষুর, ক্ষুরকও তোমার নাম। ক্ষুর অর্থে বিলেখন (একে বলা হয় আঁচড়ে দেওয়া), তোমাকে দ্রংষ্ট্রিগণ নিঃশেষ ক'রতে পারে না, যেহেতু তুমি কণ্টকাঙ্গ হ'য়ে আছ এবং রাত্রে চৌরগণ তোমাকে লঙ্ঘন ক'রে চুরি ক'রতে পারে না, যেসব দ্রংষ্ট্রি তোমার কাছে আসে, তুমি তোমার দেহের হনু দ্বারা তাদিকে নিবৃত্ত কর। তুমি দ্বিপদ মনুষ্য ও চতুষ্পদের শুক্রবল রক্ষা কর। শুক্রের বিসর্গপথের অর্থাৎ নিঃসরণ পথের বাধা দূর ক'রে দাও।

বৈদ্যকের নথি

বৈদিক তথ্য থেকে কি পাওয়া গেল?

(১) এই ওষধির বিলেখন করার শক্তি আছে।

(২) তুমি মানুষের এমন কি পশুরও শুক্রবল রক্ষা কর।

(৩) শুক্রের বিসর্গপথের অর্থাৎ নিঃসরণ পথের বাধা দূর ক'রতে পারো।

সংহিতা যুগের দৃষ্টিকোণ

চরক সংহিতায় ক্ষুরক এই বৈদিক নামটিতে 'ই' কার আগম ক'রে ব্যবহার ক'রেছেন, ভারতীয় ভাষায় বর্ণের আগম এবং বর্ণের লোপ, বর্ণের বিপর্যয় করার স্থল বহু আছে, তাদের মধ্যে এই ক্ষুরক শব্দেও 'ই' কারটি আগম বর্ণ। একে পৃষোদর বলে। অর্থাৎ 'ই' কারকে যুক্ত করা হ'য়েছে; তবে এই 'ই' কারকে যুক্ত করাতে গভীর অর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, ইক্ষু শব্দের অর্থের সঙ্কেত হ'লো মধুর রসের গন্ধ, এই কুলে-খাড়ার রসে ইক্ষু বা আখের রসের গন্ধ পাওয়া যায়। চরক সংহিতায় এর প্রাধান্য দেওয়া হ'য়েছে শুক্রশোধনের উপযোগিতার ক্ষেত্রে। আর অশ্মরী চিকিৎসায় যে তার প্রাধান্য আছে, সেটাও স্বীকৃত হ'য়েছে; তবে তাঁদের মতে এক্ষেত্রে মূলটাই বেশী কার্যকর।

এই দুটি ক্ষেত্র সম্বন্ধে বোঝার বিষয় হ'লো—যেখানে শুক্রশোধনের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়, সেখানে অবশ্যই জেনে নিতে হয় মজ্জ ধাতুর অর্থাৎ সপ্তম কলার স্থান থেকে।

এই একটি পদার্থ (শুক্র) যেটি সর্বদেহগত হ'য়েও বস্তিদ্বারের দুই আঙ্গুল দক্ষিণে এর কলা বা আধার থাকে, রমণীদের দেহেও ঐ স্থানে থাকে। কোন কারণে সেই শুক্র বিমার্গ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্ম ধাতুর বিকার হ'লে অথবা অতিমৈথুনের দ্বারা মেঢ্র ও মুষ্কের অভ্যন্তরে যে শুক্রবহ স্রোতের নল তাকে সে রুদ্ধ করে। এই ক্ষেত্রে এর মূলের উপযোগিতা স্বীকৃত।

পরিচিতি

প্রাচীন বোটানীতে—অথর্ববেদে তাকে বলা হ'লো 'ক্ষুরক' অর্থাৎ সে চেঁছে বার ক'রে দেয়। দ্বিতীয় নাম ইক্ষুরক। তার ডাঁটার রসে আছে 'ইক্ষু' অর্থাৎ আখের রসের গন্ধ ও অল্প মিষ্টত্ব, আর বলা হ'লো দ্রংষ্ট্রী, অর্থাৎ এই নাম দেওয়ার কারণ গাছের পর্বে-পর্বে খুব কাঁটা হয়, যার জন্য তাকে কোন চতুষ্পদ জন্তু নির্মূল ক'রে খেতে পারে না এবং চোরেও তাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। এটা তার দেহগত বর্ণনা।

সংহিতার যুগে এসে তার নাম হ'লো কোকিলাক্ষ। এই নামকরণের তাৎপর্য হ'লো—তার বীজগুলির রং দেখতে যেন কোকিল পাখীর চোখের রংয়ের মত, এ ভিন্ন আর যতগুলি নাম পাওয়া যায় সবই তার গুণবাচী।

দেখতে কেমন? সাধারণত পুরনো মূল থেকে ফেঁকড়ি বেরিয়ে গাছও হয়, আবার বীজ থেকেও গাছ হয়; বর্ষাকালে যখন নূতন গাছ গজায় তখন দেখতে অনেকটা হিঞ্চে (Enhydra fluctuans) শাকের গাছের মত, তবে তার পাতা এই হিঞ্চে শাকের

পাতা থেকে একটু লম্বা; সমগ্র পাতার গায়ে সরু শুঁয়োর মত কাঁটা আছে। প্রথমদিকে গাছে কোন কাঁটা হয় না; আশ্বিন-কার্তিকের পর থেকে পাতার গোড়া থেকে কাঁটা বেরোয়, ক্ষুপ জাতীয় গাছ, দেড় দুই ফুট উঁচু হয়, আবার জায়গা হিসেবে ৩/৪ ফুটও উঁচু হ'তে দেখা যায়; যেখানে হয় সেখানে ঝোপ হ'য়ে যায়, সাধারণতঃ জমির আলে অথবা রাস্তার পাশে অল্প জল যেখানে থাকে, যাকে আমরা গাঁয়ের ভাষায় পগার বলি, সেখানে হ'য়ে থাকে। মূলে বহু শিকড় হয়, গাছের কাণ্ডটা একটু ফাঁপা এবং চতুষ্কোণ অর্থাৎ চারকোণা হয়; ফুল হয় অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে, রং অল্প বেগুনে। বীজ ভিজালে চটচটে ও লালার মত হয়। একে চলতি কথায় কুলেখাড়ার গাছ, আবার কোন কোন জায়গায় কুল্‌পো শাক বলে। এটির হিন্দি নাম তালমাখনা; বোটানিকাল্ নাম Asteracantha longifolia Nees., ফ্যামিলি Acanthaceae.

রোগ প্রতিকারে

১। **শোথে:—** পায়ের চেটো (যে অংশটার ওপর ভর দিয়ে আমরা হে'টে বেড়াই) ফোলে, এটা সাধারণতঃ পেটে আম (অপক্ক মল) জমার জন্য হয়; সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র পাতার রস (ডাঁটা বাদ) ৪ চা-চামচ একটু গরম ক'রে ছে'কে, সকালে ও বৈকালে দু'বার খেতে হবে; এর সঙ্গে ২/৫ ফোঁটা মধু দেওয়াও চলে। এর দ্বারা ঐ ফুলোটা চ'লে যাবে।

২। **পাণ্ডু রোগে:—** এ রোগের লক্ষণ হ'লো শরীরের রং ফ্যাকাসে হওয়া (হ'লদে নয়), যাকে প্রচলিত ভাষায় বলা হয় 'এনিমিয়া'। এক্ষেত্রে অমোঘ ঔষধ হ'লো, কেবলমাত্র কুলেখাড়া পাতার রস ৪ চা-চামচ একটু গরম ক'রে দু'বেলা খাওয়া।

৩। **বাতরক্তে:—** যে রোগে শরীরে ক্ষত হয়, ফেটে যায়, রস গড়ায়, আয়ুর্বেদে এটাকে বলা হয় বাতরক্ত; এক্ষেত্রে সমগ্র গাছকে থে'তো ক'রে ৪ চা-চামচ রস একটু গরম ক'রে দু'বেলা খেতে হয়। এটা কিন্তু বাগভটের উপদেশ। এর সঙ্গে ঐ রস যদি গায়ে মাখা যায় তা'তে আরও তাড়াতাড়ি উপশম হয়। এটা বাংলার বৈদ্যককুলের প্রত্যক্ষ উপলব্ধ যোগ।

৪। **অনিদ্রায়:—** কুলেখাড়া শিকড়ের (মূলের) রস ২ থেকে ৪ চা-চামচ সন্ধ্যার পর খাওয়ালে সুখনিদ্রা হয়, এটা হারীত সংহিতার উপদেশ।

৫। **অশ্মরী (পাথুরী) রোগে:—** সে পিত্তের থলিতেই হোক আর কিড্‌নিতেই হোক, পিত্তবিকারে যে পাথুরী (stone) হয়, সেখানে কুলেখাড়া বীজ আধ চা-চামচ আধ গ্লাস জলে গুলে সবটাই খেতে হয়।

৬। **দীর্ঘস্থায়ী সম্ভোগে:—** যাঁরা ইচ্ছুক তাঁরা শোধিত আত্মগুপ্তা (আলকুশী—Mucuna prurita) বীজের গুঁড়ো আধ চামচ ও কুলেখাড়া বীজের গুঁড়ো আধ চামচ একসঙ্গে গরম দুধে গুলে খাবেন, এটার দ্বারা ঐ উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হবে। তবে এখানে একটা কথা বলা দরকার যে 'তালমাখনা' হলো কুলেখাড়া বীজ—এই যে অনেকের ধারণা আছে সেটা কিন্তু ঠিক নয়; বাজারে যেটা তালমাখনা ব'লে বিক্রি হয় ওটা পৃথক দ্রব্য, আর বাজারে যেটা কুলেখাড়া বা কোকিলাক্ষ বীজ ব'লে বিক্রি হয় ওটাও কুলেখাড়া বীজ নয়। আসল কুলেখাড়া বীজের রং অবিকল কোকিলের চোখের রং হবে।

৭। **শোথে:—** সে যকৃৎ দোষেই হোক আর কিড্‌নির দোষেই হোক, এই শোথ চ'লে যায়—যদি সমগ্র গাছ অন্তর্ধূমে দগ্ধ ক'রে অর্থাৎ মুখঢাকা পাত্রে পুড়িয়ে যে ছাই পাওয়া যাবে, সেটাকে গুঁড়ো ক'রে দু'বেলা এক গ্রাম (১৫ গ্রেণ) ক'রে ঠাণ্ডা জল দিয়ে খাওয়া যায়, এর দ্বারা প্রস্রাব পরিষ্কার হবে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ফুলো ক'মে যাবে; এটা চক্রদত্তের উপদেশ।

৮। **রক্তরোধে:—** উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে ক্ষেত-খামারে (ধান কাটার সময়) কোন কিছুতে হাত বা পা কেটে বা ছ'ড়ে গিয়ে রক্ত পড়তে থাকলে এই পাতাকে থে'তো ক'রে ঐ কাটায় চেপে দিয়ে বে'ধে দিয়ে থাকে; এর দ্বারা অতি শীঘ্রই রক্ত বন্ধ হয়ে যায় আর ক্ষতও শুকিয়ে যায়।

৯। **হার্‌পিসে:—** একে পোড়া নারেঙ্গাও বলে, এটি পিত্ত-শ্লেষ্ম-বিকৃতিজনিত রোগ; এ রোগে কুলেখাড়ার পাতা, কাঁচা হলুদ একসঙ্গে বেটে লাগাতে হয়, এটাতে জ্বালা যন্ত্রণা চ'লে যাবে এবং ক্ষতও শুকিয়ে যাবে।

১০। **শীতলী রোগে:—** পায়ের শিরাগুলি কাল ও মোটা হ'য়ে কু'চ্‌কে কে'চোর মত জড়িয়ে যায়, তার জন্য যন্ত্রণাও হয়। এক্ষেত্রে ঐ গাছপাতা বাটা লাগালে কাজ হবে, এর সঙ্গে ঐ কুলেখাড়ার পাতা রস ক'রে ৪/৫ চা-চামচ ক'রে খেতে হবে।

১১। **বাজীকরণে:—** অকালে যাদের যুবজনোচিত রতিশক্তি ক'মে গিয়েছে, সেক্ষেত্রে এই কুলেখাড়ার মূল চূর্ণ ২ গ্রাম দুধ সহ খেলে এই অসুবিধেটা কিছুদিনের মধ্যে উপশমিত হয়। এটা চরক সংহিতার চিকিৎসাস্থানে ২৬ অধ্যায়ে বলা হ'য়েছে। এই উদ্দেশ্যে সুশ্রুত সংহিতায়ও ব্যবস্থা দেওয়া হ'য়েছে ধারোষ্ণ দুধের সঙ্গে।

১২। **ক্রোধী:—** কোন অল্প কারণে হঠাৎ রেগে যায়, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, বিশেষতঃ শৈশবাবস্থায়ও এটা দেখা যায় যে, অনেকে জেদীও থাকে; এক্ষেত্রে এই কুলে-খাড়া পাতা ও ডাঁটা দিয়ে ঝোল ক'রে বেশ কিছুদিন খাওয়ালে ওটার পরিবর্তন দেখা যাবে। আরও একটা লাভ হবে এটাতে যকৃৎকেও (লিভারকে) সক্রিয় ক'রবে।

এই নিবন্ধটির শেষ অঙ্কে একটা কথা বলে রাখি, কোন ভেষজের জন্মলগ্ন কবে এবং কোথায় সেটাও যেমন আমাদের অঙ্কের বাইরে, তার রাশিচক্র বিচার করে নাম-করণের নথিপত্র নেই সত্যি, তবে আমাদের পূর্বসূরিগণ কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন যে দেননি, সেটা আমরা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি, তাই এই ক্ষুরক শুধু একটাকে চাঁছায় না, আবার মেরামতও করে।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Alkaloids. (b) Phytosterol, mucilage potassium salt of oxalic acid. (c) Diastase, lipase, protease. (d) Essential oil. (e) Semidrying oil.

বিম্বী

বিম্বীফলের রংয়ের রূপ দিতে গিয়ে, বোধ করি কবির মাথা যতটা ঘেমেছে, তাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে কবিরাজেরও মাথা কম ঘামেনি। তাই ভাবছিলাম কবি বড় না কবিরাজ বড়? তবে বিচারে দেখা যায়, কবি তো রচনা করেন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাবছায়া নিয়ে; কিন্তু কবিরাজ কাব্য রচনা করেন অস্থি-মজ্জা থেকে আরম্ভ ক'রে দেহের যত বস্তু আছে তাদের নিয়ে; শুধু তাই নয়, প্রকৃতির মৌল উপাদান, যেমন আলো, বাতাস, মাটি, জল, এ থেকে উদ্ভূত যাবতীয় পাঞ্চভৌতিক দ্রব্যের প্রকৃতির ও বিকৃতির যথার্থ বাস্তবরূপ জানাতে রচনা করেছেন কাব্য ও উপাখ্যান এবং এসবের বিকৃতি ঘটলে যে ব্যথা-বেদনার উদ্ভব হয়, তার উপশমের পথেরও সন্ধান দিয়েছেন। এমনি একটি অযত্নসম্ভূত ভেষজলতা বিম্বীকে কেন্দ্র করেও কবি ও কবিরাজের সমীক্ষণ; তাই গ্রাম্য কবির চোখে—

বুলবুলির যে সোহাগ জাগে বিম্বীফলের রঙে।
প্রাণ ভ'রে সে খায় যে চুমু মধুযামিনীর ঢং-এ॥
মাকাল ফলের রঙটা দেখে মনে জাগায় সাড়া।
খাই না কেন, ভাবে কোকিল, কিন্তু কাকে করে তাড়া॥

কাব্যে বিম্বীফলের রূপের বর্ণনায় সংস্কৃত কবি লিখেছেন—

বিম্বাধরাঞ্জনৈ বিম্বৈ গুঞ্জা ফলমিতি ভ্রমাৎ।
চৌরেণাপহৃতং সর্বং বিনা নাসাগ্র মৌক্তিকম্॥

এর অর্থ হ'চ্ছে—নিদ্রিতা তরুণীর সব অলংকার চোরে নিয়ে গেল, কিন্তু নাকের

মুক্তাটি নিল না, কারণ নাকের মুক্তোটিতে প'ড়েছিল বিম্বীফলের কান্তি, অধর ও ওষ্ঠ দুটির প্রতিবিম্ব, আর চোখের কাজলের প্রতিফলন প'ড়েছিল মুক্তোর উপরটায়, তাই মুক্তোটি দেখাচ্ছিল ঠিক যেন কুঁচ ফলের মত (গুঞ্জা—Abrus precatorius). এই তুচ্ছ ফল ব'লেই সে নেয়নি।

কবি তো এই দেখলেন, এখন কবিরাজ কি দেখলেন দেখি—

> ত্বং বর্ণা ব্যনক্তি বিম্বা ওষধীঃ অর্বন্তমাশু সাদন্যং বিদথ্যম্।
> ব্যথ্যং চ ককুভা রিষ্যং পৃথিব্যা আগাদ্ দধৎ রত্না॥
> (অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ৯১।১১২।১৮)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> ত্বং বিম্বা বিং=কান্তিং বন্ন্ অচ্ তুণ্ডিকেরীতি। অর্বন্তং= উৎক্রেশং আশু সাদন্যং সাধুং বিদথ্যং দদাতু। অতঃ ওষধীশ্চ

পৃথিব্যা রম্না, ককুভা কং=বাতং অপি কান্ত্যা স্কুভ্যাতি যা সা এব ত্বং প্রকাশয়সি। রিষ্যং ক্লেদং বিহায়সি ইতি রিষ্যাতি, আগাৎ অগ্রেচর স্বভাবা।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—তুমি বিম্বা, কান্তি তোমার সহজাত (তুণ্ডিকেরী) অর্থাৎ তুণ্ড মুখ তার কান্তি মুখ্য বা ছবি তোমাতে। তুমি গৃহে থাকা ভেষজ, তোমার কান্তি বায়ুও প্রকাশ করে। তুমি উৎক্লেশ ক্লেদকে আশু দূর করে দাও।

অতএব পরিষ্কার ধারণা করা যায়, কবি আর কবিরাজের প্রভেদ কোথায়। ঋষি কবিরাজ দেখেছেন বিম্বফলের কান্তি যে মুখকান্তিকে শুধু অগ্রণী ক'রেই দেয় তাই নয়, তার কান্তি এত তরল যে বায়ুও তাকে বহন ক'রে নিয়ে যায়, যে গৃহে থাকার আমন্ত্রণ পায়। কারণ সে ভেষজ, অর্থাৎ ভয় দূর করে।

কোন কারণে কেহ বিষ ভক্ষণ ক'রলে, অজীর্ণে ভুগতে থাকলে, আমাশয়ের কৃমিজাত ক্লেদে আক্রান্ত হ'লে, অথবা অরুচি বা অতৃপ্তিকর কিছু বা মশা মাছি পেটে গেলে তার প্রতিকারের জন্য শ্রেষ্ঠ ভেষজ 'বমনকর' দ্রব্যের উপযোগ অর্থাৎ নির্বাচন; কবিরাজের দৃষ্টিতে ব'লবো—এটি বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে বমনকারক দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভেষজ।

মহীধর সংস্কৃত পরিভাষায় বলেছেন তুণ্ডিকেরী, আর বাংলায় এর পরিভাষা 'তেলাকুচা', অর্থাৎ তেল-চিক্কণ; তেল থেকে লোকায়তিক ভাষায় তেলা আর চিক্কণটা কুচা হ'য়ে গিয়েছে।

বৈদ্যকের নথি

তা যাক, এখন দেখি এই বিম্ব বা তেলাকুচার ব্যবহার বেদের পরবর্তীকালে রচিত সংহিতাগুলির কোথায় কি আছে।

চরক সংহিতার সূত্রস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে 'বমনোপগ' (বমনোপযোগী) ভেষজ পর্যায়ে, বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে তো আছেই, তা ছাড়া সিদ্ধিস্থানের ২য় অধ্যায়ে শ্লেষ্ম রোগের প্রসঙ্গে সেখানেও এই বিম্বীর ভৈষজ্য বিধান।

তারপর সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ে বিম্বীর গণ পর্যায়ে রস, গুণের বৈশিষ্ট্য কি তা বলা হয়েছে; আর ৩৮ অধ্যায়েও এবং এটি মিষ্ট রসাস্বাদ হ'লে কি গুণ হবে তা বলা হ'য়েছে ৩৯ অধ্যায়ে।

এর পর বাগ্‌ভটে এসে সূত্রস্থানের ১৫ অধ্যায়ে তিক্তরস বিম্বী এবং মিষ্টরস-সম্পন্ন হ'লে যে তার নাম তুণ্ডিকেরী—তা বলা হ'য়েছে বাগ্‌ভট্ গ্রন্থের ২১ অধ্যায়ে। নিত্য ভোজ্য হিসেবে 'তুণ্ডিকেরী'। এটি আরও স্পষ্ট ক'রেছেন টীকাকার অরুণ দত্ত মহাশয়।

প্রতিটি সংহিতার যোগগুলির অর্থকে আরও সহজ ক'রে নিয়ে বৈদ্যককুল এই তেলাকুচার মূল, পত্র ব্যবহার ক'রে আসছেন; তবে ঔষধার্থে তিক্তরস সম্পন্ন বিম্বীকেই ব্যবহার করা হয়। আর মিষ্টরস তুণ্ডিকেরীকে আহার্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখানে একটা কথা ব'লে রাখি, এই মিষ্টরস তুণ্ডিকেরীই আমাদের দেশের সর্বজনগ্রাহ্য 'কুঁদ্‌রী' ফল; যেটা বিহার বা উত্তরপ্রদেশের সাধারণে তরকারি হিসেবে রান্না করে খেয়ে থাকেন।

পরিচিতি

অযত্নসম্ভূত লতাগাছ, বাগানের বেড়ায় অথবা কোন গাছকে আশ্রয় ক'রে জন্মে থাকে—বাংলা কেন, ভারতের প্রায় সর্বত্রই হয়। পাতার আকার পাঁচকোণা, ব্যাস ৪/৫ ইঞ্চি পর্যন্ত হ'তে দেখা যায় এবং তার কিনারা (ধার) করাতের ছোট দাঁতের মত কাটা; পাতার বোঁটা আন্দাজ এক ইঞ্চি, প্রায় বারোমাসই এই লতাগাছে ফুল হয়, তবে শীতকালে বিশেষ হ'তে দেখা যায় না, আর সব ফুলেই ফল হয় না। এই সব ফুলের বোঁটা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা, আর যেসব ফুলে ফল হয় তার বোঁটা আধ ইঞ্চির মত লম্বা হয়। ফলগুলি লম্বায় ১½/২ ইঞ্চির বেশী হতে দেখা যায় না। ফলগুলি আমড়া ঝাঁটি পটোলের মত দেখতে হ'লেও আকারটা যেন পটোলের মত। কিন্তু ফলের উপরটা মসৃণ (তেলা), কাঁচায় সবুজ রং, গায়ে সাদা ডোরা দাগ, পাকলে লাল হয়। কাঁচা বা পাকা কোন অবস্থাতেই খাওয়া যায় না, কারণ ফলের শাঁস তিতো (তিক্ত), এবং বমির উদ্রেক হয়; এর মধ্যে বহু বীজ আছে, অনেক পাখীর এটা প্রিয় খাদ্য, কিন্তু এদেশে অনেকে এর ডাঁটা-পাতার ঝোল ক'রে খেয়ে থাকেন। এই লতাগাছটির বোটানিকাল্ নাম Coccinia cordifolia Cogn. অথবা Coccinia indica W&A. পূর্বে এটির নাম ছিল Cephalandra indica Naud. এই গাছটির সিনোনিম্ (synonym) বদলে গেলেও এদের ফ্যামিলি সেই Cucurbitaceae. ঔষধার্থে ব্যবহার হয় ফল, পাতা, লতা ও মূলের রস।

এ ভিন্ন কি-গাছে আর কি-ফলে, ঠিক একই রকম দেখতে কিন্তু স্বাদে তিতো নয়, আর একটা ফল বাজারে তরকারি হিসেবে বিক্রি হয়, তাকে বলে কুঁদ্রি বা কুন্দ্রুকি; তাকে অনেকে মিষ্টি তেলাকুচো বলে থাকে।

লোকায়তিক ব্যবহার

১। **সর্দিতে:—** ঋতুকালের বিবর্তনে যে সর্দি হয়, সেই সর্দিকে প্রতিহত ক'রতে পারে, যদি তেলাকুচা পাতা ও মূলের রস ৪/৫ চা-চামচ একটু গরম ক'রে সকালে ও বৈকালে খাওয়া যায়; তা হ'লে এর দ্বারা আগন্তুক শ্লেষ্মার আক্রমণের ভয় থাকে না, তবে পাতার ওজনের সিকি পরিমাণ মূল নিলেই চলে।

এ সম্পর্কে একটি প্রবচন আছে—

> প্রাবৃষি ন ভ্রাম্যতি শরদি ন ভক্ষতি। ভক্ষতি হিম-শিশিরান্তে।
> স্বপিতি নিদাঘে ভ্রমতি বসন্তে সোঽরুক্ সোঽরুক্ সোঽরুক্॥

একটি বৃক্ষের শাখায় একটি পাখীই যেন কোঽরুক্ কোঽরুক্ কোঽরুক্ ধ্বনি ক'রছিলো। তাই কবির ভাষায় তার উত্তর দিয়েছিলেন, সেই রোগগ্রস্ত হয়, যে প্রাক্-বর্ষায় অর্থাৎ বর্ষার প্রাক্কালে জলে ভিজে বা হেঁটে যায় এবং শরৎকালে যে খুব বেশী পেট ভরে খায় তারা পীড়িত হয়। হেমন্তে ও শিশিরে যে পেট ভ'রে না খায়, আর গ্রীষ্মের দুপুর ছাড়া যে দুপুরে ঘুমোয়, সেও পীড়িত হয় এবং বসন্ত ঋতুর উষা ও উষসীতে অর্থাৎ ভোরে ও গোধূলিকালে যে ভ্রমণ না করে সেও পীড়িত হয়।

২। **অধোগত রক্তপিত্তে:—** জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে না অথচ টাটকা রক্ত পড়ে, অর্শের

কোন লক্ষণই পূর্বে বোঝা যায়নি; এক্ষেত্রে মূল ও পাতার রস ৩ চা-চামচ গরম ক'রে খেলে ঐ রক্তপড়া ২/৩ দিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে।

৩। **আমজ শোথে**:— যাঁদের আমাশা প্রায়ই লেগে থাকে, পা ঝুলিয়ে রাখলেই ফুলে যায়, এক্ষেত্রে মূল ও পাতার রস ৩/৪ চা-চামচ প্রত্যহ একবার ক'রে খেলে ঐ ফুলোটা চলে যাবে। তবে মূলরোগ আমাশার চিকিৎসা না করলে এ ফুলো আবার আসবে।

৪। **পাণ্ডু রোগে**:— (শ্লেষ্মা জন্য) এটির বিশিষ্ট লক্ষণ দেওয়া হয়েছে 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩২০ পৃষ্ঠায়। এইরূপ ক্ষেত্রে এর মূলের রস ২/৩ চা-চামচ গরম না ক'রেই সকালের দিকে একবার খেতে হবে।

৫। **শ্লেষ্মাজন্য জ্বরে**:— এইসব জ্বরে তেলাকুচো পাতা ও মূল একসঙ্গে থে'তো ক'রে ২/৩ চা-চামচ রস একটু গরম ক'রে সকালে ও বৈকালে ২ বার ক'রে দিন দুই খেলে জ্বরটা ছেড়ে যায়। এ জ্বরে সাধারণতঃ মুখে খুবই অরুচি, এমনকি জ্বর-ঠুঁটোও বেরোয়, আবার কারুর কারুর মুখে ঘাও হয়।

৬। **হাঁপানির মত হ'লে**:— আসলে বুকে সর্দি বসে গিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হ'চ্ছে, পূর্বে বংশপরম্পরায় হাঁপানি বা এক্‌জিমা অথবা হাতের তালু ও পায়ের তলায় অস্বাভাবিক ঘাম হওয়ার ইতিহাস নেই, এইরকম যে-ক্ষেত্র সেখানে এই তেলা-কুচোর পাতা ও তার সিকিভাগ মূল একসঙ্গে থে'তো ক'রে তার রস ৩/৪ চা-চামচ একটু গরম ক'রে খেলে ঐ সর্দিটা তরল হ'য়ে উঠে যায়।

৭। **শ্লেষ্মাজন্য কাসিতে**:— এই কাসিতে শ্লেষ্মা (কফ) একেবারে যে ওঠে না তা নয়, কাসতে কাসতে বমি হ'য়ে যায় তাও নয়, এই কাসিতে সর্দি (কফ) কিছু না কিছু ওঠে, তবে খুব কষ্ট ক'রে। এই রকম ক্ষেত্রে মূল ও পাতার রস ৩/৪ চা-চামচ একটু গরম ক'রে, ঠাণ্ডা হ'লে আধ চা-চামচ মধু মিশিয়ে (সম্ভব হ'লে) খাওয়ালে ঐ শ্লেষ্মা তরল হ'য়ে উঠেও যায় ও কাসিরও উপশম হয়।

৮। **জ্বরভাবে**:— জ্বর যে হবে তার সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, মাথা ভার, সর্বশরীরে কামড়ানি, এই অবস্থায় কাঁচা তেলাকুচো ফলের রস ১ চা-চামচ একটু মধু সহ সকালে ও বৈকালে ২ বার খেলে ঐ জ্বরভাবটা কেটে যাবে, তবে অনেক সময় একটু বমি হ'য়ে তরল সর্দিও উঠে যায়; এটাতে শরীর অনেকটা হাল্কা বোধ হয়। তবে যে ক্ষেত্রে এই রোগে বায়ু অনুষঙ্গী হয় সেখানে কাজ হবে না, যেখানে পিত্ত অনুষঙ্গী হয় সেখানেও কাজ হবে না; কেবল যেখানে শরীরে কফের প্রবণতা আছে, তার সঙ্গে ডায়েবেটিস্, সেখানেই কাজ ক'রবে। এ ক্ষেত্রের লক্ষণ হবে থপ্‌থপে চেহারা, কালো হ'লেও ফ্যাকাসে, কোমল স্থানগুলিতে ফোড়া হ'তে চাইবে বেশী, এ'দের স্বাভাবিক টান থাকে মিষ্ট রসে, এ'রা জলা জায়গার স্বপ্ন বেশী দেখেন। রমণের স্থায়িত্বও নেই যে তা নয়, এই বিকার যে কেবল বৃদ্ধকালে আসবে তা নয়, সব বয়সেই আসতে পারে। এদের ক্ষেত্রে আলু খাওয়া, মিষ্টি খাওয়া, ভাত বেশী খাওয়া নিষেধ ক'রেছেন আয়ুর্বেদের মনীষীগণ, যাঁরা বায়ু বা পিত্ত বিকৃতির সঙ্গে ডায়েবেটিস্ রোগে আক্রান্ত হন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই সব বর্জনের খুব উপযোগিতা আছে বলে আয়ুর্বেদের মনীষীগণ মনে করেন না।

৯। **বমনের প্রয়োজনে :—** অনেক সময় বমি করানোর দরকার হয়, যদি কোন কারণে তাঁর পেটে কিছু গিয়ে থাকে বা খেয়ে থাকেন—সেক্ষেত্রে তেলাকুচো পাতার রস ৫/৬ চা-চামচ কাঁচাই অর্থাৎ গরম না ক'রেই খেতে হয়, এর দ্বারা বমন হ'য়ে থাকে।

১০। **অরুচিতে :—** যে অরুচি শ্লেষ্মাবিকারে আসে অর্থাৎ সর্দিতে মুখে অরুচি হ'লে তেলাকুচোর পাতা একটু সিদ্ধ ক'রে, জলটা ফেলে দিয়ে শাকের মত রান্না ক'রে (অবশ্য ঘি দিয়ে সাঁতলে রান্না ক'রতে হবে) খেতে বসে প্রথমেই খাওয়া; এর দ্বারা ঐ অরুচিটা সেরে যাবে।

১১। **ডায়বেটিসে :—** অনেক সময় আমরা মন্তব্য করি, তেলাকুচোর পাতার রস খেলাম, আমার ডায়েবেটিসে সুফল কিছুই হ'লো না; কিন্তু একটা বিষয়ে যোগে ভুল হয়ে গিয়েছে। এই রোগ তো আর এক রকম দোষে জন্ম নেয় না। এক্ষেত্রে তেলাকুচোর পাতা ও মূলের রস ৩ চা-চামচ করে সকালে ও বৈকালে একটু গরম ক'রে খেতে হবে। এর দ্বারা ৩/৪ দিন পর থেকে তার শারীরিক সুস্থতা অনুভব করতে থাকবেন।

১২। **স্তন্যহীনতায় :—** মা হলেও স্তনে দুধ নেই, এদিকে শরীর ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে, এ'কে কাঁচা সবুজ তেলাকুচো ফলের রস একটু গরম ক'রে ছে'কে তা থেকে এক চা-চামচ রস নিয়ে ২/৫ ফোঁটা মধু মিশিয়ে সকালে ও বৈকালে ২ বার খেলে ৪/৫ দিনের মধ্যে স্তনে দুধ আসবে।

১৩। **অপস্মার রোগে :—** এটি যদি শ্লেষ্মাজন্য হয়, তবে এ রোগের বিশিষ্ট লক্ষণ হবে রোগাক্রমণের পর থেকে ভোগকালের মধ্যে রোগী প্রস্রাব ক'রে থাকে। এদের দাঁড়ানো বা চলাকালে কখনও রোগাক্রমণ বড় দেখা যায় না। খাওয়ার পর ঘুমন্ত অবস্থায় অথবা খুব ভোরের দিকে এদের রোগাক্রমণ হবে। এদের (এ রোগীর) মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরোয় না। এটা যদি দীর্ঘদিন হ'য়ে যায় অর্থাৎ পুরাতন হ'লে যদিও নিরাময় হওয়া কষ্টসাধ্য, তথাপি এটা ব্যবহার ক'রে দেখুন। এই ক্ষেত্রে তেলাকুচোর পাতা ও মূলের রস একটু গরম ক'রে, ছে'কে নিয়ে ২ চা-চামচ ক'রে প্রত্যহ খেতে হবে। তবে এটা বেশ কিছুদিন খাওয়ালে আক্রমণটা যতশীঘ্র আসছিলো সেটা আর আসবে না।

এই নিবন্ধের সমাপ্তির পরে এইটাই মনে হ'চ্ছে—বৈদিক যুগে ত্রিশূল ছিল না সত্যি, কিন্তু আমাদের বায়ু, পিত্ত ও কফ যেন ত্রিশূলের তিনটি ফলা। এই ফলার ধারটা বুঝে যদি খোঁচাটা দেওয়া যায়, সে খোঁচায় কাজ হবেই; এইটাই ছিল চরকীয় ধারার বৈশিষ্ট্য। আমরা না প'ড়ে বিদ্যেসাগর হ'য়েই না আমাদের আজ এই অধঃপতন!

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Enzyme, Hormone, Amylase. (b) Traces of alkaloids. (c) Vitamin-A, vitamin-C.

তরুণী

আপনার বয়স যেখানেই থাক, এই তরুণী শব্দাখ্যাত বস্তুটি নজরে আসুক আর মনেই আসুক, আপনার মন থ'মকে যাবেই; শুনেছি সেইটাকে টপকাবার জন্যই মধ্যযুগে তখন তান্ত্রিকদের একটি সাধনার অঙ্গ ছিল—কোন কুমারী তরুণীকে নিরাবরণা ক'রে কোলে বসিয়ে সাধনা করা; এটা নাকি তন্ত্রসাধনার একটি ধারা। এইভাবে সাধনার ব্যাখ্যায় তাঁরা ব'লেছেন, এখানকার আসল উদ্দেশ্য ছিল—শরীরের প্রথম ও প্রধান রিপুকে জয় করা। এই তরুণীর ব্যাখ্যায় লোক-সংস্কৃতিতে বলা হ'য়েছে—

"আষোড়শাদ্ ভবেদ্ বালঃ ততস্তরুণ উচ্যতে"

অর্থাৎ ১৬ বৎসরের ঊর্ধ্বের বয়সকেই বলা হয় তরুণ বা তরুণী। তা হ'লে এই শব্দটি কি পরবর্তীকালের সংযোজন? তাই যদি হবে তা হ'লে শব্দটি কি ক'রে সাধিত হয়েছে, তার নজির থাকবে তো, না কি? তবে এটা নিশ্চয়ই বৈদিক শব্দ।

অবশ্য তার প্রমাণ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে—যদি আমরা বৈদিক অভিধান যাস্ককে অনুসরণ করি।

তিনি ব'লেছেন, 'তৃ+উনন্ ইতি ঋক্,' (১০।৩।৪২), এর অর্থ তৃ ধাতুর বেদার্থ হ'লো ইর বা এর অর্থাৎ উত্তীর্ণ বা সরল ক'রে নিয়ে যায়। এই পর্যন্ত যেটুকু পাওয়া গেল তার দ্বারা সব অর্থটাই কিন্তু পরিস্ফুট হ'লো না, তবে ভাষ্যকার ভৈষজ্যকল্পের ক্ষেত্রে তরুণ এরণ্ড বৃক্ষের প্রথম বয়সের গঠন ও বৃদ্ধিকে উদ্দেশ ক'রে ব্যাখ্যা ক'রেছেন এবং আর একটা অর্থও ক'রেছেন, সেটি হ'লো পিচ্ছিল মাংসবৎ বস্তু যেখানে, তারই নাম তরুণ, আবার সেটি যদি লতাকৃতি ক্ষুপ জাতীয় ভূমিসান্নিধ্যা

হয়, সে হ'ল তরুণী বা কুমারী। আমার এ ক্ষেত্রের বক্তব্য কিন্তু মানবী তরুণীকে নিয়ে নয়, ভৈষজ্য তরুণীকে নিয়ে। তার সন্ধান পাওয়া যাবে—অথর্ববেদ বৈদ্যককল্প

৩৬।১২১।২ সূক্তে—

> যেন বহসি সহস্রং যেনাগ্নিং প্রতি জাগৃহি।
> যোনৌ যুবানান্ তরুণী কৃস্বানা বাতাংসী ত্বয়ি তন্তুমেতম্॥

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> আশয় ভেদেন গ্রহণীং শক্তিং ধারয়ন্তী তরুণী কুমারী বা তাং কুম্বানাঃ=কুর্বাণা বাতাংসী=অতানিষু অনুক্রমেণ বিস্তারিতবন্তঃ তন্তুং জজ্ঞং এতং ত্বয়ি। অপিচ যুবানান্=দেব যানান্ তরুণী বহতি তাং অগ্নিবহাং অগ্নিং ইব প্রতিজাগৃহি, যে সা সহস্রং অগ্নিং যোনৌ ধারয়তি, তন্তুকারণাৎ যজ্ঞকারণাৎ। তৃ+উনন্ ইতি যাস্ক (১০।৩।৪২)।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—যজ্ঞ কার্যে এবং এই দেহকার্যে আশয়ের পার্থক্য থাকায় গ্রহণী শক্তির প্রয়োজন সর্বাগ্রে, তারই জন্য ঋষিগণ এই তরুণী ভেষজের প্রশস্তি রচনা ক'রেছেন, এটি তরুণী বা কুমারী।

অপরপক্ষে বয়স হ'লেও যার বার্ধক্যের রূপ প্রকাশ পায় না, এই ভেষজ দেবযান-গুলি বহন করে, এখানে দিব্ অর্থ অগ্নি, সেই অগ্নি বাহিত হয় শরীরের সর্বত্র, তরুণী তার যোনিতে অগ্নিকে জাগ্রত রাখে। যজ্ঞের কার্যের জন্য (অপরপক্ষে দেহের কার্যের জন্য) গ্রহণী বা অগ্ন্যাশয়ের অগ্নিকে জাগ্রত রাখে। ঋষিগণ সেই তরুণীকে অগ্নিস্থান মনে ক'রেই জাগ্রত রাখেন। বেদের এই সূক্তের অর্থ বহুমুখ প্রসারী, নারীকে বলা হয় 'ঘৃতকুম্ভ সমা নারী' অর্থাৎ সামান্য তাপ সঞ্চারিত হ'লেই তাঁরা উত্তপ্তা হন বা গ'লে যান। কারণ ঘৃত শব্দটি অন্বিত হ'য়েছে ঘৃ+ত অর্থাৎ যা ক্ষরিত হয় অথবা যা দ্বারা বহ্নি দীপ্ত হয়। এই তরুণী বা কুমারী ভেষজও সামান্য তাপ ও চাপ পেলেই ক্ষরিত হয় এবং সেই তরুণীরসও অগ্নিকে দীপ্ত রাখে। এইজন্য আমাদের দেশে সেই কুমারীকে আরও স্পষ্ট ক'রে বোঝাবার জন্য ঘৃত শব্দ সংযোগে বিশেষিত করা হ'য়েছে, তাই তার প্রচলিত নাম 'ঘৃতকুমারী'; তাছাড়া বৈদিক ভাষ্যকারের অভিমতের সংগে মিল হয় এর পিচ্ছিল এবং মাংসল অবয়বের জন্য।

বৈদ্যকের নথি

(সংহিতা যুগের অনুশীলন)

চরক সংহিতার (বিমান অষ্টম অধ্যায়) তিক্তক স্কন্ধে এবং সিদ্ধিস্থানে তরুণী নামই গৃহীত হ'য়েছে, অনেকের ধারণা ঘৃতকুমারী বহির্ভারত হ'তে এদেশে এসেছে, এ ধারণা যে ভ্রান্ত, সেটা বৈদিক তথ্য ও চরকের উদ্ধৃতিই প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে। তাছাড়া চরকের ঐ বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ের ১৬৫ গদ্যে বলা হ'য়েছে, শ্লেষ্মরোগে যেগুলি প্রশস্ত ভেষজ, তাদের মধ্যে তরুণীও, অর্থাৎ শ্লেষ্মায় যেখানে অগ্নিমান্দ্য হয়, যার ফলে আম, ক্রিমি, সর্দি, আমশূল প্রভৃতির উৎপত্তি হয় সেক্ষেত্রে এর উপযোগিতা খুব। দ্বিতীয়বার উল্লেখিত সিদ্ধিস্থানের দশম অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে; এখানেও শ্লেষ্ম-বিকারে মলভেদ দেখা দিলে তরুণীর রস খুবই ফলদায়ক হয়। তাকে আরও বেশী ক'রে পর্যালোচনা ক'রে শার্ঙ্গধর প্রভৃতি অন্যান্য সংগ্রহকার বহু রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছেন। তথাপি সংহিতাকারের এবং বৈদিক তথ্যের আলোচনা ক'রে দেখছি—শ্লেষ্মবহ স্রোতের ক্ষেত্রে এটি কাজ করে; কিন্তু শ্লেষ্মার একান্ত আশ্রয় যে মস্তক, সে ক্ষেত্রে এটির ব্যবহারের উপযোগ দেখছি না, তবে এটা ঠিক যে, যে শ্লেষ্মার বিকারে অগ্ন্যাশয় বিকৃত হয় সেখানেই কাজ করে, কিন্তু লোকায়তিক

ব্যবহারে দেখা যায়, যেখানে বায়ুর আধিক্যে মাথায় চক্কর দিতে থাকে, কোন কোন প্রদেশে সেক্ষেত্রে এর শাঁসকে মাথায় লাগাবার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন।

পরিচিতি

ভারতের নানা স্থানের বাগানে চাষ করা হয়, তা ছাড়া দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে জঙ্গলের ধারে নানা ধরনের (নানা জাতীয়) ঘৃতকুমারী দেখা যায়, সেগুলি অযত্ন-সম্ভূত। এ ভিন্ন সৌখিন লোকেরা বাগান সাজাবার জন্যও এই গাছ লাগিয়ে থাকেন, এমন কি টবেও বসানো হয়। পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মতে এই গাছের আদিম বাসস্থান আরব ও সক্রোটা দ্বীপ; তবে একে এতটা গণ্ডিভুক্ত করা সমর্থন করা যায় না, কেননা অথর্ববেদে এই গাছের সমীক্ষা রয়েছে। সে সূক্তটি এই ভেষজ আলোচনার মধ্যে দেওয়া হ'লো।

এ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলার আছে, আর যদি ধরা যায় বর্তমান ভারত বা জম্বুদ্বীপ বিশাল অশ্বক্রান্তার (বর্তমান এশিয়া) অংশবিশেষ, তা হ'লে এ ভেষজটি যে পাশ্চাত্য (পশ্চাতে আগত) এ কথাটার প্রসঙ্গই ওঠে না।

এই গাছ এক/দেড় ফুট উঁচু হয়, পাতাগুলি পুরু, কিন্তু পাতার নিচের দিকটা আংশিক বৃত্তাকার, উপরের দিকটা সমান, পুরু পাতার দু'ধারই করাতের মত কাটা, ভিতরের মাংসল শাঁস পিচ্ছিল লালার মত; এর একটা উৎকট গন্ধও আছে, তার উপর তিক্তাস্বাদ। এর হলুদ রংয়ের যে আঠা (নির্যাস) বেরোয়, সেইটাই শুকিয়ে মুসব্বর তৈরী হয়। এই গাছের পুষ্পদণ্ডটি সরু লাঠির ন্যায়, ফুল লেবু রংয়ের, শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়। এটির বোটানিকাল্ নাম Aloe indica Royle. পূর্বে এর নাম ছিল Aloe barbadensis Mill. একে Aloe vera ও বলে। Liliaceae ফ্যামিলিভুক্ত। আর একটা কথা এখানে জানাই যে, কাথিয়াবাড় অঞ্চলের জাফিরাবাদে যে প্রজাতির ঘৃতকুমারী পাওয়া যায়, সেটির বোটানিকাল্ নাম Aloe abyssinica Lam., এটির আদিম দেশ আবিসিনিয়া। রোগ প্রতিকারে ব্যবহার হয়—পাতার মাংসল পিচ্ছিলাংশ, ডাঁটা, মূল ও শুষ্করস (মুসব্বর)।

লোকায়তিক ব্যবহার

১। **শুক্রমেহে ঃ—** প্রধানতঃ যাঁরা শ্লেষ্মাপ্রধান রোগে ভোগেন, তাঁদেরই এই রোগ বেশী হয়; কোঁত্ দিলে অথবা প্রস্রাব করার সময় শুক্রস্খলন হয়, এই সব লোকের ঠাণ্ডা জিনিসে আকর্ষণ বেশী দেখা যায়—এই ক্ষেত্রেই কেবল ঘৃতকুমারীর শাঁস আন্দাজ ৫ গ্রাম একটু চিনি মিশিয়ে হয় সকালে নইলে বৈকালের দিকে সরবত ক'রে খাওয়া অথবা শুধু চিনি মিশিয়ে খাওয়া। এর দ্বারা ৬।৭ দিনের মধ্যেই ঐ ক্ষরণ বন্ধ হ'য়ে যাবে।

২। **গুল্ম রোগে ঃ—** 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডে ৩৩৪ পৃষ্ঠায় এর বর্ণনা দেওয়া আছে। তা হ'লেও সংক্ষেপে একটু ইঙ্গিতটা দিই—গর্ভ হ'লে পেটে ব্যথা হয় না, আর গুল্মে প্রায়ই পেটে কুন্‌কুনে ব্যথা হ'তে থাকে; তবে এটা যে গুল্ম সেটা চিকিৎসকের রায় পেলে এই ঘৃতকুমারীর শাঁস ৫/৬ গ্রাম একটু চিনি দিয়ে দু'বেলাই সরবত ক'রে খেলে ৩/৪ দিনের মধ্যে ওটা ক'মে যাবে। তবে রক্তগুল্ম হ'লে এটায় কিছু হবে না।

৩। **ঋতুবন্ধেঃ—** গর্ভও নয় আবার গুল্মও নয়, অথচ মাসিক **ঋতু হয় না।** আবার কারও কারও মাসের মধ্যে ২/৩ দিন স্তনে ব্যথাও হয়। এমনকি কোমরেও ব্যথা হয়। এই অসুবিধের ক্ষেত্রে ঘৃতকুমারীর শাঁসকে চটকে তরল ক'রে আমসত্ত্ব যেমনভাবে রোদ্রে শুকিয়ে তৈরী করা হয়, সেইভাবে ৫/৬টি স্তর দিয়ে শুকিয়ে নিয়ে সেইটা আন্দাজ ২/৩ গ্রাম গরমজলে ভিজিয়ে দিনে ২ বার খেতে হয়। এর দ্বারা ঐ মাসিকটা আবার স্বাভাবিক হয়।

৪। **অগ্নিমান্দ্যেঃ—** (পিত্তবিকৃতির জন্য) এর বিস্তৃত পরিচয় 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র ৫৪৮ পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'য়েছে। সকালে ও বৈকালে ৩ গ্রাম (সিকি তোলা) আন্দাজ নিয়ে একটু চিনি মিশিয়ে খেলে ঐ অগ্নিমান্দ্য চ'লে যাবে।

৫। **ক্রিমিতেঃ—** (এর বিবরণ উক্ত পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৩১৯ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে), এক্ষেত্রে ঘৃতকুমারীর শাঁস ৫ গ্রাম ক'রে দু'বেলা জল দিয়ে খেতে হবে।

৬। **শিশুর মলরোধেঃ—** সদ্য প্রসূত শিশুর এক মাসের মধ্যে যদি দেখা যায় পেট ফাঁপা আছে, স্তন্যপানে অনিচ্ছা, তার সঙ্গে কান্না, এক্ষেত্রে তাকে কোন প্রকার জোলাপ দেওয়া সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে ১ ফোঁটা ঘৃতকুমারীর পিচ্ছিলাংশের রস মধুর সঙ্গে মিশিয়ে জিভে লাগিয়ে দিলে মলত্যাগ ক'রবে এবং পেটের বায়ুও ক'মে যাবে।

৭। **অর্শরোগেঃ—** এটির বর্ণনা উক্ত গ্রন্থের ৩১৮ পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'য়েছে। মোট কথা বলি, এ রোগের স্বভাবধর্ম কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়া, অবশ্য সেটা থাকুক আর নাই থাকুক, এক্ষেত্রে ঘৃতকুমারীর শাঁস ৫/৭ গ্রাম মাত্রায় একটু ঘি মিশিয়ে সকালে ও বৈকালে ২ বার খেতে হয়; এর দ্বারা দাস্ত পরিষ্কার হবে এবং অর্শেরও উপকার হবে।

৮। **এক্‌জিমায় (চর্ম রোগে):—** দেশ-গাঁয়ে একে বলে আঁধারযোনি রোগ —অনেকের এ রোগটা কৃষ্ণপক্ষে বাড়ে এবং শুক্লপক্ষে কমে আর বর্ষাকালে অথবা গ্রীষ্ম-কালেও এটা প্রায়ই বাড়ে; এক্ষেত্রে ঘৃতকুমারীর শাঁস ওখানে রগড়ে দিয়ে, খানিক পরে স্নান করুন, পরে একটু তিল তেল লাগিয়ে দিতে হয়; অথবা সম্ভব হ'লে আয়ুর্বেদিক মরিচাদ্য তেল লাগালে ভাল কাজ হয়।

৮। **ফিক্ ব্যথায়ঃ—** ঘৃতকুমারীর শাঁস লাগিয়ে আস্তে আস্তে খানিকক্ষণ মালিশ করুন, এটাতে কমে যাবে।

৯। **গ্রহণী রোগেঃ—** এর বিস্তৃত পরিচয় 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩১৭ পৃষ্ঠায় বলা হ'য়েছে; সংক্ষেপে বক্তব্য হ'লো—দিনের বেলায় ৩/৪ বার একটু একটু দাস্ত হবে, রাত্রে কিছু নয়। এ'দের মানসিকতা দেখা যাবে সর্বদা মতের পরিবর্তন—কোনটায় সারবে; তার ফলে আরও বিপদ আসে—হয় সংগ্রহগ্রহণী, তার পরিণতিতে হয়তো উদরী রোগও হ'তে পারে। যা হোক, এক্ষেত্রে ঘৃতকুমারীর শাঁস ৪/৫ গ্রাম খাওয়ার অভ্যাস ক'রলে ওটা সেরে যাবে।

এই পর্যন্ত রোগ প্রতিকারে তার যতগুলি মুষ্টিযোগ লেখা হ'লো তার সব কয়টিই এর পত্ররসের প্রয়োগ। এ ভিন্ন এই নির্যাস (আঠা) শুকিয়ে একটি জিনিস তৈরী হয় সেটা মুসব্বর ব'লে পরিচিত। এটার প্রচলন প্রাচীন ভারতে যে ছিল, তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব এটা ঐসলামিক্ দেশ আরব থেকে প্রথম এদেশে

আমদানী হ'য়েছে। তারপর মহীশূর ও কাথিয়াবাড়ের নিকটবর্তী জাফিরাবাদ অঞ্চলে কিছু কিছু তৈরী হ'তে থাকে। এখন এদেশের মুসব্বরই ভারতে চ'লছে, তবে গুণোৎকর্ষের দিক থেকে আরবের মুসব্বরই প্রধান। আর মহীশূর অঞ্চলের মুসব্বর শিল্পকার্যে ব্যবহার হয়।

এই মুসব্বর সম্পর্কে 'মেটেরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া' নামীয় ইংরাজী গ্রন্থে ডঃ আর্ এন্ ক্ষোরি যেটা লিখে গিয়েছেন তারই অনুবাদ হ'লো—মুসব্বর যকৃতের ক্রিয়াবর্ধক, মৃদু বিরেচক, আর্তবরজঃস্রাবকারী এবং ক্রিমিনাশক। অল্প মাত্রায় পাচক, যকৃতের বলবর্ধক এবং ধারক। বৃদ্ধ বয়সের দৌর্বল্য উৎপাদক পীড়া, ব্যায়াম বর্জনপূর্বক শয্যাসনসুখে রতি এবং পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ জন্য যে কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মিয়া থাকে তাহা দূরীকরণার্থ মুসব্বর খাওয়ানো যায়। অর্শরোগীর আমসংযুক্ত রক্তস্রাবে এটি হিতকর। লৌহাদির সহিত সেবিত হইলে ইহা আর্তবরজোরোধ বা রজঃকৃচ্ছ্র, বিমর্ষাত্মক মনোবিকার, গ্রহণী ও কোষ্ঠবদ্ধ রোগে হিতকর। এ ভিন্ন মুসব্বর সেবিত হইলে স্তন, যকৃত এবং কট্যভ্যন্তরস্থিত ইন্দ্রিয়গণ উত্তেজিত হয়, সুতরাং গর্ভস্রাব, অধোগ রক্তপ্রবৃত্তি এবং পুং শরীরে শিশ্নের সতত উত্তেজিতভাবে অবস্থান জন্মাইয়া থাকে। এ ভিন্ন আরও প্রতিবেদন তাঁর পুস্তকে লেখা আছে; তবে প্রাচীন বৈদ্যগণ ঘৃতকুমারীর প্রয়োগই বেশী করেছেন, তবে ইদানীংকালে দুটি-একটি ক্ষেত্রে এটির প্রয়োগের মুষ্টিযোগ আয়ুর্বেদসেবিগণের মধ্যে দেখা যায়।

উপসংহারে জানাই যে, আমরা শিব, দুর্গা, কালী, রাম, কৃষ্ণ কোন না কোনটা জপ করি; কিন্তু এই নামের মহিমা আমরা উপলব্ধি ক'রতে পারি কি? সেটা না পারার কারণ হ'লো ক্ষেত্রটা তাকে গ্রহণ ক'রতে পারছে না। সেই রকম এই তরুণী সেখানেই উপযোগী হবে, যদি যোগ্যস্থানে তাকে দেওয়া যায় তবেই, নইলে ক্ষেত্রটা যদি নপুংসক হয় তা হ'লে?

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Aloin, isobarbaloin, emodin, chrysophanic acid, uronic acid.
(b) Gum, resin, glycosides.

অশোক

এই অশোক লিখতে গিয়ে আমাদের মন চ'লে যায় সেই লঙ্কায়; সামনে রাবণ আর সেই বিরহিণী সীতা, গাছে হনুমান, চারিদিক পরিবেষ্টিত ক'রে আছে চেড়ী। আচ্ছা সে কাননে এত রকম বৃক্ষ তো ছিল, কিন্তু অশোক বনকে কেন নির্বাচন করা হ'লো, এটা ঋষি বাল্মিকীর স্বকপোলকল্পনা, না কোন গূঢ় তাৎপর্য রেখেই মহাকাব্যে তাকে স্থান দিয়েছেন? তারপর পুরাণের কাহিনীতে এসে যদি পেঁছুই তা হ'লে দেখা যাবে, পার্বতী যখন উপেক্ষিতা হ'য়েছিলেন শঙ্করের কাছে, তখন সেই মহেশ্বরকে পাওয়ার জন্য উমা কঠোর তপস্যা ক'রলেন ব্রতের সঙ্গে। এই কঠোর ব্রত ক'রতে উমা যখন যান, তখন দেবী মেনকা বলেছিলেন—

> "উ-মেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা।
> পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম।"

মেনকা ব'লেছিলেন, উ! অর্থাৎ বৎসে বা বাছা। মা অর্থাৎ তপস্যায় যেয়ো না; সেই থেকেই এর নাম উমা হ'লো। মায়ের বারণ না শুনে উমা গিয়েছিলেন তপস্যা ক'রতে। তাঁর তপস্যার নিকেতন যে বৃক্ষের তলদেশে হ'য়েছিলো সেটি ছিল অশোক বৃক্ষ; অনন্তকালের জন্য পার্বতীর শোক দূর হ'য়েছিলো ব'লেই তার পুরাণ-প্রসিদ্ধ নাম অশোক। এ তথ্যটি পাওয়া যায় অমরকোষের বনৌষধি বর্গের টীকাকার ক্ষীরস্বামীর সংগৃহীত তথ্য থেকে।

আবার এও প্রসিদ্ধি আছে, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র কলিঙ্গরাজের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে শত-সহস্র মানুষের জীবনহীন দেহস্তূপ দেখে সমগ্র জীবনের স্বভাবটাকেই

পরিবর্তিত ক'রলেন; আর তার নামও হ'লো প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোক।

এছাড়া ভারতীয় ব্রতচারিণী এয়োবৃন্দ আজও চৈত্রের শুক্লা ষষ্ঠীতে অশোক-ষষ্ঠী ও শুক্লা অষ্টমীতে অর্থাৎ বাসন্তী অষ্টমীতে অশোক-অষ্টমী ক'রে থাকেন; এই দুই দিন কয়েকটি ক'রে অশোক ফুলের কুঁড়ি কাঁচা দুধ দিয়ে খেয়ে থাকেন, এটাও একটা ব্রতোপচারের মধ্যে ধরে রাখা হ'য়েছে।

এ তো গেল সবই পরবর্তীকালের ঘটনা, তার পূর্বে এই গাছটির কোন ঐতিহ্য
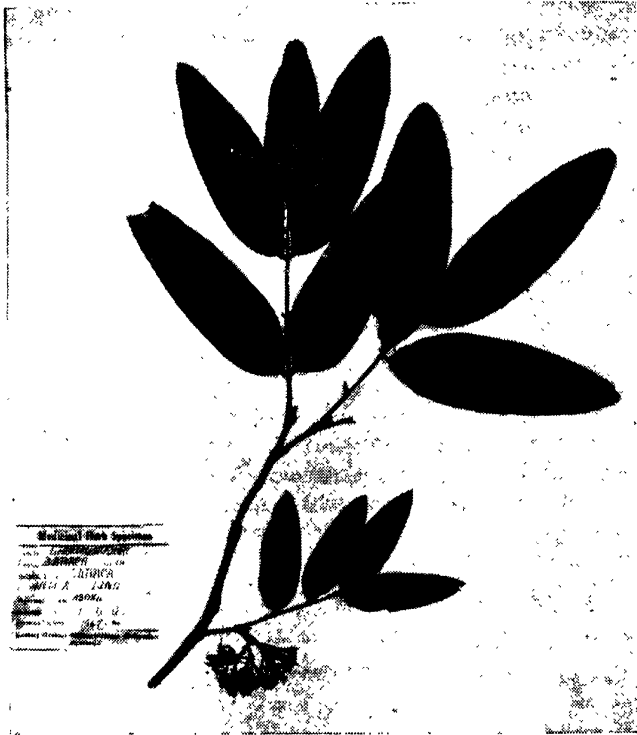
আছে কিনা সেটা অনুসন্ধান ক'রলে পাওয়া যাবে অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পে ৩৯৭। ১১১।২ সূক্তে এই বৃক্ষটি সম্পর্কে বলা হয়েছে—

রুচং জনয়ন্তঃ দেবা অগ্রে তদব্রুবন্।
শোণং অশোকঃ যস্ত্বেবং তৃষ্কাং অরুণদ্ দিব্যা বসন্ ম ইষাণ॥

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

অশোক মুদ্দিশ্য আচার্য্যাস্তু ব্যঞ্জুলং পাঠান্তরং গৃহীত্বা তব রুচং কান্তিং দেবা অগ্রে ব্রুবন্তঃ তেষাং ইষাণ এষণীয়ম্ যৎ তদ্ এবং

শোণিতং শোণ রূপং অরুণদ্ জনয়ন্তঃ দাহ-দোহদ্ এব দিব্যাঃ বসন্ এব।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—অশোককে উদ্দেশ্য করে আচার্যগণ একে ব্যঞ্জুলা বলেও পাঠান্তর গ্রহণ ক'রে ব'লেছেন, তোমার কান্তির কথা অগ্রে দেবতারাই বর্ণনা ক'রেছেন, তোমার মধ্যে তাঁদের এষণীয় অরুণ ও শোণিত রূপ ধারণ ক'রে আছে—ওটি দিব্য এবং দাহ ও দোহদ দুঃখ দূর করে।

এই সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ আলংকারিকবৃন্দ ব'লেছেন—কার্যকারণ হেতু না পেলে এসব ক্ষেত্রে দোষ ধরতে নেই, এটা মনে ক'রে নিতে হবে স্বতঃই, যেমন—পাপের রূপ কাল, যশের ও হাসির রূপ সাদা, রাগের রং রাঙা, চাঁদে কলঙ্ক; সরোবরে হংস চ'রছে, চকোরে চাঁদের জ্যোৎস্না পান ক'রছে এইসব। তেমনি বন্ধ্যা অশোক গাছে যুবতী পদাঘাত ক'রলে ফুল ফোটে, যুবতী রাঙা মেয়ে সৌরভযুক্ত মদের কুলকুচি করে বকুল গাছে ফেললে গাছে ফুল আসে।

"পদাঘাতাদশোকং বিকশতি বকুলং যোষিতামাস্য মদ্যৈঃ"।

এমনি আরও কত কবি-প্রসিদ্ধির বর্ণনা আছে। তাই ব'লছিলাম, এই অশোক নামটি কি শুভক্ষণেই না কার মুখে জন্ম নিয়েছে!

বৈদ্যকের নথি

বৈদিকসূক্ত ও সূক্তভাষ্য আমাদিগকে আরও গভীরে নিয়ে যায়; কারণ তার পরবর্তী সংহিতাকারবৃন্দ এই শব্দটির লোকব্যাকরণ সূত্রে এর পদচ্ছেদ ক'রে ও তার অর্থবোধ ক'রে যে নির্গলিতার্থ প্রকাশ ক'রেছেন, তাকে অনুসরণ ক'রেই আমরা চরক ও সুশ্রুত সংহিতার এবং আরও পরবর্তীকালের সংগ্রহ গ্রন্থে অশোকের স্বাভাবিক দ্রব্যশক্তির পরিচয় পাই; চরকের বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে, কল্পস্থানের প্রথম অধ্যায়ের ৩১ গুচ্ছে অশোকের দ্রব্যশক্তি হিসেবে এটিকে শ্লেষ্ম রোগে ও বমনোপযোগী দ্রব্য হিসেবেই ব্যবহারের উপদেশ পাওয়া যায়।

আর সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার ডল্লন ব'লেছেন—

"অশোকঃ শীতলশ্চার্শঃ ক্রিমীন্ হন্তি প্রয়োজিতঃ।"

অর্থাৎ এই অশোক স্বভাবতই শীতবীর্য, কিন্তু এর বীর্য ও প্রভাব দূর করে অর্শ ও ক্রিমি রোগ। তবে যথাযোগ্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হ'লে পর।

এটি আছে সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৩৮ অধ্যায়ে।

তাছাড়া, ষষ্ঠ শতকের বাগ্‌ভট্ এ সম্পর্কে নিজের অভিমত ব্যক্ত ক'রে ব'লেছেন, (সূত্রস্থানের ১৫ অধ্যায়ে) অনেকে ভুল ক'রে অশোক এবং বঞ্জুলকে এক ক'রে দেখেন, সেটা ঠিক নয়। বাগ্‌ভটের এই নির্দেশকে ভাবপ্রকাশকার (ষোড়শ শতক) আরও পরিষ্কার ক'রে ব'লেছেন (পূর্বখণ্ডের শেষ অধ্যায়ে) কতকগুলি শব্দের দ্ব্যর্থ, ত্র্যর্থ এবং অনেকার্থ নির্ণীত হয়, যেমন বঞ্জুল শব্দের তিনটি অর্থ—অশোক, বেতস ও তিনিশ। অতএব শব্দার্থের ঐক্য কখনও বহু বস্তুর ঐক্য হয় না, এই তাঁর বিশেষ অভিমত। তাই প্রাচীন ভেষজসমীক্ষকের মন্তব্য হ'লো, দুটি ক্ষেত্রের বঞ্জুল পৃথক দ্রব্য নয়, তা ব'লে অশোকও নয়। ওখানে ওটা জলবেতস। এটা আছে সুশ্রুতের উত্তর

তন্ত্রের কল্পস্থানের কীটকল্পের অষ্টম অধ্যায়ের ৫৩ শ্লোকে।

তা যাক, এখন দেখা যাচ্ছে—সুশ্রুত সংহিতার সূত্রস্থানের ৩৮ অধ্যায়ে সপ্তম গুচ্ছে রোধ্রাদিগণে অশোককে যোনিদোষহর এবং বিষবিনাশক বলা হ'য়েছে, আবার বিষ-দোষ দূর করার ক্ষেত্রে অশোককে একাকী না রেখে ত্রিবৃৎ (operculina turpethum) প্রভৃতি দ্রব্যের সঙ্গে ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে; অতএব বলা যায়, চরক সংহিতায় যাকে বঞ্জুল বলা হ'য়েছে সেটি অশোক নয়। সুশ্রুত সংহিতায় ও বাগ্ভটে অশোক নামই ব্যবহার করা হয়েছে, এমন কি চক্রদত্তও অশোক ব'লেছেন।

এ সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা, চক্রদত্ত ছাড়া কোন সংগ্রহ গ্রন্থে কিন্তু অশোকের বীজের ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায় না। চক্রদত্ত মূত্রাঘাতে (প্রস্রাব রোধে ও অশ্মরী রোগে) একটি বা দুটি অশোকের বীজ জলে বেটে খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়েছেন। অবশ্য এটাও আশ্চর্য লাগে যে, কষায়ধর্মী দ্রব্য মূত্ররোধে কি ক'রে ফলপ্রদ হ'তে পারে। জানি না দ্রব্যের প্রভাব এখানে এই রোগ উপশমে কার্যকরী হয় কিনা।

পরিচিতি

অশোক বহু শাখাবিশিষ্ট ছায়াতরু, বর্তমানে পথের ধারে একে রোপণ ক'রতে দেখা যাচ্ছে।

এই গাছ দীর্ঘদিনের হ'লে ২৫/৩০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হ'তে দেখা যায়। পাতার ডাঁটায় সাধারণতঃ ৫/৬ জোড়া পাতা থাকে। এই পাতা লম্বায় ৩ ইঞ্চি থেকে ৮/৯ ইঞ্চি পর্যন্ত হয় এবং চওড়া ১—১½ ইঞ্চি; কচিপাতা যখন বেরোয়, তখন তার রং লালচে তামাটে; এইজন্য গাছটির একটি নামকরণ করা হ'য়েছে 'তাম্রপত্রী'। বসন্তকালে গুচ্ছা-কারে লালচে কমলালেবুর রঙের ফুল হয়, বর্ষায় ৩ থেকে ১০ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা ও ১—১½ ইঞ্চি চওড়া শিম্বী অর্থাৎ শুঁটি হয়, তার মধ্যে ৪ থেকে ৮টি পর্যন্ত বড় বড় বীজ হ'তে দেখা যায়।

জন্মস্থান

দক্ষিণ ভারত, আরাকান, টেনাসেরিম, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, উড়িষ্যা ও আসামের অঞ্চল বিশেষ। পূর্বে এটি অযত্নসম্ভূত ছিল, বর্তমানে আস্তে আস্তে দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে আসছে, তবে শোভার জন্য অনেকে যত্নের সঙ্গে এই গাছটিকে বাগানে লাগিয়ে থাকেন।

এর বোটানিকাল্ নাম Saraca indica Linn., ফ্যামিলি Leguminosae.

ঔষধার্থে ব্যবহার হয়—গাছের বা মূলের ছাল, ফুল ও বীজ।

জ্ঞাতব্য বিষয়

একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যে, ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলের গাছের ছালের (ত্বকের) রঙও একটু লাল এবং সিদ্ধ ক'রলে কালচে লাল রং হয়; মনে হয় ঐ অঞ্চলের মাটিতে লোহার (লৌহের) অংশ থাকাতে এই গাছের ছাল লৌহের অংশের প্রভাব পায় এবং তার গুণ গ্রহণ করাটাও অস্বাভাবিক নয়। উপকারিতার দিক থেকে ময়ূরভঞ্জের ছালই ভাল। আর দক্ষিণ ভারত থেকে যে ছাল আমদানি হয়, তার রং লালচে নয়, একটু হ'লদে ধরনের। সিদ্ধ ক'রলে তার রং ঐ হ'লদে ধরনেরই হয়। এর প্রজাতি বা গণের

কোন পার্থক্য নেই।

এ সম্পর্কে আর একটি তথ্য জানানোর আছে; উত্তর প্রদেশ ও তৎসান্নিহিত অঞ্চলের বৈদ্যগণ অশোক ব'লে আমাদের এই অঞ্চলের প্রচলিত বীথিতরু দেবদারু—যার বোটানিকাল্ নাম Polyalthia longifolia Benth., ফ্যামিলি Anonaceae. এই গাছটিকে তাঁরা ব'লে থাকেন 'তপনীয়াশোক'। তবে বর্তমানে 'সর্বভারতীয় সন্দিগ্ধ ভেষজ কমিটি' বাংলাদেশে ব্যবহৃত অশোককেই প্রকৃত অশোক বলে স্বীকার ক'রেছেন।

লৌকিক ব্যবহার

প্রথমেই বলে রাখি, বায়ু, পিত্ত, কফ এদের স্বাভাবিক ক্রিয়া হ'তে থাকলে আমরা নীরোগ থাকি; সেটার যখনই অসমবণ্টন চলে (কোন কারণে বিগড়ে) তখনই শরীরে অস্বস্তি বোধ করি। এই অশোককে সাধারণতঃ প্রয়োগ করা হয়েছে যেখানে বায়ুবিকার, সে পিত্ত বা কফ যেটাই তার অনুবন্ধী হোক্। তাই চরক সুশ্রুতাদি গ্রন্থে এটিকে প্রয়োগ ক'রা হ'য়েছে বায়ুবিকারের ক্ষেত্রে।

১। **স্নায়ুগত বাতে ঃ—** প্রায়ই মাংসপেশীগুলি হঠাৎ শক্ত হ'য়ে সংকুচিত হয়, যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, সেক্ষেত্রে ১২ গ্রাম অশোকছাল একটু কুটে নিয়ে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে, এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সেই জলে ১ গ্রাম আন্দাজ সৈন্ধব মিশিয়ে সকালে ও বৈকালে দুইবারে খেতে হবে। এর দ্বারা স্নায়ুগত বাতের উপশম হবে। তবে এখানে একটু সাবধান ক'রে দিই, যাঁরা হাই ব্লাড্‌প্রেসারে ভুগছেন, তাঁরা এটা ব্যবহার ক'রবেন না।

২। **শ্বেত বা রক্ত প্রদরে ঃ—** যেখানে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধ'রে অল্প অল্প ঝির্‌ঝির্ ক'রে স্রাব হ'তে থাকে—সে সাদাই হোক আর রক্তই হোক, সেখানে অশোক-ছাল কাঁচা হ'লে ২০/২৫ গ্রাম আর শুকনো (শুষ্ক) হ'লে ১২ গ্রাম একটু কুটে নিয়ে, ১২৫ মিলিলিটার (প্রায় আধ পোয়া) দুধ ও জল ৫০০ মিলিলিটার (প্রায় আধ সের) একসঙ্গে মিশিয়ে সিদ্ধ ক'রে, আন্দাজ ১২৫ মিলিলিটার (আধ পোয়া) থাকতে নামিয়ে, গরম অবস্থায় ছে'কে বৈকালের দিকে খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৩। **রক্তার্শে ঃ—** যেখানে দেখা যায় মলদ্বার থেকে কাঁচা রক্ত প'ড়ছে অথচ বলিতে কোন জ্বালা-যন্ত্রণা নেই, সেখানে বুঝতে হবে এখানে বায়ুর প্রাধান্য, তাই ১০ গ্রাম আন্দাজ অশোকছাল কুটে ১ গ্লাস (২০০ মিলিলিটার) গরম জলে ১০/১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে, ছে'কে, প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে দু'বার খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ রক্তপড়া বন্ধ হবে।

৪। **হৃদ্‌দৌর্বল্যে ঃ—** বাজ পড়ার শব্দে, বন্দুকের বা বোমার আওয়াজে, এমনকি জোরে আলমারি বন্ধ করার শব্দেও বুক কে'পে ওঠে। এই রকম ছোটখাটো আওয়াজে ত্রস্ত হ'য়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, এটাও তো হৃদ্‌দৌর্বল্য। এই রকম যে অবস্থা সেখানে অশোকছাল ৫/৭ গ্রাম একটু কুটে নিয়ে, এক কাপ গরম জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে, ১০/১২ ঘণ্টা বাদে ওটাকে ছে'কে নিয়ে খেতে হবে। তবে এই ছালের ক্বাথ দিয়ে যথাযথ নিয়মে ঘি তৈরী ক'রে সেই ঘি ৬ গ্রাম (আধ তোলা) মাত্রায় খেলে ওটা সেরে যাবে।

৫। **নাড়ী স'রে আসায়ঃ—** প্রসব করানোর দোষে অথবা বহু সন্তানের মা হ'লে, মায়েদের অনেকের জরায়ুর নাড়ীটা ঝুলে আসে যেমন, আবার এদিকে তার সঙ্কোচনের শক্তিও ক'মে যায়; তারই পরিণতিতে ব'সবার সময় কারও বা অবাঞ্ছিত শব্দও হয়, এটা কিন্তু শিথিলতার বিশেষ লক্ষণ, তাই এই ক্ষেত্রে অশোকছাল ১০/১২ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে প্রত্যহ খেতে হবে।

৬। **মৃতবৎসায়ঃ—** মা হওয়ার ইচ্ছে কিন্তু গর্ভ হ'চ্ছে না অথচ এমন কোন বাধার কারণও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর যদি বা সন্তানসম্ভবা হ'লেন সেটাও নষ্ট হ'য়ে গেল, এক্ষেত্রে অশোকছাল ১৪/১৫ গ্রাম (২০ গ্রাম পর্যন্ত নেওয়া যায়) ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, একটু দুধ মিশিয়ে প্রত্যহ একবার ক'রে মাসিক বন্ধ হওয়ার পর পরের মাসে মাসিক ঋতু হওয়া পর্যন্ত পুরো ২৬/২৭ দিন খেতে হবে।

৭। **আমসংযুক্ত মলেঃ—** যে আম বায়ুতে শুকিয়ে চিম্‌সে হ'য়ে যায়, অবশ্য ধরে নিতে হবে এটা ক্রিমির উপদ্রবে সৃষ্টি হ'চ্ছে, সেক্ষেত্রে অশোকবীজ চূর্ণ ক'রে আধ গ্রাম মাত্রায় দু'বেলা একটু গরমজল সহ খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৮। **তৃষ্ণা রোগেঃ—** প্রবৃত্তি জাগে ঠাণ্ডা জল খাই, কিন্তু যত খাই—পিপাসা আর মিটছে না; আরও বেড়ে যাচ্ছে, জল খেয়ে পেট ঢাক। এখন প্রশ্ন হ'লো এটা কেন হ'চ্ছে? আয়ুর্বেদের চিন্তাধারা হ'লো—কোন উষ্ণদ্রব্য সেবনের পর অথবা রৌদ্রে ঘুরে এলে রসবহ স্রোতের উষ্ণতা আসে, অপরদিকে তার অগ্নিবলও ক'মে যায়; তাই ওটা (অগ্নির) সমধর্মিতা সৃষ্টি ক'রতে পারে না, সেই জন্যই তার এই চাহিদা। এক্ষেত্রে অশোকছাল ১০ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে, সকালে ও বৈকালে খেতে হবে, এর দ্বারা পিপাসা রোগটা সেরে যাবে।

বাহ্য প্রয়োগ (External application)

৯। **চর্মের কর্কশতায়ঃ—** খসখসে চামড়া, সাত রকম মেখেও চামড়ার ঔজ্জ্বল্য রাখা যায় না; বুঝতে হবে বায়ু বিকৃত হয়ে মাংসবহ স্রোতকেই দূষিত ক'রছে। এক্ষেত্রে অশোক বীজ বেটে হলুদের মত মাখলে ওটা সেরে যাবে।

আর এটা যদি সংগ্রহ করা সম্ভব না হয় তা হ'লে অশোকছালের ক্বাথ একটু ঘন ক'রে, গায়ে লাগিয়ে, এক/দেড় ঘণ্টা বাদ স্নান ক'রতে হবে।

১০। **দাহ রোগেঃ—** যাঁদের পিপাসা হয়, তাঁদের অনেকের শরীরে জ্বালা হ'তে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে অশোকছাল ২০/২৫ গ্রাম আন্দাজ ৪/৫ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, সেই ক্বাথ দিয়ে শরীরটা মুছে দিতে হয়, তারপর ঘণ্টাখানেক বাদে স্নান ক'রতে হবে। এটির ব্যবহারে গায়ের দাহটা ক'মে যাবে।

১১। **রক্তবন্ধেঃ—** কোন জায়গায় কেটে গেলে অশোক ছালের মিহি গুঁড়ো সেখানে টিপে দিয়ে বে'ধে রাখলে রক্তপড়া বন্ধ হ'য়ে যায়।

১২। **বিষাক্ত কীটের দংশনে বা স্পর্শ লেগেঃ—** যদি সেখানে ফুলে যায়, সেখানে অশোক ছালের ক্বাথ বার বার সেচন ক'রলে ঐ বিষুনিটা কেটে যাবে।

অশোক নিবন্ধ লেখার শেষে একটি কথা মনে প'ড়লো—লোকপ্রবাদ—"রাম জন্মাবার পূর্বেই রামায়ণ লেখা হ'য়েছিলো", তা হ'লে বাল্মিকী রামায়ণে লঙ্কার অশোকবনে যে সীতাকে রাখা হবে, সেটা লেখা ছিল কি ছিল না, আমার জানা নেই। তবে অশোক শব্দের অর্থ জ্ঞান; অর্থাৎ যে শোকগ্রস্ত হয় না সেই তো অশোক, তাই জ্ঞানীব্যক্তিকে বলা হয় "অশোকপুরুষ"। অশোকবনে সীতাকে রাখার অন্তর্নিহিত কোন তথ্য আছে কিনা সেটা গুণীজনের বিচার্য বিষয়; তবে আমার মতো গোলা বদ্যির বুদ্ধিতে আসছে যে, স্ত্রীপুরুষ ভেদে সকলকে যে ভয়গ্রস্ত করে না অর্থাৎ ভয়ার্ত করে না সেই অশোক। তার নামের স্মৃতিচারণা হিসেবে কি অশোকের ফুল খাওয়া? যেমন পূজার ফর্দ ক'রতে গেলো, প্রথমেই সিদ্ধি লিখতে হয়, আবার ফর্দের উপচারের সংগে দু-দশ পয়সার কিনতেও হয়, সেই রকম নয়তো?

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Tannin, catechol, essential oil. (b) Catechol, haematoxylin, a ketosterol, a saponin, organic calcium compound.

শিমুল

কি মানব আর কি মানবেতর প্রাণীর জগতে উলঙ্গ দেখলেই তার সান্নিধ্য চায়।

এমন কি এই বৃক্ষজগতেও আমরা সর্বদা ৪টি গাছকে দেখতে পাই—এরা বৎসরে ২ মাস উলঙ্গ থাকে; সে সময়ে তাদের সঙ্গ কামনা করে বিহঙ্গকুল। এরা হ'লো

শিমুল, পলাশ (Butea monosperma), পারিজাত (Erythrina indica) ও পদ্মক (Prunus cerasoides)। তাই মহাকবি কালিদাস তাঁর কাব্যের একটি স্ফুলিঙ্গ এই শিমুলকে উপলক্ষ্য ক'রে লিখেছেন—

বহুতর ইব জাতঃশাল্মলীনাং বনেষু।
ক্ষরতি কনক গৌরঃ কোটরেষু দ্রুমাণাং॥
পরিণত দল শাখানুৎপতন্ প্রাংশুবৃক্ষাণ্।
ভ্রমতি পবনধুতঃ সর্ব্বতোঽগ্নির্বনান্তে॥

এটির অর্থ হ'লো, যখন গ্রীষ্মের আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়েছে, তখন শাল্মলী তার সর্বাঙ্গে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আগুনকেই ব'লছে, এসো না এসো না এখানে, আমার সর্বাঙ্গে আগুন, তুমিও দগ্ধ হ'য়ে যাবে, শাল্মলীর এই অন্তর্বাণী বুঝেই পবন তার গায়ে ঢ'লে পড়ে, আরও যেন অগ্নিতরঙ্গ বাড়াতেই শাল্মলীর অঙ্গ-অগ্নিকে সর্বাঙ্গে তরল করে ছ'ড়িয়ে দিচ্ছে।

মহাকবির শাল্মলীর অগ্নিবর্ণের কুসুমগুলিকে বর্ণনা ক'রতে কবির চিত্তদর্পণকে যেদিকে ঘুরিয়েছেন সেইদিকেই শাল্মলীর রূপ ফুটে উঠেছে।

আমাদের বৈদিক ভারতের ঋষি কবিগণ আরও অন্তমুখী, আরও বাস্তবানুগ দৃষ্টিতে শাল্মলীকে দেখে ব'লেছেন—

পথস্পথঃ মোচঃ পরিপতিঃ সীষধাস কামেন তুলম্।
বিহঙ্গাঃ ভদ্রাঃ দুহানাঃ মচ্ছন্তু প্রপীতা স্বস্তিভিঃ সদানঃ॥
(অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ৭৩।১১২।২)

মহীধর এই সূক্তটির ভাষ্য ক'রেছেন—

ত্বং মোচঃ শাল্মলী ইতি লোকে শালঃ=দুর্গবৎ তিষ্ঠতি, সীধু মোচয়তি=মোচঃ পথস্পথঃ কামেন কাম্যত ইতি, কামং তেন বাঞ্ছিতেন পরিপতিঃ=অধিপতিঃ পথস্পথঃ=মার্গস্য সর্বেষাং মার্গানাং সীষধাসি তুলং=তুলিকাং, যে ভদ্রাঃ বিহঙ্গাঃ তে মোচয়ন্তু ইতি মোচঃ সীধুঃ মধু প্রপীতা। তব কুসুমানি পিবন্তীতি নঃ সদা স্বস্তিভিঃ অবিনাশৈঃ পালয়ত।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—তুমি মোচ, সাধু মোচন কর তাই মোচ, লোকপরিচয় শাল্মলী। শাল শব্দের অর্থ দুর্গ (বৃক্ষের কাঁটাগুলির গঠন স্তূপাকার দুর্গের মত), তুমি মার্গস্থ হ'য়ে বাঞ্ছিত ফলদান কর। মার্গের সকলেরই তুমি অধিপতি। তুমি তুলিকা দাও। তোমার কুসুমগুলি ভদ্র বিহঙ্গগুলিকে সীধু দান করে; তাই তুমি মোচ। তুমি অবিনাশী, আমাদিকে পালন কর।

ঋষিকবির এই দৃষ্টিটি শাল্মলীর অন্তর্ বহিঃশক্তির একটি দিক্‌কে নিরীক্ষণ ক'রবার অঙ্গীকার ক'রেই বোধ হয় এই সূক্তিটির জাগরণ হ'য়েছে।

বৈদ্যকের নথি

মহাকবির কাব্যরূপ, আর ঋষিকবির বাস্তব দৃষ্টিকে একত্র ক'রে আয়ুর্বেদ সংহিতায় তার রূপ দেওয়া হ'য়েছে—চরক সংহিতার সূত্রস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে মোচ বা শাল্মলীকে একবার শোণিতস্থাপনে আর একবার বেদনাস্থাপনে প্রয়োগ ক'রতে বলা হ'য়েছে, অর্থাৎ দেহের মধ্যে শোণিতের স্থান একটি বিশিষ্ট স্থান; কারণ শোণিতজ ব্যাধির যেমন স্বাভাবিক প্রকৃতি আছে, তেমনি আছে তার ঔপসর্গিক রূপও। এটিকে চিকিৎসাস্থানের ১৩ অধ্যায়ে ব্রণের দাহ নিবারণের জন্য বাহ্য ব্যবহার, তারপর সুশ্রুত সংহিতার দ্রব্যবর্গের মধ্যে প্রিয়ঙ্গু বর্গের ও শোণিতজ ব্যাধির উপশমনে যে তার দক্ষতা আছে সেটি শোণিতস্থাপন বর্গেই পঠিত। তাদের মধ্যেও এই মোচরসের বিশিষ্ট ভূমিকা। সেখানেও খুব সূক্ষ্ম সমীক্ষণ। কারণ জীবশোণিতের (Maternal blood) পরিপোষক এই দেহজাত শোণিত।

এ ছাড়া চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় শাল্মলীরসকে বিভিন্ন রোগের উপশামক হিসেবেও ব্যবহার করার উপদেশ। তবে এই মোচরস অর্থাৎ বৃক্ষের নির্যাসই ওষধি হিসেবে উপযোগিতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তারপর তার বৃন্ত (বোঁটা), ফুল ও তুলোর ব্যবহারের উপযোগিতা। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাবলা (Acacia arabica), জিওল (Lannea grandis) গাছে কোন অস্ত্রদ্বারা আঘাত ক'রে রেখে দিলে কিছুদিন বাদে সেখানে আঠা জমতে থাকে কিন্তু শিমুল গাছে কোন আঘাত

ক'রে অর্থাৎ কোপ দিয়ে রেখে দিলে সেখান থেকে এর নির্যাস বেরোয় না, অর্থাৎ এইভাবে মোচরস সংগ্রহ হয় না, সেটা মোটা গাছের গুঁড়ি থেকে আপনা-আপনি নির্গত হয়। এই বৃক্ষটির বিভিন্ন অংশের লোক-ব্যবহার প্রচুর; সেই সব মুষ্টিযোগ বৈদ্যক মহলে সুপরিচিত।

পরিচিতি

প্রথমেই ব'লে রাখি পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মতে এই শাল্মলী (Bombax) গণ (Genus) ভুক্ত; এই গণের ১০টি প্রজাতি (Species) এশিয়া, আফ্রিকা এমন কি আমেরিকার উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে ৪ হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু বনৌষধির সে বর্গীকরণ (classification) বর্তমানের চিন্তাধারায় হয় নি; তাই আমরা আমাদের বনৌষধির প্রাচীন গ্রন্থে তিন প্রকার শাল্মলীর উল্লেখ দেখতে পাই। (১) রক্ত শাল্মলী (২) শ্বেত শাল্মলী (৩) কূট শাল্মলী। রক্তবর্ণ পুষ্প ব'লেই তার নাম দেওয়া হ'য়েছে রক্ত শাল্মলী, যাকে আমরা চ'লতি কথায় শিমুল বলি।

এই লাল ফুলের শিমুল গাছই সমগ্র ভারত ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে চার হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যে তো আছেই, তা ছাড়া সিংহল, বর্মা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশেও জন্মে। গাছ ৫০/৬০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়, শাখা (ডাল) প্রশাখা হয় বটে, তবে অনেকটা সরল, গাছের গায়ে বহু কাঁটা, এই কাঁটাগুলির অগ্রভাগ সরু ও তীক্ষ্ণ কিন্তু কাঁটার গোড়াটা (মূলভাগ) বেশ মোটা, তাই বৈদিক তথ্যে উপমা দেওয়া হ'য়েছে 'তোমার গায়ে দুর্গের আকারের কাঁটা আছে।' এই গাছটির পাতার গঠন একটি লম্বা বোঁটায় যেন ছড়ানো আঙ্গুলের হাতের পাঞ্জা, শীতের শেষে গাছে আর পাতা থাকে না, বসন্তে ফুল হয়। এর ফুলে এক প্রকার স্বাদু তরল পদার্থ সঞ্চিত থাকে, তাই পাখীরা পিপাসা মেটাবার জন্য এই শিমুল গাছে ভিড় করে, তারপর হয় ফল, সেটা পাকে গ্রীষ্মে। গাছ থেকে ফলগুলি না ভেঙ্গে নিলে ওটা আপনা-আপনিই ফেটে গিয়ে তুলো বেরিয়ে যায়। এই গাছের গুঁড়ি থেকে এক রকম আঠা (নির্যাস) বেরোয়, সেটিই প্রচলিত মোচরস, সেটা শুকিয়ে বাজারে বিক্রি হয়, এর রং কৃষ্ণাভ লাল, অনেকে একে সুপারির ফুল বলে, আকারে না হ'লেও গুণের ও স্বাদের সাদৃশ্যের জন্যই এর এই নাম। আবার কোন কোন অঞ্চলে একে খয়েরের পরিবর্তে পানের সঙ্গে খেয়ে থাকে। এই গাছটির বর্তমান বোটানিকাল্ নাম Salmalia malabaricum Schott & Endl., ফ্যামিলি Bombacaceae, পূর্বে এটির নাম ছিল Bombax malabaricum, ফ্যামিলি Malvaceae.

ঔষধার্থে ব্যবহার হয়—ছোট চারাগাছের কচি মূল, বৃক্ষের মূলের ছাল, গাছের ছাল, ত্বক্‌রস (মোচরস), ফুল ও বীজ।

দ্বিতীয়টি হ'চ্ছে—শ্বেতপুষ্প শাল্মলী বা শ্বেত শাল্মলী। গাছগুলি দেখতে প্রায়ই একই রকম। সোজা হ'য়ে ওঠে, মাথাটা আস্তে আস্তে ক্রমশ সরু হ'য়ে জাহাজের মাস্তুলের মত হয়। গাছে কাঁটা কম হয়, কচি ডালগুলোয় কাঁটা নেই ব'ললেই হয়। ফলগুলি ফুটে গেলে মুখটা নিম্নাভিমুখী হয়। এটির বোটানিকাল্ নাম Ceiba pentandra (Linn.) Gaertn., ফ্যামিলি Bombacaceae.

তৃতীয়টি হ'চ্ছে—কূট শাল্মলী। এই বৃক্ষ কূটে অর্থাৎ পর্বতশৃঙ্গে জন্মে। দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রতীরবর্তী নিম্ন পর্বতমালায় প্রচুর হ'তে দেখা যায়—কাণ্ড ও শাখায় কাঁটা হয় না, বড় বড় হ'লদে রংয়ের ফুল হয়। এই তিনটি গাছের ফলেই তুলো হয়।

এই কূট শাল্মলী সম্পর্কে 'ইকোনমিক্ প্রোডাক্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থে বলা হ'য়েছে—"A common tree of the lower hills of India from Garhwal, Bundelkhand, Behar, Orissa and westward of the Deccan. It has large yellow flowers".

এই গাছটির বর্তমান বোটানিকাল্ নাম Cochlospermum religiosum (Linn.) Alston., ফ্যামিলি Cochlospermaceae. এই গাছ থেকে যে আঠা বেরোয় —সেইটাই শুকিয়ে 'কতিরা' বা 'কতিলা' ব'লে বাজারে বিক্রি হয়।

লোকায়তিক ব্যবহার

শিমুল প্রধানতঃ কাজ করে রক্তবহ ও শুক্রবহ স্রোতের উপর।

১। **প্রাক্-যৌবনে শুক্রক্ষয়েঃ—** এটা ঠিক যেন—

'বিবি যখন মানুষ হবে।
সাহেব তখন কবরে যাবে'॥

সেই দশাই হয়। যৌবন এলো সত্যি, প্রয়োজনও এখন, কিন্তু অন্তঃসারশূন্য ক'রে ব'সে আছে। এক্ষেত্রে কাঁচ শিমুলমূল (এই কাঁচ শিমুলমূল ব'লতে ২/৩ বৎসরের চারা গাছের মূল), সে মূলের ভিতরটা হবে পিচ্ছিল এবং শাঁখ আলুর মত নরম—এই মূল ৮/১০ গ্রাম মাত্রায় একটু চিনি দিয়ে দু'বেলা খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ শুক্রাল্পতার পূরণ হবে।

২। **প্রৌঢ় বয়সের স্বল্পতায়ঃ—** যৌন সংসর্গে এলেই নিজে অপ্রতিভ, এক্ষেত্রে কাঁচ শিমুলমূল চাকা চাকা ক'রে কেটে, শুকিয়ে, গুঁড়ো ক'রে ছেঁকে নিয়ে, সেই গুঁড়ো দেড় থেকে দু' গ্রাম মাত্রায় দু'বার এক কাপ গরম দুধ সহ খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটার নিরসন হবে।

৩। **অধিক রজঃস্রাবেঃ—** শিমুলগাছের মূলের ছাল চূর্ণ দেড় গ্রাম মাত্রায় প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে জল সহ খেতে হবে। তবে চমৎকার কাজ হয়, যদি যজ্ঞডুমুরের (Ficus racemosa) ছালের (গাছের) রস ১ চা-চামচ আধ কাপ জলে মিশিয়ে সেই জল দিয়ে ঐ শিমুলমূলের ছালের গুঁড়োটা খাওয়া যায়।

৪। **উরঃক্ষত রোগেঃ—** এই রোগ দীর্ঘদিন হ'লে কাসি আরম্ভ হয়। কিন্তু রক্ত উঠছে না সত্যি, কাসলেই বুক ব্যথা হয়, এ'দের উচিত শিমুলের আঠা (মোচরস) চূর্ণ ক'রে ৮০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় দু'বেলা দুধ সহ খেতে হবে।

৫। **দমকা রক্তামাশায়ঃ—** এটা মাঝে মাঝে হয়, আবার ওষুধবিষুধ খেলে বন্ধও হ'য়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল আমও যেমন রক্তও তেমন, এক্ষেত্রে এক গ্রাম বা দেড় গ্রাম মাত্রায় মোচরসের গুঁড়ো দু'বেলা ছাগল দুধ অথবা জল সহ খেতে হয়। এর দ্বারা এক-দু'দিনের মধ্যেই রক্তপড়া তো বন্ধ হবেই, আমাশাও উল্লেখযোগ্যভাবে ক'মে যাবে।

৬। **আমাশার মোচড়ানিতেঃ—** যেন প্রাণ যায়, কিন্তু দাস্তের নাম নেই। এক্ষেত্রে শিমুলের পাতার ডাঁটা ১০/১৫ গ্রাম এক দেড় ইঞ্চি ক'রে কেটে, থেঁতো ক'রে এক/

দেড় কাপ গরম জলে ভিজিয়ে, আধ ঘণ্টা বাদ ওটাকে চ'টকে নিয়ে, ছে'কে, ঐ জলটা একটু মিছরি মিশিয়ে খেলে দাস্ত পরিষ্কারও হ'য়ে যাবে আর মোচড়ানি ব্যথাও থাকবে না।

৭। **গ্রীষ্মের পিপাসায়ঃ—** জল খেয়েও পিপাসা যাচ্ছে না, এদিকে জল খেতে খেতে পেট জয়ঢাক; এই বেশী জল খাওয়ারও একটা দোষ আছে। কিছুদিন খেতে খেতে এ'দের অগ্নিমান্দ্য হ'য়ে যায়; তাই এই পিপাসাকে সীমিত ক'রতে গেলে শিমুল পাতার ডাঁটা ৬/৭ গ্রাম একটু থে'তো ক'রে এক গ্লাস জলে ভিজিয়ে রেখে একটু চ'টকে নিয়ে সেটা ছে'কে ২/৩ বার খেলে পিপাসার টানটা ক'মে যাবে। অনেকের মতে ফুলের সবুজ বাটির মত পুষ্পাধিটাই "শাল্মলী বৃন্ত"।

৮। **পুরনো কাসিতেঃ—** একে আমরা হামেশাই ব'লে থাকি "ক্রনিক কাসি"। এ'রা কেসে যাচ্ছেন, কিন্তু বিশেষ কিছু উঠছে না, মনে হ'চ্ছে গলাটায় এখনও কিছু আটকে আছে, আর যদিও একটু বেরুলো, সেটা যেন পাকা তালশাঁসের টুকরো। এই যে ক্ষেত্র এখানে মোচরসের গুঁড়ো ৮০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় দু'বার জল সহ খেতে হবে; তবে যদি বাসকপাতার রস ৪ চা-চামচ একটু গরম ক'রে, ছে'কে নিয়ে, সেই রসটাকে সহ পান করা যায়, তা হ'লে আর কথা নেই, তবে দু'বেলা বাসক পাতার রস না খেলেও চলে।

৯। **রক্তপিত্তেঃ—** এটির বর্ণনা 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩২১ পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'য়েছে, তবুও এখানে সংক্ষেপে ব'লে রাখি, এ'দের রক্তক্ষরণ হয় ভূমিকম্পের মত; মাসের, ঋতুর, দিন বা রাত কবে এবং কতদিন বাদে আসবে তার কিছুই ঠিক নেই; এ'দের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ হয়—মাঝে মাঝে নাক দিয়ে গরম নিশ্বাস বইতে থাকবে, আর চোখেও যেন আগুনের হল্কা দিচ্ছে; এক্ষেত্রে শুকনো (শুষ্ক) শিমুল ফুলের গুঁড়ো দেড় গ্রাম মাত্রায় চিনির জলে মিশিয়ে দু'বেলা খেতে হবে।

১০। **অপুষ্টিজনিত কৃশতায়ঃ—** এটা দেখা যায় গরীবের ঘরে। এ'দের মা ষষ্ঠীর কৃপার অভাব নেই, তারই পরিণতিতে এই অপুষ্টি। এদের হাত পা হয় নুলো অথচ পেটটা বড়। এদের ৪০০ মিলিগ্রাম (৩ রতি/৬ গ্রেণ) মাত্রায় মোচরসের গুঁড়ো যদি আধ কাপ দুধে মিশিয়ে প্রত্যহ খাওয়ানো যায়, তা হ'লে এই অপুষ্টির আংশিক পূরণ হবে।

১১। **প্লীহার ব্যথায়ঃ—** অনেকদিন থেকে ভাল হজম হ'চ্ছে না, মাঝে মাঝে আমাশাও হয়, এ'দের নোন্তা (লবণাস্বাদ) জিনিসে বেশী আসক্তি। পেটে ব্যথা হ'চ্ছে কিন্তু ঠিক করা যাচ্ছে না এটা কিসের ব্যথা। এক্ষেত্রে শিমুল ফুলের কুঁড়ি—শুক্নো হ'লে পাঁচ গ্রাম আর কাঁচা হ'লে ১০ গ্রাম—৩ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে প্রত্যহ একবার খেতে হবে। এটাতে ঐ প্লীহার ব্যথাটা চ'লে যায়।

১২। **প্রদর রোগেঃ—** এই রোগটি মা-বোনদেরই আসে, তবে তার কোন বয়েস নেই, রোগা-মোটা নেই, তাঁদের স্বভাবটা প্রায়ই খিটখিটে হ'য়ে যায়, পরিণামে এ'দের বাতরোগ আসাটা প্রায়ই নির্ধারিত হ'য়ে আছে, আর নইলে জরায়ুতে ক্যান্সার হওয়াটাও অসম্ভব নয়; সুতরাং উপেক্ষা করার অর্থই দাঁড়াবে ডাকাত পোষা। যা হোক, এই ক্ষেত্রে শিমুলফুল গাওয়া ঘিয়ে ভাজতে হবে, সেটা নামাবার সময় একটু সৈন্ধব

লবণ ছড়িয়ে দিতে হবে। সেইটি অন্ততঃ দেড় থেকে দু'গ্রাম মাত্রায় দু'বেলা খেতে হবে। এখানে একটা কথা ব'লে রাখি—বারোমাসই কাঁচা শিমুল ফুল পাওয়া যাবে না, সেক্ষেত্রে শুকনো (শুষ্ক) ফুলকে এক ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে, ওটা জল থেকে তুলে নিয়ে, জল ঝ'রে গেলে সেই ফুল ঘিয়ে ভেজে নিতে হবে।

১৩। **শিশুদের হাজায়ঃ—** এ হাজা হাত-পায়ের হাজা নয়, এটি একপ্রকার জীবাণুঘটিত রোগ। বাড়ীতে একটি শিশু হ'লে পাশাপাশি যারা থাকে তারা (শিশুরা) প্রায়ই এটাতে আক্রান্ত হয়। এদের লক্ষণ হ'লো আমাশা আর পেটে বায়ু, কখনও বা দুধ তোলার মত ছানা-কাটা ছানা-কাটা দাস্ত এবং দুর্গন্ধ; এর সঙ্গে বুকের দুধও খেয়ে যাচ্ছে, এদিকে মায়ের যে অম্লরোগ নেই তাও নয়, অবশ্য এক্ষেত্রে মায়ের অসুখটা কিন্তু গৌণ, আসলে শিশুটাই এই জীবাণুতে আক্রান্ত। এই ক্ষেত্রে মোচরসের মিহি গুঁড়ো ৫০ মিলিগ্রাম (এক গ্রেণের অথবা আধ রতির একটু কম) মাত্রায় একটু ছাগ-দুগ্ধ অথবা স্তন্যের সঙ্গে খেতে দিতে হবে। দুই-এক দিনে ঐ জীবাণুগুলি ম'রে যাবে এবং মলও স্বাভাবিক হবে।

বাহ্য ব্যবহার

১৪। **লোম ফোড়ায়ঃ—** লোমকূপের গোড়া থেকেই এগুলি ওঠে, এর জ্বালাও কম নয়, এ ক্ষেত্রে শিমুল ছাল বেটে, ঐ সব জায়গায় লাগিয়ে দিলে ২।৩ দিনের মধ্যেই ওর জ্বালাও চলে যাবে, ফোড়াও সেরে যাবে।

১৫। **পোড়া ঘায়েঃ—** পোড়ার ফোস্কাটা গ'লে গেলে হ'লো ঘা, এর প্রথমেও যেমন জ্বালা, যতক্ষণ না শুকোয় জ্বালার যন্ত্রণায় কাতর। প্রাচীন বৈদ্যদের এ ক্ষেত্রের প্রশমন করার হাতিয়ার ছিল শিমুল তুলোর সঙ্গে অল্প মোচরস মিশিয়ে, বেটে, ঐ পোড়া ঘায়ের উপর প্রলেপ দেওয়া, এর দ্বারা ক্ষতরোপক হ'য়ে পোড়া ঘা তাড়াতাড়ি পুরে উঠবে ও জ্বালার তীব্রতাও চ'লে যাবে, তবে মোচরস সমান পরিমাণের বেশী তুলো দেওয়ার দরকার নেই।

১৬। **মুখের মেচেতায় ও ব্রণেঃ—** শিমুলের কাঁটা (গাছের গায়ের) দুধে বেটে বা ঘ'ষে মুখে লাগাতে হবে, তবে বেশ কিছুদিন না লাগালে এ দাগ যায় না।

প্রদেশান্তরের কয়েকটি মুষ্টিযোগ

১৭। **অতিসার ও আমাশায়ঃ—** মোচরসের গুঁড়ো আধগ্রাম মাত্রায় সকালে ও বৈকালে দু'বার দুধ সহ খেতে হবে—এটা ডাঃ Stewart সাহেবের সমীক্ষা।

১৮। **অর্শ রোগেঃ—** শিমুল ফুল (শুষ্ক) ৫ গ্রাম, পোস্তদানা ৩ গ্রাম; ছাগল দুধ আধ কাপ আর জল ৩ কাপ একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'লে, সেটাকে চ'টকে, ছে'কে ঐটাকে সকালে ও বৈকালে দু'বারে খেতে হবে। এর দ্বারা অর্শের উপশম হবে।

১৯। **গণোরিয়ায়ঃ—** কচি শিমুল মূল ৫—১০ গ্রাম মাত্রায় জলে বেটে মিছরি দিয়ে সরবতের মত ক'রে খেলে গণোরিয়ার উপশম হয়।

২০। **গ্রন্থি স্ফীতিতেঃ—** কোন জায়গায় গ্ল্যাণ্ড্ ফুলেছে, সেখানে শিমুল গাছের

পাতা বেটে অল্প গরম ক'রে ওখানে প্রলেপ দিলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়।

২১। **শিশুদের দাস্ত অপরিষ্কারে:—** বয়সানুপাতে এক বা দেড় গ্রাম শুষ্ক ফুল জলে সিদ্ধ ক'রে, চ'টকে, ছে'কে নিয়ে খাওয়ালে কোষ্ঠকাঠিন্য সেরে যায়। Ref. W. G. Watt.

ভেষজ সমীক্ষার উপসংহারে জানাই যে, এই শাল্মলী বৃক্ষ যেন পৌরাণিকযুগের ধ্রুব-প্রহ্লাদের মত, শিশুকালের মহিমায় রোগাকুল মানুষকে মোহিত ক'রেছে, সেটি এই বনস্পতিটির বাল্যের মহিমা; আবার যৌবনে সে হিরণ্যকশিপু, তার কণ্টকাকীর্ণ দেহ বধ ক'রেছে বহু রোগকে, আবার যখন সে পুষ্পিতা তখন সে মাতৃস্বরূপা হ'য়ে বিহঙ্গকুলকে দান ক'রেছে স্তন্য স্বরূপ ফুলের মধু। আমার পূর্বপুরুষরা তার তিনটি রূপকেই দেখেছিলেন।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Catechutannic acid, fatty matter, stearin, proteins, semul red, tannins, arabinose, galactose, pectous matter, starch, mucilage (salicophosphoric ester of mannogalactan.) (b) Lipids viz., phosphatides, cephaelin.

ন্যগ্রোধ (বট)

সমাজের ধনীশ্রেণীর বা প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের ছায়ায় থেকে অন্য কোন ক্ষুদ্র ব্যক্তি বড় হ'তে পারে না বা তারা ছোটকে বাড়তে দেয় না—তার মনস্তত্ত্বটা জাগতিক

রীতিতে মাৎস্যন্যায় স্বভাবসিদ্ধ; উদ্ভিদ জগতেও বোধহয় এর ব্যতিক্রম হয়নি, তার অন্যতম নিদর্শন এই ন্যগ্রোধ।

এটা কেন বলছি

বেদভাষ্যকার মহীধর ন্যগ্রোধের ব্যাখ্যায় যাস্কের শব্দভেদের উল্লেখ ক'রে ব'লেছেন ন্যক্+রুণদ্ধি=রুধ্ অচ অর্থাৎ 'ন্যক্' অর্থে ক্ষুদ্রতা, তাকে যে ধ'রে রাখে সেই-ই
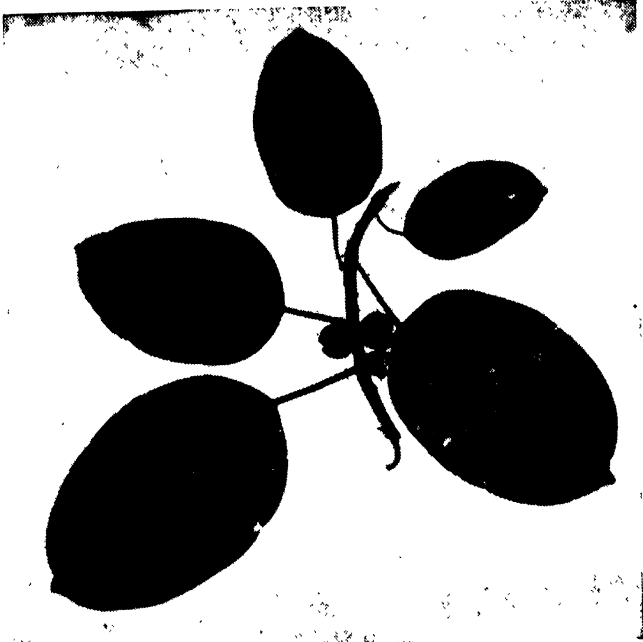
ন্যগ্রোধ। আর ন্যক্কার শব্দটি এই 'ন্যক্' থেকে এসেছে, এটি নীচতার দ্যোতক, কিন্তু কবির চোখে ন্যগ্রোধের চারিত্রিক বর্ণনা যা রয়েছে সেখানে তিনি তুলনা ক'রেছেন ন্যগ্রোধপত্রের আকারকে নারীর বক্ষোশোভার সঙ্গে। সেখানে বলেছেন—

"স্তনৌ সুকঠিনৌ যস্যা নিতম্বেচ বিশালতা
মধ্যে ক্ষীণা ভবেদ্ যা সা ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলা।"
(রসমঞ্জরী)

এখানে যৌবনভরা দেহের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অংশ দুটি স্তন ও নিতম্ব। কবি তাদের তুলিত করেছেন ন্যগ্রোধের সঙ্গে। এখানে কবির বক্তব্য, দেহের বাকী অংশটাই তার চোখে ছোট হ'য়ে থাকলো নিতম্ব আর পীন-বক্ষোজের মোহিনীতে।

ন্যগ্রোধের প্রচলিত আর একটি নাম বট। এখন 'বট' এই শব্দ-নামটি কোথা থেকে এলো!

আদি শাস্ত্রে বট শব্দটা খুঁজে পাওয়া যায়নি, কিন্তু 'বৃত্ত' শব্দের উল্লেখ আছে। তবে রামায়ণে এটার উল্লেখ আছে; কারণ জটা তৈরী করার জন্য বটের আঠার ব্যবহার করা হ'য়েছে, আর আছে আয়ুর্বেদের সংহিতা গ্রন্থে।

সেই আদি 'বৃত্ত' শব্দটি পালি ভাষার রূপান্তর হ'তে হ'তে দাঁড়িয়েছে—বৃত্ত= বৃট্ট=বট্ট, সেইটাই বট ব'লে প্রচলিত হ'য়েছে। দূর থেকে বট গাছকে একটা বৃত্ত অর্থাৎ গোল দেখায়, তাই সে বট। উপমার ক্ষেত্রে কবি একেও বাদ দেননি, তাই তার ছায়ার শীতলত্ব সম্পর্কে বর্ণনা ক'রতে গিয়ে লিখেছেন—

"কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামাস্ত্রী ইষ্টকালয়ম্।
শীতকালে ভবেৎ উষ্ণা গ্রীষ্মকালে তু শীতলা॥"

অর্থাৎ কুয়োর জল, বটগাছের তলা, শ্যামা স্ত্রী আর পাকা বাড়ী—এদের সান্নিধ্য শীতকালে গরম থাকে এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা থাকে।

এবার ফিরে যাই বৈদিক যুগে, সেখানে কি বলা হয়েছে দেখা যাক।

আয়ুষ্মান্ অগ্রে ন্যগ্রোধঃ সবিতৃ প্রতীকঃ দাহযোনির্ভাস্বৎ ষ্বক্‌ধি।
পিতেব পুত্রং শকুনং বিভর্ত্তি যম প্রশস্তা অভিরক্ষতাদিমান্।
(অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ১৭।৩।৭৩)

এই উক্তিটির মহীধরের ভাষ্য হ'লো—

ত্বং অগ্রে আয়ুষ্মান্ ভব চিরঞ্জীব, ত্বং ন্যগ্রোধঃ অসি অন্যান্ ক্ষুদ্রান্ তুচ্ছীকৃত্য স্বাত্মানং অগ্রে ধারয়সি, রোধয়সি চ। ত্বং সবিতুঃ প্রতীকঃ মুখং। ত্বং দাহস্য যোনিঃ যুনি শান্তৌ, ভাস্বৎ কান্তিং ষুক্‌ধি=ধারয়। যথা পুত্রং পিতা বিভর্ত্তি তথা ত্বং শকুনং= শকং=শুভাশুভং ব্যনক্তি পক্ষী=গৃধ্রাদি তং। ত্বং যমঃ সংগ্রাহী সর্বেষাং অভিরক্ষতাৎ অভিরক্ষ ইমান্।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—ওহে ন্যগ্রোধ (বট), তুমি অগ্রবর্তীকালে চিরজীবী হও। তুমি তো ন্যগ্রোধ। অন্য ক্ষুদ্র বৃক্ষকে তুচ্ছ ক'রে নিজেকে সকলের আগে তুলে ধর; কিংবা তাদিকে রুদ্ধ কর। তুমি সূর্যকিরণের প্রতীক। তুমি তাপের শান্তি দাও। দেহের কান্তিকে ধারণ কর, যারা ভাবী শুভাশুভের ইঙ্গিত বহন করে, সেই শকুন (গৃধ্র) পক্ষীকে স্থান দাও। তুমি যম বা সংগ্রাহী। তুমি আমাদের সঙ্গে এদিকেও রক্ষা কর।

বৈদ্যকের নথি

(সংহিতা যুগের অনুশীলন)

আলোচ্য সূক্তটিতে উক্ত 'ন্যগ্রোধ' শব্দটি সুশ্রুতেও গৃহীত হ'য়েছে, কিন্তু চরকে

গৃহীত হয়েছে 'বট' ও 'ন্যগ্রোধ' দুই-ই। চরকের সূত্রস্থানের ৪র্থ অধ্যায়ে বট শব্দের উল্লেখ; অন্যত্র ন্যগ্রোধের। বট শব্দের অর্থ হ'লো—যা গোল ক'রে বেষ্টন ক'রে থাকে এবং প্রসারিত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে। এর ভৈষজ্য শক্তি পর্যালোচনাকালে বেদের শব্দটি অর্থাৎ সংগ্রাহী শক্তিটির উল্লেখ ক'রে বলেছেন—এটি মূত্র-সংগ্রাহী। শব্দের বক্তব্য হলো—আহারের সারহীন মলের দ্রবাংশ। এটি রসবহ স্রোতের দ্বারা প্রবাহিত হয়। বায়ু-প্রধান হলে পান্ডুর বর্ণ, পিত্ত-প্রধান হলে রক্তবর্ণ এবং শ্লেষ্ম-প্রধান হলে ফেনা ফেনা এবং খুব সাদা হয়। মেহন স্থান দূষিত হলে বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মার প্রাধান্য ও বিকার ঘটলে এক্ষেত্রে সংগ্রাহী ঔষধ দিতে হয়। চরক সংহিতায় মূত্রের সংগ্রাহী বলায় মূত্রের মৌলিক স্রোতটি দূষিত হওয়ারই ইঙ্গিত করেছেন—সেক্ষেত্রে বটের ঝুরি বা বটের ছালের ক্বাথ মূত্রবহ স্রোতকে শুদ্ধ করেই সংগ্রহ করে। তারপর এই সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে এই বটের আর একটি বিশেষ গুণের কথা বলেছেন—এটি পিত্তপ্রধান অতিসারে ব্যবহার করবে।

সুশ্রুতে বলা হয়েছে—এই ন্যগ্রোধ ভগ্নসাধক, রক্তপিত্তহারক, দাহহারক (এটি অবশ্য বৈদিক ইঙ্গিত), মেদোহারী; বিশেষ ক'রে যোনির যত প্রকার রোগ হয়, তা দূর করে।

বাগভট্ এই সুশ্রুতের মতই ন্যগ্রোধের ব্যবহার বেশী ক'রে গ্রহণ করেছেন। বটের সর্বাংশেরই গুণ সংকোচক—এই অভিমত চরকের এবং বেদেরও।

আরও পরে ভাবপ্রকাশের বক্তব্য—

> বটঃ শীতো গুরুর্গ্রাহী কফপিত্তব্রণাপহঃ।
> বর্ণ্যো বিসর্পদাহঘ্নঃ কষায়ো যোনিদোষহৃৎ॥
> বটাঙ্কুরা মসূরাশ্চ প্রলেপাদ্ ব্যঙ্গনাশনম্।

এই উক্তিগুলি বৈদিক ও চরক-সুশ্রুতের মতেরই বাহক।

পরিচিতি পর্ব

সমস্ত ভারতবর্ষে এটি একটি সুপরিচিত নাম। আর সেজন্য এটির বিশেষ পরিচিতির কোন প্রয়োজন নাই। এর শাখা-প্রশাখাগুলি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, এক এক সময়ে বোঝা যায় না কোনটি প্রাচীন অংশ। বসন্ত ও গ্রীষ্মে এর ফুল এবং বর্ষায় এর ফল হয়। ফলগুলি গোলাকার, পাকলে রক্তবর্ণ হয়। এটি Urticaceae পরিবারভুক্ত এবং এর বোটানিক্যাল নাম Ficus bengalensis Linn., একে ইংরেজীতে Banyan tree বলা হয়। হিন্দীতে একে বড়কল বলে।

আধুনিক দৃষ্টিতে

ছাল ও ঝুরিতে ১০% ট্যানিন, মোম ও রাবার পাওয়া যায়। ফলে তৈল, অ্যাল-বুমিনাইড্, কার্বোহাইড্রেট, সূত্র ও ভস্ম ৫-৬ শতাংশ থাকে।

গুণ বিচারে

এটি গুরু, রুক্ষ, শীতবীর্য, কষায় রসবিশিষ্ট, বিপাকে কটু। ইহা ধারক, সঙ্কোচক,

দাহ-শান্তিকারক, রক্তপিত্তহর, বর্ণকারক, যোনিদোষনাশক, মূত্র সংগ্রণীয়, রক্তশোধক ইত্যাদি।

ঔষধার্থে এটির ছাল, দুধ (ক্ষীর), শুঙ্গ (অঙ্কুর), পাতা ফল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োগ ক্ষেত্র

১। **আমাতিসারেঃ—** যেখানে দাস্তের সঙ্গে শরীরের দাহ থাকে, সেখানে পিত্ত-বিকার হ'য়েছে এইটাই প্রমাণিত; কেবলমাত্র সেই অতিসারে বটের কুঁড়ি (পল্লবের শীর্ষভাগের অংশটি) ২টি ক'রে বেটে তিন ঘণ্টা অন্তর ২/৩ বার আতপ চাল ধোওয়া জল দিয়ে খেতে দিলে ওটার উপশম হবে। তবে শিশু বা বালকের মাত্রা বয়সানুপাতে। এটাতে দু'দিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া যায়।

২। **নাক দিয়ে রক্ত পড়ায়ঃ—** নাসা (পলিপাস্) নেই এবং হাই প্রেসারও নেই, অথচ রক্ত প'ড়ছে—এক্ষেত্রে রুক্ষতাই এর কারণ। এখানে বটের কুঁড়ি, ঝুরি ও ছাল মিলিত তিনটিতে ৮/১০ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে, ১ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে, একটু দুধ মিশিয়ে খেতে হবে। সুশ্রুত সংহিতায় উক্ত আছে এটা রক্তপিত্তেও দেওয়া যায়।

৩। **যোনির অর্শেঃ—** এখানেও অর্শের মত বলি হয়, অনেক সময় ব্যথা ও অল্প স্রাব হয়, কিন্তু সেটা রক্ত নয় এবং একটা আঁস্টে গন্ধও থাকে। এক্ষেত্রে ৮/১০ গ্রাম বটের ছাল থেঁতো ক'রে ১ কাপ গরম জলে ভিজিয়ে রেখে, সেটা ছেঁকে অর্ধেকটা জল খেত হয় আর বাকী অর্ধেকটা দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়।

৪। **শুক্রতারল্যেঃ—** (যাকে আমরা চলতি কথায় বলি ধাতু পাত্লা) শুক্রটা জলের মত পাত্লা হ'য়ে গিয়েছে, ধারণের শক্তি কম, অল্প উত্তেজনায় ক্ষরিত হয়, এক্ষেত্রে বটের আঠা ৩০/৪০ ফোঁটা দুধে মিশিয়ে সকালে বৈকালে ২ বার খেতে হয়। এটাতে কয়েকদিনের মধ্যেই ওটার যে ঘনত্ব আসছে সেটা প্রত্যক্ষ ক'রবেন।

৫। **ধসা মেদেঃ—** ঢোলা শরীর, মেদের যেন কোন আঁটসাঁট নেই; সেক্ষেত্রে ৫/৬ গ্রাম বটের ছাল থেঁতো ক'রে এক কাপ গরম জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে, পরের দিন ছেঁকে ওটা সকালে ও বৈকালে দুই বারে খেতে হবে।

৬। **দাহ রোগেঃ—** কি গ্রীষ্ম কি বসন্ত, কি সকাল কি বৈকাল, সর্বদাই গায়ে জ্বালা, হাওয়াতেও যেন স্বস্তি হ'চ্ছে না; এক্ষেত্রে ৫০ বা ১০০ গ্রাম আন্দাজ বটের ছাল ১ লিটার জলে সিদ্ধ করে সিকি থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে অন্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে সেই জলে স্নান করা আর ঐ সিদ্ধ জল ২/৩ চা-চামচ নিয়ে খেতে হবে, তবে খাওয়ার সময় একটু দুধ মিশিয়ে খেলে ভাল হয়। এটা আমার কথা নয়, 'সুশ্রুত সংহিতা' ও 'অষ্টাঙ্গ হৃদয়' এই দুটি প্রামাণ্য গ্রন্থের সিদ্ধযোগ।

৭। **রক্তপ্রদরে (স্ত্রী-রোগ)ঃ—** মাসিক হ'লে দীর্ঘদিন ধ'রে চলে, কখনও বেশী কখনও কম, প্রস্রাবে গন্ধ থাকে, আবার এটা ক'মে গেলে চুলকোয়, এক্ষেত্রে বটছাল ৫ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে একটু দুধ ও চিনি মিশিয়ে খেতে হবে। তবে ছাগল দুধ হ'লে ভাল হয়। তবে এটা সিদ্ধ করার

সুবিধে না হ'লে ওটা থে'তো ক'রে গরম জলে ভিজিয়ে রেখে পরের দিন ছে'কেও খাওয়া যায়।

৮। **ফোড়ায় (স্থান বিশেষের):—** বেয়াড়া জায়গা, সেখানে কম্‌প্রেস্‌ ক'রতে নেই আবার করাও অসুবিধে, সেখানে বটের কচিপাতা বেটে লাগিয়ে দিতে পারলে ওটা ব'সে যায়, কারণ এসব জায়গায় পাকানো বা ফাটানো উচিত নয়।

৯। **পা-ফাটায়:—** এটা হয় বায়ু, পিত্তাধিক্য প্রকৃতির লোকের। যাঁদের ফাটে তাঁদের স্বভাবটা হবে নিজের কোলে ঝোলটা বেশী টানা, আত্মম্ভরিতায় তাঁরা সদা তৎপর। তাঁরা পায়ে ফাটা আসছে দেখলেই সুরুতেই বটের আঠা পায়ের গোড়ালি বা ধারে লাগিয়ে দেবেন, ওটা আর আসবে না।

১০। **মেচেতায়:—** রূপ থাকতেও রূপের বড়াই করা যায় না, আবার লুকোবারও উপায় নেই, অথচ ঘষেমেজেও যায় না—এ সমস্যা সমাধানের উপায় বটের শুঙ্গ (ফল বেরোবার আগে এটা হয়) আর মসুরির ডাল একসঙ্গে বেটে মুখে লেপে দিতে হবে; তবে দাস্ত পরিষ্কার যেন হয় সেটাও লক্ষ্য রাখতে হবে।

১১। **হাড় মচ্‌কে যাওয়ায়:—** বটের ছাল বেটে অল্প গরম ক'রে প্রলেপ দিয়ে উপর ও নিচে একটা শক্ত জিনিস চাপা দিয়ে বে'ধে দিতে হবে। কয়েকদিন একনাগাড়ে বে'ধে রাখলে ঐ মচকানোটা ঠিক হ'য়ে যাবে।

১২। **দন্তশূলে:—** বটের আঠা লাগালে উপশম হয়।

১৩। **পতিত স্তনে:—** বটাবরোহ, (বটের ঝুরি) অগ্রভাগের কচি অংশটা জলে বেটে চন্দনের মত করে স্তনে লাগালে শৈথিল্য ক'মে যায়।

এই নিবন্ধটি শেষ ক'রে ওঠার সময় মনে প'ড়ে যায় রাজতন্ত্রের প্রজাপালনের ধারাটাকে। বিরাট রাজ্য জুড়ে বসে আছে এই বৃক্ষরাট মহীরুহ। যেন বলছে—তোমরা আমার রাজ্যে থাকতে পারো, কিন্তু মাথা নিচু ক'রে থাকতে হবে। অন্তশ্চেতনার অভিব্যক্তি বোধহয় এই ন্যগ্রোধেই চিরঞ্জীব হ'য়ে আছে।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Milky juice. (b) Sterols, glycoside. (c) Terpenoids. (d) Albuminoids, ficosterol. glutathione cellulose, lignin.

অশ্বত্থ (ধর্মধ্বজ)

ভারতের জনমানসে যত শব্দ ধরা আছে, তার মধ্যে ধর্ম শব্দের জট বেশী পাকিয়ে আছে। এ যেন এস্‌রাজ; রীডের পীড়ন—ধাপে ধাপে তাকে পীড়িত ক'রলে শব্দ ঝঙ্কার ব'দলে যায়, এও সেই রকম। এই ধর্ম শব্দটাকে যখনই ভেঙ্গে ফেলা যাবে, তখনই এর অর্থ হ'লো—যে ধ'রে রাখে সেই তো ধর্ম; তা হ'লে প্রকৃত অর্থটা কি বোঝানো হ'লো তাই তলিয়ে দেখছি।

আমরা বাক্‌জাল বিস্তার ক'রে অনেক বক্তব্য রাখি সত্যি, কিন্তু আক্ষরিক অর্থে তার সন্ধান মিলেছে কি?

স্মার্ত নির্দেশে অশ্বত্থ বৃক্ষকে প্রতিষ্ঠা ক'রে তার পূজার ব্যবস্থা দেওয়া হ'য়েছে এবং প্রত্যহ মন্ত্রাবৃত্তি ক'রে জলদানের ব্যবস্থাটাও পুরোহিততন্ত্রে দেওয়া আছে। তার আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে—এটি ধর্মবৃক্ষ। আচ্ছা, এত গাছ থাকতে এই অশ্বত্থ গাছকে ধর্মবৃক্ষ কেন করা হ'লো? নিশ্চয়ই এর একটা উপযোগিতা সমাজে আছে, তাই তাকে জনপদে পূজ্য বৃক্ষ করা হ'লো। এখন দেখা যাক, এই ধর্মের শিকড় কতদিন থেকে আমাদের সমাজে এ'সেছে।

ভারতের সুপ্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতির পর সংকর সংস্কারের নবীকরণ করার যুগকে বলা হয় স্মার্ত যুগ বা পৌরাণিক যুগ; ইতিহাসের দিক থেকে পৌরাণিক যুগ বা স্মার্ত যুগকে দেখা হয় বুদ্ধের পরবর্তী যুগ। এই হিসেবে বলা যেতে পারে প্রায় সব পুরাণের কোন না কোন জায়গায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছাপ পড়েই আছে; অবশ্য এসব তথ্য নিয়ে যাঁরা অনুশীলন করেছেন বা করেন, এই মন্তব্যটা তাঁদের কাছ থেকেই পাওয়া।

এই অশ্বত্থ গাছটিকে বলা হ'য়েছে 'বোধিবৃক্ষ'। তা হ'লে কূটবিচারে দেখা যাচ্ছে,

ধর্মের শিকড় সেই বৌদ্ধযুগ থেকেই আমাদের মনে গেঁথে ব'সেছে। তাই বলছি সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে বৃক্ষ, নদী ও মূর্তিতে ধর্মের আরোপ না থাকলেও সমাগত স্মার্ত যুগেও ধর্মের ব্যাপকতা ছিল, কিন্তু গোঁড়ামি ছিল না; এক্ষেত্রেও ধর্মটার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য জনকল্যাণ। তাই বৈদিক যুগে এই বৃক্ষটির ধর্মগত পরিচয়ে বিশিষ্ট স্থান থাকলেও তার বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ পাওয়া যায় ঋক্‌বেদের ১০।৯৭।৫ সূক্তে এবং পরবর্তী বেদ অথর্বের বৈদ্যককল্পের ১৩৬।২২।৬ সূক্তে। দুটি সূক্তের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছুই নেই, তাই ঋক্‌বেদের আদি সূক্তটি এখানে উদ্ধৃত ক'রছি।

অশ্বত্থং বো নিষদনম্ পর্ণে বো বসতিষ্কৃতা।
সবিতা তে শরীরাণি মাতুরুপস্থ আবপতু॥
তস্মৈ পৃথিবী শংভব।
(ঋক্‌বেদ ১০।৯৭।৫, অথর্ববেদ ১৩৫।২২।৬)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

ন শ্বত্থ ইতি অশ্বত্থ চিরং তিষ্ঠতি ইতি। গর্দভাণ্ডকশ্চ গর্দভং গন্ধবিশেষং অমতি গচ্ছতি; অস্য পত্রেষু অশ্বতুল্যাকারঃ দৃশ্যতে

চ। ফলেষু মদ্যবিশেষং যৎ তিষ্ঠতি তৎ অশ্বপ্রিয়ং চ। তস্য ছায়াসু অশ্বস্য নিষদনং পর্ণে বসতিস্কৃতা, অস্য পলাশে ফলিতে বৃহ্যা-দীনাং ফলিত কালং। অস্য শরীরাণি সবিতা সূর্য্যঃ মাতুঃ পৃথিব্যাঃ উপস্থে উৎসঙ্গে স্থাপয়ন্ সর্বেষাং শং আবপতু শুভবায়ুঃ বহতু।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—বহুকাল বেঁচে থাকে তাই এর নাম অশ্বত্থ। এর অপর নাম গর্দভাণ্ড। গর্দভ শব্দটি একপ্রকার বিশেষ গন্ধ, সেই গন্ধ এর থেকে বের হয়। এর পত্রে অশ্বতুল্য আকার আছে। এর ফলে এক জাতীয় মদ্য প্রস্তুত হয়, সেই মদ্য অশ্বের প্রিয়, এর ছায়ায় অশ্ব দাঁড়াতে ভালবাসে। এর পত্র যখন বিকশিত হয়, তখন ধান্যাদির অংকুরোদ্গমের কাল। এর শরীর এর মাতা পৃথিবীর কোলে থাকে। সূর্য তাকে রক্ষা করে। শুভ বায়ু বয়ে যায়।

ঋক্ সূক্তের বিশেষ ইঙ্গিত

(১) এতে আছে একপ্রকার বিশেষ গন্ধ।

(২) এর ফলে মদ্য প্রস্তুত করাও যায়।

(৩) এই বৃক্ষের নূতন পত্রোদ্গমের কাল হৈমন্তিক ধান্যের অংকুরোদ্গমের কালের নির্দেশক।

(৪) সূর্যের শোষকশক্তির সংগ্রাহক ও ধারক এই বৃক্ষটি।

অশ্বত্থ বৃক্ষের ভৈষজ্যগুণ সম্বন্ধে সর্বাধিক প্রশংসা ক'রেছেন অথর্ববেদীগণ। তাঁদের অভিজ্ঞতা হ'য়েছিল অশ্বত্থবৃক্ষের বায়ু সর্বপ্রকার অশুভের প্রতিষেধক। এর পাতা দিয়ে তাঁরা রাজ-অভিষেক ক'রতেন; কারণ বাড়িতে কোনও দৈববিপত্তি হ'লে এর পল্লব দিয়ে সেই দৈবকৃত অশুভকে বিতাড়িত ক'রতেন, তাই বোধহয় পৌরাণিক যুগে এসে পূজা-পার্বণে ঘটস্থাপনে নির্বাচিত পঞ্চপল্লবের মধ্যে অর্থাৎ পাঁচটি পাতা সমেত যে শাখাগ্র দেওয়ার বিধি স্মার্ত সম্প্রদায় দিয়েছেন—তার মধ্যে বট ও অশ্বত্থের পল্লবকে তাঁরা গ্রহণ ক'রেছেন। এখানে পল্লব অর্থে পত্র (পাতা), পাঁচটি পত্র সমেত ১টি শাখাগ্রকেই পঞ্চপল্লব বলা সমীচীন এবং হওয়াই উচিত; কিন্তু বর্তমান লোক-প্রচলিত পাঁচটি গাছের শাখাগ্র। এখানে আর একটা কথা ব'লে রাখি, রাত্রিবেলা অশ্বত্থ তলায় বাস ক'রতে নেই, এর হাওয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক, আবার রাত্রিবেলায় বটতলায় বাস করা ভাল, আর দিনের বেলায় অশ্বত্থতলায় বাস করা ক্ষতিকারক নয়, বরং ভাল।

প্রসঙ্গত বলা যায়—বৃক্ষটি যে কাক, শকুন, চিলের প্রিয় আবাস, তাও বাস্তব; আর অশ্বত্থ এবং বটের মধ্যে বায়ু বিতরণের ক্ষেত্রে অশ্বত্থের বেলায় রাত্রিতে তার স্পর্শলাগা বায়ু অশুভ; কিন্তু বটগাছের (Ficus bengalensis) স্পর্শলাগা বায়ু রাত্রিতে শুভ। আর অশ্বত্থগাছে কাক, চিল, শকুন রাত্রিতে বাস করে, মলমূত্র ত্যাগে নোংরাও হয়, তাও তো একটা কারণ হ'তে পারে। তাই পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডের ১৬১ অধ্যায়ে অশ্বত্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে—এই বৃক্ষটি অলক্ষ্মীর আবাস।

সংহিতা যুগের অনুশীলনের আদিপর্ব

বৈদ্যক ঋষিদের চরক সম্প্রদায় তার শোষকশক্তিকে বিশেষ অনুশীলন ক'রে কাজে

লাগিয়েছেন মূত্র-সংগ্রহণের ভেষজ হিসেবে (চরক, সূত্রস্থান ২ অধ্যায়)।

মূত্রের সঙ্গে শ্বেতবর্ণের মেদের নিঃসরণ হ'তে থাকলে তার সঙ্গেও অশ্বমূত্রের তুলনা, আবার বিস্বাদ, বিবর্ণ, পীতবর্ণ, ক্ষারগন্ধি মূত্রের নিঃসরণ হ'লেই অশ্বমূত্রের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়। এইসব ক্ষেত্রে চরক সংহিতার উপদেশ—মূত্র-সংগ্রহণের জন্য এর ভৈষজ্য শক্তির দ্বারা চিকিৎসা করা।

এই গাছটিকে অশ্বের নামের সঙ্গে যুক্ত করার ইঙ্গিত হ'লো—এইসব লক্ষণান্বিত মূত্রঘটিত রোগ নিরাময় করার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও বলে অনুমিত হয়; কারণ এই রোগ সোম ধাতুর বিকারের আধিক্যে সৃষ্ট হয়, তাই সৌরশক্তির ধারক যে বৃক্ষ, সেটাই শোষকধর্মী হ'য়ে ঐ রোগ নিরাময়ের সহায়ক হবে—এইটাই তাঁদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। তাছাড়া এই যে বিশ প্রকার মেহ রোগ আছে, তার মধ্যে কয়েক প্রকার আছে যেগুলি সাধ্য আর কয়েক প্রকার অসাধ্য।

পরিচিতি

ছায়াতরু হিসেবে অশ্বত্থ রাস্তার ধারে রোপণ করা হ'লেও উপযোগিতায় বটগাছের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। তবে বট, অশ্বত্থ, পাকুড় প্রভৃতি যাদের গুপ্তবীজ, সেইসব গাছের তলায় বহু ফল প'ড়ে থাকলেও সেই সব ফলের বীজ থেকে চারা হ'তে দেখা যায় না; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাঙ্গা বাড়ির ফাটলে বা কার্ণিসে এর চারা দেখতে পাই, কারণ যেসব পাখী এসব ফল খায়, তাদের উদরের মধ্যে যে তাপ আছে, হয়তো জননোপযোগী বীজগুলিই কেবল তারই দ্বারা অঙ্কুরিত হবার যোগ্য হয়। দেখা যাচ্ছে এই ফ্যামিলির বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমের ইন্‌কিউবেটর্ (Incubator: ডিম ফোটাবার যন্ত্র) হ'লো এইসব পাখীর উদর। বাংলা তথা সমগ্র ভারতের জনসাধারণের কাছে অশ্বত্থ গাছের বর্ণনার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এই গাছটির বোটানিকাল্ নাম Ficus religiosa Linn., ফ্যামিলি Moraceae. তবে এই ধরনের আর একটি গাছ হয়, সেটির প্রচলিত নাম নন্দীবৃক্ষ বা গয়া অশ্বত্থ। এর বোটানিকাল্ নাম Ficus rumphii Blume. সমগ্র পৃথিবীতে এই ফ্যামিলির প্রায় ৬০০টি প্রজাতি (species) থাকলেও ভারতবর্ষে ১১২টি প্রজাতি বর্তমান। চৈত্র মাসে অশ্বত্থবৃক্ষ পত্রশূন্য হয় এবং বৈশাখে আবার নতুন পাতায় ভ'রে যায়। তারপরেই হয় ফল এবং বর্ষার শেষে ফল পেকে যায়। একে হিন্দিভাষী অঞ্চলে বলে থাকে পিপ্পল গাছ। সংস্কৃত নাম ক্ষীরদ্রুম, গজভক্ষ্য।

রোগ প্রতিকারে

১। **বাতরক্তে:—** এই রোগের লক্ষণের বর্ণনা 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩৩০ পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'য়েছে। অশ্বত্থবৃক্ষের স্বরস ছাল (উপরের চটা অর্থাৎ মরা ছাল নয়) ২০ গ্রাম নিয়ে, থেঁতো ক'রে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে সকালে ও বৈকালে আধ কাপ ক'রে খেলে ১০/১৫ দিনের মধ্যে এটা কমের দিকে যাবে। তবে এর সঙ্গে আধ চা-চামচ ক'রে মধু মিশিয়ে খেতে পারলে ভাল হয়; এটা চরকীয় ব্যবস্থা।

২। **ইন্দ্রিয়শৈথিল্যে:—** পুরুষের বয়সের ৪টি স্তরে ইন্দ্রিয়ের চর্চার ধারা ৪টি—কিশোর, তরুণ, যুবা ও প্রৌঢ়। কৈশোরে থাকে শিহরণ, যুবার ও তরুণের বিভিন্ন

প্রক্রিয়ার ও বিভিন্ন পথে তার প্রবৃত্তির উপভোগে আসক্তি, তারই অত্যধিক ক্ষয়ে প্রৌঢ়ে আসে ইন্দ্রিয়শৈথিল্য, এর পূর্বাভাসে দেখা যায়—যোগসূত্রের ক্ষেত্রটা বাস্তবের কাছে পে'ছুলে তবেই তার উদ্দীপনা। যদি এইসব বয়সে এগুলির স্বাভাবিকতা না দেখা যায় অর্থাৎ কৈশোরে তার শিহরণ নেই, যৌবনের উন্মাদনাও তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে না, তরুণের তরুণীতেও বিরাগ, তার কারণ তার এবং প্রৌঢ়কালে হাল থেকেও বেহাল, তখন বুঝতে হবে চিকিৎসার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একটা বদ-ফরমাশ লিখতে বাধ্য হচ্ছি—যেহেতু এটার ফল নিশ্চিত। কি ক'রতে হবে—অশ্বত্থগাছের গোড়া অন্ততঃ ১/১½ হাত খুঁড়ে ফেলতে হবে, তারপর আঙ্গুলের মাপে ৩/৪টি শিকড়কে (মূল).. কলম-কাটা ক'রে ২/৩টি একত্রিত ক'রে বাঁধা যায় এমন শিকড়কে নির্বাচন ক'রতে হ'বে এবং এমনভাবে কাটতে হবে যেন একই জায়গায় ঐ কাটা মুখগুলি পড়ে; যে দিক গাছের সঙ্গে সংযুক্ত আছে সেইদিকটাকেই নিতে হবে এবং একটি ঘট বা এল্যুমিনিয়ামের পাত্র খেজুর বা তালগাছে রস ধরার জন্য যেমন ক'রে পেতে রাখে, সেইভাবে রেখে তবে পাত্রটা পাততে হবে। তারপর কোন পাতা বা চট দিয়ে অশ্বত্থগাছের গোড়া, যেখানটায় মাটি খুঁড়ে ফেলা হ'য়েছে, সেখানটায় ঢেকে দিতে হবে এবং ঘটের মুখটাও কোন ন্যাকড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হয়, যেন ওটাতে পোকামাকড় কিছু না পড়ে। সমস্ত রাত্রি শিকড় থেকে টপ্‌টপ্ রস ঐ পাত্রে প'ড়বে; পরদিন সকালে ঐ পাত্রটা থেকে সংগৃহীত রসের ১/১½ চা-চামচ নিয়ে সকালে ও বৈকালে ২ বার একটু দুধ মিশিয়ে খেতে হবে; নতুবা শুধুও খাওয়া যায়। এর দ্বারা যে বয়সে যে অসুবিধে চ'লছে সেটা সামলে দেবে।

৩। **স্বপ্নদোষে:—** এটা তিন প্রকার কারণে হ'তে পারে— (১) অজীর্ণ দোষে, (২)ভোগের লিপ্সা দমিত হ'লে, (৩) অতৃপ্ত ভোগে। এ'দের ক্ষেত্রে অশ্বত্থের শুঙ্গ ৩/৪টি (পাতা বেরোবার সময় যেটা গোল হ'য়ে বেরোয়) জল দিয়ে বেটে একটু চিনি মিশিয়ে অথবা শুধু খেতে হবে। এই শুঙ্গ যে অবিকশিত পত্রমুকুল—এটা চক্রদত্ত গ্রন্থের টীকাকার শিবদাস সেন লিখেছেন।

৪। **পিত্ত বমনে:—** অনেক সময় এই পিত্তবমনটা জ্বর হ'লেও হয় আবার না হ'লেও হয়; এক্ষেত্রে অশ্বত্থের চটা (স্বভাবমৃত ছাল) অন্তর্ধূমে দগ্ধ ক'রে অর্থাৎ হাঁড়ির মধ্যে ছাল পুরে, সরা চাপা দিয়ে, মাটি দিয়ে হাঁড়ির মুখ লেপে, রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে, পোড়া দিতে হয়; ভিতরের ছালগুলি পুড়ে কয়লায় পরিণত হবে, সেই অঙ্গার ৪/৫ গ্রাম ১ কাপ জলে দিয়ে নেড়ে ঐ কয়লাটা একটা ন্যাকড়ায় ছে'কে ফেলে দিয়ে ঐ পরিষ্কার জলটা একটু একটু ক'রে খেলে পিত্তবমন বন্ধ হ'য়ে যায়।

৫। **পিত্তজ্বরের পিপাসায়:—** উপরিউক্ত পদ্ধতিতে জল তৈরী ক'রে দু-এক চা-চামচ ক'রে খেলে পিপাসা চ'লে যায়।

৬। **শিশুদের মুখের ক্ষতে:—** অশ্বত্থের ছাল (চটা নয়) শুকিয়ে সেটাকে মিহি চূর্ণ ক'রে ১টিপ ২/৫ ফোঁটা মধু মিশিয়ে চাটালে মুখের ক্ষত শুকিয়ে যায়।

বাহ্য প্রয়োগ

৭। **ক্ষতে:—** এমন কতকগুলি ক্ষত হয়, যেটায় পুঁজ প্রচুর জন্মে এবং যন্ত্রণাও থাকে; সেক্ষেত্রে অশ্বত্থের কচিপাতা ক্ষতের উপরে চাপা দিয়ে বে'ধে রাখলে ঐ পুঁজ পড়া ক'মে যাবে এবং যন্ত্রণারও উপশম হবে।

৮। **গভীর ক্ষতেঃ—** ক্ষত আস্তে আস্তে গভীর হ'য়ে যাচ্ছে, শুকিয়ে যাওয়ার নাম নেই, এক্ষেত্রে ঐ অশ্বত্থগাছের চটা (অর্থাৎ উপরের ছালের যে অংশটার স্বভাবমৃত্যু হ'য়েছে, এগুলি প্রায় হাত দিয়েই তুলে নেওয়া যায়) মিহি চূর্ণ ক'রে ঐ ক্ষতের উপর খুব পাতলা ক'রে ছড়িয়ে দিলে ২/৪ দিনের মধ্যেই ওটা পুরে উঠবে। সাবধান, কাঁচা সরস ছাল শুকিয়ে সেটার গুঁড়ো যেন প্রয়োগ ক'রবেন না, তাহ'লে এটাতে উল্টোই হবে।

৯। **পোড়ার ঘায়ে (ক্ষত):—** অন্তর্ধূম দগ্ধ অশ্বত্থের (চটার অন্তর্ধূম দগ্ধ) কয়লার মিহি গুঁড়ো ক'রে নারকেল তেলের সঙ্গে অথবা মোমের সঙ্গে বা ভেস্‌লিনের সঙ্গে মিশিয়ে ঐ পোড়ার ঘায়ে লাগালে ২/৪ দিনের মধ্যে শুকিয়ে যায়।

১০। **যোনির ক্ষতেঃ—** অনেক কারণেই হ'তে পারে, এক্ষেত্রে অশ্বত্থগাছের ছাল ২০/২৫ গ্রাম ৬ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে ঐ ক্বাথে ডুস্ দিয়ে ধুইয়ে দিতে হবে অথবা পিচকারী ক'রে যোনির বিবরটা ধুয়ে ফেলতে হবে; এইভাবে একদিন অন্তর একদিন পরিমাণমত ৩/৪ বার ডুস্ দিলে ওটা সেরে যায়।

১১। **যোনিকন্দেঃ—** এটি সাধারণতঃ যোনিদ্বারের নিম্নভাগে হয়, এটি নারী-জাতির বড়ই লজ্জাকর রোগ। এ রোগে প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত রসস্রাব হ'তে থাকে। এক্ষেত্রে অশ্বত্থছাল ও পাতা সমপরিমাণে নিয়ে (২৫/৩০ গ্রাম) ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে, ঐ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এর দ্বারা ওর রসস্রাব কমে গিয়ে আস্তে আস্তে শুকোতে থাকবে।

১২। **কানের পুঁজে ও যন্ত্রণায়ঃ—** দুটি অশ্বত্থের পাতা নিয়ে পানের খিলির মত ঠোঙা ক'রে, সরষের তেল এক চা-চামচ আন্দাজ ঐ ঠোঙায় ঢেলে, প্রদীপে অথবা বাতি জেবলে গরম ক'রতে হবে, ঐ তেলটা ফুটে যখন তলার দিকটা পুড়ে প'ড়ে যাওয়ার মত অবস্থা হবে, তখন ঐ গরম তেল ড্রপারে ক'রে নিয়ে কানে ফোঁটা দিতে হবে; এর দ্বারা ঐ পুঁজ পড়া ও কট্‌কটানি বা যন্ত্রণা চ'লে যাবে।

এই সম্বন্ধীয় লেখার পরিসমাপ্তি ক'রতে ব'সে স্মৃতিটা যেন ঘুরপাক খেয়ে সেই স্মার্ত পণ্ডিতের টোলের দরজায় পেঁছে গিয়ে মনে এসে গেল—ন শ্ব তিষ্ঠতি অর্থাৎ কাল আর থাকবে না সেই তো অশ্বত্থ। ও বাবা! বেদে যে দেখলাম, ন শ্বশ্চ ইতি অশ্বত্থং চিরং তিষ্ঠতি অর্থাৎ যে চিরকাল থাকে সেই অশ্বত্থ। তা হ'লে পুবের সন্ধ্যে-আহ্নিক কি পশ্চিমে ব'সে সারার বিধি? তবে বাস্তবটার সঙ্গে মিলিয়ে নিলে বেদ-বাক্যের সাক্ষী খুঁজতে হয় না। এখন ভাবছি, বদ্যি হ'লে তার নাস্তিক্য বুদ্ধিটা কেন জেগে ওঠে জানেন? আমাশার কামড় পেটে দিলে আর স্মার্তবিচারের স্তব-কবচে সামলানো যায় না, তখন ছাল-শিকড়-পাতা-মুথো খুঁজতে হয়।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Protein. (b) Inorganic elements viz., calcium, phosphorous. (c) Glycosides. (d) Resins, tannin, caoutchouc. (e) Traces of alkaloids.

শূরণ (ওল)

হালকা মনে হালকা রসের পরিবেশন কেবল এ যুগেই যে দেখছি তা নয়, সেই ঋক্‌বেদের আমল থেকেই চ'লে আসছে, তবে তার ধারা ব'দলেছে; যেহেতু এখন প্রাক্-আর্যদের সঙ্গে মিলে মিশে চ'লেছি সবাই। তাই তাদেরই আদিরসের প্রভাবটা সমাজের সঙ্গে হাড়ে নাড়ে জড়িয়ে গেছে। তাই এই রকমই একটি নজির—

"ন হিনস্তি বৃথা জন্তূন্ তৃণান্যপি ন হিংসতি।
সুবৃত্তঃ শূরণঃ সাক্ষাৎ শূরো দুর্নাম বিদ্ধকম্॥

এটির অর্থ হ'লো, বৃথা কারও হিংসা করে না, না জীবজন্তুর না ঘাসপাতার, কিন্তু সেই সুবৃত্তটি শূর এবং যে দুর্নামগ্রস্ত হয় তাকে সে বিদ্ধ করে।

এখানে কবিরহস্য আছে দুর্নাম ও দুর্বৃত্ত নিয়ে। সুবৃত্ত যার নাম (এখানে সুবৃত্ত দুর্বৃত্তেরই বিপরীত) অর্থাৎ গোল অর্থও প্রকাশ করে এবং সচ্চরিত্র এই অর্থও প্রকাশ করে, আবার তারই অপর নাম শূরণ।

এদিকে দুর্নাম মানে কলঙ্কও হয় আবার অর্শ রোগেরও একটি নাম। এখানে কবি এইটাই বলতে চাইছেন যে স্বভাব-দুর্বৃত্ত যে, সে তো হিংসা করেই থাকে, কিন্তু এই সুবৃত্ত ভেষজটি যদি দুর্নাম অর্থাৎ অর্শোরোগকে পেয়েছে, তাকে সে বিদ্ধ ক'রে থাকে; তখন সুরের স্বভাবের বিবর্তন হ'য়ে সে হয় হিংসাশ্রয়ী, তাই ভেষজটির নাম হ'য়ে গেল শূরণ।

এই শূরণকে কেন্দ্র ক'রে পণ্ডিতী আর একটি বুলেটিন—

দুর্নামতঃ শঙ্কিতচিত্ত এষঃ পলায়তে জীবক শোণিত ক্ষয়াৎ।
মা মা স যাতু প্রমুদং লভেৎ চ যাবৎ স শূরণ এষ ঐতি।

অর্থাৎ উনি দুর্নামে শঙ্কিত হ'য়ে পলায়ন ক'রেছেন। জীবনে দুর্নামের পরিণতি জীবরক্তের ক্ষয়েই শেষ হয়। না না, তার জন্য পলায়ন ক'রতে হবে না। যতদিন মহাবীর শূরণ রয়েছে এবং সে উপস্থিত হ'চ্ছে, ততদিন সুখে থাক, কোন চিন্তা নেই। এখানে

পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যঙ্গোক্তি—খুঁজতে গেলাম শূর অর্থাৎ বীর, পেলাম সেখানে শূরণ অর্থাৎ হিংসাত্মক খল দ্রব্য।

এইসব হে'য়ালির গোড়াপত্তন করা হ'য়েছে সেই ঋক্‌বেদের যুগ থেকে।

দ্বিতীয় পর্ব

প্রতি ২০/২৫ ক্রোশ (৫০/৬০ কিলোমিটার) অন্তর ভাষার এবং উচ্চারণের ঢং

বাংলায়, সেইরকম একটি দ্রব্যের নাম দীর্ঘ কয়েক হাজার বৎসরে বদল হওয়া স্বাভাবিক, এমন কি একই উচ্চারণ, একই শব্দ প্রদেশভেদে তার সংজ্ঞা পৃথক—যেমন বাংলার ঠাকুর (ব্রাহ্মণ) আর বিহারের ঠাকুর (পরামাণিক), সেই রকমই এই ভেষজটি। নাম ছিল তার 'সুবৃত্ত', হ'লো শূরণ, এখন আমাদের কাছে 'ওল'।

এখন এই ওল কথাটা কোথা থেকে পেঁছেছে সেটা বলি—এটা প্রাক্-আর্য ভাষায় বলা হ'তো 'ওল্ল', কথাটির অর্থ ঐ রকমই বোঝায়। যাঁরা বাহ্যতঃ সৎ এবং নিটোল গড়ন, অথচ ভিতরে সুবৃত্ত নয় অর্থাৎ দুর্বৃত্ত (যার প্রকৃতি হিংসুক), তাকেই প্রাক্-আর্য ভাষায় 'ওল্ল' বলে; সেইটাই অপভ্রংশ হয়ে 'ওল'-এ দাঁড়িয়েছে। এই ওলের পাতা কার্তিকের কৃষ্ণাচতুর্দশীর চৌদ্দশাকের মধ্যে দেওয়া হয়। এই কিছুদিন পূর্বেও পূজা-পার্বণের জন্য শুধু চিনির গোল মোণ্ডা তৈরী হ'তো, তার প্রচলিত নাম ছিল 'ওলা'; এও সেই সুবৃত্তের আকার প্রাক্-আর্য ভাষার ওল্ল থেকেই ওলা হ'য়েছে।

এই ওলকে কেন্দ্র ক'রে গ্রাম-বাংলায় লোককথা—'যেমন ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল'।

এই রকমই গ্রাম্য রাসলীলায় ছন্দপতনের পরিণতিকে উদ্দেশ ক'রে প্রচলিত—'ও সখি না বুঝে খেয়েছি ওল, এখন তুই তেঁতুল গোল'।

মুসলিম সংস্কৃতির ওলাবিবির নাম শোনা যায়, ইনি বিসূচিকার অধিষ্ঠাত্রী। এই সংস্রবে ওলা-ওঠা (কলেরা) কথাটা চলিত, অর্থাৎ দাস্ত হওয়া। 'ওলা' অর্থে নামা আর ওটা বা ওঠা অর্থাৎ বমন বা বমি হওয়া, তাই তার এই নাম।

এখন দেখা যাক বৈদিক যুগে এর কোন স্থান ছিল কিনা, তবে যতদূর দেখা যায়, মূল বেদ গ্রন্থে এই ভেষজটির কোন উল্লেখ নেই। সেটা পাওয়া যায় অথর্ববেদের পরবর্তী সংহিতা গ্রন্থ উপবর্হণ সংহিতায়—

> যোঽ অস্মভ্যং অরাতীয়াদ্যশ্চ সুবৃত্তং দ্বেষতে জনঃ।
> নিন্দাদ্যো অস্মান্ ধিপ্সাশ্চ সর্বং তং ভস্মনা কুরু।

এই সূক্তটির উবট্ ভাষ্য ক'রেছেন—

> যঃ সুবৃত্তঃ শূরণকন্দঃ শূরঃ হিংসায়ং কংজলং অপি দূষয়তি= ইতি কন্দঃ। তত্রৈব সুবৃত্তঃ দূষয়ন্ জাতঃ। সোঽস্মভ্যং অরাতীয়া-দ্যাশ্চ শত্রুবৎ জনশ্চ দ্বেষতে কার্যবিঘাতং যঃ করোতি স দ্বেষী ধিপ্ সাৎ দম্ভিতুং ইচ্ছতি তৎসর্বং ভস্মাৎ কুরু।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হলো—তুমি জলকেও দূষিত কর এবং জন্মগ্রহণ ক'রে দোষ নিয়েই সুবৃত্ত (গোল) হও। সর্বদাই তোমার হিংসা করা প্রবৃত্তি, সর্বজনেই তোমাকে দ্বেষ করে, যেহেতু তুমি সর্ব কার্যের বিঘ্নাতক। ওহে সুবৃত্ত, তাদের এই দম্ভকে তুমি ভস্ম কর।

উপবর্হণ সংহিতার এই সূক্তটির অর্থ—অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

বৈদ্যকের সন্ধি

এই অন্বয় ও ব্যতিরেক কথাটার চিন্তাধারাটা কি, চরকের চিন্তাধারাটা বলি—যে দ্রব্য খেলে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, শরীরে সেই লক্ষণটা এলে বা দেখা দিলে সেই দ্রব্যেই তার ফললাভ হ'য়ে থাকে, এইটাই হ'লো সমধর্মিতা লক্ষণের চিকিৎসা, তাই

চরক সংহিতার মতবাদ হ'লো "সমঃ সমং শময়তি"; একে বলা হয় অন্বয় মতবাদে চিকিৎসা।

আর সৌশ্রুতীয় চিন্তাধারা হ'লো—ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দিয়ে, যেমন ফোড়া হ'লে রক্ত-দুষ্টির চিকিৎসায় তিনি প্রাধান্য দিতে চাননি—ফোড়াটা সারে কি ক'রে তারই প্রাধান্য বিচার ক'রেছেন, সে ঔষধেই হোক আর শস্ত্র চিকিৎসায়ই হোক, একেই বলা হয় অন্বয় ব্যতিরেকে চিকিৎসা। এইজন্য এই সুবৃত্ত বা শূরণ কন্দের ব্যবহার চরক সংহিতায় নেই কিন্তু সুশ্রুত সংহিতায় আছে।

সুশ্রুতে বলা হ'য়েছে এটি বনকন্দ এবং ভূকন্দ। তাকে স্থলকন্দের সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হ'য়েছে, বাগ্‌ভটে (ষষ্ঠ শতকের গ্রন্থ) বলা হ'য়েছে এটি প্রাবৃট্-উদ্ভব অর্থাৎ প্রাক্-বর্ষায় জন্মে, তবে অত্যন্ত দোষল। মাত্র অর্শেতে পরম্পরা ক্রমে কোন প্রক্রিয়ায় তাকে সংস্কার ক'রে ব্যবহার করার বিধি।

সুশ্রুতের এই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ ক'রেই একাদশ শতকের চক্রপাণি দত্ত, যাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'চক্রদত্ত সংগ্রহ' দ্রব্যগুণ বিচারে বলেন—শূরণ কন্দ যদিও দোষবহুল কিন্তু পরিণাম ক্রমে অর্থাৎ সেটির রস পরিপাক হ'লে, যাকে বলা যায় শুকিয়ে গেলে, তাকে সংস্কৃত ক'রে অর্থাৎ কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা তাকে শোধন ক'রে ব্যবহার ক'রলে তবেই ফললাভ হয়। তাই বলা হয়েছে—

> শূরণঃ দীপনো রুচ্যঃ কফঘ্নো বিশদো লঘুঃ।
> বিশেষাৎ অর্শসাং পথ্যঃ ভূকন্দ স্থতি দোষলঃ॥

এখানে তিনি অযত্নসম্ভূত বন্য ওলকে ব'লেছেন শূরণ এবং চাষ ক'রে যেটা হ'য়ে থাকে তাকে ব'লেছেন ভূকন্দ। এটি প্রাক্-বর্ষায় চাষ করা হয়, সমগ্র বর্ষায় এর বৃদ্ধি, এইকালে অগ্নিবল দুর্বল হয়, তাই তাকে শুকিয়ে নিয়ে, সংস্কার দ্বারা লঘু ক'রে খেতে হয়।

এটি সংস্কার করার দুটি পদ্ধতি—একটি হ'লো আগুনে ঝ'লসে অথবা সিদ্ধ ক'রে ঘিয়ের সঙ্গে। তবে প্রাচীন বৈদ্যগণ সর্বদাই ঘি সংযোগে ব্যবহার ক'রতে বলেছেন। সরষের তেল দিয়ে মেখে অথবা রান্না ক'রে খাওয়ার ব্যবস্থা কখনও দিতেন না। এই গাছটির পরিচিতি বাংলাদেশে দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি না, তবুও জানাচ্ছি।

পরিচিতি

কন্দোদ্ভব গুল্ম, বর্ষজীবী, কন্দ; পূর্বেই ব'লেছি এর সংস্কৃত নাম শূরণ, বন্য ওলের নামই শূরণ আর যেটা চাষে জন্মে তার নাম ভূকন্দ। অবশ্য হিন্দি নামের সঙ্গে এই নামের সাদৃশ্য আছে, ওসব অঞ্চলে ব'লে থাকেন 'জমিন্ কন্দ্'। এই কন্দ থেকে বহু সাদা শিকড় বেরোয়। এক একটা ওলের কন্দ এক/দেড় ফুট ব্যাস পর্যন্ত হ'তে দেখা যায়, গাছ ৩ ফুট পর্যন্ত উঁচু হ'তে দেখা যায়, ছত্রাকার পাতা। এই গণের ২৫টি প্রজাতি সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে পাওয়া যায়, তার মধ্যে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় ৭টি প্রজাতি (species) পাওয়া যায়। তবে প্রধানভাবে বাংলা, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে চাষ হয়। এটির বোটানিকাল্ নাম Amorphophallus Campanulatus (Roxb) Bl., ফ্যামিলি Araceae.

আর এক প্রকার অযত্নসম্ভূত বন্য শুরণ (ওল) পাওয়া যায়; সে গাছগুলি দেখতে একই রকম কিন্তু এই কন্দের (ওলের) রং একটু লাল্‌চে (রক্তাভ) এবং কন্দের আঁশগুলি (ভিতরকার ফাইবার্‌গুলি) একটু লম্বা। এগুলি সিদ্ধ করার পর মাখনের মত, যাকে বলে সিদ্ধ গোল আলুর মত হয় না। এটির বোটানিকাল্‌ নাম Amorphophallus Sylvaticus (Dymock). এই বন্য ওলের কোষে Calcium oxalate-এর সূচগুচ্ছ সন্নিহিত থাকায় ওটা খেলেই গলায় ওগুলি বিঁধে যায়। তার জন্যই চুলকোতে থাকে ও ফুলে যায়, তেঁতুল বা লেবু খেলে ঐ সূচগুলি গলে যায়। এই বন্য ওল বাংলাদেশে সাধারণের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয় না বটে, কিন্তু বোম্বাই অঞ্চলে একে চাকা চাকা ক'রে কেটে শুকিয়ে 'মদন-মস্ত্‌' নামে বিক্রি হয়। ওটি ওসব অঞ্চলে রসায়ন ঔষধ হিসেবে সাধারণ লোকে ব্যবহার করেন, তবে ব্যবহার করার পূর্বে তাকে শোধন করা হয়।

ওল, কচু, মান তিনই সমান ব'লে দেশগাঁয়ে একটি কথা প্রচলিত, এটি তাদের স্বরূপগুণের কটূক্তি। আর একটি কথা আমরা প্রায়ই বলি 'কচুপোড়া', যদিও এটি অপদার্থের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু এরও যে প্রয়োজন আছে তা দেখতে পাচ্ছি এই ওলকে নাড়াচাড়া ক'রতে বসে।

এখন কি ক'রে পোড়াতে হবে তাই বলি—এখানে পোড়ানো অর্থে ঝলসানো। আন্দাজ ৭৫ বা ১০০ গ্রাম একটা ওলের টুকরো খোসা ফেলে মুখী বাদ দিয়ে মাটি লেপে, রৌদ্রে অল্প শুকিয়ে নিয়ে উনুনে ফেলে পোড়াতে হয়, যেমন ক'রে কাঁচা বেল পোড়ানো হয়। তারপর উপরের মাটি অংশ ফেলে দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে ব্যবহার করাই সাধারণ বিধি।

রোগ প্রতিকারে

১। **অর্শ জন্য কোষ্ঠবদ্ধতায়ঃ—** এই ঝল্‌সা পোড়া ওল ঘি দিয়ে মেখে খেতে হয়, লবণ খুবই অল্প দিতে হয়, অবশ্য না দিলেই ভাল হয়। এটাতে ঐ কোষ্ঠবদ্ধতাটা চ'লে যাবে।

২। **শোথেঃ—** এটা প্রায়ই আমের দোষ থাকার জন্য হয়, তবে পায়ের দিকে এই শোথটা দেখা দেয় (কিন্তু কিড্‌নির বা হৃদ্‌যন্ত্রের (হার্টের) দোষে পায়ে যে শোথ সেক্ষেত্রের জন্য এটা নয়), এক্ষেত্রে ঝল্‌সানো ওল কাজ করে।

৩। **অর্শের রক্তস্রাবেঃ—** স্রাব হয় বটে, তবে খুব কম, এক্ষেত্রে হয় টাটানি বেশী, আর তলপেটে যেন শূল ব্যথা, মনে হয় যেন আম হ'য়েছে; এক্ষেত্রেও ঐ ঝল্‌সানো ওল ঘি দিয়ে মেখে খাওয়া।

৪। **গাঁটে বাতঃ—** অনেক সময় এ'দের অর্শ থাকে, কারও রক্ত পড়ে কারও বা পড়ে না, এক্ষেত্রে ঐ গেঁটে বাত সেরে যাবে ঝল্‌সানো ওল ঘি দিয়ে মেখে খেলে।

৫। **গ্রহণী রোগেঃ—** এর প্রধান লক্ষণ দিনেই বার বার দাস্ত হয়, রাত্রে হয় না ব'ললেই হয়। এ'রা ঝল্‌সা পোড়া ওল খাবেন ভাতের আমানির সংগে (ভাতকে ভিজিয়ে রেখে পরের দিন ঐ ভিজে ভাতের জলটাকেই আমানি বলা হয়) খেতে হয়। এর দ্বারা ঐ দোষটা উপশম হবে। তবে পথ্যাশী না হ'লে গ্রহণী সারবে না।

৬। **অর্শোজন্য অগ্নিমান্দ্যে:—** পেটে বায়ু তার থাকবেই, তার উপর হজমও হয় না, আবার দাস্ত পরিষ্কারও হয় না, অথচ মলের কাঠিন্যও থাকে না, এক্ষেত্রে তক্র অর্থাৎ ঘোল দিয়ে ঐ ঝল্‌সানো ওল খেতে হয়। আন্দাজ ৫০ গ্রাম নিতে হবে। খেতে ভাল না লাগলে অল্প লবণ দিয়েও খাওয়া যায়; এর দ্বারা ঐ দোষটা চ'লে যাবে।

৭। **মৃতবৎসার ক্ষেত্রে:—** একে দেশগাঁয়ের ভাষায় বলে 'মড়াঞে দোষ'। অনেক মায়ের ৩/৪ মাসে অথবা ৭/৮ মাসেও নষ্ট হ'য়ে যায়, আবার কারও কারও জীবিত ভূমিষ্ঠ হ'য়েও কিছুদিনের মধ্যে ম'রে যায়, এক্ষেত্রে ঐ ওল পোড়া ৪০/৫০ গ্রামের সঙ্গে শ্বেত চন্দন ঘষা সিকি চা-চামচ মিশিয়ে খেতে হয়, এর সঙ্গে একটু ছাগল দুধ মিশিয়ে দিলে আরও ভাল। তবে অনেক প্রাচীন বৈদ্য শালপানি (Desmodium gangeticum) ১০/১২ গ্রাম ৩/৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আধ কাপ থাকতে নামিয়ে সেটার সঙ্গেও এই ঝল্‌সানো ওল খেতে দিয়ে থাকেন; অথবা বলা, যাকে আমরা চলতি কথায় বেড়েলা বলি, যার বোটানিকাল্ নাম Sida cordifolia, এর ক্বাথ দিয়েও খাওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। পূর্বোক্ত ঐ শালপানির ক্বাথ তৈরীর নিয়মে এই বেড়েলার ক্বাথ তৈরী ক'রতে হবে। তবে এটির প্রয়োগের ক্ষেত্র গর্ভসঞ্চার হ'লে তারপর।

৮। **মদে অরুচি আনতে:—** সকালে ছাড়ে বিকেলে খায়, রোজই ছাড়ে রোজই খায়. সত্যিই যদি এ ঝোঁক কাটাবার ইচ্ছে থাকে, তা হ'লে ঝল্‌সানো ওলের রস মদে মিশিয়ে ২/৪ দিন খেলে আর দোকানের দিকে চাইতে ইচ্ছে ক'রবে না। এটায় অসুবিধে হ'লে ঝল্‌সানো ওলের চাট্ খেলেও ঐ কাজ হবে।

৯। **সস্তায় জমাট নেশা:—** যাঁরা অল্প পয়সায় নেশায় ভরপুর হ'তে চান— তাঁরা ঝল্‌সা পোড়া ওলকে পূর্বদিন মদে ভিজিয়ে রাখুন, পরের দিন ছে'কে নিয়ে ঐ মদটা খেয়ে দেখুন, যাকে বলে তুরুপের তাস।

১০। **কফ প্রবণতায়:—** অনেক সময় দেখা যায় সাবধান থেকেও সর্দি কাসির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না, এর হেতুটা আরও পরিষ্কার হয়, যদি তাঁর নিজের অথবা তাঁর পিতা বা মাতার কারও অর্শের দোষ থেকে থাকে। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অর্শের সম্বন্ধ না থাকলেও, রক্তে দোষাংশ প্রবহমান, তাই এক্ষেত্রে একটু ওল পোড়া (ঝল্‌সানো) নারকেল কোরা ও ৫/৭ ফোঁটা ঘি মিশিয়ে খেলে ঐ সর্দির দোষটা নষ্ট হবে।

১১। **বাতের ব্যথায়:—** ওলটা পুড়িয়ে থে'তো ক'রে অল্প ঘি মিশিয়ে অথবা এরণ্ড তেল, যাকে আমরা চলতি কথায় রেড়ির তেল বলি, মিশিয়ে (সহ্যমত গরম গরম) পোঁট্‌লা বে'ধে ব্যথার জায়গায় সে'ক দিলে যন্ত্রণাটা ক'মে যাবে।

১২। **ছুলিতে:—** একে আয়ুর্বেদে সিধ্ম কুষ্ঠ বলে। ছুলির ওপর ঘি মাখিয়ে পোড়া ওল ঘষলে ২/৩ দিনের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যাবে। (সিধ্মই যে ছুলি এ সম্পর্কে মতভেদ দৃষ্ট হয়।)

১৩। **দদ্রুতে (দাদে):—** উপরিউক্ত নিয়মে ঘ'ষলে ওটা তথনকার মত সেরে যাবে।

১৪। **মুখের ক্ষতে:—** ওলকে কুচি কুচি ক'রে কেটে শুকিয়ে নিয়ে মাটির কোন

পাত্রে মুখ বন্ধ ক'রে ,লেপে, সেটা শুকিয়ে নিয়ে পোড়াতে হবে, তারপর সেই ওল-পোড়ার ছাইকে একটু ঘি-এর সঙ্গে মিশিয়ে দাঁত মাজলে মুখের ও দাঁতের মাঢ়ীর ক্ষত সেরে যাবে।

· ১৫। **হাজা হ'লেঃ—** ওলের ডাঁটার রস ওখানে লাগালে ২।৩ দিনেই আরাম হয়, তবে কারণটা যদি প্রতিনিয়ত চ'লতে থাকে তা হ'লে কোনটাতেই একেবারে রুদ্ধ করা সম্ভব হয় না।

১৬। **মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল ও বিছার কামড়েঃ—** সঙ্গে সঙ্গে ওলের ডাঁটা দংশিত স্থানে ঘষে দিন। ৫/৭ মিনিট পরেই যন্ত্রণার উপশম হবে।

একটা কথা এখানে ব'লে রাখি— মাটি না লেপে ওল পুড়িয়ে সেটা ব্যবহার ক'রলে উল্টোই ফল হবে; সুতরাং পূর্বোক্ত নিয়মেই ওলকে পোড়াতে হবে।

মন্তব্য

এই নিবন্ধে রসিকজনের হয়তো বা রসিকতার খোরাক জোগাবে, তবে যিনি অর্শের শূলুনিতে ভুগছেন, তাঁর কাছে এ সংবাদটা হবে খুবই আদরণীয়—এ যেন শূলী দেবতার শিরনি।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Enzyme, calcium oxalate, (b) Protein, carbohydrates, vitamin-A, vitamin-B.

বদর (কুল)

আজ যে বদরকে লক্ষ্য ক'রে এই নিবন্ধের অবতারণা ক'রছি—সেটা আমাদের দেশের টোপাকুল দেখে নয়, সেই বৈদিক যুগের বদরের সঙ্গে কি রূপে কি গুণে তার সামঞ্জস্য করা যাবে না, কারণ সবেরই তো বিবর্তন হ'য়েছে; তবুও শব্দের সার্থক বিন্যাসটা এখানে বলি।

বৈদিক শব্দাভিধানে মহামতি যাস্ক বদ্ ধাতুকে স্থৈর্য অর্থ ক'রেছেন, আর সেই ধাতুর উত্তরে অরচ্ প্রত্যয় ক'রে ব'লেছেন—"বদর অর্থে স্থৈর্য-সাধক"। মহাভারতে ৯/৪১ অধ্যায়ে বদরতীর্থ অথবা বদরিকা তীর্থের প্রশংসা। সুপ্রাচীন ঋষিদের চরম তপস্যার শ্রেষ্ঠভূমি বদরতীর্থ মর্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠ দেবস্থান বদরিনাথ বা বদরিনারায়ণ, আর শ্রেষ্ঠতম ঋষি বাদরায়ণ।

সেই বদরই আবার শব্দগত সঙ্কেত হ'য়ে মুসলিম সভ্যতায় এসে পাঁচটি পীর ও সমুদ্রের দেবতায় বদর হ'য়েছেন, হয়তো বা নদীমাতৃক দেশে বিবর্তিত আর্যবংশীয়রা নদীতে যাত্রা করার সময় বদর বদর ব'লতেন; যেহেতু এটির অর্থ স্থৈর্যের সাধক। এটা অমুসলমান কি মুসলমান, এ'রা ধর্মে পৃথক হ'লেও বিপদের আশঙ্কায় কার দেবতা কে, সে পার্থক্য থাকে কি? আকবর বাদশাহের আমলের সত্যপীরের অস্তিত্ব আর শিরনি আজ তো আমাদের পূজ্য সত্যনারায়ণ আর তাঁর নৈবেদ্য; তাঁর নৈবেদ্যটা তো এখনও শিরনিই আছে।

তা যাক, এখন ফলরূপী বদরের লোকায়তিক নাম কুল, এই কুল শব্দটিও বদরের মত সমার্থক না হ'য়েও তুল্যার্থক। সেখানে কুল শব্দের অর্থ কিন্তু কুল্+অক্, কোলয়তি সংহতি ভর্বতি। এখানে এর অর্থ সামাজিক মর্যাদা ও তার অনুশাসন, কি যোগ সাধনায় আর কি তন্ত্র সাধনায়। এই লোকায়তিক ভেষজ কুল ফলটি ধ্বন্যাত্মক

হ'লেও আমাদের রসনার রসজলনিধি।

আর সেটা কবির চোখে—

শ্রীমদ্ বসন্ত! ভবদভ্যুদয়ে চ বৃক্ষাঃ
কে পত্র পুষ্প ফলশালিন এব ন স্যুঃ।
অস্মাকমল্প তপসাং বদরীতরূণাং
ভ্রষ্টং ফলং চির শিখাস্তু জনৈ র্বিলূনাঃ॥

এটির অর্থ হ'চ্ছে—ওহে শ্রীমান বসন্ত! তোমার অভ্যুদয়ে কোন্ বৃক্ষই বা পত্রে পুষ্পে ফলে শোভিত না হয়, কিন্তু হতভাগ্য বদরীতরুর ভাগ্য এমনি যে, প্রথমে সমুদয় ফলভ্রষ্ট হয়, অবশেষে চিরজাত শাখাপল্লবের শোভাও বিনষ্ট হয়। এখন দেখা যাক বদর বা কোলের কৌলিন্য কোথায়?

শুক্ল যজুর্বেদে ১৯/২২ সূক্তে সৌত্রামনী যাগে বলা হয়েছে—

ধানানাং রূপং কুবলং পরীবাপস্য গোধূমাঃ
সক্তূনাং রূপং বদরং উপ বাকাঃ করম্ভস্য।

বৈদিকযুগে দেখা যাচ্ছে দু'টি নাম—একটি কুবল আর একটি বদর; এদের জাতি একই তবে প্রজাতি পৃথক। মহীধর সেই সূক্তের ভাষ্যে ব'লেছেন—

কুবলং=কোমলং কৌ পৃথিব্যাং বল সঞ্চারণে অচ্
হৈমফলং হিমবৎ দেশজাতং অপরং মুক্তাকান্তিবৎ।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—কুবল অর্থে কোমল, আর এই ধরায় যেটি বল সঞ্চারে সহায়তা করে। এটি হিমাচল অঞ্চলে জন্মে এবং এর কান্তি মুক্তার মত। এর পরের সূক্তে বলা হ'য়েছে—

পয়সো রূপং যদ্য বা দধ্নো রূপং কর্কন্ধূনি।
সোমস্য রূপং বাজিনং সোমস্য রূপ মামিক্ষা॥

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

যে যবাঃ তে পয়সো রূপং কর্কন্ধূনি স্থূল বদরাণি দধ্নো রূপং অমিক্ষা সোমস্য=চরোঃ রূপং ভবতু।

ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—ঐ যববর্ণের ফলগুলি দুধের বর্ণ এবং দৈ-এর বর্ণ, স্থূল কর্কন্ধুগুলি এবং বদরগুলি ছানার মত বর্ণ, ওগুলি দিয়ে আমাদের চরু প্রস্তুত হোক।

বৈদ্যকের নথি

এখানকার বক্তব্য অনুশীলন ক'রলে দেখা যাচ্ছে—বদর, কোল ও কর্কন্ধু, এগুলি আহার্য ও পথ্য হিসেবেই বেদে বর্ণিত হ'য়েছে। অর্থাৎ রসপ্রধান বস্তুই যখন আহার্য, তারই অনুবর্তন করা হ'য়েছে, কিন্তু বীর্যের প্রাধান্য দিয়ে তার ভৈষজ্য বিধানের ব্যবস্থা পরবর্তী সংহিতা গ্রন্থগুলিতে নিবন্ধ করা হ'য়েছে, এটির উল্লেখ হয়তো বা বর্তমান চরক সংহিতার আদি জনক অগ্নিবেশ তন্ত্রে ছিল, কিন্তু সেটি একান্তভাবে দুর্লভ হওয়ায় চরক সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ চরক সংহিতায় এই বদর কুল ও কর্কন্ধুর ভৈষজ্যশক্তির প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়।

চরক সংহিতার সূত্রস্থানের ৪র্থ অধ্যায়ে এই ফলটিকে হৃদ্য বলা হ'য়েছে, অর্থাৎ স্বাদু ও হৃদ্-উপকারক; তারপর এর ভৈষজ্যশক্তি কতখানি তার উল্লেখ—চরক চিকিৎসা-স্থানের (১) তৃতীয় অধ্যায়ে এর ফল ও পাতা বেটে বাতে প্রলেপের ব্যবস্থা। (২) সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে এর দোষ কি তার উল্লেখ। এটি পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপক, কিন্তু এ দোষ কুল ও কর্কন্ধুর, (রাজ)বদরের নয়। (৩) বদর স্নিগ্ধ ভেদক, বায়ু ও পিত্তকে উপশমিত করে আর সেটা যদি শুকনো হয় তবে। (৪) এটি কফ ও বাত রোগ দূর করে, পিত্তের বিরোধী হয় না। দেখা যাচ্ছে—চরক সংহিতার অভিমত বাগ্ভটাচার্য (৬ষ্ঠ শতক) পুরোপুরি গ্রহণ ক'রেছেন। এভিন্ন চরকে আরও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপদেশ।

সুশ্রুত সংহিতার সমীক্ষা

কর্কন্ধু, কোল ও বদর কাঁচা থাকলে কফ ও পিত্ত বৃদ্ধি করে; কিন্তু পাকা হ'লে পিত্ত ও বায়ুর বিকার নষ্ট করে; কারণ এগুলি স্নিগ্ধ ও মধুর এবং মৃদু বিরেচক।

এ ছাড়া বদরের দ্বারা সৌবীর মদ্য প্রস্তুত করা যায়, অর্থাৎ কাঁজি প্রস্তুত করে, তার দ্বারা বহু ব্যাধি দূর করা যায়; সেটি স্নিগ্ধ, মধুর এবং বায়ু পিত্ত উভয়কে জয় করে (সুশ্রুত সূত্রস্থান)। এভিন্ন চক্রদত্তে ব্যবহৃত যোগগুলি লোকায়তিক ব্যবহারের যোগগুলির সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হ'লো।

পরিচিতি

আজ এই বদর অর্থাৎ কুল নামক ফলটির কুলজিনামা লিখতে ব'সে কূলকিনারা পাচ্ছি না; এই জন্যে যে, আমাদের শ্রুতির অন্যতম যজুর্বেদে এর দুটি নাম স্থান পেয়েছে—একটি হলো কুবল আর একটি এই বদর—একই সম্প্রদায়ের এবং বংশেরও; তবে একটির চরিত্র কোমল ও মধুর, আর একটির স্বভাব যাকে বলা যায় দোষে-গুণে। একটির জন্ম হ'য়েছে হিমাচল অঞ্চলে, আর একটি জন্মেছে উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে, হয়তো বা জলবায়ুর স্বভাবে তার প্রকৃতিটাই এই রকম হ'য়ে আছে।

তারপর শ্রুতির আর একটি সূক্তে দেখা যাচ্ছে তার বংশে আরও একটি জন্মেছে, তার নাম 'কর্কন্ধু'। সেটার প্রকৃতিও খারাপ নয়। জগতে ভক্ষ্য-ভোজ্য সম্বন্ধ যখন, তখন শ্রেষ্ঠ জীব মানুষও যেমন তাদের আহার্য ও পথ্য হিসেবে কাজে লাগিয়েছে, জন্তুকুলও তাকে কম কাজে লাগায়নি।

পরবর্তী সংহিতার কালে এসে চরকীয় চিকিৎসক সম্প্রদায়, তার মধ্যে যে বিশিষ্ট ভৈষজ্যশক্তি আছে সে-সবের অনুশীলন করেছেন, তাঁরাও ঐ বদর, কুবল ও কর্কন্ধুর গবেষণা ক'রেছেন, তাই তাঁদের সংগৃহীত সংহিতা গ্রন্থ চরক সংহিতার সূত্রস্থানের ৪৯ অধ্যায়ে তার গুণপনার বর্ণনা।

তারপর বহু শতাব্দী কেটে গেছে, ষোড়শ শতকের ভাবমিশ্রের কালে এসে, তাঁর সংকলিত গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে দেখা যাচ্ছে রাজবদর (বিলিতি বা নারকুলে কুল নয় কিন্তু) তার পর্যায় নাম দেওয়া হ'য়েছে 'পৃথু ফল', তনু বীজ, মধুর ফল। আর বদর অর্থাৎ কুলের পর্যায় নাম বজ্রকণ্টক, বৃত্ত ফল ও দৃঢ় বীজ; চলতি কথায় যে কুলকে আমরা 'টোপা কুল' বলি। এভিন্ন লঘু বদর নামে একটি কুলের উল্লেখ, সেটার পর্যায় নাম বলা হ'য়েছে 'বজ্রকণ্টক', 'সূক্ষ্মপত্র', দুষ্পর্শ এবং শবরাহার, এভিন্ন ভূবদরী (ভূঁই-কুল) নামে আর এক রকম কুলের উল্লেখ।

পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিজ্ঞানীগণের সমীক্ষা

এই গণের (genus) গাছগুলি ঝোপ-ঝাড় জাতীয়। তার মধ্যে কতকগুলি অর্ধ-লতাকার, আবার কোনটি বা ভূলুণ্ঠিত। এর প্রায় ৫০টি প্রজাতি এশিয়া ও আমেরিকার উষ্ণ বা শীতোষ্ণ অঞ্চলে দেখা যায়, আবার তার মধ্যে প্রায় ২০টি প্রজাতি ভারতেই দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে মাত্র কয়েকটি জনপদে চাষ হয়, অধিকাংশই অযত্নসম্ভূত, যাকে বলে জংলী গাছ।

বৈদিক তথ্যে কুবল ব'লে যে ফলটির উল্লেখ আছে, তার সঙ্গে তুল্যমূল্যতায় দেখা

যায় বর্তমানের ইউনানি চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত উনাও বা উনাব বলে যেটি, তার আকার অবিকল শুষ্ক কুলের মত। সেটিকে উত্তর ভারতের বৈদ্যগণ গ্রহণ ক'রে থাকেন, তার বর্তমানের বোটানিকাল্ নাম Zizyphus sativa Geartn., পূর্বে এটির নাম ছিল Zizyphus Vulgaris. তারপর বদর ব'লে বর্তমানে যেটি প্রচলিত তার বোটানিকাল্ নাম Zizyphus jujuba Lam. আর কর্কন্ধু ব'লে যেটিকে চিহ্নিত করা হ'য়েছে তার সংস্কৃত আর একটি নাম 'শৃগালকোলি', যার লোকায়তিক নাম শেয়াকুল বা শে'কুল। এটির বোটানিকাল্ নাম Zizyphus oenoplia Mill. আর একটি প্রজাতির কুল গাছ ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে থাকতে দেখা যায়, তাকে বলা হয় ভূবদরী। এটির বোটানিকাল্ নাম Zizyphus nummularia W&A. আরও একটি প্রজাতি আমাদের বাংলায় মেদিনীপুর অঞ্চলের বিলের পতিত জমিতে হয়ে থাকে, সেটাও ভূলুণ্ঠিত বলা চলে। এটির নাম Zizyphus minima. এরা সকলেই Rhamnaceae ফ্যামিলিভুক্ত। ঔষধার্থে ব্যবহার হয়—ফল, বীজ, মূলের ও গাছের ছাল ও পাতা।

লোকায়তিক ব্যবহার

প্রথমেই ব'লে রাখি—ঔষধার্থে যেখানে কুলের আভ্যন্তরিক ব্যবহার (Internal use) করার কথা বলা হবে, সেখানেই সুপক্ক শুষ্ক (শুক্নো) কুল প্রয়োগ করার বিধি লেখা হলো—

১। **অতিসারে:**— বর্ণচোরা আমের মত ভিতরে রং ধরে আছে যে অতিসার অথচ বাহ্যতঃ প্রকাশ পাচ্ছে না—এই রকম যে ক্ষেত্র অর্থাৎ কাদা কাদা দাস্ত হয়, পেটে দুর্গন্ধও থাকে, সঙ্গে আমও যে নেই তা নয়, এই রকম ক্ষেত্রের অতিসারে ১০ থেকে ১৫ গ্রাম শুকনো কুল তিন কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে খেতে দিলে উপকার যে হবে না তা নয়, তবে এর সঙ্গে একটু সাদা দই মিশিয়ে খেলে ভাল ফল হয়, আর যদি সে সময়ে দালিম (দাড়িম্ব Punica granatum) পাওয়া যায়, তা হ'লে তার সঙ্গে ২/১ চা-চামচ রস মিশিয়ে খেলে আর কথা নেই; এটাতে উপকার হবেই; তবে একটা কথা, সব সময়ে তো দালিম পাওয়া যায় না, তাই দালিমের খোসা ঐ কুল সিদ্ধ করার সময় ৫ গ্রাম আন্দাজ মিলিয়ে সিদ্ধ ক'রলেও উপকার হবে।

২। **অতিসারে:**— (দ্বিতীয় যোগ) শুকনো কুলের গুঁড়ো ৩/৪ গ্রাম একটু সাদা দৈ মিশিয়ে খেলেও উপকার হয়। এই অতিসারের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ শতকের আচার্য বাগ্ভট তাঁর সংগ্রহ গ্রন্থে লিখেছেন যে, কুলের বীজের গুঁড়োও কাজ করে।

৩। **পেটে বায়ু ও অরুচি:**— এই অসুবিধেটা কিছুতেই যাচ্ছে না—এক্ষেত্রে শুকনো কুলের গুঁড়ো, তার সঙ্গে একটু সৈন্ধব লবণ, গোলমরিচের গুঁড়ো এবং একটু চিনি মিশিয়ে চূরণের মত তৈরী ক'রে রাখুন, তবে এগুলি পরিমাণ মত দিলেই তবেই না মুখ ছাড়বে? এই চূরণ মাঝে মাঝে চেটে খেয়ে দেখুন। পেটের বায়ুও ক'মবে অরুচিও সারবে।

৪। **হৃদরোগে:**— এখানে ঋষিকল্প কবিরাজ গঙ্গাধরের মুষ্টিযোগ তুলে দিচ্ছি। তিনি ব'লেছেন **কুবল** (বদরের প্রকারভেদ) শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে সকালে ও বৈকালে দুই বার ৩/৪ গ্রাম মাত্রায় জল সহ খাওয়ার ব্যবস্থা দিতেন।

এখানে একটি ইঙ্গিত রেখে যাচ্ছি—উত্তরসূরিগণের জন্যে ইউনানি সম্প্রদায় এক

প্রকার কুল (শুষ্ক) ব্যবহার করেন, তাকে বলা হয় 'উনাব', যার উচ্চারণ "উনাও", এটিতে টকের লেশমাত্রও নেই, এটি শ্লেষ্মানাশকও বটে এবং কফনিঃসারকও বটে, তাঁদের মতে এটি হৃদ্য, তাই সেটাকে কুবল বলে গ্রহণ করা অযৌক্তিক নয় বলে আমি মনে করি।

৫। **খাই খাই রোগে (ভস্মকাগ্নিতে):—** যতই খেয়ে যাক, তার পেটের অসুখ ব'লতে যেটা অর্থাৎ পাতলা দাস্ত যে হয় তা নয়, অথচ গায়ে মাংস লাগে না। প্রাচীনদের সমীক্ষা হ'লো—এই লোকের পেটে (অন্ত্রে) বড় ক্রিমি আছে, তাই এ'দের এই দুর্দশা। এইসব লোকের ক্ষেত্রে কাঁচা মিষ্টি কুলের শাঁস অন্ততঃ ১০ গ্রাম ৩ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে ঐ পিচ্ছিল ক্বাথটি প্রত্যহ একবার ক'রে খেতে দিলে এ'দের দাস্ত পরিষ্কার হবে এবং ঐ অত্যাধিক ক্ষিধেটাও প্রশমিত হবে, তবে এর ক্রিমি যাতে বেরিয়ে যায় তার ব্যবস্থা করাটাই সমীচীন। এর দ্বারা তাঁর শরীরটা শীঘ্র ভাল হ'য়ে যাবে।

৬। **কোষ্ঠবন্ধে:—** সাধারণতঃ বাত পিত্তের ধাত, অবশ্য এ'দের কোষ্ঠবদ্ধতা বড় থাকে না, তবে যদি এ'দের সেটা আসতে থাকে, তখনই বুঝতে হবে—অর্শরোগ দরজার গোড়ায় এলো ব'লে; এক্ষেত্রে মিষ্টি পাকা কুলকে চ'টকে, খোসা ও বীজগুলো বাদ দিয়ে অথবা ছেঁকে, তার সঙ্গে অল্প জল মিশিয়ে ছেঁকে, কয়েকদিন খেতে হয়। এটাতে ঐ কোষ্ঠবদ্ধতা সেরে যায়। আর অর্শটা তখনকার মত থমকে দাঁড়িয়ে যায়। এখন প্রশ্ন, তখন যদি কাঁচা কুলের সময় না হয়? তা হ'লে শুকনো কুল ১৫ গ্রাম আন্দাজ নিয়ে ৩/৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে খোসা-বীজ বাদ দিয়ে, অল্প লবণ বা চিনি মিশিয়ে খেলেও হবে, তবে সেটা অনুকল্পই হ'লো।

৭। **বসন্ত রোগে:—** দুই-একটা বেরিয়েছে, আর বেরুচ্ছে না এবং যেটা বেরিয়েছে সেটা পাকেও না, যেন দরকচা হ'য়ে আছে। এক্ষেত্রে বীজ বাদ দিয়ে শুকনো কুলকে গুঁড়ো ক'রে সেই গুঁড়োর অন্ততঃ ৪/৫ গ্রাম অল্প গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে একটু একটু ক'রে চেটে চেটে খেতে দিতে হবে। সমস্ত দিনে অন্ততঃ ৫/৭ গ্রাম খাওয়ানো চাই (এটা পূর্ণবয়স্কের মাত্রা)। এর দ্বারা বসন্তের ঐ গুটিগুলি ঝেড়ে বেরিয়ে যাবে এবং তাড়াতাড়ি পেকে যাবে। তারপর যথারীতি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

৮। **প্রদর রোগে:—** এটা স্ত্রীরোগ, সাদাস্রাব বা রক্তস্রাব যেটাই হোক না কেন, আয়ুর্বেদ মতে দুটোই প্রদর রোগ, একটিকে বলা হয় শ্বেতপ্রদর আর অন্যটিকে বলা হয় রক্তপ্রদর, তবে প্রথম মাসিক (ঋতুদর্শন) না হ'লে এটা হয় না, আর সব বয়সের মেয়েদের সাদা স্রাব হ'য়ে থাকে। যাদের মাসের প্রায় সবদিনই অল্পই হোক আর বেশীই হোক, স্রাব চলতে থাকে, তাঁদের ক্ষেত্রের রোগটাকে হালকা ক'রে দেখা উচিত নয়, তবুও আমি ব'লছি—বীজ বাদে শুকনো কুলের গুঁড়ো আন্দাজ ৫ গ্রাম প্রত্যহ একটু আখের (ইক্ষু) গুড় মিশিয়ে চেটে খেলে ৮/১০ দিনের মধ্যে ওটা উপশম হবে। তবে শারীরিক বলাধান না বাড়ালে, কিছুদিন পরে ওটা আবার আসে; তাই দরকার তাঁর স্বাস্থ্য যাতে ভাল হয়, সেদিকে লক্ষ্য করা।

৯। **যোনি কণ্ডূয়নে:—** জননেন্দ্রিয়ের মুখের কাছে অসম্ভব চুলকোয়, বলারও না আর দেখানোরও না, নিজেই অস্বস্তি ভোগ করা; বিশেষতঃ মাসিক হওয়ার পরেই এটা বেশী হয়, আবার কখনও কখনও বেশী, এই যে অবস্থা এক্ষেত্রে শুকনো কুলের গুঁড়ো ৫ গ্রাম ক'রে একটু আখের গুড় বা চিনি মিশিয়ে খেতে হবে।

১০। **শ্বেত প্রদরে :—** এ'দের পাতলা চেহারা, মেজাজ খিটখিটে হয়, আস্তে আস্তে নিতম্ব (পাছা) শ্নকিয়ে যেতে থাকে এবং চেহারাটাও একটন্ ফ্যাকাশে দেখায়; এটিও একপ্রকার ক্ষয় রোগ—এ'দের সম্পর্কে একটা সহজ মন্ষ্টিযোগ লিখছি—সেটা হ'লো ৮/১০টি কুলের বীজ ভেঙেগ, তার ভিতরের শাঁস ঘষে বা মেড়ে নিয়ে, চাল-ধোয়া জল অথবা শ্বেত চন্দন ঘষা আধ চামচ ও একটন্ দন্ধ একসঙেগ মিশিয়ে খেতে হবে।

১১। **রক্তামাশয়ে :—** পাতলা দাস্ত কয়েকবার হওয়ার পর রক্ত প'ড়ছে, তার সঙেগ আমও (Mucus) আছে, এক্ষেত্রে কুলগাছের কাঁচা ছাল (উপরের মরা ছাল বাদ) আন্দাজ ২ গ্রাম বেটে নিয়ে, তার সঙেগ একটন্ দন্ধ মিশিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা দন্ই তিন দিনের মধ্যেই অতিসার সেরে যাবে।

১২। **রক্তপিত্তে (উধর্বগত) :—** এটাকে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ হিমপ্‌টিসিস্ (Heamoptisis) ব'লে থাকেন। এর লক্ষণ হ'লো—গলা সন্ড়সন্ড় ক'রে একটন্ কাসি হয়, আর তাতেই টাটকা রক্ত আসতে থাকে। এখানে ব'লে রাখি—এটা কিন্তু রক্ত নয়, বক্তিম পিত্ত, দেখতে রক্তের মত। এই রক্তের একটা পরীক্ষা হ'লো এটা কুকুরে খায় না কারণ এটা তিতো (তিক্ত)। এই রোগটা সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালের দিকে বেশী হ'তে দেখা যায়। এক্ষেত্রে কুলগাছের কাঁচা ছাল ২/৩ গ্রাম বেটে, একটন্ দন্ধ মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। তবে এ সময় যদি তালশাঁসের জল পাওয়া যায় তা হ'লে খন্বই ভাল হয়। আর একটা কথা—এই রক্ত ওঠাটা তখনকার মত বন্ধ হ'লো সত্যি, কিন্তু রোগেব চিকিৎসা হওয়া দরকার।

১৩। **মেদ রোগে :—** যাঁদের পেট ও পাছাটা (নিতম্ব) ভেরে যাচ্ছে, তাঁদের ক্ষেত্রে কুলের কাঁচা পাতা ৫ গ্রাম করে নিয়ে বেটে সরবত ক'রে খেতে হবে, তবে চিনি বা মিছরি না মিশিয়ে। এ রোগের ক্ষেত্রে নিষেধ—দন্'বেলা ভাত খাওয়া (খেতে হবে একবেলা রন্টি আর একবেলা ভাত, তাও কড়া সে'কা রন্টি) আর চিনি বা যে কোন মিষ্টি ও আলন্ও। এই পাতাবাটা দন্'বেলা খেলেই ভাল হয়। এর দ্বারা ঐ দন্টোই ঝ'রে যাবে।

এখানে একটা কথা ব'লে রাখি—যেখানে দেখা যাচ্ছে সর্বাঙগই স্থন্ল সেখানে মেদ রোগ বলে যেন ভ্রম না হয়, মাংসগত বাত হ'লেও এ অবস্থা আসে, এক্ষেত্রে কুলের পাতা কিন্তু ব্যবহার্য নয়।

১৪। **স্বরভঙেগ :—** কুলের পাতা বাটা আন্দাজ ৫ গ্রাম এক চা-চামচ ঘিয়ে অল্প ভেজে সেটার সঙেগ একটন্ গোলমরিচের গন্ঁড়ো মিশিয়ে খেতে দিলে এক সপ্তাহের মধ্যে সেরে যায়, তবে নৈমিত্তিক কারণে যে স্বরভঙ্গ হয়েছে সেক্ষেত্রে এটি কার্যকর হবে না।

এটি কিন্তু একাদশ শতকের চক্রপাণি দত্তের লিখিত চক্রদত্ত গ্রন্থের দন্ষ্টফল যোগ।

১৫। **মাথার যন্ত্রণায় :—** চক্রদত্ত আর একটি মন্ষ্টিযোগ লিখেছেন—কোন আগন্তুক কারণে, যেমন খন্ব রৌদ্র লাগা, আগন্নের তাপ লাগা, হঠাৎ জন্র আসছে, এই রকম ক্ষেত্রে মাথায় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সেখানে পাতা ও কচি ডগা বেটে প্রলেপ দিলে ঐ যন্ত্রণার উপশম হবে। তবে বর্তমান যন্গে এটা করার মানসিকতা কয়জনেরই বা হবে? তবে লিখে রেখে গেলাম।

১৬। **মদাত্যয় রোগে :—** এটা কিন্তু অসন্খ নয়, বিসন্খ; বেশী দিন মদ খেতে

খেতে এটা দেখা দেয়। গা (শরীর) জ্বালা, মুখটা একটু ফুলো ফুলো। এই যে জ্বালা এক্ষেত্রে কুলপাতা বেটে জলে গুলে ঝাঁকিয়ে, তার ফেনা গায়ে লাগালে জ্বালা কমে; তবে ২/৪ চা-চামচ টক দই-এর জল মিশিয়ে সেটা লাগালে আরও তাড়াতাড়ি জ্বালা ক'মে যায়।

১৭। **প্লীহা রোগেঃ—** কুলের কাঁচা পাতা তিল তেলের সঙ্গে বেটে, ঐ বাটা জিনিসটা প্লীহার উপর মালিশ ক'রতে হবে; অবশ্য অল্প একটু চেপে মালিশ ক'রতে হয়, যাকে বলা যায় মৃদু চাপ। এটা কয়েকদিন ক'রতে হবে। এই দ্রব্যের ব্যবহার চলাকালে দুধ খেয়ে থাকার ব্যবস্থা দিয়েছেন ষষ্ঠ শতকের বাগ্‌ভটাচার্য। ইনি ছিলেন আয়ুর্বেদজগতের একজন দিক্‌পাল।

একটা কথা—আজ বিংশ শতকে হয়তো মনে হ'তে পারে যে দুধে যে পরিমাণ ঘৃত থাকবে, সেটা প্লীহা রোগে খাওয়া উচিত হবে কিনা; সে সম্বন্ধে আয়ুর্বেদের চিন্তা-ধারা হ'লো প্লীহা, শোথ ও উদরী রোগের ক্ষেত্রে দুধই একমাত্র শোষক, এখানে স্নেহকে দান ক'রে মূত্রবহ স্রোতে দুধের জলীয়াংশ বেরিয়ে যাবে এবং তার দ্বারা যে পোষণ হবে সেটার দ্বারা তার অগ্নিবল বৃদ্ধি করাবে। এই জন্যই এই দুধ তার পক্ষে ক্ষতিকারক হয় না। তাছাড়া তার মৃদু রেচনক্রিয়াও সাধিত হবে।

১৮। **অর্শের যন্ত্রণায়ঃ—** মলত্যাগ ক'রে আসার পর মলদ্বার দপ্ দপ্ ঝন্ ঝন্ ক'রছে, ব'সতে অস্বস্তি বোধ। এক্ষেত্রে ১৫/২০ গ্রাম কুলপাতা সিদ্ধ ক'রে ছে'কে নিয়ে, সেই জলটায় একটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে মলদ্বারে আস্তে আস্তে চেপে ধরে ঐ ক্বাথটা লাগালে অর্শের যন্ত্রণা ও দপ্‌দপানি, ঝন্‌ঝনানির উপশম হবে; তবে অন্তর্বলির ক্ষেত্রে ততটা উপশম লক্ষ্য করা যায় না।

১৯। **বিষাক্ত কীট দংশনেঃ—** বোল্‌তা, ভীমরুল বা যে কোন কীটের হুলের বিষের জ্বালা ও ফুলোয় ও শুঁয়োপোকা লাগার ফোলায় যজ্ঞডুমুর (Ficus recemosa Linn.) ও কুলপাতা একসঙ্গে বেটে ওখানে লাগিয়ে দিলে জ্বালা ও যন্ত্রণার উপশম হবে এবং ফুলোও ক'মে যাবে, তবে কাঁকড়াবিছের হুলের জ্বালা রুখতে পারে না।

২০। **ফোড়ায়ঃ—** অনেক সময় মাংসল জায়গায় ফোড়া হয়, তার মুখ হয় না; পাকতে চায় না, ফেটে যাওয়া তো দূরের কথা, তার ওপর সে জায়গাটা খুব লাল হ'য়ে আছে, এক্ষেত্রে কুলপাতা বেটে, গরম ক'রে লাগিয়ে দিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এর কাজ উপলব্ধি ক'রবেন।

২১। **মুখে হাজায়ঃ—** অনেক সময় পিত্তশ্লেষ্মার দোষে আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণের মধ্যে এই রোগ মুখের মধ্যে হয়। ছোট ছোট ফুস্‌কুড়ি, সেগুলি লাল হয়, কিছু খেলেই জ্বালা করে। লোকে চল্‌তি কথায় একে বলে সান্নিকের দোষে হ'য়েছে। এক্ষেত্রে কুলপাতা ৫/৭ গ্রাম নিয়ে ৩ বা ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সেই জল মুখে নিয়ে ৫/১০ মিনিট রেখে, ফেলে দিতে হবে। একে আয়ুর্বেদে বলা হয় কবল ধারণ করা। এইভাবে ২/৩ বারে ২০/২৫ মিনিট কুলপাতার ক্বাথ ব্যবহার ক'রলে ২/৩ দিনের মধ্যে মুখের হাজা সেরে যায়।

২২। **শয্যাক্ষতে (Bed sore) :—** কুল কাঠের কয়লাকে সূক্ষ্ম চূর্ণ ক'রে (পাউডারের মত) সেটা প্যাড্ ক'রে সেই প্যাড্ ওখানে বে'ধে দিলে ঐ ক্ষতটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে।

এই ভেষজ নিয়ে আলোচনা করার শেষে এই কথা মনে আসছে—তখনকার কালে "ঔর্বানল" (বারুদ) তৈরী করা হ'তো কুলকাঠের কয়লা দিয়ে, যেহেতু তার অগ্নির প্রখরতা সর্বাধিক।

আচ্ছা এটা তো ভাবা যায়, এই গাছটার অস্থি তো তার কাঠটাই, তা হ'লে তার জীবিতকালে সে-দেহে কতটা অগ্নির তীক্ষ্ণতা ছিল, যেটা থেকে পুষ্ট হ'য়ে তার অস্থির গঠন হ'য়েছে; সুতরাং এই ভেজষটির সমগ্রাংশ যে বল ও স্থৈর্যের প্রতীক এ সমীক্ষা তো সেই বৈদিক যুগেরই ইঙ্গিত, তবে বর্তমান আয়ুর্বেদ কুলহারা, তাই সে অকূলে বসে।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Potassium oxalate. (b) Essential oil. (c) Fatty alcohol.

অগস্ত্য পুষ্প

এই নামটির সঙ্গে বাংলার একটি সংস্কার জড়িত। সাধারণতঃ ভাদ্রমাসের প্রথম দিনটিতে আমরা কোন দূরান্তরে যাত্রা ক'রতে চাই না বা যেতে দিই না। ঐ দিনে যাত্রা ক'রলে আর নাকি ফিরে আসে না। এর একটা কিংবদন্তীও আছে, সেটা হ'লো—এক সময়ে দেখা গেল বিন্ধ্যপর্বত এত উঁচু হ'য়ে চ'লেছে যে, দেশের একাংশ জলাধারে পরিণত হ'য়ে যাবে, তাই সকলে অগস্ত্য মুনির কাছে প্রার্থনা ক'রলেন বিন্ধ্যের ঊর্ধ্ব গতি রোধ করার জন্য; তিনি বিন্ধ্যপর্বত পার হ'য়ে দক্ষিণে যাওয়ার সময় ব'লে গেলেন যে, আমি যতদিন না ফিরে আসি ততদিন আর মাথা উঁচু ক'রো না, তিনিও আর

ফেরেননি, বিন্ধ্যেরও আর মাথা উঁচু করা হ'লো না; আসলে বৈজ্ঞানিকদের যুক্তি—মধ্য ভারতের পর্বতমালাই সারা ভারতের স্থিতি-সাম্য বজায় রেখে চ'লেছে।

অন্য দৃষ্টিকোণ

সৌর ভাদ্রের সপ্তদশ (১৭ই) দিবসে অগস্ত্য নক্ষত্রের উদয়, প্রকৃতির এমনই খেলা—এই দিন থেকে জলের মলাংশ অধঃস্থ হ'তে থাকে, আর ওদিকে অগস্ত্য নামীয়

পুষ্পটিরও এই ভাদ্রমাসের শেষ থেকেই প্রধানভাবে ফোটা সুরু হয়; এই পুষ্প-বৃক্ষটির অগস্ত্য নামকরণের এটি কারণ নয় তো?

এ সম্বন্ধে আরও কত কথা ভাবা যায়—অগকে অর্থাৎ পর্বতকে যিনি স্তম্ভিত ক'রেছিলেন অর্থাৎ থামিয়ে দিয়েছিলেন তার ঊর্ধ্বদিকের বৃদ্ধি রোধ ক'রে।

এ সম্বন্ধে ভূতাত্ত্বিকদের একটি মতবাদ আছে—কোন এক সময়ে ভূগর্ভের প্রচণ্ড কম্পনে মধ্য ভারতের পর্বতগুলি নীচে ব'সে যায়, আর তার দু'পাশের জমি ধীরে

ধীরে উঠতে থাকে, এর দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ দিকের ভূমি জলা হ'য়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক নিয়ম; ঘটনাক্রমে তেমনি ভূকম্পনের দিনেই বা ঐ নামের কোন সন্ত দক্ষিণ ভারতের পথে যাত্রা ক'রেছিলেন, আর তিনি ফিরে আসেননি। হয়তো বা এই সময় থেকেই আমাদের দেশে সৌর ভাদ্রের প্রথম দিনটি অগস্ত্য যাত্রা ব'লে প্রচলিত। সমগ্র ভারতে এটা মেনে চলা হয় কিনা জানি না, তবে এ প্রবাদটাকে এই বাংলার হিন্দু-সংস্কার-বিশিষ্ট মানুষ মেনে চলেন।

আর একটি মতবাদ আছে যে, অগস্ত্য ঋষি প্রাক্-আর্যদের মধ্যে আর্য সভ্যতাকে প্রচার করার জন্য বিন্ধ্য পার হ'য়ে দক্ষিণ ভারতে যাত্রা ক'রেছিলেন। প্রচার ক'রতে ক'রতে তিনি ওখানেই দেহ রেখেছিলেন। তিনি আর ফিরেননি বলেই প্রবাদ হ'য়ে আছে—অগস্ত্য যাত্রা। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করার বিষয়—ওখানকার অধিকাংশ কৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরই অগস্ত্য গোত্র।

আমার বক্তব্য কিন্তু অগস্ত্য পুষ্পকে কেন্দ্র ক'রে।

গবেষণার আদি সূত্র

> মর্মাণি তে বর্মণা ছাদয়াসি অগস্তিঃ ত্বা রাজামৃতেন অনুবস্তাম্।
> যত্র কবচং উরো বরীয়ো বরুণ স্তে কৃণোতু॥

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> ত্বং অগস্তিঃ অসি। অগং=অচলং অস্যাতি ত্যক্ত্বা গচ্ছতি বকবৎ কুটিলং গচ্ছতি তে পুষ্পং, তব বর্মণা মর্মাণি ছাদয়াসি। তে অমৃতেন রাজা ভিষক্ অনুবস্তাম্। যত্র কবচং উরো বরুণঃ বরীয়ঃ।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—

তুমি অগস্তি। পর্বত ত্যাগ ক'রে বকের মত কুটিল গতিতে তুমি পুষ্প প্রকাশ কর; তোমার কবচ মুক্ত করে মর্তের অমৃত রাজভিষক্ গ্রহণ করেন। তোমার বক্ষ বরুণের চেয়ে বরীয়ান্।

সংহিতাগ্রন্থে বৈদিক অগস্তি কি অনুপস্থিত?

এর উত্তরে বলা যায়—বর্তমান চরক সংহিতার এইটাই যখন আদিরূপ নয় ব'লে (ঐতিহাসিকদের অনুমান খৃষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে সপ্তম) দৃঢ়বলাচার্য স্বীকার ক'রেছেন. (ইনি বর্তমান চরকের কল্পস্থান ও সিদ্ধিস্থানকে সংযোজন ক'রেছেন. এটা চরকের সিদ্ধিস্থানের শেষেই লেখা আছে) তখন সুপ্রাচীন অগ্নিবেশ তন্ত্রটিকেই বর্তমান চরকের আদি জনক, এমন অভিমত জ্ঞাপন করার পরই প্রশ্ন ওঠে যে, অগ্নিবেশ তন্ত্রে এই অগস্তি কুসুম নিবন্ধ ছিল কিনা। এ প্রশ্নটা কিন্তু অবান্তর হ'য়ে যাচ্ছে, যখন কাশ্যপ, জীবক, সুশ্রুত, হারীত প্রভৃতি সংহিতাগুলিতে অগস্তি কুসুমের প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে, সুতরাং অগ্নিবেশ তন্ত্রেও যে এটি ছিল এটা ধ'রে নেওয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বর্তমানের চরক সংহিতায় অগস্তি এই নামে কোন কুসুমের নামোল্লেখ দেখা যায় না, কিন্তু অবাক্‌পুষ্পী এবং বসুক এই দুটি নামে যে পুষ্পের উল্লেখ ও ব্যবহার

আছে, (বিমানস্থান অষ্টম অধ্যায় ১৭৩ গুচ্ছ) সেটা বৃক্ষের মূল-ত্বকের।

এখন বিচার্য হ'লো—অগস্ত্য, অবাক্ ও বসুক পুষ্পই অগস্তি কিনা সেটা অনুশীলনের বিষয়; তবে নত, ন্যুব্জ ও অধোমুখ বোঝাতে অগস্ত্য শব্দের ব্যবহার শিষ্ট প্রয়োগ (শিশুপাল বধ ৬।৭৯), দক্ষিণ দিকের নামও অবাচীন, অগস্ত্য, অবাক্ দিক। অব+অনচ্+কিন্ সমাসে পূর্বপদ অবাচস্থানে অবাক্ হয়। এই অবাক্পুষ্পী যে অগস্তি এর সমর্থন পাওয়া যায় চরক সংহিতার প্রখ্যাত টীকাকার চক্রপাণি দত্তের বক্তব্যে। তিনি পরিষ্কার ব'লেছেন, অবাক্পুষ্পীই অগস্ত্য এবং এর আর একটি নাম বসুক—এই তিনটিই এর পর্যায় নাম; সেখানে এটাও ব'লেছেন, এই পুষ্পটি বিষমাকারের ষড়্দল ও তিক্তরসসম্পন্ন।

লোকব্যবহার

(আভ্যন্তরিক প্রয়োগ)

১। **বুকে সর্দি:—** ব'সে গিয়ে হাঁসফাঁস ক'রছে, পাশ ফিরতে কষ্ট, নিশ্বাস-প্রশ্বাসেও কষ্ট, মনে হবে নিউমোনিয়া, কিন্তু যদি চিকিৎসক মনে করেন এই সর্দিটা উঠে গেলে অসুবিধেটা চলে যায়, সেক্ষেত্রে বকফুলের রস ১ চা-চামচ ক'রে ২/৩ ঘণ্টা বাদে দুই/তিন বার খাওয়ালে সর্দিটা তরল হ'য়ে উঠে যাবে। এখানে কিন্তু একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে, কারণ বারো মাসই তো বকফুল পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে ঐ গাছের পাতার রস ক'রে, তাকে একটু গরম ক'রে ২ চা-চামচ ক'রে দুই/তিন ঘণ্টা বাদে দুই-তিন বার খাওয়াবেন। এর দ্বারা একই রকম কাজ হবে।

২। **প্রতিশ্যায়ে** (নেজাল্ এলার্জিতে):— কথা নেই বার্তা নেই, কারণও কিছু হ'য়েছে এমনও নজরে আসছে না অথবা মনেও প'ড়ছে না; এক্ষেত্রে দশ-বিশটা হাঁচি, আর নাক দিয়ে সড়সড় ক'রে কাঁচা জল গড়াতে লাগলো, সেক্ষেত্রে বকফুল গাছের পাতার রস ২ চা-চামচ একটু গরম ক'রে খাওয়া, আর দুই/এক ফোঁটা নাকে টানা; এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে। প্রাচীন বৈদ্যদের কাছে এটা ছিল এণ্টি-হিষ্টামিনিক্ ড্রাগ (Anti-histaminic drug.)।

৩। **ঘুসঘুসে জ্বরে:—** একটু একটু জ্বর, কিছুতেই যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে বকফুল গাছের ছাল ৫/৬ গ্রাম, হরীতকী ৫/৬ গ্রাম একসঙ্গে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সকালে একবার খেতে হবে। তবে একটা কথা, যদি এর সঙ্গে ৫ গ্রাম গোক্ষুর বীজ (Tribulus Terrestris Linn.) এর সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে ঐ ক্বাথটা করা যায় তো আরও ভাল হয়।

৪। **রাতকাণায়:—** বর্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন, ভিটামিনের অভাবে রাতকাণা রোগ হয়। অর্থাৎ রাতে দেখতে পায় না। আয়ুর্বেদে কয়েকটি কারণের কথা বলা আছে; এটা বংশগতও হ'তে পারে, আবার মেহ রোগে যাঁরা ভুগছেন তাঁদেরও হ'তে পারে। তাছাড়া দিনে বেশী রৌদ্রে ঘুরে বেড়ালে, চোখের সূক্ষ্ম স্নায়ুশিরাগুলির শুষ্কতাও কারও কারও আসে। তাই ক্ষীণ আলোয় সে আর ভালো দেখতে পায় না। সেইটাই হ'লো রাত্র্যন্ধ বা রাতকাণা; সকালে তীব্র আলোকে সেটা অনুভূত হয় না। সেই ক্ষেত্রে বকফুলের পাতার রস দিয়ে ঘি তৈরী ক'রে নিত্য এক চা-চামচ ক'রে খাওয়া, আর ঐ ঘি কাজলের মত সকালে ও সন্ধ্যায় চোখে লাগানো।

ঘি প্রস্তুতবিধি—যতটা ঘি, তার চারগুণ রস নিতে হয়; ঘি কড়ায় চ'ড়িয়ে নিস্ফেন হ'লে ঐ ঘিয়ের কড়া নামিয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'লে, ঐ রসটা ঢেলে দিয়ে আবার কড়াটাকে চড়িয়ে ঐ রসটা ম'রে গেলে, নামিয়ে, ছে'কে নিতে হবে। আর না হয় ঐ পাতা মিহি ক'রে বেটে, ঐ পাতা বাটাটা ঘিয়ের সঙ্গে পাক ক'রতে হবে। যেমন ক'রে তরকারির জন্য বাটনা ভাজা হয়; মোটকথা, ঐ বাটা জিনিসটার জল ম'রে যাবে অথচ পুড়ে যাবে না এমন সময় নামিয়ে, ওর ঘি ছে'কে নিতে হবে। তবে পূর্বোক্ত নিয়মে পাক ক'রলে ভাল হয়।

৫। **মৃগী রোগেঃ—** এর আর একটি নাম অপস্মার রোগ। এই রোগটির নাম দুটিই সার্থক। এই রোগের দুটি নামের বৈশিষ্ট্যটাই তার রোগ নির্বাচন করে। এর একটি নাম হ'লো তার বাহ্য লক্ষণের, আর একটি নাম হ'লো তার আভ্যন্তর বিকার লক্ষণের।

অপস্মার নামের সার্থকতা হ'লো—রোগের পূর্বে ও পরে কিছুক্ষণ সে সব ভুলে যাবে; আর বাহ্য লক্ষণ হ'লো—রোগের প্রারম্ভে হরিণী লাফ দেওয়ার পূর্বে যেমন পা কু'কড়ে, মেরুদণ্ড বে'কিয়ে লাফ দেয়, সেই রকম ভঙ্গী নিয়ে এই রোগাক্রমণ আসে, তাই এই রোগের নাম দেওয়া হ'য়েছে—মৃগী রোগ। আর একটি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়, (রোগাক্রমণের সময়) সেই সময় রোগী অসাড়ে প্রস্রাব ক'রে ফেলে।

এই রোগগ্রস্ত হ'লে বকফুলের পাতার রস ৪ চা-চামচ, তার সঙ্গে গোলমরিচের গুঁড়ো সিকি গ্রাম (২ রতি) মিশিয়ে সকালে একবার, প্রয়োজন হ'লে বৈকালেও একবার খেতে হয়, আর রোগাক্রমণের সময় ঐ রসে একটু গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে দিতে হ'বে (অবশ্য সম্ভব হ'লে), নইলে পরে দিলেও চ'লবে।

৬। **বাতরক্তেঃ—** (এই রোগটির বর্ণনা 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩৩০ পৃষ্ঠায় আছে), মহিষের দুধের মাখন ৪০০ গ্রাম নিয়ে কড়ায় চড়িয়ে তাতে ২০০ গ্রাম বকফুল বাটা দিয়ে মাখনের সঙ্গে পাক ক'রতে হবে, এই পাকটা এমন সময় নামাতে হবে, যেন পুড়েও না যায় আবার কাঁচাও না থাকে; তারপর ওটাকে ছে'কে নিয়ে সেই ঘি ২ চা-চামচ ক'রে প্রত্যহ ভাতের সঙ্গে খেতে হবে। এভিন্ন বকফুল শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে মহিষের দুধের সঙ্গে মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে ঐ দুধের দই পাততে হবে, সেই দই পরের দিন গায়ে মাখতে হবে। এর দ্বারা বাতরক্তজনিত দাগ ও ফাটা সব সেরে যাবে। এখানে এক পোয়া (২৫০ মিলিলিটার) দুধে অন্ততঃ ২ চা-চামচ শুকনো বকফুলের গুঁড়ো মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে সেই দুধের দই পাততে হবে।

৭। **বসন্তেঃ—** লাট খেয়ে গিয়েছে, উঠছে না অথবা গুটি বেরুতে দেরী হ'চ্ছে, এক্ষেত্রে বকফুলের রস ১ চা-চামচ একটু গরম ক'রে দিনে দুই/তিন বার খাওয়ালে, ঐ বসন্তের গুটিগুলি বেরিয়ে যায়।

৮। **শরীরে ব্যথা ও যন্ত্রণায়ঃ—** সাধারণতঃ অল্প অল্প ঠাণ্ডা আবহাওয়া (আশ্বিন-কার্তিক মাসে) অথচ জ'লো হাওয়া যায়নি, এই সময় শরীরে পিত্ত-শ্লেষ্মা বিকারজনিত কারণে এটা আসে। এক্ষেত্রে কয়েকটি আধ ফোটা বকফুলকে নিয়ে থে'তো ক'রে সেই রস এক চা-চামচ ক'রে দিনে ২/৩ বার খেতে দিলে শরীর ঝরঝরে হ'য়ে যায়।

৯। **মাসিক ঋতুর অতি বা অল্প স্রাবেঃ—** এই রোগে যাঁরা ভুগছেন তাঁদের চেহারাটা

সাধারণতঃ একটু স্থূলো হ'তে দেখা যায়, বিশেষ ক'রে শরীরের মাঝের অংশটা। এ'দের স্রাবে থাকে দুর্গন্ধ ও মাজায় ব্যথা। এই ক্ষেত্রে বকফুলের রস প্রত্যহ ২/৩ চা-চামচ ক'রে সকালে ও বৈকালে দুইবার খেতে হয়। এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যায়।

১০। **শুষ্ক কাসিতেঃ—** শ্লেষ্মা শুকিয়ে গিয়েছে, উঠছে না, কাসতে কাসতে বুক-পিঠ ব্যথা হ'য়ে গেল, এক্ষেত্রে অন্ততঃ ২/৩টি ক'রে বকফুল ঘিয়ে ভেজে প্রত্যহ খেতে হবে। এর দ্বারা বক্র বায়ু সর্দিকে শুকিয়ে দিয়ে যে কাসি সৃষ্টি ক'রেছিল, এই বকফুল ঐ বক্রতাকে (বায়ুকে) সোজা ও সরল ক'রে কাসিকে কমিয়ে দেবে।

১১। **শূলের ব্যথায়ঃ—** (colic) খুবই কষ্ট হ'চ্ছে, এক্ষেত্রে ৪/৫টি ফুল ঘিয়ে ভেজে খেতে দিলে সাময়িক উপশম হবে।

১২। **ক্ষয়রোগঃ—** আসছে—তার পূর্বলক্ষণ হ'লো দেহের ওজন ক'মে যেতে থাকবে, মাঝে মাঝে জ্বর হবে, মাঝে মাঝে কাঁধ দুটো ব্যথা হবে। কাসিও যে হয় না তা নয়, এক্ষেত্রে বকফুলের রস ২ চা-চামচ ক'রে প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে দু'বার খেতে হবে। এর দ্বারা কয়েক দিনের মধ্যে উপকারিতা বোঝা যায়।

এই নিবন্ধের উপসংহার ক'রতে ব'সে ভাবছি—আচ্ছা, আমাদের সম্প্রদায় কি অগস্ত্য পথের যাত্রী? অথবা এ পথ আমরা কবে থেকে ধরেছি? সেটা কি ইচ্ছে ক'রে? না আমাদের কেউ যাত্রা ক'রতে বাধ্য ক'রেছে? তাই-ই বা কেন? আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যতই প্রতিকূল হোক, আমরা বেদ, সংহিতাকে যদি না দূরে সরিয়ে রেখে ওকেই আঁকড়ে ধরে থাকতাম, তা হ'লে বোধ হয় আমাদের প্রাক্-আর্যদের দলে ভিড়াতে কেউ পারতো না।

আজ আমরা ধর্মান্তরিত, সুতরাং ক্ষোভ বা আক্ষেপ ক'রে কোন লাভ হবে না, তাই আমরা এখন গড্ডলিকার যাত্রী।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Protein, vitamin-A, thiamine, riboflavin, nicotinic acid, vitamin-C. (b) Grandifloral.

নাদেয়ী (জয়ন্তী)

সামাজিক ভাষার স্রোতে বহু নতুন শব্দ ভেসে এসে মানুষের মনের স্রোতের তীরে লাগে। এই রকমই একটি সংস্কৃত শব্দ রসিক সাহিত্যিক লিখে চালু ক'রলেন—গুল্+গল্প=গুল্পো!

সেইরকম ঘটনা কিনা জানি না, তবুও পরম্পরায় চ'লে আসাটারই একটা প্রাচীন রটনা জানিয়ে রাখি।

ধারা নদীর অধিপতি ভোজরাজের শিরঃপীড়া; কোন রকমেই সারানো যাচ্ছে না. ক্রোধান্বিত রাজার নির্দেশে তাঁর রাজ্যে বৈদ্যকুলের প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'তে চ'লেছে। দেবলোক ত্রস্ত. মর্তে আয়ুর্বেদের চিহ্ন থাকবে না, ছদ্মবেশে অশ্বিনীকুমার যুগল এলেন মর্তে, রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হ'য়ে পরীক্ষান্তে নিদেন (হেতু) জানালেন—নদীতে স্নানের সময় জলের দ্বারা নাসাধৌত ক'রতে গিয়ে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য নাসারন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ ক'রে শিরঃপীড়া ঘটিয়েছে: অতএব কুসুমের মধ্যে অচেতনকর ভেষজচূর্ণ শুঁকিয়ে এ'কে অজ্ঞান ক'রে মস্তকের আবরণটি খুলে ওটা বের ক'রে দিলেই উনি সুস্থ হবেন। সে-সময় শুধু রানী থাকবেন কাছে, আর মাথার পাশে থাকবে একটি জলপাত্র—তাই উক্ত আছে—

> 'তথা রাজ্ঞাপি তথা কৃতম্। ততস্তাবপি কুসুমাভ্যন্তরে মোহচূর্ণানি স্থাপয়িত্বা তেভ্যো মোহয়িত্বা শিরঃ কপালমাদায় তৎ করোটি-কাপুটে স্থিতং শফরিকাং গৃহীত্বা জলভাজনে নিক্ষিপ্য সন্ধান-করণ্যা যথাবৎ কপালং আরচ্য সঞ্জীবন্যা চ তং জীবয়িত্বা বিশল্য-করণীং বিদ্যাং তস্মৈ দর্শয়তাম্'॥

(উপরিউক্ত তথ্যটির অনুবাদ প্রথমেই বলা হ'য়েছে।)

অনুরূপ করা হলো—এইভাবে বিশল্যকরণীবিদ্যার সাফল্য দেখালেন। রাজা শিরঃপীড়ামুক্ত হ'লেন। তারপর রাজা পথ্যের কথা জানতে চাইলেন; তখন অশ্বিনী-কুমার যুগল বললেন—

নাদেয়ং নাদেয়ং কিঞ্চিৎ শরদি চ বসন্তকে।
আদেয়ী নাদেয়ী তত্র দেয়া ধারাপতেঃ শুভা॥

অর্থাৎ শরৎ ও বসন্তকালে নদনদীর জল ভাল নয়। আর ঐ সময় নাদেয়ী ব্যবহার ক'রবেন, ওটি শুভ।

না-দেয়ং জলং ন আদেয়ং ন গ্রহণযোগ্যম্।

নাদেয়ী গ্রহণ করা উচিৎ, নাদেয়ী জয়ন্তী।

অতএব নাদেয়ী যে একটি শুভকর ভেষজ, সেটা পরিষ্কার বোঝা যায় ভোজরাজের আখ্যানের মাধ্যমে।

বৈদ্যকের নথি

এখন নাদেয়ী শুভকর ভেষজ বুঝলেও, চরক সুশ্রুতে এই নামে কোন ভেষজের

উল্লেখ দেখা যায় না; অথচ ষোড়শ শতকের ভাবপ্রকাশে এবং পরবর্তী ভেষজের নিঘণ্টু গ্রন্থ 'রাজনিঘণ্টু'তে নাদেয়ী অর্থে নাগর মুথো (নাগর মুস্তক) ও ভুঁই আমলা (ভূম্যামলকী)। তাছাড়া অন্যান্য ভেষজকোষে নাদেয়ী ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের নাম। এক্ষেত্রে প্রথম প্রামাণ্য বেদ, দ্বিতীয় প্রামাণ্য গ্রন্থ চরক ও সুশ্রুত সংহিতা। একটি সূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ২২৪।৬৫।১৩ সূক্তে।

সেখানে বলা হয়েছে—

> নাদেয়ী সুষদাসি ক্ষত্রস্য যোনিরসি, স্যোনামাসীদ সুষদামাসীদ, মন্থিনোঽধিষ্ঠানমসি।

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> ত্বং নাদেয়ী, নদ্যা নদস্য বা তীরজঃ ত্বং তর্কারী, তর্কং দীপ্তং অর্ গতৌ ঈন্। ক্ষত্রস্য যোনিরসি, যোনিঃ আবাসঃ, স্যোনা শোথঘ্নী, সুখদা এবং সুষদা, মন্থিনো ভূতঘ্নী অসি, ক্রিমীনাং ভূতত্বাৎ।

এই সূক্তটির অনুবাদ হ'লো—তুমি নাদেয়ী, নদ বা নদীর তীরেই তোমার জন্ম হয়, তুমি তর্কারী। তর্ক অর্থে দীপ্তি। তাকেই তুমি দান কর ক্ষত্রিয়ের আবাস। শোথঘ্নী ব'লেই তুমি সুষদা, ভূতঘ্নী, ভূতার্থ হ'লো ক্রিমি, তাকেই তুমি মন্থন ক'রতে পার।

এক্ষেত্রে বৈদিক নাদেয়ীটি যে "তর্কারী" নামে কোন ভেষজকে জ্ঞাপন করে, এটি চরক-সুশ্রুতোক্তিতে পাওয়া মুলে এবং সেই তর্কারীটি যে জয়ন্তী তা পাওয়া যায় টীকাকারদের উক্তিতে।

চরকের বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ের ১৭৫ গুচ্ছে "তর্কারী" নামে ভেষজটির পত্র নিতে বলা হ'য়েছে। আদা (আর্দ্রক), রসুন এবং তর্কারী ও সরষের পাতার রসে যে শক্তি রয়েছে, সেটি বাতব্যাধিতে প্রয়োগ ক'রলে (তৈল পাকে) বাত নষ্ট করে। শ্লেষ্মজ ব্যাধিতে শ্লেষ্মাবিকার দূর করে এবং পিত্তজ ব্যাধিতে পিত্তবিকার দূর করে।

সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়েও তর্কারীর উক্তি এবং টীকায় জয়ন্তী পরিচয়।

এটাতে পরিষ্কার বোঝা যায়, জয়ন্তীর সুপ্রাচীন নাম তর্কারী এবং নাদেয়ী। এ দুটির মধ্যে তর্কারী নামটি বেছে নেওয়া হ'য়েছে দুটি সংহিতায়। আর নাদেয়ী নামকরণের একটি উৎস পাওয়া যায়—দাক্ষিণাত্যের ওয়ারনা ও কৃষ্ণা নদীতে জল বেড়ে দু'কূল ছাপিয়ে যায়, তারপর এই নদীর তীর বরাবর যে পলি পড়ে, সেখানে এই জয়ন্তী গাছের বীজ প'ড়ে এক বৎসরেই ১০/১৫ ফুট উঁচু গাছ হ'য়ে থাকে। এই যে নদীর কিনারায় তার বাড়-বাড়ন্ত, সেইটাই তার নাদেয়ী নামকরণের উৎস নয়তো?

এইসব সংহিতাগ্রন্থের পরবর্তী লোকতান্ত্রিক চিকিৎসাগ্রন্থ এবং অথর্ববৈদিক তন্ত্রসংহিতা গ্রন্থে কিন্তু নাদেয়ী বা তর্কারী নামের পরিবর্তে জয়ন্তী নামটি সর্বাধিক স্থানে গৃহীত হ'য়েছে, যেমন চক্রদত্ত গ্রন্থের জ্বর চিকিৎসায় জয়ন্তী পাতার রস দিয়ে ঘি (ঘৃত) পাক ক'রে ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া আছে। বাগ্‌ভটের উত্তরতন্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এবং ভাবপ্রকাশেও জ্বর চিকিৎসায় (কর্ণমূল শোথ সহ) ঐ পাতার রসে পাক করা ঘিয়ের ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া আছে। রসতান্ত্রিকগণ এর শিকড় (মূল) ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছেন। এভিন্ন পারদ গন্ধকাদি শোধনে জয়ন্তী

পাতার রসের ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়; অবশ্য রসতান্ত্রিকদের গ্রন্থে। তাছাড়া হৃদ্‌রোগের ঔষধে জয়ন্তী পাতার রসে ভাবনা দেওয়ার অর্থাৎ নিষিক্ত করার বিধি রসগ্রন্থেই উল্লেখিত।

পরিচিতি

জয়ন্তী বৃক্ষ বেশী উ'চু হয় না, সাধারণতঃ ১০/১২ ফুট পর্যন্ত হ'তে দেখা যায়; গাছ বেশী ঝোপ-ঝাড় হয় না, পাতাগুলি দেখতে অনেকটা তে'তুল পাতার মত, সাধারণ বৃন্তে (ডাঁটায়) ১৪/১৫ জোড়া পাতা থাকে, সেগুলি মসৃণ লোমযুক্ত। বৃন্তাগ্রে বিজোড় পাতা থাকে না, ফুলের রং ফিকে হ'ল্‌দে; আর-এক রকম ফুল হয় তার পিঠের দিকের রং গাঢ় বেগুনে। এই ফুলের গঠন বকফুলের (যাকে সংস্কৃতে বলা হয় অগস্ত্য পুষ্প) মত, তবে আকারে খুবই ছোট। পুষ্পদণ্ডে অনেকগুলি ফুল হয় বর্ষাকালে; তারপর সরু শুটি হয়; এগুলি ৬—৯ ইঞ্চি লম্বা, অনেকগুলি বীজ থাকে; বীজগুলির প্রকোষ্ঠ পৃথক—যেমন বর্‌বটির হয়। ফাল্গুন-চৈত্রে পাকে এবং আপনা-আপনি বীজ প'ড়ে যায়। এটির বোটানিক্যাল্‌ নাম Sesbania Sesban (Linn.) Mear., ফ্যামিলি Leguminosae.

রোগ প্রতিকারে

১। **নাকের জল:—** প্রায় সারা বৎসরই পড়ে, হয় সকালের দিকে না হয় সন্ধ্যে-বেলা ঝির্‌ঝির্‌ ক'রে আসে, কাঁচা সর্দি কিছুতেই যায় না। এ'দের পক্ষে ভাল ওষুধ এই জয়ন্তী পাতা ৫/৬ গ্রাম একটু সিদ্ধ ক'রে, তেল দিয়ে সাঁতলে শাকের মত খাওয়া. এর দ্বারা এই আপদটা চ'লে যাবে।

২। **জ্যাম্‌:—** নাক বন্ধ, মাথাও ভার, সর্দি গড়ায় না, বেরোয়ও না; এক্ষেত্রে জয়ন্তী পাতার রস ২ চা-চামচ একটু গরম ক'রে প্রত্যহ সকালের দিকে খেয়ে দেখুন, ঐ জ্যাম্‌টা খুলে যাবে।

৩। **শিশুর সর্দিতে:—** এটাতে প্রায়ই ভোগে, বুকে ব'সে যায়, হাঁসফাঁস করে, মনে হয় যেন হাঁপানীর টান, এক্ষেত্রে জয়ন্তীর পাতার রস একটু গরম ক'রে সেটা থেকে ২/৩ ফোঁটা দুধে মিশিয়ে খেতে দিন; আর বাকী রসটার সঙ্গে একটু সরষের তেল মিশিয়ে বুকে-পিঠে আস্তে আস্তে মালিশ ক'রে দিলে ঐ কষ্টটা চ'লে যাবে, আর সর্দি তরল হ'য়ে হয় বমি হবে, না হয় দাস্তের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে।

৪। **সিকতা মেহে:—** প্রস্রাবের তলানিতে এরারুটের মত পড়ে, এটাতে বয়সের কালাকাল কিছু নেই. তবে শরীরের বলাধান ক'মে যাচ্ছে; এক্ষেত্রে চক্রপাণি দত্তের (একাদশ শতকের) সিদ্ধ যোগ হ'লো জয়ন্তী পাতার রস ২ চা-চামচ একটু দুধ মিশিয়ে সকালে ও বৈকালে দু'বার খাওয়া। এটাতে ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে। তবে প্রথমে এক বা দেড় চা-চামচ ক'রে খাওয়া আরম্ভ করা উচিত।

৫। **ইক্ষুমেহ রোগে:—** প্রস্রাব বেশী, ইক্ষু (আখের) রসের মত গন্ধও, পি'পড়েও লাগে, হাটুর বল ক'মেও যাচ্ছে—এটা কিন্তু মধুমেহের পূর্বাবস্থা।

এক্ষেত্রে জয়ন্তী পাতার রস ২ চা-চামচ ক'রে সকালে ও বৈকালে দু'বার খেয়ে

দেখুন। উপশম হবে।

৬। **মধুমেহে:—** এই জয়ন্তী পাতার রস ৩/৪ চা-চামচ একটু গরম ক'রে, ঠান্ডা হ'লে অন্ততঃ আধ কাপ দুধে মিশিয়ে খেতে হয়। এটা ১৭শত খৃষ্টাব্দের চিকিৎসক ও গ্রন্থকার বঙ্গসেনের আমল থেকে চ'লে আসছে, তবে প্রাচীন রীতি ভংগ ক'রে একটা কথা আজ জানাই যে, আমার মাননীয় রক্ষণশীল বৈদ্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরা এই জয়ন্তী পাতা শুকিয়ে চূর্ণ ক'রে ওষুধ হিসেবে দিতেন—যবের আটার সঙ্গে মিশিয়ে রুটি ক'রে খেতে। মাত্রা ছিল ৪/৫ গ্রাম। আর তাঁরা যে কোন ঔষধই দিতেন, তার একটির সহপান (অনুপান) এই জয়ন্তী পাতার রস থাকবেই।

৭। **বাত শিরায়:—** অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী হ'লেই, হয় শিরে টান ধরে, না হয় জ্বরভাব বা জ্বর অথবা দুই-ই, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পায়ের পেশীতে বা বগলে ব্যথা, এক্ষেত্রে এক বা দেড় ইঞ্চি ক'রে পাতা সমেত জয়ন্তীর ডাল ভেঙ্গে নিয়ে সেটাকে অল্প ভাপিয়ে, গরম অবস্থায় সেই জায়গাটিতে বেঁধে রাখলে ওটা উপশমিত হবে।

৮। **বোলতা, ভীমরুল বা বিছের হুলের বিষের জ্বালায়:—** জয়ন্তীর বীজ বেটে বা ঘষে ওখানে লাগিয়ে দিলে বিষের জ্বালা প্রশমিত হবে।

৯। **পালা জ্বরে:—** এ জ্বর ২ দিন বা ৩ দিন অথবা ৪ দিন অন্তর আসতে পারে, অনেক সময় ১৫ দিন অন্তরও হয়। এক্ষেত্রে জয়ন্তীর শিকড় (মূল) মাথায় বাঁধলে ওটা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এ উক্তিটি অথর্ববেদিক সম্প্রদায়ের বৈদ্যক গোষ্ঠী পরম্পরায় চ'লে আসছে। হয়তো বা হ্যাঁ, হয়তো বা না—এ তর্ক চিরকালই থাকবে। আমরা রত্নও তো ধারণ করি এবং সে বিধিও তো দেওয়া আছে। বাস্তব কিনা সেটা দেখার জন্যই সূত্রটা এখানে রেখে গেলাম।

১০। **বসন্ত রোগ প্রতিষেধে:—** মাঘের শেষ থেকেই রোগ আসে, সে সময় শরীরে পিত্তশ্লেষ্মার সঞ্চয় হ'য়ে রসস্থ হয়; এই সময় জয়ন্তীর বীজ ২৫টি পিষে, একটু ঘি মিশিয়ে পর্যুষিত (বাসি) জল দিয়ে খেতে হয়, এর দ্বারা ঐ সঞ্চয়টা নষ্ট হয়, এটি প্রতিষেধক হিসেবে বহুকাল থেকে চ'লে আসছে।

১১। **শূল ব্যথায়:—** পেটে অসম্ভব যন্ত্রণা, কারণ বোঝা যাচ্ছে না, সে যেজন্যেই হোক, গমের আটার (ভূষিমিশ্রিত) সঙ্গে জয়ন্তী পাতা বেটে রুটি ক'রে, সে হাতে গ'ড়েই হোক আর বেলুনি দিয়ে বেলেই হোক, চাটুতে সেঁকে সহ্যমত গরম গরম যেখানে ব্যথার অনুভব হ'চ্ছে সেখানে বসিয়ে দিলে ৪/৫ মিনিটের মধ্যেই উপশম হবে।

১২। **শ্বেতীতে (শ্বিত্র রোগে):—** দেহের যেখানে রোমোদ্গম হয় না—যেমন অধরে (ঠোঁটে), হাতের ও পায়ের তলায়, মলদ্বারে ও মেঢ্রে—দেহের এইসব অঙ্গে যদি সাদা দাগ হয়, সেটা দুঃসাধ্যের পর্যায়ে পড়ে যায় দীর্ঘদিন হয়ে গেলে। তথাপি বলা আছে, প্রাথমিক স্তরে শ্বেত জয়ন্তীর মূলের ছাল গোদুগ্ধ দিয়ে বেটে লাগালে ও খেলে এ রোগের উপশম হয়। অন্য জায়গায় হ'লে উপশম হবে—একথা বঙ্গসেন তাঁর পুস্তকে লিখে গিয়েছেন।

এখানে আর একটি কথা ব'লে রাখি, আমি নিজে বহু চেষ্টা ক'রে শ্বেতপুষ্প জয়ন্তীর সন্ধান পাইনি এবং বহু উদ্ভিদবিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা ক'রেছি, তাঁরাও যে দেখেছেন একথা ব'লছেন না, আর এটা যে ছিল না এটাই বা বলি কি ক'রে?

১৩। **গর্ভ নিরোধেঃ—** অনেকে ভাবছেন এটার প্রয়োজন আছে জনসংখ্যাকে সীমিত করার জন্যে; কিন্তু আমরা দেখতে পাই, চরক সুশ্রুতের যুগে, এমনকি একাদশ শতকের চক্রপাণি দত্তের কাল পর্যন্তও এ সমস্যা ছিল না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ষোড়শ শতকে এসে এ ভাবনা মাথায় ঢুকেছে ভাবমিশ্রের, (ইনি ভাবপ্রকাশ গ্রন্থের রচয়িতা), কি কারণ ছিল তা জানি না। তিনি একটি সিদ্ধযোগ লিখে গিয়েছেন, সেইটা বলি— নারী ঋতুমতী হ'লে সেই তিন দিন জয়ন্তী পাতা বেটে পুরনো গুড় দিয়ে রোজ সকালে খালিপেটে সরবত ক'রে খেতে ব'লেছেন, এর দ্বারা এই অশোকাষ্টমীটা কেটে যাবে, ফিরে মাসে আবার হ'লে পুনরায় এই তিন দিন খেতে হবে। এমনকি এও শোনা যায় (বৃদ্ধ বৈদ্যদের কাছে) যে, কয়েক মাস নিয়মিতভাবে এই তিন দিন ক'রে খেলে তাঁর গর্ভধারণের ক্ষমতাটাই চলে যায়, অথচ শরীর খারাপ হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ এইবার এইটাকে নেড়েচেড়ে দেখুন এটা বাস্তব কিনা।

আজ এই নিবন্ধটি লেখার শেষে ব'সে ভাবছি, যদি আমি নাস্তিক হ'য়ে যাই, তাতে ক্ষতি কি? আচ্ছা এই যে দেবদেবীর নাম—এ-সব কোথা থেকে সংযোজন করা হ'লো? আমাদের ভেষজ সম্পদই বলুন আর আহার্য দ্রব্যই বলুন, সবই তো ভূমি-লক্ষ্মীর সৃষ্টি; আচ্ছা, আপনারা একটা দেবদেবীর নাম কেউ ব'লতে পারেন—যে নামে কোন উদ্ভিদ নেই? অবশ্য আমি তো খুঁজে পাইনি।

এখন দেখা যাচ্ছে, যখন থেকে আমরা বাস্তবকে পিছনে রেখে স্বর্গের সিঁড়ি খুঁজতে আরম্ভ ক'রছি, তখন থেকেই আমরা আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে প'ড়েছি, আর আমরা বাস্তব সত্ত্বার উপলব্ধ জ্ঞানকে হারিয়ে ফেলেছি, তাই হাত জোড় ক'রে বলি—

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গে শিবে ক্ষমা ধাত্রি স্বধা স্বাহা নমস্তুতে॥

এই যে মানস-চিন্তার স্থবিরতা, এটা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেল না পিছিয়ে নিয়ে গেল? তাই আমার অভাবনার-ভাবনা।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) A neutral unsaturated lactone. (b) Furocoumarin. (c) A gummy material. (d) Flavonols, protein, vitamin-C. (e) Fatty acids viz., palmitic, stearic, lignoceric, oleic, linoleic and linolenic.

অপরাজিতা

এক বৈয়াকরণিক শব্দকাণ্ডের উপসর্গে প'ড়ে ভাবছেন—অপ-কীর্তির জন্য অপ-রাধী হ'য়ে এবং অপ-ভাষা শুনে আর অপ-বাদ নিয়ে বেঁচে থাকার থেকে অপ-মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, কিন্তু যদি "অপ-রূপকে" হাজির করি, তা হ'লে তাকেও কি ঐ পর্যায়ে ধ'রে নিতে পারি? এ দ্বন্দ্ব কেন মনে আসছে যে, এটাকে ঐ পর্যায়ে ধরা যায় না? কিন্তু যদি অপ-রাজিতাকে বা অ-পরাজিতাকে সামনে ধরি? তা হলে অপ শব্দের হীনমন্যতা থেকে শুধু মুক্তই হ'লো না, শ্লাঘার ভাবও জেগে উঠলো, এখন এই অ-পরাজিতা শব্দটির সৃষ্টি কোন্ যুগে এবং কাকে উপলক্ষ্য ক'রে?

> অনুত্তমা তে মঘবন্ নকি র্নু ন ত্বাবাঁ২পরাজিতা।
> ন জায়মানা নশতে ন জাতা যানি করিষ্যাকৃণুহি প্রবৃদ্ধঃ।
>
> (যজুর্বেদ ৩০।১১)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> অনুত্তমা অপরাজিতা, তাং হি তে মঘবন্ অপরাজিতেতি অনুত্তং ন কেনাপি নাশিতং নু ইতি নিশ্চয়ে, কিঃ ইতি কোঽপি তে অনুত্তমা নাশয়িতুং প্রবৃদ্ধঃ। বিদ্যয়া লতয়া যানি কর্মাণি বৃত্র-বধাদীনি ইতি কর্ত্তুং যোগ্যা রক্ষা কর্মণি মেধঃ সংবর্ধনানি কর্মাণি কৃণুহি, অনয়া অনুত্তময়া।

এই সূক্তটির অনুবাদ হ'লো—ওহে ইন্দ্র, তোমার অনুত্তমা অপরাজিতা বিদ্যা ও লতার দ্বারা বৃত্রাসুর বধাদি কর্ম সাধিত হয়। রক্ষাকর্ম ও মেধা সংবর্ধন দুই তোমার অপরাজিতা, এটি তোমার অনুত্তম কর্ম।

এই নজির থেকেই দেখা যাচ্ছে—অপরাজিতা একটি বিদ্যা ও একটি লতার নামও। প্রথমোক্তটির দ্বারা রক্ষাকর্ম ও দ্বিতীয়টি মেধা বর্ধনার্থে। এই অপরাজিতা বিদ্যার

সাধনা ক'রেছিলেন অথর্ববেদের তন্ত্রসাধকগণ, আর আবিষ্কার ক'রেছিলেন এই বিদ্যার দুটি ধারাকে—একটি আধি-ভৌতিক আর একটি আধিদৈবিক। আধি-ভৌতিক ধারাটি চুরি করার ক্ষেত্রে, যেমন—গৃহস্থের সকলকে ঘুম পাড়ানো, যাকে বলা হয় 'নিদুলী' দেওয়া, এটাও অপরাজিতার অন্তর্গত।

আর দ্বিতীয় অপরাজিতা বিদ্যায়—কবচ, মাদুলী, শিকড়-বাঁধা, বশীকরণ, মারণ, উচাটন প্রভৃতি। এই সবই আধিদৈবিক বিদ্যারই অন্তর্গত।

বৈদ্যকের নথি

চরক সংহিতায় এই অপরাজিতা বিদ্যার ধারাটিকে দৈবব্যপাশ্রয়ী চিকিৎসা অর্থাৎ মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা, তাই তারা শিকড় বা দৈবকার্যের অনুকূলে মত পোষণ ক'রেছেন।

একাদশ শতকেও এর প্রভাব চ'লে এসেছে। শুধু তাই নয়, সেটা যে এখনও গ্রামাঞ্চলে এবং সাধুসন্তের কাছে পাওয়া যায় না, তাই বা বলি কি ক'রে? এটা যে অথর্ববেদের ধারাসূত্র থেকেই এসেছে, সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। বর্তমানে তার মধ্যে বেনো জলই বেশী ঢুকে গেছে; এজন্য বৈজ্ঞানিকদের চক্ষে এটা একটা বুজরুকির পর্যায়ে পড়েছে।

এই অপরাজিতা বিদ্যাটি এককালে মাননীয় মনীষীবৃন্দের কাছেও খুবই মাননীয় ছিল, নইলে মহাকবি কালিদাসের অমর নাটক 'শকুন্তলায়' সপ্তম অঙ্কের ২০ শ্লোকে অপরাজিতা বিদ্যা ও অপরাজিতা পুষ্পের উল্লেখ দেখা যায় কেন? তাছাড়া অপরাজিতা নামটি গৃহীত হয়েছে স্কন্দপুরাণে, সেখানে বলা হ'য়েছে—দেবী দুর্গার একটি মূর্তির নাম 'অপরাজিতা', একে ঈশান কোণে রেখে অপরাজিতা কুসুমের দ্বারা অর্চনা ক'রলে (আশ্বিনের শুক্লাদশমীতে) গৃহীর মনোবাসনা পূর্ণ হয়। তাই অদ্যাবধি বাংলার তন্ত্রসাধকগণ শারদীয় দুর্গাপূজার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন অপরাজিতা লতার বেষ্টনী ও কুসুমের দ্বারা। এটা দেখা যায় অথর্ববেদের রাজকল্পে দুর্গ বিজয়ের পর নিজের বিজিত সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য অপরাজিতার রোপণ; অতএব 'অপরাজিতা' নামটি সুপ্রাচীন এবং আমাদের আদি সূত্রের মধ্যমণি যজুর্বেদে তাঁরা জনকল্যাণের জন্য এই ভেষজ লতাটিকে গ্রহণ ক'রেছেন।

'সংহিতাকারের দৃষ্টিতে—ভেষজলতা অপরাজিতা'

এখন প্রশ্ন হ'লো—আমরা অপরাজিতা লতার দুই রকম ফুল দেখতে পাই—একটি সাদা আর একটি নীল; কিন্তু চরক সংহিতায় (বিমানস্থান, অষ্টম অধ্যায়) শ্বেত পুষ্প অপরাজিতার উল্লেখ এবং সুশ্রুত সংহিতায়ও ঐ শ্বেত পুষ্পেরই ব্যবহার, সেখানে "শ্বেতা" ব'লে উল্লেখিত; আর ব্যবহার করা হয়েছে—বয়ঃস্থাপনে অর্থাৎ বৃষ্য রসায়নে এবং বিষ চিকিৎসায় (২৫ অধ্যায়); দর্বীকর সাপে অর্থাৎ ফণাধারী সাপে কামড়ালে এই অপরাজিতা মূলের ছালের বাহ্য প্রয়োগ ও আভ্যন্তর প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়েছেন। শার্ঙ্গধর সংহিতায় আরও অগ্রগতির গবেষণা দেখা যায়—সেখানে বলা হ'য়েছে পরিণাম-শূলে আভ্যন্তরিক প্রয়োগের কথা। এছাড়া হারীত সংহিতায় এটিকে শ্লীপদ রোগেও প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়েছেন।

পরিচিতি

এই লতাগাছটিকে বাগানে, বেড়ার ধারে অথবা গেটের উপর লাগানো হয়। এর লতা থেকে পাতার ডাঁটা বেরোয়, সেগুলি লম্বায় ৩/৪ ইঞ্চি, সেই ডাঁটায় দুই বা তিন জোড়া পাতা থাকে আর তার মাথায় একটি বিজোড় পাতা থাকে, পাতাগুলি ডিম্বাকৃতি। এদেশে সাদা, নীল ও কদাচিৎ বেগুনী রংয়ের ফুলের অপরাজিতা আমরা দেখতে পাই; এই নীল অপরাজিতার দুই স্তবকের পাপড়ির ফুলও দেখা যায়। পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-

বিজ্ঞানীগণ বলেন—এই অপরাজিতা ফুলের বীজ আনা হ'য়েছে টারনেটি (Ternete) থেকে, এই টারনেটি মালাক্কা দীপপুঞ্জের অন্তর্গত। এটি টারনেটি থেকে আনা হ'য়েছিলো ব'লেই এই লতাগাছটির প্রজাতির নাম রাখা হ'য়েছে ternatea (টারনেটিয়া)।

জানি না সেটা নীলপুষ্প অপরাজিতার বীজ আনা হ'য়েছিল কি না, কারণ যজুর্বেদে দেখা যাচ্ছে, শ্বেত পুষ্প অপরাজিতার উল্লেখ এবং তার গুণাগুণের বর্ণনা; তবে মালাক্কা সে যুগের জম্বুদ্বীপের (বৃহত্তম ভারতের) অন্তর্গত ছিল কিনা জানি না। যা হোক, এই অপরাজিতা গাছে বারোমাসই ফুল হয়, তবে কম-বেশী; তবে এটা লক্ষ্য করা গেছে—নীল ফুলের গাছ যত তাড়াতাড়ি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে, শ্বেত পুষ্প লতাগুলি সেটা করে না। এর ফলগুলি শিমের মত চেপ্টা, চওড়া সিকি ইঞ্চিরও কম আর লম্বা ১১/২ ইঞ্চি, বীজে গাছ হয়। এটির বোটানিকাল্ নাম Clitoria ternatea Linn., ফ্যামিলি Papilionaceae. উড়িষ্যাতেও অপরাজিতা নামে এটি খ্যাত।

রোগ প্রতিকারে

১। **মূর্ছায়** (Hysteria):— মূর্ছা না অপস্মার? হিষ্টিরিয়া না এপিলেপ্সি? কোন্ রোগ এটা বিচার হয়—যদি রোগাক্রমণের পূর্বে বা মধ্যে অথবা হওয়ার পরই প্রস্রাব হ'য়ে যায়, তবে বুঝতে হবে এটা অপস্মার, নইলে সেটা মূর্ছা; এই মূর্ছার ক্ষেত্রে (আক্রমণের সময়) যদি এর মূল, গাছ ও পাতা থেঁতো ক'রে, ছেঁকে ১ চা-চামচ আন্দাজ রস কোন রকমে খাইয়ে দেওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ ওটা ছেড়ে যাবে।

২। **শূল ব্যথায়:**— খাওয়ার ২/৩ ঘণ্টা বাদে ব্যথা ধরে, বুক-পিঠ যেন সেঁটে ধরতে থাকে, এক্ষেত্রে ৩/৪ গ্রাম অপরাজিতার মূলের ছাল বেটে একটু ঘি, মধু ও চিনি মিশিয়ে সকালে ও বৈকালে দু'বার ক'রে খেলে ৭/৮ দিনের মধ্যে এর উপশম হবে।

৩। **ভুতোন্মাদে:**— দেখা যায় মেয়েদেরই এটা বেশী হয়, ভূত পুরুষের কাছে আসে না। এটা আসার একটা বয়স আছে। এটা মাসিক হওয়ার পূর্বেও হয় না, আর বন্ধ হওয়ার পরও হয় না, আসলে এটা কামজ উন্মাদ; এক্ষেত্রে এর মূলের ছাল ৩ থেকে ৬ গ্রাম পরিমাণে নিয়ে ঘি-এর সঙ্গে শিলে ভাল ক'রে পিষে, দিনে ২ বার আতপচাল ধোয়া জল দিয়ে খেতে দিতে হবে। এটাতে ঐ কামজ উন্মাদ সেরে যাবে; এভিন্ন সাধারণ উন্মাদেও এটা ব্যবহার করা যায়। এটা সংগ্রহ যুগের গবেষণা।

৪। **গলগণ্ডে:**— এর মূল ৫/৬ গ্রাম (আধ তোলা আন্দাজ) ঘি দিয়ে শিলে পিষে, অল্প মধু মিশিয়ে খেলে এটা সেরে যায়। এটা একাদশ শতকের ব্যবহৃত যোগ (চক্রদত্ত সংগ্রহ)।

৫। **স্থির শোথে:**— যে ফুলো ওষুধে ক'মছে না, লবণ ছাড়লেও যাচ্ছে না অথচ শ্লীপদের (ফাইলেরিয়া) লক্ষণও নেই, সেক্ষেত্রে নীল অপরাজিতা (গাছে-মূলে) বেটে অল্প গরম ক'রে ঐ ফুলোয় লাগাতে হয় এবং আরও একটা উপদেশ দেওয়া আছে—এই গাছের মূল ৪/৫ গ্রাম এবং ৫টি গোল মরিচ একসঙ্গে বেটে কাঁচা দুধ দিয়ে প্রত্যহ একবার ক'রে খেতে দিতে হবে।

৬। **ঘন ঘন প্রস্রাবে :—** অনেক বালকেরও দেখা যায়—নড়েচড়ে আর প্রস্রাব করে, অথচ পরিমাণে অল্প, আবার বুড়োকালেও এটা দেখা যায়; এক্ষেত্রে সাদা বা নীল যা-ই পাওয়া যাক, গাছে-মূলে নিয়ে, রস ক'রে ১ চা-চামচ আন্দাজ প্রত্যহ ২ বার একটু দুধ মিশিয়ে খেতে হয়। এটি কিন্তু পূর্ণমাত্রা।

৭। **মেধা বৃদ্ধিতে :—** সকলের মুখে মুখে চ'লে আসছে ব্রাহ্মীঘৃত এর একমাত্র ঔষধ, কিন্তু এই শ্বেত অপরাজিতা মূলের কল্ক আর গাছপাতার ক্বাথ দিয়ে আয়ুর্বেদীয় ঘৃত প্রস্তুত-পদ্ধতিতে ঘৃত প্রস্তুত ক'রে খেতে দিতে হয়। এটি ব্যবহারের নিয়ম ভাত খাওয়ার প্রথম গ্রাসের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে, এর সঙ্গে লবণ মাখানো চ'লবে না, এটাতে প্রত্যক্ষ ফল উপলব্ধি হয়। তবে বৈদ্য ভিন্ন সাধারণের পক্ষে প্রস্তুত করা সম্ভব নয়।

৮। **পুষ মেহে :—** সম্ভোগে অস্বস্তি, শিশ্নাগ্রে ব্যথা বোধ—কোন কোন সময় টিপলে একটু পুঁজের মত বেরোয়; সেক্ষেত্রে এর মূলের রস ১ চা-চামচ আধ গ্লাস মিছরির সরবতের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে।

৯। **স্বরভঙ্গে :—** এ ক্ষেত্রটি যক্ষ্মার স্বরভঙ্গে নয়, অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়জনিতও নয়, অথবা গরম-ঠাণ্ডা জল খেয়েও নয়; কেবলমাত্র যে স্বরভঙ্গটা শ্লেষ্মার দ্বারা অধিজিহ্বাকে (Larynx) দূষিত ক'রে সৃষ্টি হয়, সেই ক্ষেত্রেই এটি কার্যকর হবে।

কি ক'রতে হবে? সমগ্র লতাপাতা আন্দাজ দশ গ্রাম থে'তো ক'রে ৪/৫ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, সেই জলে কবল ধারণ করা, আর গরগরা (গারগেল্) করা—অন্ততঃ ১৫ মিনিট ধ'রে এটা ক'রতে হবে, এর দ্বারা ৪/৫ দিনের মধ্যে ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

১০। **গলক্ষতে :—** সাদা পরদা প'ড়ে আছে, অথবা লাল, ক্ষতের পূর্বাবস্থা, এমন-কি কোন জায়গায় ক্ষতও দেখা দিয়েছে, সেক্ষেত্রে ঘিয়ের চারগুণ ওজনের গাছকে ভাল ভাবে থে'তো ও গাছের ৮ গুণ জলে সিদ্ধ ক'রে সেই জলের সিকিভাগ অর্থাৎ চতুর্থাংশ থাকতে নামিয়ে ছে'কে নিয়ে সেই ক্বাথ দিয়ে ঘি তৈরী ক'রতে হবে, তারপর অল্প ঠাণ্ডা হলে সেই ঘি ছে'কে নিতে হবে। এই ঘি প্রত্যহ দু'বার ক'রে তুলি দিয়ে লাগালে গলক্ষত ভাল হয়।

১১। **শুষ্ক কাসিতে :—** একে আমরা চল্‌তি কথায় শুকনো কাসি বলি। কাসিই হয়, কিন্তু কিছু বেরোয় না, যদিও বেরোয় সেটা আঠার মত (সাধারণতঃ এলার্জির কাসিতে এই রকম বেরোয়), এক্ষেত্রে অপরাজিতা মূলের রস আন্দাজ ১ চা-চামচ আধ কাপ অল্প গরম জলে মিশিয়ে, সেই জল মুখে পুরে ১০/১৫ মিনিট বসে থাকতে হয় (একে বলে কবল ধারণ করা) আর মুখটা উ'চু ক'রে এমনভাবে গরগরা ক'রতে হয় যেন গলতালুতে লাগে; এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

১২। **আধকপালে :—** এর আয়ুর্বেদিক নাম অর্ধাবভেদক। এই রোগে এক টুকরো মূল ও গাছ একসঙ্গে থে'তো ক'রে ওটার রসের নস্যি নিতে হবে। এর দ্বারা ২/৩ দিনের মধ্যে ঐ আধকপালের ব্যথাটা সেরে যাবে।

১৩। **খোস-পাঁচড়ায় :—** যেসব খোস-পাঁচড়া পৌষ মাসের শেষে দেখা দেয়, সেই ক্ষেত্রে এই গাছপাতার ক্বাথ দিয়ে তৈরী তেল গায়ে মাখলে ওটা সেরে যায়।

যেভাবে তৈরী ক'রতে হবে :— সরষের তেল কড়ায় চড়িয়ে নিস্ফেন হ'লে (গ্যাঁজা

ম'রে গেলে) ঐ সিদ্ধ ক্বাথ তেলে মিশিয়ে নেড়ে নেড়ে পাক ক'রতে হবে, জলটা শুকিয়ে গেলে কড়াইয়ের তলায় একটু চিট্‌চিটে আঠার মত জড়িয়ে যাবে, সেই সময় নামাতে হবে। পরিমাণ হ'লো—যতটা তেল তার ৪ গুণ গাছে-মূলে, আর গাছের ৮ গুণ জল দিয়ে ক্বাথ ক'রতে হবে, অবশিষ্ট থাকবে জলের চতুর্থাংশ অর্থাৎ সিকি ভাগ।

অপরাজিতা লিখতে ব'সে তার শেষ পর্যায়ে অপরাজিতা বিদ্যাকে আমি আপনাদের পরিবেশন ক'রতে পারলাম না, যেহেতু আমার পূর্বসূরিগণের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান আহরণ ক'রতে পারিনি; তাই এ থেকে স'রে এসে এই লতাকে জড়িয়ে ধ'রে আমার বক্তব্য রেখে গেলাম, ভবিষ্যে যাঁরা আসছেন তাঁদের জন্যে।

এখন দেখা যাচ্ছে, বৈদিক যুগের পরেও বহু ক্ষেত্রে রোগ প্রতিকারে এই লতা গাছটিকে আভ্যন্তর ও বাহ্য প্রয়োগে ব্যবহার করা হ'য়েছে। এখনও এ নিয়ে গবেষণার বিষয় যে নেই, তা বলা যায় না। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি—পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মতে গলগণ্ড রোগ (Goitre) থায়রয়েড্ গ্লাণ্ডের বৃদ্ধিতে সৃষ্টি হয়, অবশ্য এই গ্লাণ্ডের বিকারে বহু রোগ হ'য়ে থাকে। এক্ষেত্রে অপরাজিতা মূল সেবনের উপযোগিতা কতটুকু আর তার সঙ্গে ঘৃত সহযোগের সার্থকতাই বা কি, এটাও সন্ধানীয়। বর্তমানে এ মন্তব্য কি আমার প্রাপ্য নয়—"গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল!"

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Fatty acids viz., oleic acid, limoleic acid, myristic acid, palmitic acid, stearic acid. (b) Sterol viz., gamasitosterol. (c) Fixed oil. (d) A bitter resinous principle. (e) Tannin.

শৃঙ্গাটক (পানিফল)

আচ্ছা, আপনিও তো জানেন—শৃঙ্গ অর্থে শিং. ভাষাতত্ত্ববিদেরা কাছে এই শিংয়ের গুঁতো খেতে খেতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে হয় দেখুন—প্রথম হ'লো **ঋষ্যশৃঙ্গের** দ্বারা **যজ্ঞের** আয়োজন ক'রে তাঁর সেই যজ্ঞের চরু ভক্ষণ ক'রে দশরথের তিন পত্নীর গর্ভে চারটি পুত্র জন্মেছিলেন। আবার সেই দশরথপত্নী কৌশল্যার পুত্র রাঘব (রাম) **শৃঙ্গবের** পুরীতে উপনীত হ'য়েছিলেন (ঐতিহাসিকদের মতে আধুনিক মুর্জাপুরের নিকটবর্তী একটি পার্বতীয় দেশে), এখানে একটি পর্বতের সানুদেশই বক্তব্য।

তারপর মহাভারতের যুগে এসে দেখা যাচ্ছে—শমীক মুনির পুত্র **শৃঙ্গীর** দ্বারা রাজা পরীক্ষিত অভিশপ্ত হ'য়ে প্রাণত্যাগ করেন। এটা আছে মহাভারতের ১।৫০ শ্লোকে।

আবার সেই মহাভারতের কথাই বলি—ভক্ত কবির চোখে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের রূপ যেন মূর্তিমান **শৃঙ্গার** রস. অর্থাৎ ছয়টি রসের আদি রস যে শৃঙ্গার (কাম অথবা কামনা) তারই প্রকট মূর্তি শ্রীকৃষ্ণ।

সামাজিক চিত্র আঁকতে গিয়ে আবার পণ্ডিত-কবির কলমে বেরোয়—তিনি কামিনীর ভ্রূলতার **শৃঙ্গের** দ্বারা মোহিত হ'য়ে স্বজন-বান্ধব ত্যাগ ক'রে গিয়েছেন। এখানে শৃঙ্গের অর্থ কোণ বা কোনা; যার প্রচলিত লোককথা হ'লো 'চোখ মারা'। এদিকে বাৎসায়নের কামসূত্র ঘাঁটলে সেখানে পাওয়া যাবে—'মন্মথের **শৃঙ্গই** যুবক-যুবতীকে রসাবিষ্ট ক'রে তোলে, এ যেন জীবদেহে প্রকৃতির দেওয়া চুম্বক। আবার সেই শৃঙ্গার যখন পরিণত বয়সের পণ্ডিতের মুখে চুট্‌কীর আকারে বেরোয়, সেটা হয়—তিনি সর্বদাই নিজের অঙ্গকে শৃঙ্গার ক'রে তবে বাইরে আসেন। এখানকার নির্গলিতার্থ হ'লো—তিনি সেজেগুজে বাইরে আসেন। চাণক্যের কূটনীতি যখন প'ড়বেন, তখন

দেখবেন শৃঙ্গী ও নখী সর্বদাই অবিশ্বাস্য; তাই তো প্রবাদ আছে—দাঁতাল, মাতাল আর শিংএ—এদের বিশ্বাস ক'রতে নেই।

এইবার কবিরাজের ঘরের শৃঙ্গের বেসাতি দেখুন—

(১) শৃঙ্গবের চূর্ণ ও মধু সহ ঔষধ সেব্য (এখানে শৃঙ্গবের হলো শুংক আদা অর্থাৎ শুঠ চূর্ণ);

(২) কর্কট শৃঙ্গীর চূর্ণের দ্বারা হাঁপানি উপশমিত হয়, যাকে চলতি কথায় কাঁকড়াশৃঙ্গী বলা হয়;

(৩) ভয়াবহ একটি কন্দবিষের নামও তো শৃঙ্গীবিষ (একোনাইট্);
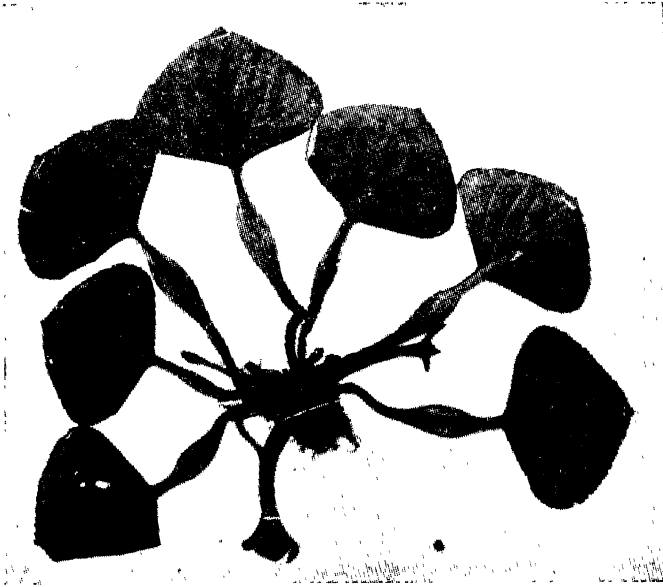
(৪) মৎস্য শৃঙ্গবিষে (শিঙি বা কানমাগুর মাছের কাঁটায়) আহত ব্যক্তিকে প্রথমে শল্যশাস্ত্রের চিকিৎসাই বিধেয়;

(৫) শৃঙ্গাটকের লপ্সিকা যেমনি হৃদ্য অর্থাৎ হৃদ্‌বলকারক, তেমনি পুষ্টি-কারক। এখানকার বক্তব্য হ'লো—শুকনো পানিফলের গুঁড়োর হালুয়া সুস্বাদু ও পুষ্টিকর।

এমনিভাবে কতই উদাহরণ র'য়েছে আমাদের ভারতীয় গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠাগুলিতে এই শৃঙ্গকে নিয়ে। তাই প্রথমেই ব'লেছি শিংয়ের গুঁতো।

এখন প্রশ্ন হ'লো—একটি শব্দের পরিবেশনার চাতুর্যে যদি তার ভাবরূপ এইভাবে বদলায়, তাহলে কি তার বাস্তব অর্থ কিছু নেই?

হ্যাঁ, আছে বৈকি—বৈদিক অভিধান যাস্ক দেখুন, তিনি ব'লেছেন—

আত্মানং প্রাধান্যেন প্রকাশয়তি যঃ স শৃঙ্গঃ

—অর্থাৎ নিজেকে প্রধানভাবে যে প্রকাশ করে, তারই নাম শৃঙ্গ। আরও পরিষ্কার ক'রে বলা যায় যে, সে নিজে মূক (বোবা) থাকে কিন্তু আত্মপ্রাধান্য ব্যক্ত ক'রতে পারে যে মুদ্রায় বা যে আকার-প্রকারে, তাকেই বলা হয় শৃঙ্গ; তাই আমাদের হিমগিরি উন্নতশির, গম্ভীর অথচ মূক, তাই সে গৌরীশৃঙ্গ, অতএব শৃঙ্গ শুধু শিংই নয়।

এই নিবন্ধে যে শৃঙ্গ নিয়ে আলোচনা হ'চ্ছে, সেইটিকে অথর্ববেদ কোন্ চোখে দেখেছেন, সেইটাই বলছি—

আক্রম্য বারি পৃথিবীং শৈশিরং পলাশৈঃ ইচ্ছন্ রুচা ত্বম্।
ভূম্যা বৃত্ত্বায় নো ব্রূহি শৃঙ্গাট সর্বা বিধুনোতি নিচিকীয়তে।
(অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ১৫২।১৭।২৬)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

ত্বং শৃঙ্গাটোঽসি শৃঙ্গং=প্রাধান্যং অটতি ইতি স্বার্থে কন্। বারি পৃথিবীংচ আক্রম্য পলাশৈঃ ব্যাপ্তিং কুর্বন্ প্রসরসি=ইচ্ছসি আত্মপ্রাধান্যং, অতঃ শৃঙ্গাটঃ। ত্বং রুচা চ পলাশমিব আত্মানং গোপায়সি, শৈশিরং=মাঘ-ফাল্গুন মাসদ্বয়ে বৃত্ত্বায়=বৃতু বর্ত্তনে ভূম্যা=ভূমেঃ প্রদেশং মৃদং=ভূমিং নিচিকীয় পশ্যাতি, বিধুনোতি ত্বং মূলং কথং ব্রূহি।

এই সূক্তটির অর্থ হ'লো—তুমি শৃঙ্গাট অর্থাৎ আত্মপ্রাধান্য প্রকাশ ক'রে ভ্রমণ কর। বারি ও পৃথিবীকে আক্রমণ ক'রে তোমার পত্রের দ্বারা নিজেকে ব্যাপ্ত ক'রতে ইচ্ছা কর। তোমার কান্তিও পত্রের বর্ণসদৃশ, তাই পত্রের দ্বারা নিজেকে আবৃত ক'রতে ইচ্ছা কর, শৈশিরে অর্থাৎ মাঘ-ফাল্গুনের আবর্তন এলে ভূমির প্রদেশকে স্পর্শ ক'রতে এবং মূলকে কম্পিত ক'রতে কেন বল?

বৈদ্যকের নথি

সংহিতাকারগণ ভৈষজ্যনামের আদি উৎস বেদের এই নামটির সঙ্গে তার গুণগত পরিচয়ের মধ্যেই তার দার্শনিক, প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন।

এই জলশায়ী ও জলসংসারী ভেষজটি অন্যান্য ভৌম ভৈষজ্যের মত কোথাও যে আত্মগুণ প্রকাশ ক'রছে, সে অনুসন্ধানের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে একটি শব্দে—সেটি হ'লো শৈশিরে অর্থাৎ মাঘ-ফাল্গুনে এই পানিফলের গাছের নিচের সূক্ষ্ম তন্তুগুলি ভূমিগ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করে—এটি তার বংশ রক্ষা করার জন্য প্রকৃতির ইঙ্গিত।

চরক সংহিতার মধুর রসপ্রধান ভেষজ বিচিন্তায় যেসব দ্রব্যের নাম লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে অর্থাৎ বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে, শৃঙ্গাটক বা পানিফল তাদের আদি শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে।

তারপর তার ভৈষজ্যশক্তি কোথায় কোথায় আত্মপ্রকাশ করে, তারও একটা রূপ পাওয়া যায় ক্ষতক্ষীণ (Haemoptysis) রোগে (চিকিৎসাস্থান ১৬ অধ্যায়), কাসরোগে (২২ অধ্যায়) এবং ঐ কাসরোগেই লেহ প্রস্তুতের ভেষজে।

তারপর সুশ্রুতের শারীরস্থানে এবং চিকিৎসাস্থানের তৃতীয় অধ্যায়েও এর উল্লেখ। কিন্তু বিস্ময়ের কথা—রাজনিঘণ্টুকারের (১৮ দশকের গ্রন্থ) গবেষণায় দেখা যায়—চরক সুশ্রুতের ভৈষজ্য-সমীক্ষার সঙ্গে এটির গুণাকৃতির সর্বাংশে মিল নেই অথচ অনেক নূতন তথ্য দেওয়া হ'য়েছে; এটি শ্লেষ্মাকর ব'লেই বর্ণনা করা হ'য়েছে। মনে হয় এটি অপক্কাবস্থায় শ্লেষ্মাকর হওয়াই সম্ভব, কারণ এর জন্মকালটি ভাদ্রের মধ্যকালেই যখন।

পরিচিতি

শৃঙ্গাটকের ভাষানাম পানিফল। জলেই ফল হয় ব'লে এর নাম পানিফল; যদিও দক্ষিণ ভারত ছাড়া সর্বভারতীয় ভাষানাম প্রায় একই, তবে অনেকটা সংস্কৃত-নির্ভর শিঙ্গাড়াও বলে কিন্তু বৈদিক ও সংহিতাগত নাম শৃঙ্গাট বা শৃঙ্গাটক। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের বহু জলাশয় এবং ঝিলে চাষ করা হয়। উড়িষ্যার অঞ্চলবিশেষে এটিকে শিঙ্গাড়া বলে।

এটি একটি ভাসমান বিস্তৃত জলজ উদ্ভিদ, এই জল-সঞ্চারী শৈবাল-সদৃশ (শেওলা) ভেষজগুলির পাতা ২/৩ ইঞ্চি চওড়া এবং ৩/৪ ইঞ্চি লম্বা হয়, পাতার কিনারাগুলি করাতের ন্যায় বড় দাঁতবিশিষ্ট। পাতার বোঁটা ৪-৬ ইঞ্চি এবং পশমময়। ফলগুলি ত্রিকোণাকার কিন্তু মোটা। এই ফলের দুই কোণে দুটি ধারালো কাঁটা হয়। ভাদ্র-আশ্বিন থেকে ফল হ'তে শুরু হয় এবং মাঘ-ফাল্গুন পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়, তারপর পুরনো পাতা প'চে যেতে থাকে। এটির বোটানিকাল্ নাম Trapa bispinosa Roxb., ফ্যামিলি Onagraceae.

এই গণের আর একটি প্রজাতি আছে—এটি প্রধানতঃ ছোটনাগপুর অঞ্চলে দেখা যায়, এর পাতাগুলি আকারে ছোট, এই গাছের ফলগুলির চারকোণে চারটি কাঁটা আছে, তার মধ্যে দুটি কাঁটা অপেক্ষাকৃত ছোট, ফল ঐ এক সময়েই হয়। এটির বোটানিকাল্ নাম Trapa incisa. ঔষধার্থে ব্যবহার হয় ফল ও গাছ।

রোগ প্রতিকারে

এটি প্রধানভাবে কাজ করে রসবহ স্রোতের উপর।

১। **পেটের দোষ ও তার সঙ্গে প্রমেহ:—** এই ক্ষেত্রটি একটু বিচিত্র, এর সঙ্গে প্রমেহ থাকলেই মল-সঙ্কোচ হ'য়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে শুকনো (শুষ্ক) পানিফলের শাঁস গুঁড়ো ক'রে ছে'কে নিয়ে, সেটা এক বা দুই চা-চামচ, সিকি কাপ গরম দুধে গুলে সকালে ও বৈকালে দু'বার খেলে প্রথমে পেটের দোষটা সেরে যাবে, তারপর মেহরোগটা আস্তে আস্তে নিরাময় হবে।

২। **পিত্তের জ্বালায়:—** শরৎকালে যাঁরা পিত্তের জ্বালা অনুভব করেন—এ'দের দেখা যায় শ্লেষ্মাপ্রধান প্রকৃতি এবং পিত্ত তার অনুষঙ্গী। এইসব লোকের শরৎকালে এই উপসর্গটা দেখা দেয়, এক্ষেত্রে পানিফল বেটে ৫/৭ গ্রাম ক'রে দু'বেলা খেতে হবে। আর স্নানের পূর্বে পানিফল বাটা গায়ে মেখে স্নান ক'রতে হবে। এর দ্বারা ঐ পিত্তের দাহটা (গা-হাত-পা জ্বালা) ক'মে যাবে।

৩। **শরৎকালের আমাশায়:—** অনেকের দেখা যায়, শ্রাবণ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত

পেটটা নরম হয় এবং মলের সংগে মাঝে মাঝে রক্তও পড়ে। এক্ষেত্রে শুষ্ক পানিফলের শাঁস ১৫/২০ গ্রাম একটু থেঁতো ক'রে ২ কাপ ঠাণ্ডা জলে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে, সেটাকে ছেঁকে, সকাল থেকে ৩/৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই জলটা খেতে হয়—এর দ্বারা ঐ দাস্তটা পাতলা আর থাকে না।

৪। **ভ্রম রোগেঃ—** অনেক সময় মনে এসেও স্মৃতিতে ধরা যাচ্ছে না, আবার এও দেখা যায়—কোথায় কি রাখছেন সেটা মনে থাকছে না, এ'দের ক্ষেত্রে শুষ্ক পানিফলের শাঁস সুজির মত গুঁড়ো ক'রে, ঘিয়ে ভেজে, দুধ চিনি দিয়ে হালুয়ার মত রান্না ক'রে প্রত্যহ খাওয়া, এর দ্বারা ঐ ভুলে যাওয়াটা আর থাকবে না, তবে এটাও ঠিক যে, ৭২ বৎসর বয়সের পর এটা হওয়া স্বাভাবিক। তার পূর্বে হ'লেই চিকিৎসার ক্ষেত্র।

৫। **আগন্তুক শোথেঃ—** একে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এলার্জি ব'লে থাকেন। আয়ুর্বেদ মতে এই রোগটির হেতু হ'লো—কোন বিশিষ্ট দ্রব্য খেলে বা স্পর্শ ক'রলে রসবহ স্রোত স্ফীত হয়, যার জন্য শরীরের বিভিন্ন স্থানে কি-বা বাহ্য এবং কি-বা আভ্যন্তর শোথের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে কাঁচা পানিফল যতদিন পাওয়া যায়, সে কয়টা দিন কাঁচা খাওয়াই ভাল, তারপর শুকনো (শুষ্ক) পানিফলের শাঁসকে গুঁড়ো ক'রে গমের সংগে মিশিয়ে রুটি ক'রে খেলে এটার প্রবণতা চ'লে যায়।

৬। **রমণে অতৃপ্তিঃ—** যাকে বলে 'ফুললো আর ম'লো', সেইরকম। তৃপ্তি কারুরই হ'লো না—এই যে অসহায় অবস্থা, এক্ষেত্রে কাঁচা পানিফল বেটে অল্প চিনি মিশিয়ে লপ্‌সি ক'রে খাওয়া—এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

বাহ্য প্রয়োগ

৭। **মূত্ররোধেঃ—** অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বায়ুতে অনেক সময় প্রস্রাব বন্ধ হ'য়ে গেল—সেক্ষেত্রে পানিফল বেটে বস্তির (bladder) উপরটায় প্রলেপ দিলে প্রায় ক্ষেত্রেই প্রস্রাব হ'য়ে যায়। তবে উপরিউক্ত কারণটির চিকিৎসা চিকিৎসকের এক্তিয়ারে।

এই ভেষজটির সমীক্ষার উপসংহারে একটি কথা মনে আসছে—এক ধরনের চরিত্রের লোক পাওয়া যায়—যাকে আমরা চলতি ভাষায় ব'লে থাকি "মিঠে সন্নিপাত"। এ'দের ভিতরের আগুনের উষ্মা বাইরে বোঝা যায় না, মনে হয় বাইরে নিরুত্তাপ। সেই রকম উদ্ভিদ জগতেও আছে; তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই পানিফল। এর জন্ম কর্ম ও বৃদ্ধি জলে কিন্তু সে উষ্ণগুণধর্মী। জীবজগতের মধ্যে কাছিম বা কচ্ছপ, যার সংস্কৃত নাম 'কূর্ম'—জলে তার বসবাস কিন্তু তার মাংস খুবই উষ্ণধর্মী, যার জন্য বাত রোগে এটি খাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা।

এখন এটির বিজ্ঞান কোথায়?

যেহেতু এই দুটি দ্রব্যে স্নেহপদার্থ নেই ব'ললেই হয়, আর স্নেহ-সৃষ্টিতে বাধা তার উষ্ণতা, তাই জলেই তার বাড়-বৃদ্ধি।

পারিজাত

কি লোক-সাহিত্যে আর কি সংস্কৃত-সাহিত্যে, এই পারিজাত বহু উপমা সৃষ্টি করিয়েছে। তার মধ্যে লোক-প্রচলিত একটা উপমা, যেমন—মাদার গাছে গা ঘ'ষতে গিয়েছিলে কেন? যেমন গিয়েছ এখন তাল সামলাও।

আসলে এই গাছের পাতা ছাড়া সর্বাঙ্গেই ঘন কাঁটা, যদিও সেগুলি লম্বা নয়। এখন পারিজাতের এক নাম তো 'মন্দার', সেইটাই অপভ্রংশ হ'য়ে মাদার হ'য়েছে। এটা বাগানের বেড়ার জীবন্ত খুঁটির কাজ করে।

আমার কৈশোর জীবনে এর আস্বাদ যে পাইনি তা নয়।

যাক, উপমার ক্ষেত্রে এই পারিজাতেরও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল, যেমন—

কবয়ঃ কালিদাসাদ্যা ভবভূতির্মহাকবিঃ।

অর্থাৎ কালিদাস প্রভৃতিকে কবির পর্যায়ে ধরা যেতে পারে, আর মহাকবি আখ্যা ভবভূতিকেই দেওয়া যায়। কালিদাসের গুণমুগ্ধ কবিকুল তখনই উপমা দিয়ে ব'লে-ছিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, দৃষ্টিটি খাঁটি, এই যেমন—

'তরবঃ পারিজাতাদ্যাঃ স্নুহীবৃক্ষো মহাতরুঃ।'

অর্থাৎ পারিজাতও যেমন তরু (বৃক্ষ) মনসাও (স্নুহী) তেমনি মহাতরু।

কথাটা বেশ ব্যঙ্গকর, কারণ পারিজাত কুসুমের শোভা থাকলেও বৃক্ষের সারবত্তা কিছুই নেই। এরই সমপর্যায়ের মনসা গাছের সারবত্তা তো নেইই, অধিকন্তু তার ফুলও অসুন্দর। এই পারিজাত ফুলের গঠন-বৈচিত্র্য এবং তার রং এতই মনোহর যে, দেবতাদের উপাখ্যানের মধ্যেও এর উল্লেখ এবং পরবর্তীকালে মহাভারতের ও ভাগবতের মধ্যেও

এ নিয়ে একটি উপাখ্যানের বিষয়বস্তু আছে; এটি পাওয়া যায় মহাভারতের ১/৮ ও ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে, হরিবংশের ১৩৪ অধ্যায়ে। এই পারিজাতকে উপলক্ষ্য ক'রে একটি ছোটখাটো লড়াই যে হয়নি তা নয়, সেটা হ'লো—দ্বারকার অধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের (বর্তমান আসাম) অধিপতির সংগ্রাম, অর্থাৎ পশ্চিম ভারতের রাজার সঙ্গে পূর্ব ভারতের রাজার সংগ্রাম। অবশ্য হেতুটা খুবই তুচ্ছ, সেটা হ'লো—এই পারিজাত কুসুমকে নিয়ে; কোন এক সময় ইন্দ্রপ্রদত্ত একটি

পারিজাত কুসুমের মালা নিয়ে নারদ এসেছিলেন দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ ক'রতে; তিনি সেটি পেয়েই নারদের সম্মুখেই রুক্মিণীর হাতে দেন, অর্থাৎ প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ সেই মালাটি প্রিয়তমাকে অর্পণ করেন। এই দৃশ্য দেখেই নারদ (সে-যুগের রিপোর্টার সম্প্রদায়ের নাম নাকি নারদ ছিল) সত্যভামাকে সেকথা বলেন। বিদর্ভ রাজ-কুমারী (বর্তমান মধ্য ভারত) সত্যভামা এই কথা শুনে ক্ষুব্ধা হন, অভিমানে তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়; শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, নারদ নিশ্চয়ই নীরব থাকবে না,

রুক্মিণীকে পারিজাত অর্পণের কথা সত্যভামাকে ব'লবেই। শ্রীকৃষ্ণও দ্রুত সত্যভামার সান্নিধ্যে গিয়েছিলেন কিন্তু নারদ তখন স'রে পড়েছেন; এই ব্যাপারে সত্যভামার মন পাথরের মত ভারাক্রান্ত, অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হ'লেন যে, এ পারিজাত যেখানেই থাক, ওকে এনে তোমার উপবনে রোপণ ক'রবই। সেই সূত্রেরই পরিণতি বিরাট সংগ্রাম, কারণ ঐ কুসুম ছিল পূর্ব ভারতের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে, আবার এদিকে তিনি ছিলেন কৃষ্ণবিরোধী।

জানি না নিবন্ধোক্ত পারিজাত বৃক্ষটি সেই গ্রহান্তরীয় স্বর্গের পারিজাত কিনা, তবে দেখা যাচ্ছে ভারতের বৈদ্যককুল আর একটি তথ্যের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ ক'রেছেন যে, এই বৃক্ষটি পূর্ব ভারতে তো হয়ই, আর দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতেও পাওয়া যায়। তাই এই বৃক্ষটির উল্লেখ অথর্ববেদে দেখা যায়নি। আর চরক সংহিতায়ও এই নামে কোন বনৌষধির উল্লেখ দেখা যায় না, যেহেতু চরক সংহিতায় অনুশীলিত হ'য়েছে মুখ্যতঃ অথর্ববেদিক ভৈষজ্যকল্পকে অবলম্বন ক'রে; চরকে না পাওয়ার এও একটি হেতু হ'তে পারে, আর হয়তো বা অন্য নামে এই ভেষজ বৃক্ষকে উপস্থাপিত করা হ'য়েছে; কিন্তু দক্ষিণ ভারতের নাগার্জুন সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিসংস্কৃত সুশ্রুত সংহিতায় এর উল্লেখ আছে।

সন্ধান আর কোথায়?

ষষ্ঠ শতাব্দীর অমরকোষে (অভিধান) পারিজাতকে বলা হ'য়েছে দেবতরু এবং অন্যান্য অভিধানকারগণ দেবতরুর সংখ্যা ব'লেছেন পাঁচটি, আবার সেই পাঁচটির নাম নিয়েও মতভেদ আছে—**শব্দরত্নাবলী** অভিধানে বলা হ'য়েছে অর্ক, পারিজাত, চন্দন, কল্পবৃক্ষ ও সন্তানক; আবার **শব্দমুক্তাবলীতে** (এটাও অভিধান) বলা হ'য়েছে মন্দার, চৈত্যবৃক্ষ, লবঙ্গ, চন্দন ও সন্তানক। যদিও পুরাণগুলিতে পারিজাতকে দেবতরু বলা হ'য়েছে, তবুও বলা যায় এটির উল্লেখ অথর্ববেদিক উপাঙ্গ সংহিতায় অর্থাৎ উপবর্হণ সংহিতায় ১১/২৩ সূক্তে বলা হয়েছে—

> 'ত্বচা তীর্ণং ভদ্রং সুপুষ্পং যাতুধানান্ পুষ্যং নির্মোকম্।
> মাসু ভিখা মা সুরিষো অহরহঃ প্রয়াবং রিষাম্।'

এই সংহিতার ভাষ্যকার উবট্ ব'লেছেন—

> ত্বচা তীর্ণং বিদীর্ণং চেৎ যাতুধানান্ অপাকরোসি, ত্বং পুষ্যং= পুষ্য নক্ষত্রে=চন্দ্রযুক্তে সুপুষ্পং=শোভনং ভবসি, তদাভদ্রং= পারিভদ্রং=পরিতোভয়ং দূরী করোসি; পৌরাণিকাস্তু পারিণি সমুদ্রে ভদ্রং=জাতং পারিজাতং বিরলপত্রং। মা সু=সুতরাং সু= সুষ্ঠু রিষঃ=হিংসা ভব=মা বিনশস্যভব, অহরহঃ=অপ্রমাদেন প্রযাবং=মা প্রমাদঃ ভবঃ, ত্বাং রিষাম পোষণং কুর্মঃ।

এই সূক্তটির অনুবাদ হ'লো—তোমার ত্বক বিদীর্ণ হ'লে তার রসে যাতুধানগুলি দূর হয়। তুমি পুষ্য নক্ষত্র-সমন্বিত চন্দ্রে সুপুষ্প হও, তখন তোমার পারিভদ্র নামটির অর্থ হ'লো যে তুমি সর্বতোভাবে ভয় দূর কর। পৌরাণিকগণ তোমাকে জলজাত

বলেন, তাই তাঁরা পারিজাত নাম দেন, এটা সমীচীন নয়। পুষ্পোদয়ে তোমার দেহ বিরলপত্র হয়, তোমাকে অহরহ পোষণ করি, বিনাশশীল হইও না।

বৈদ্যকের নথি

উপবর্হণের এই সূক্তিকে সুশ্রুত সম্প্রদায় অনুসরণ ক'রেছেন, কিন্তু চরক সম্প্রদায়ের গ্রন্থ চরক সংহিতায় এর ভৈষজ্যগুণের কোন উল্লেখ দেখা যায় না; এমন কি চরক সংহিতার অনুগামী ধন্বন্তরী নিঘণ্টুতেও (বনৌষধির গ্রন্থ) এর উল্লেখ না থাকলেও একাদশ শতকের চক্রদত্ত সংগ্রহে অববাহুক রোগে (বাতব্যাধি চিকিৎসা) এর মূলের রসের নস্য নিতে ব'লেছেন। সুশ্রুত সংহিতায় উদক মেহে এর মূলত্বকের ক্কাথ পান করার উপদেশ দেওয়া হ'য়েছে। তা ছাড়া পূতনা গ্রহে (পেঁচোয় পাওয়া) এর মূলের ক্কাথে স্নান করানোর উপদেশ দেওয়া হ'য়েছে; এ ভিন্ন হারীত সংহিতায় অধোগ রক্তপিত্তে বিরেচনার্থ পারিভদ্রের ও আমলকীর ক্কাথ পান করারও নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে।

পরিচিতি

গ্রাম-বাংলায় এ গাছকে বাগানের বেড়ার খুঁটির কাজের জন্য লাগানো হয়, এই গাছের বা ডালের গায়ে অল্প উঁচু ঘন ঘন কাঁটা আছে ব'লেই। এর ডালগুলি (শাখা) সরল, এগুলিকে ফাল্গুন-চৈত্রে কেটে নিয়ে মাটিতে বসালেই পুনরায় গাছে পরিণত হয়; এইভাবেই সে যেন বেড়ার জীবন্ত খুঁটি হ'য়ে থাকে। তাই গ্রাম-বাংলায় এর কদর বেশী, তবে ভারতের প্রায় সর্বত্রই এ গাছ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু এক এক অঞ্চলে এক একটি প্রজাতির গাছ বেশী দেখা যায়। বাংলায় বেড়ার কাজে যে প্রজাতিকে লাগানো হয়, সেইটারই ভৈষজ্যশক্তির বর্ণনা এখানে দেওয়া হ'লো।

এই গাছ ১৫/২০ ফুটের বেশী যেমন উঁচুও হয় না, আবার তেমনি ঝোপ-ঝাড়ও হয় না। ডাল থেকে ৭/৮ ইঞ্চি লম্বা পাতার ডাঁটা হয়, তাইতে দু'পাশে দু'টি ও মাঝখানে একটি—এই তিনটি পাতা হয়। আকারে ও বিন্যাসে অনেকটা পলাশের (Butea monosperma) ছোট পাতার গড়নের; তবে তার থেকে পাতলা।

একে বাংলায় বলে পালতে বা পালধে মাদার, দেশ-গাঁয়ে বলে তে-প'লতে, হিন্দিভাষী অঞ্চলে বলে 'মান্দার' ফরহদ, আবার মেদিনীপুর অঞ্চলেও 'ফরৎ' বলে, উড়িষ্যার অঞ্চলবিশেষে এর নাম পালধুয়া।

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এ গাছ চিনতে কষ্ট হয় না, কারণ গাছের ডালে থাকে না একটিও পাতা, ডগায় শুধু লাল ফুল, তার গড়নও চমৎকার। এ গাছে ফুলের পরে গুচ্ছবদ্ধ হ'য়ে শুঁটি হয়। এর মধ্যেই শিমের মত বীজ থাকলেও আকারে ছোট। বর্ষার প্রারম্ভেই আবার গাছে পাতা গজায়। এই গাছটির বোটানিকাল নাম Erythrina Variegata Linn., ফ্যামিলি Papilionaceae. ঔষধার্থে ব্যবহার হয় মূলত্বকের ক্কাথ ও পত্র স্বরস।

রোগ প্রতিকারে

প্রথমে জ্ঞাতব্য বিষয় হ'লো—এই পারিভদ্র মুখ্যতঃ রক্তবহ স্রোতের বিকারজনিত রোগে উপকার দর্শায়। তবে রসবহ স্রোত দূষিত হ'য়ে রক্তবহ স্রোত দূষিত হওয়াই

স্বাভাবিক, কিন্তু আগন্তুক কারণে রক্তবহ স্রোতও দূষিত হ'তে পারে, তবে পরে অন্যান্য স্রোতকেও দূষিত করে।

১। **উদক মেহে:—** এই মেহরোগে প্রস্রাবের পরিমাণ বেশী হয়, তবে একটু ঘোলাটে, অনেক সময় পিচ্ছিলও হয়, কিন্তু প্রস্রাবে গন্ধ থাকে না। এ'দের আর একটি বাহ্য লক্ষণ হবে, তালু (মুখগহ্বরের উপরের অংশটা) শুষ্ক হ'তে থাকে। ক্লোম অর্থাৎ পিপাসার স্থানটাও শুষ্ক হ'তে থাকে। এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির আরও একটি বিশেষ লক্ষণ হবে—শোনা বা জানা কথা হঠাৎ মনে না আসা। তাঁদের ক্ষেত্রে ২ চা-চামচ এই গাছের ছালের রস ১ চা-চামচ মধু মিশিয়ে প্রত্যহ সকালে একবার করে খেতে হবে, যদি দেখা যায় উল্লেখযোগ্য উপকার হ'চ্ছে না, তখন দু'বেলা খেতে হবে। এটা সুশ্রুতের চিকিৎসাস্থানের ১১ অধ্যায়ে আছে।

২। **শিশুদের পুঁয়ে লাগায়:—** যাকে আমরা চলতি কথায় রিকেট্ বলি। এইসব শিশুর মুখ থাকবে টুলটুলে, কিন্তু শরীরের অন্যান্য অংশটা যেন পাকিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে গাছের মূলের ছালের রস ১০/১৫ ফোঁটা একটু দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। এটাও সুশ্রুত সংহিতার ব্যবস্থা, সেটা আছে উত্তরতন্ত্রের ৩২ অধ্যায়ে।

৩। **ক্রিমি রোগে:—** এই পারিভদ্র প্রধানভাবে কাজ করে রক্তজ ক্রিমির ক্ষেত্রে। এই রক্তজক্রিমি বহুরোগ সৃষ্টির কারণ হয়। এ ভিন্ন পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মতেও E. N. T. এলাকায় বহু রোগের সৃষ্টি হয়। এটার মধ্যে অনেকগুলি রক্তজক্রিমির উপদ্রবে সৃষ্ট, যেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ শিরঃপীড়ায় কাতর, সেক্ষেত্রে এই পারিভদ্রের পাতার রস ৪ চা-চামচ একটু গরম ক'রে খাওয়াতে হবে, তবে বৃদ্ধ বৈদ্যগণ সাধারণ ক্রিমিতেও এই রস ব্যবহার করেন। এটা সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রের ৫৪ অধ্যায়ে বলা আছে।

লোক ব্যবহার

৪। **ধাতু-দৌর্বল্যে:—** ধাতু-দৌর্বল্যের একটা উপসর্গ আছে—যাকে বলা যায় বিশিষ্ট লক্ষণ, এ'দের স্বপ্নদোষ হ'লে ভোরের দিকেই হবে, আর উত্তেজনা, সেটাও সেই ভোরবেলায়। এক্ষেত্রে এর পাতার রস ৩/৪ চা-চামচ একটু গরম ক'রে, সকালবেলা একটু দুধ মিশিয়ে, তার সঙ্গে দুই/এক দানা কর্পূর দিয়ে খেতে হবে। কর্পূর বেশী দিলে কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্য আসবে, তাই সামান্যই দিতে হয়, এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৫। **মধ্যকোষ্ঠ রোগে:—** এর বর্ণনা ক'রতে গেলে এইটাই ব'লতে হবে যে, ৪/৬টা সন্দেশ খেলেই কোষ্ঠবদ্ধতা এসে গেল, আবার একমুঠো বাদাম, কিস্‌মিস্ খেলো তো বেশী খুলে গেল, এই যাঁদের পেটের অবস্থা, তাঁদেরকে প্রাচীন বৈদ্যগণ ব'লেছেন—এ'রা মধ্যকোষ্ঠের রোগী। এ'দের ক্ষেত্রে এই গাছের পাতার রস এ-বেলা ২ চা-চামচ এবং ও-বেলা ২ চা-চামচ একটু গরম ক'রে জলসহ খেতে হবে, এর দ্বারা মধ্যকোষ্ঠের ত্রুটিটা থাকবে না। তবে এটা দেখা গেছে—এ'দের অর্শ থাকা অবশ্যম্ভাবী।

৬। **মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে** (Strangury):— এই কৃচ্ছ্রতার কারণ থাকে অন্য; যাকে বর্তমান যুগে বলা হ'চ্ছে বি-কোলাই ইন্‌ফেক্‌শন্। এর সঙ্গে একটু জ্বরও থাকে;

এক্ষেত্রে ঐ ক্রিমিই তো এই রোগের হেতু (যার জন্য এখন প্রস্রাব পরীক্ষা করা হয়), তাই পারিভদ্র পাতার রস ১ চা-চামচ অল্প জল মিশিয়ে একটু গরম ক'রে সকালের দিকে একবার ও বৈকালের দিকে একবার খাওয়া—এর দ্বারা ঐ ব্যাক্‌টিরিয়াগুলি অর্থাৎ ক্রিমিগুলি ধ্বংস হ'য়ে রোগ নিরাময় হবে।

৭। **ঋতু দর্শনেঃ—** খুবই অল্প বয়েস অথচ মাসিক হ'য়েছে; ভাল যে হয় তাও নয়, এদিকে শরীরে ভারবোধ, মাসিকের রক্ত একটু দেখা গেল, আবার বন্ধ হ'য়ে গেল, কিন্তু যন্ত্রণা খুবই হ'চ্ছে—এক্ষেত্রে পারিভদ্র পাতার রস ৩/৪ চা-চামচ একটু গরম ক'রে ঐ মাসিকের সময় অর্থাৎ চলাকালে ২/৩ দিন খেলে কোন কষ্ট থাকবে না। তবে এক মাসে সেরে না গেলেও ২/৩ মাসের মধ্যে ঐ যন্ত্রণাভোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

৮। **অকালে মাসিক বন্ধের উপদ্রবেঃ—** মাসিক ঋতু বন্ধ হওয়ার সময় হয়নি, অথচ মাসে মাসে অতিরিক্ত স্রাব হ'চ্ছে। সকল চিকিৎসকের অনুমান এটা বন্ধ হওয়ার পূর্ব লক্ষণ, কিন্তু এই অধিক স্রাব থাকবে না—যদি এই ঋতুকালে ৩/৪ দিন এই পারিভদ্র পাতার রস ২ চা-চামচ একটু গরম ক'রে প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে দু'বার খাওয়া যায়। এইভাবে ব্যবহার ক'রলে ২/৩ মাসের মধ্যে তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে; তবে স্বাভাবিকভাবে যখন বন্ধ হওয়ার তখন হবে।

৯। **মাসিক ঋতুর স্বল্প স্রাবেঃ—** ঋতু দর্শন হ'য়েছে বটে, কিন্তু স্রাব ভাল হয় না, তার সঙ্গে ছুঁচ-বেঁধানো যন্ত্রণা, (এ'রা কিন্তু প্রায়ই একটু কৃশ হয়) প্রতি মাসেই যন্ত্রণা-নিবারক কিছু ওষুধ খেতে হয়। এক্ষেত্রে এর পাতার রস ২ চা-চামচ ক'রে ঐ তিন/চার দিন খেতে হয়—এর দ্বারা ঐ যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, তবে স্রাব ভাল হওয়া না হওয়া—সেটা নির্ভর করে শরীর ভাল-মন্দের উপরে। এসব রোগিণীর প্রায়ই অর্শ থাকে দেখা যায়। তবে সেটা ভিতরের আবর্তনীতে, মলদ্বারের মুখের কাছটায় নয়।

১০। **স্তন্যহীনতায়ঃ—** সবই ভরপুর, কিন্তু দুধের অভাবে সন্তান হা হা ক'রছে—এক্ষেত্রে পারিভদ্রের পাতার রস ২ চা-চামচ আর ঝুনো নারকোলের দুধ ৪/৫ চা-চামচ একসঙ্গে মিশিয়ে, কয়েকদিন সকালের দিকে খেলে স্তন্যের অভাব থাকবে না।

১১। **অববাহুক রোগে** (Stiffness of ankle joint) :— হাত ঘোরাতেও পারা যাচ্ছে না, আবার উঁচুতেও তোলা যাচ্ছে না, আর পিঠ চুলকোবারও উপায় নেই—এই হ'লো অববাহুক রোগ। এই রোগে পারিভদ্র গাছের মূলের ছালের রস শায়িত অবস্থায় নাকে (নাসাছিদ্রে) টোপ্ ফেলা, সেটা যাতে গলা দিয়ে নেমে যায়, সেইটা ক'রতে হবে। এই রকম অন্ততঃ ৩০/৪০ ফোঁটা প্রত্যহ নাসাপান ক'রলে কয়েকদিনের মধ্যেই অববাহুক রোগ উপশম হ'চ্ছে বোঝা যাবে।

১২। **নতুন (নূতন) জ্বরেঃ—** চোখ-মুখ ঝাম্‌রে জ্বর; যাকে বলা হয় শরীর রসস্থ হ'য়ে জ্বর হ'য়েছে—সেক্ষেত্রে এই গাছের ছালের রস এক চা-চামচ একটু জল মিশিয়ে ও গরম ক'রে সকালে ও বৈকালে দুইবার একটু মধু মিশিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা দু'দিনের মধ্যে জ্বর ছেড়ে যাবে।

১৩। **রক্তামাশয়েঃ—** এই গাছের ছালের রস এক বা দুই চা-চামচ একটু গরম

ক'রে ২/৪ চা-চামচ দুধ মিশিয়ে ২/৩ দিন খেলে রক্তামাশয় সেরে যাবে।

১৪। **বাঘি হ'লেঃ—** কু'চকির এদিক বা ওদিক যে দিকেই হোক, আর যে কারণেই হোক, পারিভদ্রের পাতা বেটে, অল্প গরম ক'রে ওখানে লাগাতে হবে। দুই দিনের মধ্যে ওর টাটানি ও ব্যথাটাও চ'লে যাবে।

এই নিবন্ধের ছেদ টানতে গিয়ে ভাবছি—আমার কৈশোরে যে গাছের ডালটি পিঠে প'ড়েছিলো, অর্ধ শতাব্দীর পর আজ সেইটা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে এইটাই উপলব্ধ হ'লো—ছিলো স্বর্গে, আনলেন নারদ এবং দিলেন শ্রীকৃষ্ণকে; আবার তাকেই উপলক্ষ্য ক'রে রণ, না জানি কি জিনিস? সাধারণের কাছে এ শুধু গল্প নয়—গাল-গল্প, এ যেন মূষিকের বিষ্ঠায় পর্বত সৃষ্টি। না, তা নয়, সেটা বৈদ্যকের চোখে মহৎ কল্যাণের উপাদান দেখেই এসব উপাখ্যানের সৃষ্টি তার উপযোগিতাকে কেন্দ্র ক'রে; অবশ্য যে যুগের যে রেওয়াজ।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Poisonous alkaloids. (b) Saponin. (c) Waxy materials.

তম্তুভ (সর্ষপ)

যাকে নিয়ে আলোচনা ক'রতে ব'সেছি, সে বস্তুটির প্রকৃতি অপেক্ষা তার ব্যবহার পরিচয়টা মধুর। এমনি এক জিনিস—যাকে কেন্দ্র ক'রে কতই না উপমা সৃষ্টি ক'রেছেন কবিকুল থেকে আরম্ভ ক'রে গোপাল ভাঁড় পর্যন্ত।

আচ্ছা, কোন ফুলকে দেখলে মানুষের চোখ তো পীড়িত হয় না, কিন্তু এই গাছের ফুল চক্ষে তো বটেই, মানসচক্ষেরও উপমা সৃষ্টি-করা লোক-প্রচলিত দৃষ্টান্ত "চোখে সরষের ফুল দেখা"।

এই কথাটার তাৎপর্য কিন্তু বৈদ্যকের নথিতে গাঁথা হ'য়ে আছে, সেটা হ'লো বিরাট বিরাট সরষের ক্ষেতে যখন এই ফুল ফোটে, তার ওপর রোদ (রৌদ্র) প'ড়লে
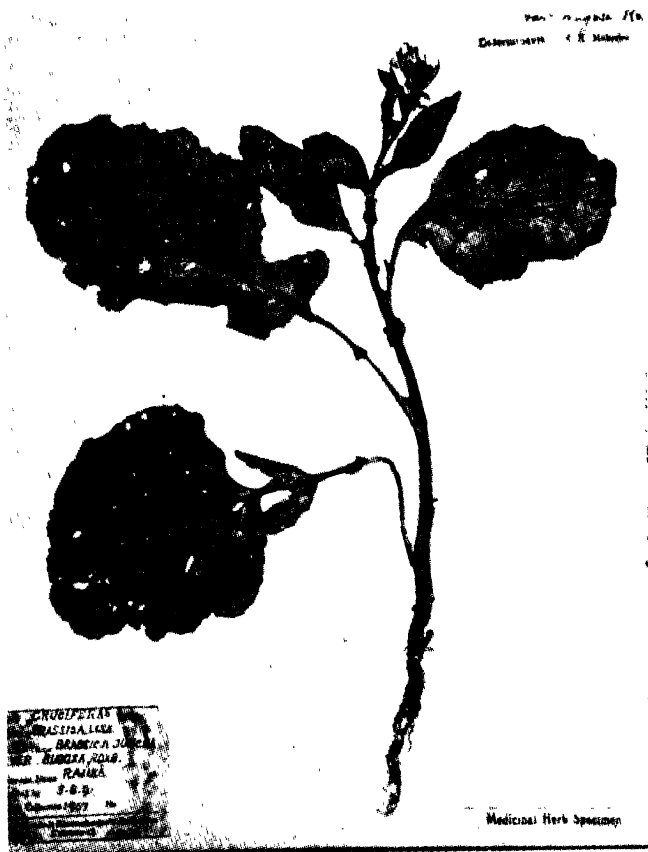
তার হ'লদে রংয়ের (পিত্তের সমধর্মী রং) সমতায় আলোচক পিত্তের আধিক্য ঘটে সেটির আধারস্বরূপ চক্ষের অক্ষিগোলকবিন্দুতে (Pupil). তাই সেটা পীড়াদায়ক হ'য়ে ওঠে। সে জন্যেই তার এই উপমা।

পুরনো সমাজের দুই-একটা বৈঠকী চুট্‌কির কথা শুনুন—আমার কামনা নতুন বয়েস, কালিদাসের কবিতা, মহিষ দুধের দই, চিনি মেশানো গরম দুধ, সদ্য ফোটা

ফুলের মত কামিনী, এগুলি পেলে এই মর্তলোকেই স্বর্গসুখ ভোগ ক'রবো। পৃথিবী থেকে স্বর্গে যাওয়ার বাসনা হবে না। আবার গাঁয়ের লোকেরও একটি বাসনার কথা শুনুন—ঝরঝরে জুঁই ফুলের মত সরু চালের ভাত, পেছল্ পেছল্ (পিচ্ছিল) দই, আর সরষের শাক, দুটি কাঁচা লঙ্কা আর যদি একটু নুন পাই—তবে জানবো এ হ'লো স্বর্গসুখের উচ্ছিষ্ট এসে মর্তে প'ড়েছে।

মোটকথা, গ্রাম্যজনের দারিদ্র্যের মধ্যেই স্বর্গসুখের ছবিতে সরষে শাকের স্থান প্রথম সারিতে ছিল, হয়তো বা আজও তা বিলুপ্ত হয়নি। হতে পারে বৈদ্যকের দৃষ্টিতে সরষে শাকের কোন গৌরব নেই, কিন্তু দারিদ্র্যের কোপে সে বিচারের অবকাশ কোথায়।

এই সরষেকে কেন্দ্র ক'রে আর একটি উপমা শুনুন—

"খলঃ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্ অপি ন পশ্যতি॥"

অর্থাৎ খলের স্বভাবই হ'লো—নিজের যে বিল্বপ্রমাণ দোষ (ছিদ্র) রয়েছে তাতে হুঁশ নেই, অন্যের যে স'রষেপ্রমাণ ছিদ্র—তাই লোকের কাছে বড় ক'রে বলে বেড়ানো।

এ কেন—মহারাজের তেল মাখা আর গোপাল ভাঁড়ের খোল (খইল) মাখা নিয়ে উপহাস্যকর যে গল্প প্রচলিত আছে, সেটা কে না জানে; তাই না গোপাল ভাঁড় ব'লেছিলো—মহারাজ, সেটা যে-গাছের তেল ছিল, এটা সেই গাছেরই খোল।

যাক, বিষয়বস্তুতে ফিরে যাই। সরষে শুধু যে ভারতেই ব্যবহৃত হয় তাই নয়, একে চূর্ণ করে বিশ্বের তাবৎ মানবসমাজই আহার্যের সাথী করে নিয়েছে। বিশ্বব্যাপী এর মান্যতা সঞ্চার দেখেই ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ অথর্ববেদ খুঁজতে গিয়ে দেখতে পাই—

অস্মাৎ ত্ব মধি জাতোঽসি ত্বদয়ং জায়তাং পুনঃ।
রিপ্রবাহ ইহৈবায়ং তন্তুভঃ প্রহিণোমি দূরম্॥

(অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ৯৫।২২৭।৩)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

তন্তুভৈঃ আহুতিং জুহোতি তন্তুভাস্তু সিদ্ধার্থাঃ সর্ষপাঃ। তন্তুস্তু=সন্তানঃ ততঃ সূক্ষ্মেণ=প্রবাহেন ভাতি দীপ্যতে ইতি তন্তুভঃ। তৈঃ আহুতিং দদ্যাৎ, রিপ্রবাহঃ=রিতর্মিতি পাপনাম (যাস্ক ৪।২১) রিপ্রং পাপং বহতি নাশয়তি, তস্মাৎ, তন্তুভস্য রিপ্রবাহ নাম। তৈঃ পাপং দূরং প্রহিণোমি কুষ্ঠাদিকং পাপমিতি। ততশ্চ অস্মাৎ কর্মদোষাৎ জাতোঽসি পুনশ্চ জায়তে। তং এব অয়ং দূরং যাতু।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—তন্তুভের দ্বারা আহুতি প্রদানকালে এই মন্ত্র পাঠ ক'রতে হয়—তোমার নাম তন্তুভ। তোমার সূক্ষ্ম সন্তানপ্রবাহ তোমাতে বিদ্যমান। তারই দ্বারা আহুতি। তন্তুভের অর্থ সিদ্ধার্থ বা সর্ষপ। এটির পাপনাশকত্ব শক্তির ব্যাখ্যায় যাস্ক (৪।২১) ব'লেছেন—সর্ষপ রিতপ্রবাহ বা পাপপ্রবাহকে দূর করে। আমরা ইহ কর্মজন্য

যে পাপপ্রবাহ কুষ্ঠাদি সৃষ্টি করি বা আমাদের প্রজ্ঞাপরাধের দ্বারা বার বার পাপ সৃষ্ট হয়, তাকে দূর করি এই তন্তুভের আহুতির দ্বারা।

বৈদ্যকের নথি

এই তন্তুভ বা সর্ষপের বেদ সমীক্ষায় তার অন্তঃশক্তি ও বহিঃশক্তি সম্পর্কে যেসব তথ্যের সন্ধান সংহিতাকারগণ পেয়েছিলেন—সেই ইঙ্গিতটুকুকেই তাঁরা সামনে রেখে রোগ-প্রতিকারে প্রয়োগ করেছেন; তবে এটা ঠিক যে, সর্ষপ সম্পর্কে প্রণম্য বৈদ্যকবৃন্দ একমত যে, এই তীক্ষ্ম ভেষজটির ব্যবহার আভ্যন্তরীণ ব্যাধির ক্ষেত্রে প্রায়শঃ অনুকূল হয় না; তাই বহির্ব্যাধির ক্ষেত্রেই প্রথম প্রযোজ্য।

চরকসংহিতায় সূত্রস্থানে কণ্ডূঘ্ন আস্থাপনোপগ এবং শিরোবিরেচনে ব্যবহার্য ব'লে উল্লেখিত হ'য়েছে; সুশ্রুতে ভেষজবর্গের মধ্যে পিপ্পল্যাদি বর্গেই সরষের উল্লেখ দেখা যায়।

সুশ্রুতের টীকাকার ডল্বন তন্তুভ শব্দটির প্রাচীনত্ব স্বীকার ক'রেও সিদ্ধার্থ এবং রাজিকা এই দুটি নামকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন; আর ধন্বন্তরি নিঘণ্টুতে সাদা ও লাল ভেদে দুই প্রকার সিদ্ধার্থ বলা হ'য়েছে। দেশভেদে কিন্তু আর এক প্রকার ছোট ছোট স'রষের জন্ম হয়, সেগুলির রং কালো।

এই স'রষের ব্যবহারিক ক্ষেত্রের ব্যতিক্রম দেখা যায় অত্রি সংহিতার বচনে, ওখানে ১৬ অধ্যায়ে বলা হ'য়েছে—স'রষে ত্রিদোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) দূর করে এবং অগ্নি-বর্ধক, অতএব রুচিপ্রদ।

অত্রি সংহিতার সঙ্গে চরক-সুশ্রুতের উক্তির সামঞ্জস্য করার দিন এসেছে। তবে এও ঠিক যে, স'রষে ভেষজটির ব্যবহারসাত্ম্যতা যেখানে আছে, সেখানে খৃীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর চরক-সুশ্রুতের উক্তির অর্থও খুব বিবেচনা করার মত।

পরিচিতি

প্রাচীন নিঘণ্টুকারদের মতে সরষের প্রকারভেদ নিয়েও মতভেদ আছে; দেখা যাচ্ছে—ধন্বন্তরি নিঘণ্টুর মতে শুভ্র, গৌর ও রক্ত ভেদে সিদ্ধার্থ তিন প্রকার; আবার অন্যান্য নিঘণ্টু গ্রন্থে চার প্রকার সরষের নামোল্লেখ দেখা যাচ্ছে, যেমন—(১) গৌর সিদ্ধার্থ, (২) রক্ত সিদ্ধার্থ, (৩) রাজিকা, (৪) কৃষ্ণ রাজিকা। তাদের গুণ সম্বন্ধেও যে কোন ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি তাও নয়, তাদের নামকরণও করা হয়েছে, যেমন—সিদ্ধার্থদ্বয়ের নাম রাখা হয়েছে—কটু স্নেহ, গ্রহঘ্ন, কুষ্ঠনাশন, আর রাজিকা দুটির ক্ষেত্রে বলা হ'য়েছে রাজসর্ষপ ক্ষুধাভিজনক ও কৃমিহৃৎ অর্থাৎ ক্রিমিকে যে অপসারণ করে। অথর্ববেদের কালে কেবলমাত্র সিদ্ধার্থের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। ইদানীন্তনকালে পরস্পর পরাগ সংক্রমণের দ্বারা বহু প্রকার সরষের প্রকারভেদ সৃষ্টি করা হ'য়েছে, তবে তাদের মৌল উপাদানের বিশেষ পার্থক্য হয়নি।

ডঃ প্রেণ সাহেবের মতে বাংলায় যেসব সরষে হয়, তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

(১) রাই সরষে (বড়)—Brassica juncea.

(২) শ্বেত রাই (সাদা রাই)—Brassica campestris.

(৩) সরষে—Brassica napus. একে টোরী সরষেও বলে।

এই গাছটি শাকবর্গের অন্তর্গত, বর্ষজীবী, ১—৩ ফুট উঁচু হয়, গাছের গোড়ার পাতাগুলি বড় হয়—আকারে প্রায় ডিম্বাকৃতি ও ঈষৎ ঢেউ-খেলানো। বাংলাদেশে এ গাছের পরিচিতি বিশেষ প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। উড়িষ্যার অঞ্চল বিশেষে এটিকে সরিস বলে। পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিজ্ঞানীগণের মতে এটি Cruciferae ফ্যামিলিভুক্ত।

রোগ প্রতিকারে

এই ভেষজটির রক্তবহ ও মজ্জবহ স্রোতের উপর প্রভাব বেশী।

১। **কুষ্ঠে:—** এই নামটি শুনলেই তো মুখে মাছি ঢুকে যায়, কিন্তু শব্দটির বিন্যাস দেখলে সেরকম ধরনের কোন প্রশ্ন মনেই আসবে না। 'কুৎসিৎ তিষ্ঠতি ইতি কুষ্ঠ' অর্থাৎ যে দেখতে অসুন্দর—সে দেহে বাসা বাঁধলেই তাকে কুষ্ঠ বলা যায়। আমাদের অতি সাধারণ গা-সওয়া জিনিস ঘামাচি, সেও তো কুষ্ঠ। আর দাদ বা দদ্রু—সেটাও তো কুষ্ঠ, তাই বৈদ্যকের চিন্তায় এই নামটি তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে না। এমনি সাধারণ রোগকে নিয়ে আমরা সচরাচর সঙ্গ করি, সেসব ক্ষেত্রের (এমন কি শ্বেতিও) প্রথম দর্শনে যদি খাঁটি সরষের তেল লাগানো যায়, তাতে প্রাথমিক স্তরে উপশম হবে। তবে আভ্যন্তরিক দোষ নিরসনের ব্যবস্থা তো ক'রতেই হবে। এটি আছে চরকের চিকিৎসা-স্থানের সপ্তম অধ্যায়ে।

২। **উরুস্তম্ভে:—** বৈদ্যকের মতে এটি রসবহ স্রোত থেকে আরম্ভ ক'রে মেদবহ স্রোত পর্যন্ত দূষিত হয়, এখানে বায়ু অবরুদ্ধ হ'য়ে প'ড়ে এই রোগ দুটি পায়েই হ'য়ে থাকে। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ঝিমুনি থাকেই, তার সঙ্গে অল্প জ্বর। অনেক সময় ভ্রম হয়, এটা বোধ হয় বাত; এখানে কোন স্নেহজাতীয় পদার্থ দিয়ে (oily substance) যত দলাই-মলাই করা যায়, ততই যন্ত্রণা বেড়ে যায়। যখন দেখা যাবে যে উরুতে জ্বালা আরম্ভ হ'য়েছে, তখনই বুঝতে হবে—এটি অসাধ্যের পর্যায়ে এসে প'ড়েছে।

এই সার্থক (অর্থবহ) নামকরণ এই জন্য যে, পা-দুটি যেন স্তম্ভের (থামের) মত হ'য়ে যায়। এক্ষেত্রে সুশ্রুতের উপদেশ—সাদা সরষে ও ডহর করঞ্জার, যার সংস্কৃত নাম নক্তমাল (Pongamia Pinnata), বীজ সমান পরিমাণে নিয়ে, গোমূত্রে বেটে একটু গরম ক'রে ওখানে লাগাতে হবে। এর দ্বারা প্রাথমিক স্তরে নিশ্চয়ই উপশম হবে। এটা আছে চরকের চিকিৎসাস্থানের বাতব্যাধিতে।

৩। **শ্লীপদে (ফাইলেরিয়া):—** এই রোগটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩৩৮ পৃষ্ঠায়। এই রোগের ক্ষেত্রে শুধু সরষের তেল ৩—৫ গ্রাম মাত্রায় প্রত্যহ বৈকালে একবার ক'রে খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা আস্তে আস্তে চ'লে যাবে। এটিও আছে সুশ্রুতের শ্লীপদ চিকিৎসায়।

৪। **উন্মাদে ও অপস্মারে:—** সাদা সরষে গোমূত্র দিয়ে বেটে শুকিয়ে রাখতে হবে। তা থেকে ৩ গ্রাম পরিমাণ নিয়ে সকালে ও বৈকালে দু'বার জলসহ খেতে দিতে হবে। এর দ্বারা ঐ রোগের উপশম হবে। এটি আছে হারীত সংহিতায়।

৫। **ঝিঁঝি বাতে ও স্নায়ু-সঙ্কোচে:—** এটার লক্ষণ হ'লো—হঠাৎ কোন অঙ্গে এমন টান ধ'রলো যে জীবন কণ্ঠাগত। হঠাৎ কোন জায়গায় ঝিঁঝি লাগে, সেক্ষেত্রে

৩ গ্রাম সাদা সরষে বেটে ছে'কে নিয়ে সরবতের মত দু'বেলাই খেতে হবে। এর মধ্যে একটু লবণ দেওয়া চ'লতে পারে, তাই ব'লে দুধ বা দই দিয়ে সরবত ক'রে নয়।

৬। **পেটে বায়ু ও অগ্নিমান্দ্যে:—** এ'দের বাহ্য লক্ষণ হ'লো—পায়খানা ক'রেও মনস্তুষ্টি হয় না, আর পরিষ্কার যে হবে—সে হবে কোথা থেকে, এদিকে অল্পাহারী, তার উপর স্নেহ জিনিসের অভাব শরীরে, বিশেষতঃ খাদ্যে, পেটে বায়ু কিছু না কিছু থাকবেই, তাই এ'দের উচিত—ভাল মাখন অল্প অল্প খাওয়া আর এটা খাওয়ার সংগতি যদি না থাকে অথবা খাঁটি না পাওয়া যায়, তাহলে এক গ্রাম ক'রে সাদা স'রষে বেটে, ছে'কে, সরবতের মত খাওয়া (জল ১ কাপ হ'লেই হবে)।

৭। **দাঁতের মাঢ়ীর ক্ষতে:—** সরষে তিন ভাগ ও সৈন্ধব লবণ এক ভাগ একসঙ্গে পিষে গুঁড়ো ক'রে রাখতে হবে। সেইটা দিয়ে দাঁত মাজলে ঐ মাঢ়ীর ক্ষতের উপশম হয়ে থাকে, অবশ্য এটিও হারীত সংহিতায় বলা হয়েছে।

৮। **কর্ণমূল শোথে:—** এটিকে চলতি কথায় মাম্‌স্‌ (mumps) বলে। এই ক্ষেত্রে সজনে গাছের মূলের (Moringa oleifera) ছাল ও সরষে সমান পরিমাণ নিয়ে, বেটে, অল্প গরম ক'রে কর্ণমূলে লাগাতে হবে। এটা আছে ভাবপ্রকাশে (ষোড়শ শতকের গ্রন্থ)।

৯। **বাতরক্তের প্রথমাবস্থায়:—** এটির বর্ণনা দেওয়া আছে 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩৩০ পৃষ্ঠায়। এই লক্ষণাক্রান্ত হ'লে সাদা সরষে বেটে ঐ জায়গায় লাগাতে হবে।

১০। **চর্মদল কুষ্ঠে:—** এই কুষ্ঠের প্রাথমিক লক্ষণ হবে—কোন জায়গায় ফেটে যাওয়া অথবা ফোস্কা প'ড়ে পরে শুকিয়ে চামড়াটা উঠে যাওয়া। এক্ষেত্রে সরষে ও সৈন্ধব লবণ সমান পরিমাণে নিয়ে, বেটে ওখানে লাগাতে হবে। এটা একদিন অন্তর কয়েকদিন লাগাতে হয়। তবে এর সঙ্গে আভ্যন্তরিক ঔষধ ব্যবহার না ক'রলে পুনরায় এটা হতে পারে।

১১। **আমবাতের (রসবাতের) ব্যথায়:—** এই বাত রোগকে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন রিউম্যাটিজ্‌ম্‌। এই ব্যথার জায়গায় সরষে অল্প ভেজে নিয়ে সেটাকে বেটে, ওখানে প্রলেপ দিতে হবে। এটাতে ব্যথার খানিকটা উপশম হবে।

১২। **অকালে রজঃরোধে:—** এ'দের বিশেষ উপসর্গ হয় মাথার যন্ত্রণা। এক্ষেত্রে সরষে ১০ গ্রাম বেটে গামছায় ছে'কে নিয়ে, সেইটা বাথ্‌টবে ২ বালতি জলে গুলে সেটাতে অল্প গরম জল মিশিয়ে ঐ জলে কোমর ডুবিয়ে অন্ততঃ ১৫/২০ মিনিট ক'রে বসে থাকতে হবে। এই পদ্ধতিতে কয়েকদিন হিপ্‌-বাথ (Hip-bath) নিলে পুনরায় মাসিক ঋতু আরম্ভ হবে।

১৩। **কপালে সর্দি ব'সে গেলে** (Synovitis) :— সরষের গুঁড়োর নস্যি নিলে সর্দিটাও তরল হবে, তার সঙ্গে হাঁচি হয়ে ওটা বেরিয়ে যাবে।

১৪। **আফিংয়ের মাত্রাধিক্যে:—** যেকোন কারণে মাত্রাধিক্য হ'য়ে থাকুক, সেটাতে বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে ৫/৬ গ্রাম সাদা সরষে বেটে সরবতের মত খাইয়ে দিলে তখনই বমি হ'য়ে ওটা বেরিয়ে যাবে।

এই নিবন্ধের শেষে ভাবছি—উদ্ভিদজগতের মধ্যে এই ভেষজটি যেন ব্রাহ্মণের

স্বভাব কিছুটা পেয়েছে। খড়ের আগুনের মত যেমন দপ্ ক'রে জ্বলেও ওঠে, আবার নিভেও যায় তাড়াতাড়ি। সে নিজে বাহ্যতঃ রুক্ষ, কিন্তু অন্তরে তার স্নেহতন্তুজাল, কারুর অকল্যাণ করার স্বভাব তার নেই। এই ভেষজের স্নেহতন্তু বিপথগামী স্রোত-পথকে শাসন করে, তাই সে 'তন্তুভ'।

CHEMICAL COMPOSITION

Essential oil, allyl isothiocyanate and related compounds viz., crotonyl isothiocyanate.
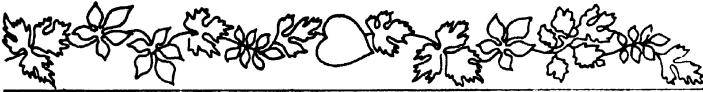
উষণ (মরিচ)

ঝাল কথাটাকে ঝালাতে ব'সে দেমাগ, মেজাজ প্রভৃতি অন্য ঝালকে যদি টানি, তবে প্রথমে আপনার মনে প'ড়বে মনের ঝাল মিটাতে কথার ঝালের পুঁটুলিটার কথা। এ ঝালের উষ্মা থাকলেও, এবং সেটার দহন মনে হ'লেও জিভে সাড়া জাগায় না।

আমার আলোচ্য নিবন্ধটি যাকে কেন্দ্র করে, তার বস্তুসত্ত্বা মুখরা অর্ধাঙ্গিনীর সোহাগের মত, তার প্রথম আস্বাদে তীক্ষ্ণতা থাকলেও রসাশ্রয়ী।

রাঁধিয়া মুগের ডালি চৈ লতা দিল ডালি ঘৃত মরিচের সন্তলন।

আবার দেখি শ্রীচৈতন্যদেব যখন পুরীধামে অবস্থান ক'রেছেন, সেই সময় গৌড়দেশ থেকে প্রতি বৎসরই যেতেন তাঁর প্রিয় পার্ষদগণ নানান উপহার নিয়ে, সবার স্নেহভাজন
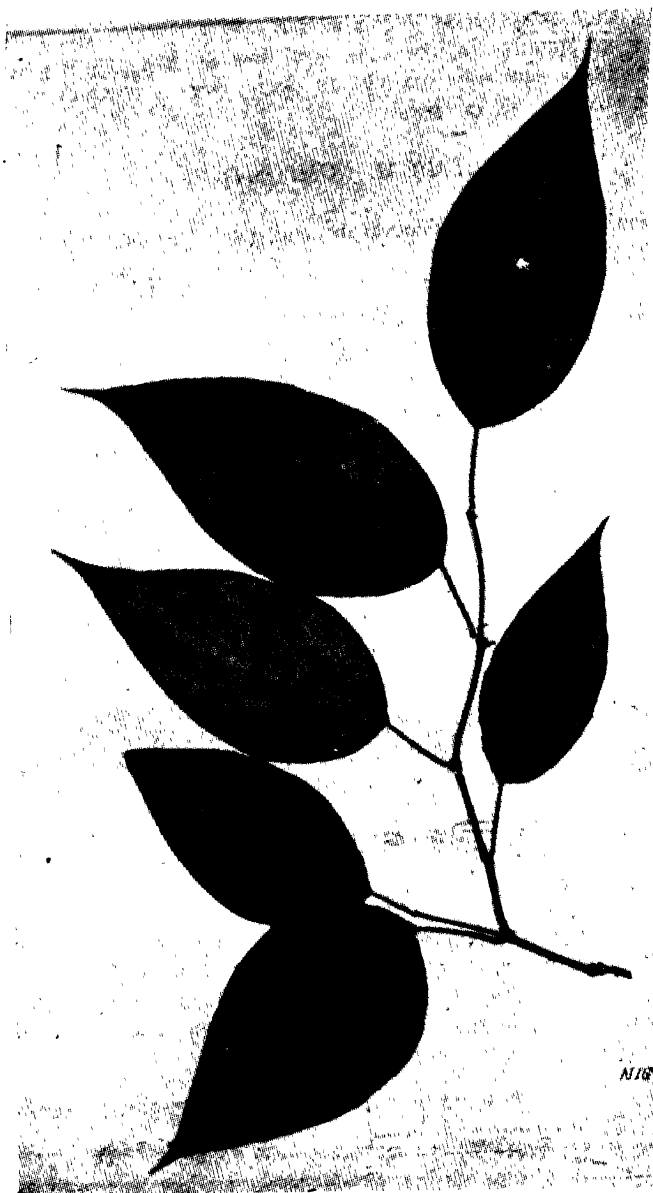
শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখতে। তাঁদের দেওয়া সুখাদ্য উপহারগুলির মধ্যে মরিচের গুঁড়ো সহযোগে প্রস্তুত নাড়ুও একটি তাঁর প্রিয় ও উপাদেয় জলযোগের বস্তু থাকতো। সেটিকে আমরা দ্রব্য সাধারণের মধ্যে গণ্য ক'রে থাকি মশল্লা হিসেবে; কিন্তু এটির যে আভিজাত্য আছে ভেষজদ্রব্য হিসেবে, সে সন্ধানও ক'রতে হয়; তাই অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৩১।৫২।২২৮ সূক্তে দেখা যায়—

> অদ্‌ভ্যঃ সম্ভৃতং পৃথিব্যৈ রসাৎ চ উষণং সমবর্ত্তত।
> যদ্‌ বিদধ দ্রূপ্‌ মেতি মর্ত্তস্য অজানম্‌ অগ্নিম্‌॥

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> যদ্‌ অদ্ভ্যঃ সম্ভৃতং তৎ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ উষণং সমবর্ত্তত, যচ্চ মর্ত্তস্য অগ্নিং অজানম্‌ জানীমঃ তদ্রূপং বিদধৎ উষণং, উষতি= দহতি যৎ তদ্‌ অগ্নিরিব মরিচম্‌ মৃ+ইচ্‌ ন।

এই সূক্তটির অনুবাদ হ'লো—জল হ'তে ও পৃথিবীর রস হ'তে যে জন্মগ্রহণ করে, মর্তে অগ্নিরূপেই তাকে আমরা জানি—সেই তুমি উষণ্‌, তোমার লোকনাম মরিচ=মৃ+ইচ্‌+ন।

এর বৈদিক নাম উষণ্‌ অর্থে অগ্নি—যে অগ্নির ক্রিয়ার ক্ষেত্র ক্ষিতি ও অপ্‌ ধাতু বিকারগ্রস্ত হ'য়ে যেখানে দেহকে পীড়িত ক'রে তাকে সংশোধন করা।

বৈদ্যকের নথি

এখন দেখা যাচ্ছে—সেই বৈদিকযুগ থেকে মরিচ আমাদের কাছে ভৈষজ্য হিসেবে পরিচিত, সেটা আয়ুর্বেদের চিন্তাধারায় অগ্নিবন্ধুরূপে, কারণ এই মরিচটি শারীর-তত্ত্ববিদ্‌ আয়ুর্বেদই প্রথমে ব'লেছেন—সামগ্রিকভাবে আমাদের দেহের খাদ্য জীর্ণ করার প্রণালীর মধ্য দিয়েই মরিচ অদ্ভুত কাজ করে। এতে যে উদ্বায়ী তেলটুকু থাকে, তাতে জৈবপ্রাণের যোগ অসাধারণ হ'য়েই অবস্থান করে। মরিচের ছোট ছোট কঠিন কণাগুলি জিভের আস্বাদবহ স্নায়ুর সংস্পর্শে এলেই কটুতায় একটা স্বাদ মানিয়ে দেয়। এ শক্তিটির বিপরীত প্রতিদ্বন্দ্বী লঙ্কা, ওর থেকে রং তৈরী হ'তে পারে, কিন্তু ওটা জিহ্বার আস্বাদবহ স্নায়ুকে উদ্দীপ্ত করে না, বরং উত্তেজিত করে। একথা মনে রাখা দরকার যে, উদ্দীপ্ত আর উত্তেজিত এক নয়। উত্তেজনায় থাকে অবসাদ ও ক্ষয় —লঙ্কার ঝালে আসে যকৃৎখণ্ডের স্নায়ুতে ক্ষত ও ক্ষয়। এইসব অনুশীলনের উৎস আয়ুর্বেদ সংহিতা গ্রন্থের শিরোমণি চরক, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভট।

চরক সংহিতার সূত্রস্থানের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থলেই মরিচের গুণকারিত্ব নিয়ে সিদ্ধান্ত এইভাবে গৃহীত হ'য়েছে। মরিচ প্রকৃতপক্ষে দীপনীয় ভেষজ, ক্রিমিঘ্ন এবং শূল প্রশমকও বটে। এছাড়া বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে মরিচকে শ্লেষ্ম রোগে আস্থাপন-যোগ্য ভেষজ ব'লে নির্বাচিত করা হ'য়েছে; তাছাড়া চিকিৎসাস্থানে রসায়ন সেবন প্রসঙ্গে। মানব-মানবীর সর্বাপেক্ষা কাঙ্ক্ষিত সুখের জন্য পানীয় মাধ্যমে ভৈষজ্য সেবনের যতগুলি উপাদান—তাদের মধ্যে মরিচ নিস্যূত বৃংহনীয় পানকও অন্যতম। তাছাড়া ঐ রসায়ন-পানকের আর একটি যোগ বৃষ্য পুপলিকা। এটি পুত্রোৎপাদনের জন্য শৌক্রিক ভেষজ, সেই ভেষজের অন্যতম উপাদান মরিচ।

সুশ্রুতে ঐ ভাবে বহুস্থানেই মরিচের হিতকারিতার কথা আছে। তবে আরও

বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যেটা চরকে উক্ত হয়নি, সেটি হ'লো—"অপতানক" (Hysterical convulsion) নামক কঠিন বাতব্যাধিতে এই মরিচের ফলপ্রদ শক্তির উল্লেখ।

এছাড়া বাগ্‌ভটে, হারীতে ও ভাবপ্রকাশেও বহু রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায়। এভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকগণের অনুভূত যোগগুলিতেও বহু নূতন তথ্যের সন্ধান দেয়।

পরিচিতি

পৃথিবীর উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এই Piper গণের প্রায় ৫০টি প্রজাতি (species) পাওয়া যায়। প্রধানতঃ এরা লতাজাতীয়; তবে এর মধ্যে কয়েকটি প্রজাতি আছে, যারা বৃক্ষের পর্যায়ে পড়ে। ভারতে এই প্রজাতির মধ্যে প্রায় ৪৫ প্রকার পাওয়া যায়; অবশ্য পান (Piper betle), কাবাবচিনি (Piper cubebe), পিপুল (Piper longam), চই (Piper chaba)—এরা সবাই এই গণের অন্তর্ভুক্ত।

এই গোলমরিচ লতানে গাছ হ'লেও অন্য গাছের আশ্রয় ভিন্ন এরা বাড়ে না। এই গণের লতাজাতীয় কয়েকটি গাছের প্রতি পর্বে শিকড় বেরোয় এবং ঐ শিকড়গুলি গাছকে আঁকড়ে ধ'রে রাখে। এই লতাগাছ ৫/৭ বৎসরের হ'লেও বড়জোর আঙ্গুলের মত মোটা হয়। পাতা আকারে প্রায় মিঠে পানের মত। এর ফল-ফুল সম্পর্কে একটি বিশেষ বক্তব্য আছে—

পটোল গাছের (Trichosanthes dioica) মত এই piper গণের গাছে কোনটিতে পুংপুষ্প, কোনটিতে স্ত্রীপুষ্প থাকে; কদাচিৎ এই লতায় দুই রকম ফুল দেখতে পাওয়া যায়। বায়ুর দ্বারা এদের মিলনকার্য সাধিত হয়, এইজন্য এদের পুষ্পিত ঋতুতে (season) সাধারণতঃ যেদিকে বায়ু প্রবাহিত হয়, তারই অনুকূলে (সেই পাশে) এই ষাঁড়া লতা অর্থাৎ পুংপুষ্পের লতা গাছকে লাগানো হয়। যেমন এক-একটা বাগানভরা পিপুল গাছ কিন্তু কোন গাছে একটিও পিপুল নেই; আবার এইভাবে মিশ্র পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প লতাগাছ একত্রে যেখানে আছে, সেখানে অজস্র পিপুল জন্মে; তেমনি গোলমরিচের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা।

জন্মস্থান— পূর্বে বোম্বাই প্রদেশের কানাড়া জেলার জঙ্গলে গোলমরিচ আপনা-আপনিই হ'য়ে থাকতে দেখা গেলেও তার পূর্ব থেকেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ঐসব অঞ্চলে চাষ হ'য়ে আসছে; এ ভিন্ন মাদ্রাজের পশ্চিম উপকূলভাগে আর্দ্র ভূমির অঞ্চলে এর চাষ করা হ'য়ে থাকে; তাছাড়া মালাবারেও ব্যাপকভাবে একে উৎপন্ন করা হয়।

চাষের পদ্ধতি— আম, কাঁঠাল, কাজুবাদাম, মাদার, সুপারি প্রভৃতি গাছের তলার মাটিতে মরিচ লতার ডগা (শিকড় সমেত পর্ব) বসানো হয়। আস্তে আস্তে পাতা গজিয়ে ঐ লতা বেড়ে যেতে থাকে, ঐ পাতার ও লতার পর্ব থেকে শিকড় বেরিয়ে গাছ'কে আঁকড়ে ধ'রে উঠে যায়। এইভাবে ২৫/৩০ ফুট পর্যন্তও উঠতে পারে, তবে ১০/১২ ফুটের বেশী উঁচুতে এদের উঠতে দেওয়া হয় না। ৩/৪ বৎসর পরে এইসব গাছে গোলমরিচ হ'তে সুরু হয়; তারপর থেকে ৩/৪ বৎসর বেশী পরিমাণ গোলমরিচ জন্মে; ফল হওয়া ক'মে গেলে ওগুলিকে কেটে ফেলে আবার নতুন গাছ ঐ গাছের তলায় লাগানো হয়।

আহরণ কাল— মরিচ ফল ডাঁসা অবস্থায় (পাকার পূর্বাবস্থায়) সংগ্রহ করা হয়,

তারপর তাকে রোদ্রে বা মৃদু উত্তাপে শুকিয়ে নিলেই প্রচলিত গোলমরিচের অবস্থায় এসে যায়। সা মরিচ (সাদা মরিচ) প্রথমেই ব'লে রাখি—মরিচফল পাকলে লাল হয়, সেই পাকা মরিচগুলি জলে র'গড়ে ওপরের খোসাগুলিকে তুলে দেওয়া হয় এবং রোদ্রে শুকানো হয়। অনেক সময় ক্লোরিনের জলে একে ধুয়ে সাদা করা হয়। তবে এটা ঠিক, সাদা মরিচ অপেক্ষাকৃত ঝাল কম।

এই গাছটির বোটানিকাল্ নাম Piper nigrum Linn., ফ্যামিলি Piperaceae.

লোকায়তিক ব্যবহার

মরিচ প্রধানতঃ কাজ করে রসবহস্রোতে এবং অগ্ন্যাশয়ে বা পচ্যমানাশয়ে।

১। **কাসিতে:—** যে কাসিতে সর্দি উঠে যাওয়ার পর একটু উপশম হয়, অথবা জল খেয়ে বমি হ'য়ে গেলে যে কাসির উদ্বেগটা চ'লে যায়, বুঝতে হবে—এই কাসি আসছে অগ্ন্যাশয়ের বিকৃতি থেকে, যেটাকে আমরা সাধারণে ব'লে থাকি পেট গরমের কাসি। সেক্ষেত্রে গোলমরিচ গুঁড়ো ক'রে, কাপড়ে ছে'কে নিয়ে, সেই গুঁড়ো এক গ্রাম মাত্রায় নিয়ে একটু গাওয়া ঘি ও মধু মিশিয়ে, অথবা ঘি ও চিনি মিশিয়ে সকাল থেকে মাঝে মাঝে একটু একটু ক'রে ৭/৮ ঘণ্টার মধ্যে ওটা চেটে খেতে হবে। এর দ্বারা ২/৩ দিনের মধ্যে ঐ পেট গরমের কাসিটা প্রশমিত হবে।

২। **আমাশায়:—** এই আমাশায় আম বা মল বেশী পড়ে না কিন্তু শূলুনি ও কোঁথানিতে বেশী কষ্ট দেয়; এক্ষেত্রে মরিচ চূর্ণ এক বা দেড় গ্রাম মাত্রায় সকালে ও বৈকালে দু'বার জলসহ খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ আমদোষ ২/৩ দিনের মধ্যেই চ'লে যাবে।

৩। **ক্ষীণ ধাতুতে:—** এখানে কিন্তু শুক্র সম্পর্কীয় ধাতুর কথা বলা হ'চ্ছে না, এটা আমাদের সমগ্র শরীরে যে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র আছে সেই সপ্তধাতু সম্পর্কে বলা হ'চ্ছে।

আহার্য থেকে যে রসধাতু উৎপন্ন হয়—তারই ক্রমপরিণতিতেই আমাদের শরীরের অন্যান্য ধাতুগুলির পোষণ হয়; এখন এক ধাতু থেকে অন্য ধাতুতে রূপান্তরিত হ'তে গেলে যে অগ্নির প্রয়োজন হয়, সেইটি ধাতুগত অগ্নি। প্রতিটি ধাতুরই অগ্নিক্রিয়ার পৃথক সত্ত্বা আছে।

এখন দেখা যাচ্ছে—সমগ্র শরীরের তথা ধাতুগুলির অগ্নি মন্দীভূত; (যাকে বর্তমান যুগে বলা হয় মেটাবলিজিম্ ক'মে যাওয়া) যার ফলে আহার্যদ্রব্য সম্যক্ পরিপাক না হওয়াতে অপক্করসের জন্ম হয়, সেই রস অপক্ক অবস্থায় ধাত্বন্তরে অর্থাৎ পরবর্তী স্তর রক্তধাতুতে গিয়ে উপস্থিত হয়। এই যে দোষযুক্ত রস—তার দ্বারা সকল ধাতুই অল্প-বিস্তর দূষিত বা ক্ষীণপ্রাপ্ত হ'তে থাকলো। এই যে ক্ষেত্র—এখানের প্রয়োজন বিকৃত রসধাতুর অগ্নিবল বাড়ানো; আবার এই রসধাতুর অগ্নিবল অগ্ন্যাশয়ের মুখাপেক্ষী; তাই মরিচ এই ক্ষেত্রে উপযোগী। সেটির প্রয়োগপদ্ধতি হ'লো ৩ গ্রাম গোলমরিচ একটু থে'তো ক'রে ন্যাকড়ায় পুটুলি বে'ধে ১৪৪ মিলিলিটার দুধ আর ২২৮ মিলিলিটার জল অর্থাৎ প্রায় আধ পোয়া আর এক পোয়া, একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে দুধটুকু অবশিষ্ট থাকতে নামিয়ে, পুটলীটি তুলে নিয়ে, সেই দুধ সকালে ও বৈকালে খেতে দিতে হবে, তবে তাঁর হজম করার শক্তি বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মরিচের মাত্রা ৫ গ্রাম পর্যন্ত নেওয়া যায়।

৪। **ভুক্তপাকেঃ—** *লোভও সামলানো যায় না, খেয়েও হজম হয় না, একটু তেল-ঘি জাতীয় গুরুপাক কিছু খেলেই অম্বলের ঢেকুর, গলা-বুক জ্বালা, তারপর বমি হ'লে স্বস্তি। যদি কোন সময় এই ক্ষেত্র উপস্থিত হয়, তাহ'লে খাওয়ার পরই গোলমরিচের গুঁড়ো এক গ্রাম বা দেড় গ্রাম মাত্রায় জলসহ খেয়ে ফেলবেন, এর দ্বারা* সেদিনটার মত নিষ্কৃতি পাবেন; তবে, রোজই অত্যাচার ক'রবো আর রোজই মরিচ খাবো, এটা ক'রলে চ'লবে না।

৫। **নাসা রোগেঃ—** এই রোগের নামটি তো ক্ষুদ্র, রোগটি কিন্তু এতটা লঘু নয়; এই রোগের মূল কারণ রসবহ স্রোতের বিকার, আর তার লীলাক্ষেত্র হ'লো গলা থেকে উপরের দিকটায়। এর লক্ষণ হ'লো—প্রথমে নাকে সর্দি, তারপর নাক-বন্ধ, কোন কোন সময় কপালে যন্ত্রণা, ঘ্রাণশক্তির হ্রাস এবং দুর্গন্ধও বেরোয়, এমন-কি আহারের রুচিও ক'মে যায়, কারও কারও ঘাড়ে যন্ত্রণা হ'তে সুরু করে, নাক দিয়ে রক্তও পড়ে—এক্ষেত্রে পুরনো (পুরাতন) আখের গুড় ৫ গ্রাম, গরুর দুধের দই (এই দই বাড়িতে পেতে নিলে ভাল হয়) ২৫ গ্রাম, তার সঙ্গে এক গ্রাম মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে সকালে ও বৈকালে দু'বার খেতে হবে। এর দ্বারা ৩/৪ দিন পর থেকে ঐ সব উপসর্গ ক'মতে সুরু ক'রবে।

৬। **ক্রিমি রোগেঃ—** অগ্ন্যাশয় বিকারগ্রস্ত, তারই পরিণতিতে রসবহ স্রোতের বিকার; এই দুটি বিকারের ফলে যে ক্রিমির জন্ম হবে, সেটার লক্ষণ হ'লো—পেটের উপরের অংশটায় (দু'ধারের পাঁজরের হাড়গুলির সংযোগস্থলের নিচেটায়) মোচড়ানি ব্যথা, এটা ২ থেকে ৭/৮ বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদেরই হয়। এই ক্রিমির কবলে প'ড়লে মাথাটা একটু হে'ড়ে (বড়) হ'তে থাকে, এদের মুখ দিয়ে জল ওঠে না, প্রায়ই যখন-তখন পেটে ব্যথা ধরে—এই ক্ষেত্রে বালক-বালিকাদের জন্য ৫০ মিলিগ্রাম মাত্রায় মরিচের গুঁড়োয় একটু দুধ মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। দরকার হলে সকালে-বৈকালে ২ বার খেতে দিতে পারা যায়।

৭। **শিশুদের ফুলো বা শোথেঃ—** ঠাণ্ডা হাওয়া লাগানো বা প্রস্রাবের উপর পড়ে থাকা, শীতকালে উপযুক্ত বস্ত্রের অভাবে যেসব শিশু ফুলে যায়, সেখানে টাটকা মাখনের সঙ্গে ৫০ মিলিগ্রাম মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে রাখতে হবে, সেটা একটু একটু ক'রে জিভে লাগিয়ে চাটিয়ে দিতে হবে।

৮। **গণোরিয়ায়ঃ—** এই রোগকে আয়ুর্বেদে বলা হয় ঔপসর্গিক মেহ। এই রোগে প্রস্রাবের সময় বা পরে অথবা অন্য সময়েও টিপলে একটু পুঁজের মত বেরোয়, এক্ষেত্রে মরিচ চূর্ণ ৮০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় দু'বেলা মধুসহ খেতে হবে। প্রথমে ২/৩ দিন একবার ক'রে খাওয়া ভাল।

৯। **মূত্রাবরোধেঃ—** প্রস্রাব একটু একটু হ'তে থাকে এবং থেমেও যায়, পূর্ব থেকে এ'দের হজমশক্তিও ক'মে গিয়েছে ধরে নিতে হবে। এ'রা গোলমরিচ ২ গ্রাম নিয়ে চন্দনের মত বেটে, একটু মিশ্রি বা চিনি দিয়ে সরবত ক'রে খাবেন।

১০। **ফিক্ ব্যথায়ঃ—** কি কোমরে, কি পাঁজরে এবং কি ঘাড়ে ফিক্ ব্যথা ধরেছে—ঝাড়ফুঁকও ক'রতে হবে না, আর মালিশও ক'রতে হবে না, শুধু গোলমরিচের গুঁড়ো এক বা দেড় গ্রাম মাত্রায় গরম জল সহ সকালে ও বৈকালে ব্যবহার ক'রবেন, এটাতে ঐ ফিক্ ব্যথা ছেড়ে যাবে। তবে এটা বৈদ্যকের নথিভুক্ত ক'রতে হ'লে ব'লতে

হবে—রসবহ স্রোত বিকারপ্রাপ্ত হ'য়ে শ্লেষ্মাধরা কলা ও মাংসধরা কলা এই দুটিতে বিকার সৃষ্টি ক'রে বায়ুকে রুদ্ধ ক'রেছে, তাই এই ব্যথা।

বাহ্য প্রয়োগ

১১। **ঢুলুনি রোগেঃ—** কথা কইতে কইতে মনের অগোচরে মাথা নেমে যাচ্ছে, চেষ্টা ক'রেও সামলানো যাচ্ছে না, এক্ষেত্রে মুখের লালায় গোলমরিচ ঘষে চোখে কাজলের মত লাগাতে হবে; এর দ্বারা ঐ ঢুলুনি রোগ সেরে যাবে। এটি একটি তান্ত্রিক যোগ।

১২। **নিদ্রাহীনতায়ঃ—** এই অনিদ্রা রোগ যাঁদের হয় সাধারণতঃ এ'রা একটু মেদস্বী বা স্থূলদেহী। এ'রা কুলেখাড়ার (Asteracantha longifolia) মূল শুকিয়ে নিয়ে তার ১০ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, সন্ধ্যেবেলা খেতে হবে। আর একটি গোলমরিচ নিজের মুখের লালায় ঘ'ষে কাজলের মত চোখে লাগালে (পুরো মরিচটা ঘ'ষে নেওয়ার দরকার নেই) এর দ্বারা ঐ নিদ্রাহীনতা চ'লে যাবে। এটাও একটি তান্ত্রিক প্রক্রিয়া; দেখা যাচ্ছে—রোগ-ভেদে তার ক্রিয়া বিপরীতধর্মী হ'য়েছে।

১৩। **বিষাক্ত পোকার জ্বালায়ঃ—** বোল্‌তা, ভীমরুল, কাঁকড়াবিছে, ডাঁস—যেসব কীট-পতঙ্গ কামড়ালে বা হুল ফোটালে জ্বালা করে, সেই জ্বালায় গোলমরিচ জলে ঘ'ষে, তার সঙ্গে ২/৫ ফোঁটা ভিনিগার মিশিয়ে ঐ দষ্টস্থানে বা হুলবিদ্ধ জায়গায় লাগালে জ্বালাটা ক'মে যাবে।

১৪। **টাক রোগেঃ—** এ রোগ শুধু যে মাথায় হয় তা নয়; ভ্রূ, গোঁফ প্রভৃতি যেখানেই লোমশ জায়গা, সেখানেই তার বসতি। একে বৈদ্যকের ভাষায় ইন্দ্রলুপ্ত বলে। এ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থে বলা হ'য়েছে—

> ইন্দ্রকীটঃ ক্রিয়াদৃশ্যঃ মায়াভিঃ ইন্দ্ররূপবৎ।
> ইন্দ্রলুপ্তেতি সা সংজ্ঞা শিরঃস্থে লোম সংস্থিতে॥

অর্থাৎ ইন্দ্র যেমন মায়ার দ্বারা আত্মগোপন ক'রে নিজ কার্য করে, তেমনি শিরস্থিত ও লোমযুক্তস্থানে এই কীটগুলি নিজের কার্য ক'রে থাকে ব'লে, অর্থাৎ তারা স্বকার্য সাধন করে ব'লেই এই কীটের নাম ইন্দ্র এবং এই ইন্দ্রকীট সব লোম লুপ্ত ক'রে দেয়—তাই ইন্দ্রলুপ্ত।

কি ক'রে এই ক্ষেত্রে ব্যবহার ক'রতে হবে? প্রথমে ছোট পেঁয়াজের (যাকে আমরা চল্‌তি কথায় ধানি পেঁয়াজ বলে থাকি) রস ঐ ব্যাধিতস্থানে লাগাতে হবে, তারপর ঐ জায়গায় গোলমরিচ ও সৈন্ধব লবণ একসঙ্গে বেটে ওখানে লাগিয়ে রাখতে হবে। ব্যবহারের কয়েকদিন বাদ থেকে ওখানে নতুন চুল গজাতে থাকবে।

এই ভেষজটির আলোচনান্তে এইটা মনে হচ্ছে যে—রগচটা লোক আর মরিচের ঝাল—এই দুটিকে কিন্তু পাল্লাতে তুলে ধরা যেতে পারে। এ'রা হঠাৎ চ'টে যান সত্যিই কিন্তু এই প্রকৃতির লোক অন্যের কল্যাণই বেশী কামনা করেন। এই মরিচও তেমনি—এর ঝালের তীক্ষ্ণতা বেশী, কিন্তু আমাদের কল্যাণকামিতায় তার তুল্য ভেষজ আমাদের কমই আছে। এ যেন সে যুগের টোলের পণ্ডিত।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Alkaloids viz. piperettine, piperine, chavicine, piperidine. (b) Acids viz., piperinic acid, isopiperinic acid, chavicinic acid, isochavicinic acid. (c) Fatty alcohols, essential oil.

আম্রাতক (আমড়া)

এই ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্ট বস্তু—কি চেতন আর কি অচেতন—সবেরই মধ্যে একটা আপেক্ষিক ধর্ম রয়েছে। সেই বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে এই আধুনিককাল পর্যন্ত আজও তার অনুশীলনই চ'লছে।

এই ধরুন না—বাব্লার (Acacia arabica) কাঁটা আপনার শূলে আর তার ডাঁটা-পাতা উটের (উষ্ট্রের) তৃপ্তিকর প্রিয় খাদ্য; যখন সেটা সে খায়, তখন এই গাছের কাঁটা মুখের মধ্যে ফুটে গলগল ক'রে রক্ত বেরোয়, তবুও সে তৃপ্তির সঙ্গে খায়।

আর একটা কথা বলি—শীত-জ্বরে বা শীতকালে কম্বল যেমন ভাল লাগে, সেটা গ্রীষ্মকালে কি সুখকর? আবার শীতকালে চন্দন মাখাটা কি গ্রীষ্মের মত তৃপ্তি দেয়? তাই বলি—একই দ্রব্যের উপযোগ কোনটা কালাপেক্ষী, কোনটা ক্রিয়াপেক্ষী, কোনটা বা সংস্কারাপেক্ষী, আবার খাদ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজন থাকে অগ্নিবলাপেক্ষিতার।

আজ আমরা যদি কোন তথ্য পরিবেশন ক'রতে চাই, তা হ'লে তার কিছু উৎস সেই পূর্বের অনুশীলিত জ্ঞানকেই কেন্দ্র ক'রে এগুতে হবে। এই আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয়নি; সেই ধারাসূত্রকে যদি অনুসরণ করি, তাহ'লে ভেষজ আম্রাতক

বা আমড়াকে কিন্তু সেই চোখেই দেখতে হবে, যেটাকে সাধারণ চোখে দেখে উপমা দিয়ে বলা হয়—সংসার ক্ষেত্রটা যেন আমড়া, তার চৌদ্দ আনাই আঁটি আর চামড়া, আর যেটুকু রইলো সেটা খেলে অম্লশূল।

আজ আমার বক্তব্য সেই আপেক্ষিকতাকে কেন্দ্র ক'রে। তবে এটা স্পষ্ট বলা যায় যে, অন্যত্র আহরণ ক'রেই অপূর্ণকে পূর্ণ করা হয়; এই পূর্ণ করার নাম কিন্তু টুকে টুকে তথ্যের কলেবর বৃদ্ধি করা নয়।

বৈদ্যকের পুথি

সংহিতার দৃষ্টিতে আম্লাতক

চরক সংহিতায় এই আমড়াকে নিয়ে প্রথমেই ব'লেছেন—অম্লমধুর রসের ফলগুলি যেমন হৃদ্য, আমড়াও সেই পর্যায়ের। অর্থাৎ হৃদয় আমাদের চেতনার স্থান, সেখানেই এই আম্লাতকের প্রবেশ। এ স্থান একাধারে দেহের ও প্রাণ-মনের আবাস, অর্থাৎ মানসব্যাধি ও দেহব্যাধি উভয়েরই হিতসাধন করে আমড়া বা আম্লাতক—এইটা ভেষজের দ্রব্যশক্তি ও দ্রব্যবীর্য। তাছাড়া এই আমড়ার মদ তৈরীর কথাও উল্লেখিত আছে, সেখানে তার নাম কপীতন; ওখানে বলা হ'য়েছে—অন্যান্য ফলজাত মদে যেমন বলাধান করে, মলশোধন করে, আমড়া তো তা করেই, তাছাড়া অপর ফলের তৈরী মদ দাস্তের সংকোচ নিয়ে

আসে, কিন্তু আমড়ার মদ সেটা হ'তে দেয় না। একথা চরক সংহিতার কল্পস্থানে বলা আছে। তবে আমড়া ব'লতে সেখানে মিষ্টি আমড়া না টক আমড়া তা বোঝা যায় না।

এরপর সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে ১০১ শ্লোকে বলা হয়েছে—আমড়া যদি মিষ্টি হয়, তবে তা বৃংহণ, বলকর, গুরু, তর্পক, স্নিগ্ধ কিন্তু শ্লেষ্মাকারক আর বৃষ্য এবং বিষ্টম্ভের সঙ্গে জীর্ণ হয়—

> মধুরং বৃংহণং বল্যমাম্রাতং তর্পণং গুরু। সস্নেহং শ্লেষ্মলং শীতং বৃষ্যং বিষ্টম্ভ জীর্য্যতি।

সুশ্রুত সংহিতায় আমড়ার উল্লেখ—সূত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ের ১৪২ সূত্রে। এখানে ফলবর্গের মধ্যে পাঠ, তবে এর গাছের ছালই ব্যবহারে প্রশস্ত এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। পরবর্তীযুগের গ্রন্থ বাগ্‌ভটেও যে তার অনুশীলন হয়নি তা নয়, তারপর চক্রদত্ত সংগ্রহে (একাদশ খৃষ্টাব্দের পুস্তক) তার ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। সকলেই সেই চরকের বক্তব্যকে সমর্থন ক'রে ব্যবহার ক'রে চলেছেন।

নামের শব্দ-ভেদ ও পরিচিতি

আম্র=আ+অততি অর্থাৎ অম্লরসের ঈষৎ অনুসরণ করে (অমরকোষ টীকা)। এই চরকীয় সম্প্রদায় এই ফলটির আর একটি নাম রেখেছেন "কপীতন"। কপীনাং ইং লক্ষ্মীং তনোতি অর্থাৎ কপিকুলের লক্ষ্মী বৃদ্ধি করে; নিকটে আমড়া গাছ পেলে কপিগৃহিণী অর্থাৎ বানরী ছুটে যায় শিশুপ্রসবের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আঁতুর ঘর ক'রতে, এর পাতা বানরের খুব প্রিয় খাদ্য কিংবা পথ্য; তার এই ভূমিকা দেখে এই ভেষজটির উপরিউক্ত নামটি রেখেছেন। গাছ ২৫/৩০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হ'তে দেখা যায়। একটি ডাঁটায় সমান্তরালভাবে কয়েক জোড়া পাতা ও ডাঁটার আগায় (অগ্রে) ১টি পাতা থাকে। অগ্রহায়ণের শেষ থেকেই পাতা ঝরতে সুরু করে, তারপর মাঘ-ফাল্গুনেই গাছে মুকুল হয়, তারপর ফল; কচি অবস্থায় ফলের বীজ নরম থাকে, পরে পুষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আঁটি শক্ত হ'য়ে যায়। বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্রই এটি পাওয়া যায়, অনেকে বেড়ার ধারে এটাকে লাগিয়ে রাখেন। কার্তিক-অগ্রহায়ণেই ফল পেকে যায়, পাকা আমড়ার একটি চমৎকার গন্ধ আছে। এই গাছটির বোটানিকাল্ নাম Spondias mangifera willd., ফ্যামিলি Anacardiaceae. উড়িষ্যার অঞ্চল বিশেষে আমজ নামে প্রচলিত। বিলিতী আমড়া ব'লে যেটা আমাদের কাছে পরিচিত, সেটার বোটানিকাল্ নাম Spondias dulcis willd. এটি আমড়ার সমগুণবিশিষ্ট, তবে দেশী আমড়ার থেকে মিষ্টি। আর এটি বহিরাগত, আমাদের দেশে বাগানে লাগানো হচ্ছে সত্যি, কিন্তু এটির মাতৃভূমি ফিজি আইল্যান্ড্, তাই আমরা তাকে বলি "বিলিতী", যেহেতু এটা বহিরাগত, তাই।

সংহিতাকারগণের আম্রাতক সমীক্ষা

১। **রেত-স্খলনে:—** যেই ভাবা, অমনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুক্র নির্গত হয়, সে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার অপেক্ষা রাখে না; সেক্ষেত্রে আমড়া গাছের মূলের অথবা ভূমিসান্নিধ্যের ছাল ভাল করে ধুয়ে থেঁতো করে এক চা-চামচ আন্দাজ রস একটু চিনি মিশিয়ে

সপ্তাহখানেক খেলে ঐ ঝরাটা আর থাকবে না।

২। **খস্‌খসে শরীরঃ—** চামড়ার কান্তির অভাবে যেন টিকটিকির চামড়ার মত, পা ফাটে, গায়ে হাত দিলে মনে হয় বালির দেওয়ালে হাত লাগছে, সাবান দিলেও তার শরীরে কোন চিক্কণতা ফিরে আসে না; এ ক্ষেত্রটি দেখলেই পাশ্চাত্য চিকিৎসকরা বলেন, ভিটামিনের অভাব; এই রকম যে ক্ষেত্র, সেখানে আমড়া গাছের ছাল থে'তো ক'রে সেই রস এক চা-চামচ ক'রে কিছুদিন খেতে হয়। এর দ্বারা ঐ দোষটা নিরসন হ'য়ে ত্বকের কান্তি ফিরে আসে।

৩। **পিত্ত বমনেঃ—** এই পিত্ত বমিটা শরৎকালে (ভাদ্র-আশ্বিনে) প্রায় হ'তে দেখা যায়; এক্ষেত্রে আমড়ার ছাল শুকিয়ে নিলে ভাল হয়, ৫ গ্রাম এক কাপ গরম জলে ভিজিয়ে রেখে ঘণ্টা দুই বাদে ছে'কে নিয়ে, অল্প অল্প ক'রে ঐ জলটা ৩/৪ বারে খেলে ঐ পিত্ত বমন বন্ধ হ'য়ে যায়; এটাও ঠিক যে, সাধারণের কবে প্রয়োজন হবে সেটার জন্য কেউ তুলে রাখবেন না সত্যি, কিন্তু যাঁরা বৈদ্য, এ সংগ্রহটা তাঁদের ক'রে রাখা উচিত।

৪। **অগ্নিমান্দ্যেঃ—** আমরা তো জানি আমের আমসত্ত্বই হয়, কিন্তু বৈদ্যদের ঝুলিতে আমড়া-সত্ত্বও আছে। বেশ সুপক্ক আমড়া—যেগুলি একটু সাদাটে এবং হলুদ রং-এর, সেগুলি অল্প মিষ্টরস হলেও সুস্বাদু হয়। আবার অল্প তিক্ত কষায় স্বাদের টোকো আমড়াও দেখা যায়—এগুলি দেখতে সবুজ, এটি নয় কিন্তু। ঐ উপরিউক্ত আমড়াকে রস ক'রে, যেমন আমসত্ত্ব করে—সেই পদ্ধতিতে শুকিয়ে রাখতে হয়, এ থেকে ৩/৪ গ্রাম নিয়ে ১ কাপ জলে ভিজিয়ে সেই জলটা অল্প অল্প ক'রে আহারের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে খেতে হবে। তবে এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হয়, যেখানে অম্লরস ক্ষরণের অভাবেই অগ্নিমান্দ্য হয়, সেখানেই এটা কার্যকরী।

৫। **দাহ রোগেঃ—** স্নান ক'রলেও গায়ের জ্বালা কমে না, মনে হয় যেন সর্বদা গায়ে লঙ্কা ঘষে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে—এটা বিদগ্ধ পিত্ত চর্মগত হ'য়েছে; এক্ষেত্রে স্নানের এক ঘণ্টা পূর্বে আমড়ার ছাল থে'তো ক'রে তার ৭/৮ চা-চামচ রস নিয়ে ১ কাপ জলে মিশিয়ে সেই জল দিয়ে শরীরটা মুছে দিতে হবে। আর এক ঘণ্টা বাদে তেল মেখে স্নান ক'রে ফেলতে হবে, তেল হিসেবে তিলেরই তেল ভাল। এই রকম ১ দিন বাদ ১ দিন ৩/৪ দিন মাখলে ঐ দাহটা আর থাকবে না।

৬। **অজীর্ণ ও দাহেঃ—** আম্‌তা-সাম্‌তা মল নির্গত হয়, রংটা সাদাটে, এর সঙ্গে পিত্তের সংযোগ যে নেই তা নয়, হাত-পায়ে একটু জ্বালা থাকে, আবার বৈকালের দিকে একটু চোখ জ্বালাও করে, মুখে বিস্বাদ, কিছু খেতে ভাল লাগে না; এক্ষেত্রে ৪/৫ গ্রাম আমড়াসত্ত্ব, নইলে পাকা পাওয়া গেলে একটা আমড়ার শাঁস এক কাপ জলে মিশিয়ে একটু চিনি দিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা উপরিউক্ত অসুবিধেগুলি চ'লে যায়। এটা ৩/৪ দিন খেলেই ফল পাবেন।

৭। **অরুচিতেঃ—** যমের অরুচি ব'লে একটা কথা আছে; এ কথার অর্থ কিন্তু যমেরও ভক্ষ্য নয়; মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক তারই উল্টো। যে কোন স্বাদের জিনিসই হোক না কেন, সে কোনটাই খেতে চায় না, অথচ ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যায়। এক্ষেত্রে আমড়া গাছের মাঝের অংশের ছালের রস ১ চা-চামচ আধ কাপ জলে মিশিয়ে এক টিপ লবণ ও মিষ্টি দিয়ে সরবতের মত ক'রে খেলে ঐ অরুচিটা সেরে যাবে।

৮। **গ্রহণী রোগেঃ—** যে দাস্ত দিনে ২/৩ বার হয়, অথচ রাত্রে কিছুই নয় *অথবা দু'বারেই আধ মাল্‌সা বেরিয়ে গেল কিংবা ৩/৪ দিন একটু একটু হ'চ্ছে, একদিন দেখা গেল অস্বাভাবিক পরিমাণে মল নির্গত হ'লো, এই রকম দাস্ত হওয়ার* ধরন, সেই ক্ষেত্রে আমড়া গাছের আঠা (আমড়া গাছে গ'দের মত আঠা বেরোয়) ৩/৪ গ্রাম জলে ভিজিয়ে রেখে একটু চিনি দিয়ে খেতে হয়, কিন্তু দু'বেলাই এটা খেতে হবে। এর দ্বারা ৪/৫ দিনের মধ্যে স্বাভাবিক দাস্ত হবে।

৯। **আমরক্তেঃ—** অজীর্ণ চ'লছে অর্থাৎ ভাল হজম হ'চ্ছে না অথচ বেশ চর্ব্য-চূষ্য ক'রে গুরুভোজন ক'রে চ'লেছেন—তার পরিণতিতে এলো আমাশা, তারপর একদিন বাদেই দেখা গেল রক্ত প'ড়ছে, এক্ষেত্রে আমড়ার আঠা ৩/৪ গ্রাম আধ কাপ জলে ভিজিয়ে রেখে তার সঙ্গে আমড়া গাছের ছালের রস এক চা-চামচ মিশিয়ে একটু চিনি দিয়ে খেলে ২ দিনের মধ্যেই ঐ রক্ত পড়া বন্ধ হ'য়ে যাবে এবং আমাশাও সেরে যাবে।

১০। **শুক্র গাঢ়ীকরণেঃ—** লোকে কথায় বলে 'আমড়ার আঁটি চুষবে?' ও বাবা, বৈদ্যের দৃষ্টি ঐ আঁটিও এড়ায়নি; যেখানে জলের মত শুক্র পাতলা হ'য়ে গিয়েছে, অল্প চিত্তচাঞ্চল্যেই ক্ষরণ হয়, সেখানে এই পাকা আঁটির জালের মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে যে নরম শাঁসটা থাকে (সেটি কিন্তু কষায়ধর্মী), সেটা চেপে অথবা অল্প থে'তো ক'রে, নিংড়ে নিয়ে, অল্প জল মিশিয়ে খেতে হবে। যদি মনে হয় সব সময়ে তো আঁটি পাওয়া যাবে না—তখন এটা সময়ে সংগ্রহ ক'রে রাখতে হবে, পরে ওটা জলে ভিজিয়ে থে'তো ক'রে ঐ রসটা খেলেই চ'লবে।

১১। **হাজায়ঃ—** জল ঘে'টেও হয়, আবার শুকনো হাজাও হয়—এক্ষেত্রে পাকা আমড়ার শাঁস ঐ হাজায় লাগিয়ে রাত্রিতে শুয়ে থাকলে পরের দিন কিছুটা উপশম হবেই, তবে জল ঘাঁটা বন্ধ করা যখন যাবে না, তখন হাজা কি আর একেবারে সার'বে? তবুও লিখে দিলাম।

১২। **রুচি ফিরাতেঃ—** আমড়ার কষায়াম্ল স্বাদের মুকুলের টকের আর জুড়ি নেই।

আজ নিবন্ধের শেষে আমার কৈশোর জীবনের কথা মনে প'ড়ে যাচ্ছে—গ্রামীণ একটা শ্লেষের কথা—"গায়ে নেই ছাল-চামড়া, দুধ দিয়ে খায় পাকা আমড়া"। সত্যিই দুধ ও চিনি দিয়ে পাকা আমড়া খুবই উপাদেয়; এ যেন প্রকৃতির দেওয়া গাঁয়ের 'রাস্‌বেরির আইস্‌ক্রীম্‌'।

কপিত্থ (কয়েৎবেল)

কৈশোরের গ্রামীণ জীবনের সব্যসাচী খুড়োর কথাগুলো যেন গায়ের আঁচড়ের মার্মাড়ির মত আমার মনে আঁক কেটে রেখেছে। তারই একটি গল্প এই কয়েৎবেলকে নিয়ে।

পাশের গ্রামের মৌসুমী সার্কাসের হাতীর কথা উঠতেই খুড়ো ব'ললে—জানিস, হাতী কৎবেল খায়, পরের দিন আস্ত কৎবেল লাদের সঙ্গে বেরোয়, তার মধ্যে শাঁস থাকে না।

প্রশ্ন ক'রেছিলাম—সেকি? এটা হয় নাকি!

হ্যাঁরে হয়, তা না হ'লে 'গজ পণ্ডিত' শ্লোক আওড়ে ব'লবে কেন—"গজভুক্ত-কপিত্থবৎ"।

সেদিনকার খুড়োর গল্পের ইমেজ্ ছিল আমার কাছে ইন্দ্রজালের মত।

পরবর্তী জীবনে এই ইন্দ্রজালের ভুল ভেঙ্গে গেল, যখন দেখলাম যে কথা আছে—'গজভুক্ত কপিত্থবৎ'। আসলে এ গজ হাতী নয়—এক প্রকার সূক্ষ্ম কীট, কয়েৎবেলে প্রবেশ ক'রে তার শাঁসগুলি খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়, অথচ শক্ত খোলাটি (বহিরাবরণটি) ঠিকই থাকে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তাই এই বাস্তব উপমা অন্তঃসারশূন্য কোন ব্যক্তিকে উপলক্ষ ক'রে। যেমন ধনীর সংসারকে লক্ষ্মীর অন্তর্ধানের পরও তো গজভুক্ত কপিত্থ বলা যায়। এখন দেখা যাক, ফলবান এই ভেষজ বৃক্ষটি আর্য গ্রাহ্য, না প্রাক্-আর্য গ্রাহ্য?

চিরাচরিত রীতিতে দেখা যাচ্ছে—চরক ও সুশ্রুত এই দু'খানি প্রাচীন আয়ুর্বেদিক সংহিতা গ্রন্থে যেসব বনৌষধির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই তার আদি উৎস হয় ঋক্ বা যজু অথবা অথর্ববেদ, কিন্তু এই একটি ফলবান ভেষজ বৃক্ষ—যেটি চরক সুশ্রুতে বিভিন্ন অংশে ব্যবহৃত; কিন্তু বেদোক্ত নয়। তবে পাওয়া যে

যায়নি তা নয়; এটার উল্লেখ আছে উপবর্হণ সংহিতার ১১/২৭ সূক্তে বা শ্লোকে। যদিও এই সংহিতাটি অথর্ববেদের বহুকাল পরে সংকলিত, তথাপি এটার আভিজাত্য আছে; কারণ এই সংহিতার সংকলক যাঁরা, তাঁরাও আর্যধারার উত্তরসূরী ও বাহক। এঁরা কিন্তু প্রাক্-আর্য সভ্যতা বা নগর-সভ্যতার (যাকে এক কথায় বলা হয় দ্রাবিড় সভ্যতা) প্রভাবে প্রভাবিত। এঁরা তুক্‌তাক্, মাদুলী, কবচ এসব ধরনের চিকিৎসায়ও বিশ্বাসী। সব থেকে মুশকিল হ'য়েছে—বৈদিক কাল্‌চার আমাদের কাছে সব

পোঁছায়নি তো, হারিয়েছেও বহু। তাই যখন চরক-সুশ্রুত সংকলিত হয়েছে, তখন বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব এই প্রাচীন গ্রন্থে অনুপ্রবেশ ক'রেছে; তার প্রমাণ পাওয়া যায় চরকে পালি শব্দের অনুপ্রবেশ দেখে; যেমন এক জায়গায় বলা হ'য়েছে 'খুড্ডাক গর্ভাবক্রান্তি'; এই খুড্ডাক শব্দটির অর্থ 'ক্ষুদ্র'।

তা যাক, এই কপিত্থ বৃক্ষ বা কয়েৎবেল গাছটা সম্পর্কে দ্রাবিড়দের কাছ থেকেই

তার সূত্র জানতে পারা গেছে—সে তথ্যটির অকাট্য প্রমাণ উপবর্হণ সংহিতার ভাষ্যকার উবটের বক্তব্যে। উপবর্হণে উল্লিখিত আছে—

> আবর্ত্তং চ আর্দ্রস্বরং প্রাকৃতং বাতকৃৎ কর্ষম্।
> কপিত্থং বভ্রং না কাময়ে দ্রঢ়ং পৈঙ্গলং গরণুৎ পর্ণধ্বৎ॥

উবট্ এই সূক্তটির ভাষ্য ক'রেছেন—

> কপিত্থং তু পর্ণধ্বৎ ন চিরং পত্রাণি বিধত্তে, আবর্ত্তং চ বর্ণলোপাৎ আর্য্যাবর্ত্তে ন জায়তে। আর্দ্রং স্বরং ইতি অপক্কে স্বরহৃৎ, অপিচ বাতকৃৎ কর্ষংচ গন্ধকৃৎ পক্কে, প্রাকৃতং=নার্য্যসেব্যং, কপিরিতি ধূসরবর্ণং পক্কাপক্কয়োঃ তদেব তিষ্ঠতি। বভ্রং=পাণ্ডুরবর্ণং তৎ ন কাময়ে দ্রঢ়ং চ দ্রাবিড়সিন্ধং পৈঙ্গলং তথাপি গরণুৎ।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—কপিত্থ হ'লো পর্ণধ্বৎ, এটি চিরহরিৎ নয়, পত্র-গুলিকে সংবৎসরটাই ধারণ করে না বৃক্ষ। এটির আবর্ত অর্থাৎ মধ্যের 'র্য্য' বর্ণটি বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে, তাই সে আবর্ত হ'য়ে আছে, আর্যাবর্ত-জাত নয়। এটি দ্রাবিড়সিন্ধ ফল। কপিত্থ নামের কারণ, কপি অর্থ ধূসরবর্ণ—এই ফলটি পক্কাপক্ক উভয় অবস্থাতেই ধূসর বর্ণ ধারণ ক'রে থাকে; এটি আর্য-সেব্য নয়, এটি স্বরহরণকারী, বাতকর, তবে গন্ধযুক্ত। এটি কামনা করি না, তবে এটি বিষহর ফল।

বৈদ্যকের নথি

উপবর্হণ সংহিতার সূক্তে এবং উবটের ভাষ্যে কপিত্থ ফলটির জন্ম, কর্ম, বর্ণ, দোষ-গুণ প্রায় সবই বলা হ'য়েছে। তার সঙ্গে আমাদের দু'টি ভুল ধারণাই বলি আর সংস্কারই বলি, সেটা ভেঙ্গে গিয়েছে; তার একটি হ'লো—তার কপিত্থ নামকরণটির আর দ্বিতীয়টি হ'লো—সে অবৈদিক হ'য়েও চরক সুশ্রুতে তার স্থান। শুধু তাই নয়—তার ভৈষজ্য শক্তির গবেষণাও হ'য়েছে।

তবে দেখা যাচ্ছে—এই ভেষজটি চরকের দু'টি স্থানে উল্লেখিত, তার মূল্যবত্তাও খুব; প্রথম সূত্রস্থান, দ্বিতীয় বিমানস্থান, বিমানস্থানকে আধুনিক ভাষায় বলা যায় এটি রসায়ন বিজ্ঞান, তবে কেমিস্ট্রী নয়। দ্রব্যের রসবিজ্ঞানের নাম বিমান। আর সূত্রস্থানের প্রাধান্য দু'টি কারণে; প্রথম হ'লো—প্রায় ভেষজগুলি বেদোক্ত নির্দেশের পর সংগ্রহ ক'রে তার শ্রেণী বিভাগ; আর দ্বিতীয় কারণ হ'লো—সূত্রস্থানের ভেষজ-গুলি চিকিৎসা ও কল্পস্থানে উল্লেখ করা।

চরক সংহিতার সূত্রস্থানে এইজন্য বেদোক্ত শ্রেণীতে কপিত্থকে স্থান না দিয়ে কপিত্থকে বিরুদ্ধ আহারের প্রতিক্রিয়াকারী ফলের মধ্যে গণ্য করা হ'য়েছে (চরক সূত্রস্থান ২৬ অধ্যায়, ১০০ শ্লোকে) এবং কপিত্থফলের দোষ-গুণের বর্ণনায় (ঐ ১০৯ শ্লোকে) তাকে বলা হ'য়েছে কাঁচা কপিত্থ (কয়েৎবেল ফল) বিষনাশক (এটি উপবর্হণ সংহিতায়ও বলা আছে), স্বরনাশক (এটিও উপবর্হণে বলা আছে), সংগ্রাহী, বাতকৃৎ; আর পাকা কপিত্থ মধুর, অম্ল, কষায় রস, সুগন্ধ ও গুরুপাক।

সুশ্রুতের দ্রব্য পর্যায়ে সূত্রস্থানের ৩৮ অধ্যায়ে কয়েৎবেলের গণবাচিতা জানিয়ে (এটি আছে ন্যগ্রোধাদিগণে) তাকে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিষরোগে (কল্পস্থানে),

বমনে এবং বাহ্য ব্যবহারেও উল্লেখিত হ'য়েছে। বাগ্‌ভটে, ভাবপ্রকাশেও কপিত্থের প্রয়োগ দেখা যায়।

পরিচিতি

এই গাছ ভারতের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে রাস্তার ধারে যেমন রোপণ করা হয়, তেমনি যত্রতত্র স্বাভাবিকভাবেও জন্মে; আবার ফলবৃক্ষ হিসেবেও রোপণ করা হয়। এই গাছের উচ্চতা ৩০/৪০ ফুট পর্যন্তও হ'য়ে থাকে। ঝোপ-ঝাড় গাছ হ'লেও এর পাতা দেখতে অনেকটা কামিনীফুল গাছের (Murraya exotica) পাতার মত, কিন্তু একটু মসৃণ ও সুগন্ধযুক্ত, পত্রদণ্ডের দু'দিকে ৫/৭টি পাতা থাকে। বর্ষার প্রথমে সাদা সাদা ফুল ও পরে ফল হয়। সেই ফল পুষ্ট হ'য়ে পাকে পৌষ-মাঘ মাসে। সে সময় গাছের পাতা ঝরে প'ড়ে প্রায় শূন্য হয়। ফল গোলাকার, ধূসরবর্ণ, বহিরা-বরণটা (খোলা) বেশ শক্ত; অপক্ক শাঁসের স্বাদ কষায়াম্ল, পাকলে মধুর অম্লাস্বাদ হয়। ফলে বীজ বহু এবং একটু চ্যাপ্টা. পাকা শাঁসের রং কৃষ্ণাভ ধূসর, কিন্তু বিশিষ্ট গন্ধযুক্ত। ফল বিলম্বে পাকে ব'লে এর "চিরপাকী" নাম. এরূপ অনেকে মন্তব্য করেন। বাংলায় এর প্রচলিত নাম কৎবেল; হিন্দিতে এর নাম কৈথ্, কৈ'ত ও কয়েদ্। উড়িষ্যার অঞ্চল বিশেষে একে কৈঠ বলে। এটির বোটানিকাল্ নাম Feronia limonia (Linn.) Swingle. পূর্বে এটির নাম ছিল Feronia elephantum correa., ফ্যামিলি Rutaceae. ঔষধার্থে ব্যবহার হয়—পাতা. ছাল, কচি ফলের শাঁস, পাকা ফলের শাঁস. গাছের আঠা।

লোকায়তিক ব্যবহার

এর প্রয়োগবিধি লিখতে বসে এখানে যদি না ব'লে রাখি যে, ইনি অবৈদিক ভেষজ হ'লেও সমাজে তার স্থান পাওয়ার অসুবিধে হয়তো হবে না. তবে পংক্তিভুক্ত ক'রতে গেলে জানিয়ে রাখার দরকার আছে বৈকি. তাই লৌকিক ব্যবহারগুলিকে উপজীব্য ক'রে ব'লতে হ'চ্ছে—এটি আমাদের শরীরের মধ্যে যে রসবহ স্রোত আছে, সেখানেই কাজ করে।

রোগ প্রতিকারে

১। **পিত্ত পাথুরীতে** (Gall stone)**:—** এই রোগ পূর্বে হয়েছিল বা হয়নি অথবা এখন পাথুরীটা (calculus) সবে কঠিনীভূত (crystallized) হ'তে সুরু ক'রেছে—এক্ষেত্রে কয়েৎবেলের পাতার রস (কচি হ'লে ভাল হয়) এক চা-চামচ ক'রে সকালে ও বৈকালে দু'বার খেতে হবে. এর দ্বারা যে অসুবিধেটা আসছিলো, সেটা আর আসবে না।

২। **পেটে বায়ু:—** দিনে বিশেষ কিছু নয়, রাতে বেশ বায়ু নিঃসরণ হ'লেও আবার ভর্তি—এক্ষেত্রে সকালে ও বৈকালে কয়েৎবেলের পাতার রস আধ চা-চামচ একটু জল মিশিয়ে, সকালে ও বৈকালে দু'বার খেতে হবে।

৩। **শ্বেত বা রক্তপ্রদরে:—** রমণীদের, সে যে বয়সেই হোক, অন্তঃসারশূন্য ক'রে

দেয়। এর লক্ষণ সম্বন্ধে 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হ'য়েছে। এই প্রদর রোগের ক্ষেত্রে গুণ্‌তিতে কয়েৎবেলের দু'টি পাতা ও একটা বাঁশ-পাতা একসঙ্গে বেটে, জলে গুলে সরবতের মত খেতে হবে। এই রকম কয়েকদিন খেলে স্রাবটা বন্ধ হ'য়ে যাবে।

৪। **প্রবল রক্তপিত্তে:—** এর লক্ষণ 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩২১ পৃষ্ঠায় বলা হ'য়েছে। এক্ষেত্রে কয়েৎবেলের পাতার রস এক চা-চামচ ক'রে, একটু জল মিশিয়ে দু'বেলা খেলে রক্তস্রুতিটা ক'মে যাবে।

৫। **আমাতিসারে:—** মলের সঙ্গে আম (Mucus) তো থাকবেই, এমনকি রক্তও এর সঙ্গে একটু একটু যাচ্ছে—এক্ষেত্রে কাঁচা কয়েৎবেল থে'তো ক'রে, ছে'কে সেই রস এক চা-চামচ নিয়ে, তার সঙ্গে একটু দই মিশিয়ে এই রকম দু'বেলা খেতে হবে।

৬। **অন্নজাত হিক্কায়:—** যাকে আমরা চল্‌তি কথায় হে'চ্‌কি ওঠা বলি, এক্ষেত্রে যদি সম্ভব হয় কাঁচা কয়েৎবেলের রস এক চা-চামচ, একটু জল মিশিয়ে খেতে দিলে ওটা বন্ধ হ'য়ে যাবে।

৭। **প্রবল বমিতে:—** পিত্তশ্লেষ্মাজনিত জ্বরে, অথবা কোন কারণে অজ্ঞাতে কোন অখাদ্য জিনিস খাওয়ায় কিংবা কোন দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য বমির হেতু হ'লে এক চা-চামচ কয়েৎবেলের রসের সঙ্গে পিপুলের গুঁড়ো (Piper longum) দুই/এক টিপ্ (দুই/এক গ্রেণ আন্দাজ) মিশিয়ে, চেটে খেলে যে কোন কারণের জন্য বমি হোক না কেন, সেটা বন্ধ হ'য়ে যাবে।

৮। **প্রবল শ্বাসে:—** পাকা কয়েৎবেলের শাঁস চ'টকে নিয়ে, ছে'কে, ৫/১০ ফোঁটা খেলে শ্বাসের কষ্টটার কিছু লাঘব হবে।

৯। **ব্রণ ও মেচেতায়:—** কাঁচা কয়েৎবেলের রস, মুখে ঘষে লাগাতে হবে। তবে আজ মেখে, কাল আয়নায় দেখে হাল ছাড়লে চ'লবে না, বেশ কিছুদিন মাখতে হবে।

১০। **চোখের পাতা পড়ে যাচ্ছে:—** এ রোগটা অনেকের দেখা যায়, এক্ষেত্রে কয়েৎবেলের ফুল বেটে অঞ্জনের মত লাগালে ওটা সেরে যাবে।

এখনও যেকথা বলা হয়নি, সেটা হ'লো—বেল বলতে দু'রকম বুঝি, বেল (বিল্ব) ও কৎবেল বা কয়েৎবেল, যাকে আমরা সাধু ভাষায় কপিত্থ ব'লে থাকি; এ দু'টির সংস্কার কিন্তু পৃথক; প্রকৃতিটা যে এদের পৃথক হবে, সেটা তো জাগতিক ধারা।

চিরঞ্জীব বনৌষধির প্রথম খণ্ডে বেল (বিল্ব) সম্পর্কে লেখা হ'য়েছে—এই বিল্ব ফলটি যখন রসে-বসে এ'লো, তখন সে হ'লো মিছরির ছুরি; আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ কয়েৎবেল বা কপিত্থটি যখন রসে-বসে ভরপুর হ'লো, তখন তার যেন বারবনিতার ভূমিকা, প্রথম ভাগে রুচিকর; তারপর?

CHEMICAL COMPOSITION

Essential oil, estragol.

কান্তার (ইক্ষু)

'স্বর্গ' হ'য়ে 'নাক' এসে মুখের শোভাবর্ধনকারী শ্বাস-প্রশ্বাসের অববাহিকা হ'লো; তাকেই না পণ্ডিতগণ ব'লেছেন নাসিকা। আবার তখনকার যুগে 'সন্দেশ' যে ছিল, তাকে 'খবর' করার কি দরকার ছিল? হোক না "কান্তার" দুর্গম, তবুও সেখানেও ইক্ষু (আখ) হ'য়ে আছে।

এই ইক্ষু তৃণদণ্ডটির নাম মনে আসার পর তাতে মিষ্টরসের কথা জ্ঞান হওয়া থেকেই জেনে আসছি বংশ পরম্পরায়; অথচ এটা চোখে দেখে কি বোঝা যায় যে, এই দণ্ডটি মধুময় হ'য়ে আছে সেই যুগ-যুগান্তর কাল থেকে? কিন্তু ইক্ষুর পণ্ডিতি ভাষ্য ইষ্-এ ক্সু প্রত্যয় ক'রে ইক্ষু হ'য়েছে, এটার দ্বারা তাতে যে মিষ্ট রসের নাম-গন্ধ আছে, সেটা কি বোঝা গেল? তবুও আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হ'লো—এটা মিষ্টরসের দণ্ড—মধুযষ্টি।

তাই ব'লছিলাম এই ইক্ষু শব্দটিকে আর্যধারার অর্থাৎ গতিশালী ধারার (আর্য অর্থে গতিশালিতা যার আছে) আদি পুরুষের সমীক্ষিত অর্থে দেখা গেল ইক্ষু শব্দের অর্থ হ'লো 'অসি পত্র' অর্থাৎ 'তলোয়ারের মত পাতা', তখনই সংবিৎ ফিরে এলো—সত্যিই তো এর পাতাগুলির দু'পাশেই ধার, একটু উল্টোপাল্টা লাগলেই তো হাত কেটে যায়। তাই তো ধূর্ত শৃগালদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আখ একটু লম্বা হ'লেই এর শুকনো পাতাগুলি দিয়ে গাছের গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়।

এই আলোচ্য নিবন্ধে আপনার মন এতটা পরিক্রমা ক'রলো সত্যি, কিন্তু সেই আর্যধারার বাহক যাঁরা, তাঁরা আপনাদের চোখে ধোঁয়া দিয়েছেন। এটাতে আমাদের চোখ কতটা ঘোলাটে হ'য়ে গিয়েছে পরে ব'লছি। এখানে মনে পড়ে এক জন্মান্ধের

দুগ্ধে ভয়ের একটা গল্প।

পুত্রকে জিজ্ঞাসা—হ্যাঁরে খোকা, দুধের রং কেমন? কেন, সাদা বকের মত! তা তো হ'লো—সাদা বক কেমন? কেন, কাস্তের মত! সেটা আবার কি রকম? তখন ছেলে বিরক্ত হ'য়ে আঙ্গুলে কাস্তেটা টেনে দিয়ে তার স্বরূপটা বুঝিয়ে দিলে। তখন জন্মান্ধ বাবার দুধ যে কি—সে বোঝার সাধ মিটে গেল; ব'ললে, ও বাবাঃ, দুধে এত ধার? দুধ আর খাব না।

ভাবছি, আজ আমাদের ইক্ষু সমীক্ষার অবস্থাটাও সেইরকম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এতক্ষণ যে ধোঁয়াটার মধ্যে ছিলেন, সেটা যেই স'রে যাবে অর্থাৎ হ'টে গিয়ে বৈদিক যুগে যখন যাবেন—তখন দেখতে পাবেন 'নাক' মানে স্বর্গ, সন্দেশ মানে 'খবর' আর "কান্তার" হ'লো ইক্ষু (আখ)। এইরকম হাজার হাজার শব্দের রদ-বদলের পালা। এখন যেটা নিয়ে গাইতে ব'সেছি—দেখুন তো তার আদি বয়ানটা কি এই ছিল না?

অয়ং স ইক্ষুর্যস্মিন্ সোমমিন্দ্রঃ সুতং দধে।
কান্তারঃ সহস্রশ্রিয়ং কামধরণং শনয়ধ্বম্॥

(অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ৩১২।৬।৭৫)

এই সূক্তের মহীধর ভাষ্য হ'লো—

অয়মেব স কান্তারঃ, কস্য=জলস্য কান্তং=মধুরং ঋচ্ছতি=দধাতি ঋ+অস্ স এব ইক্ষুরিতি ইষ্+ক্সু, অসি পত্রং যস্য। যস্মিন্ ইন্দ্রঃ সোমং মধু মদ্যং বা সুতং রসঃ, নিষ্পীড়নে সু+ক্ত যত্র তদ্ দধে। জঠরেঽপি মদ্যং বাবশানঃ বহুলং। স সহস্রশ্রিয়ং সহস্রার্হম্ কামধরণং কামস্য সম্পাদকং শনয়ধ্বম্ সেবধ্বম্॥

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—এইটিই সেই কান্তার, অর্থাৎ ক হ'লো জল আর তাতেই

মধুর রস বা কান্ত অর্থাৎ মধুর রস যে দান করে; আর এটি ইক্ষুও। কারণ ইষ্+ক্সু প্রত্যয়ে যে অর্থ, সেটি হ'লো অসি পত্র (অসি মানে তলোয়ারের আকৃতি যার পত্র)। ইন্দ্র এতেই মধুর রস গ্রহণ করেন, এটি নিষ্পীড়ন ক'রেই এর রস সংগৃহীত হয়। তাই এই ভেষজ অসি পত্রের দ্বারা আত্মরক্ষা করে, সেই রস বহুল মদ্য দান করে। এটি জঠরেও মদ্য দেয়। এ সহস্র শক্তিতে কাম ধারণ করে।

অতএব বৈদিক সূক্তের ভাষ্যের অর্থে আমরা পাচ্ছি—এই ভেষজটির নাম কান্তার। এটির পত্র অসির মত। আর একে নিষ্পীড়ন ক'রেই রস সংগৃহীত হয়, আর সেই রস থেকেই মদ্য প্রস্তুত করা হয়। এর রস জঠরাগ্নিতে পাক হ'লেও মদ্যশক্তির ক্রিয়া করে। সেই মদ্য কামশক্তির বর্ধক।

প্রকৃতপক্ষে ইক্ষুর রস পান করলেও মত্ততা আসে, আবার মদ্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান ইক্ষু রসই।

বৈদ্যকের দৃষ্টিকোণে

বৈদিক সূক্তে ও তার ভাষ্যে এইটুকু পেয়ে সংহিতাকারগণ তার অনুশীলনে ত্রুটি করেননি এবং এটার ব্যাপকভাবে রোগ-প্রতিকারে যে ভৈষজ্যশক্তি আছে—তাকে কাজে লাগিয়েছেন। তাছাড়া আছে যুগ-যুগান্তরের লোকবৈদ্যদের অনুশীলন।

সংহিতার অন্তরে

চরকের সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে ইক্ষুর শ্রেণীভেদ এবং তার রসের তারতম্য কিভাবে সংঘটিত হয়, তার বিশদ বর্ণনা দেখা যায়। তাছাড়া বেদে যে এতে সোমের সঞ্চার বলা হ'য়েছে, চরকে তারও পরিচয় ২৬ অধ্যায়ে (সূত্রস্থান)। ওখানে বলা হ'য়েছে—যেখানে সোমগুণের আধিক্য, সেইখানেই মধুর রস, আর সেই সোমগুণে আবার পঞ্চভূতাত্মক উপাদানের কম-বেশী মাত্রার সঞ্চার থাকায় এবং কালগত শক্তির বৈপরীত্য থাকায় বায়ু, পিত্ত ও কফ-কারকতারও তারতম্য হয়, আবার অহোরাত্রবশতও ভৌতিক উৎকর্ষ-অপকর্ষও সাধিত হয়। অর্থাৎ সোমগুণ এমন একটি শক্তি ধারণ করে, যেটিকে আমরা যোগবাহী মনে করি অর্থাৎ সোমশক্তি অত্যন্ত স্পর্শবাহী শক্তি, সেইজন্যই সোমরস মাত্রেই যে একক ব্যাধি দূর করে, তা করে না; কারণ তার সূক্ষ্মতম উপাদান কারণের বৈচিত্র্যের জন্যই তার গুণগত তারতম্য ঘটে। এটি চরক সংহিতার সূত্রস্থানের ২৬ অধ্যায়ের অভিমত।

এখন দেখা যাচ্ছে, এই ইক্ষু ভেষজটিকে প্রধানভাবে মূত্রজনক দ্রব্যের অন্তর্গত করা হ'য়েছে এবং মূত্র-সংক্রান্ত প্রতি পীড়াতেই এর উপযোগিতা দেখানো হ'য়েছে। চরকের সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে ইক্ষুর দুটি শ্রেণীভাগ দেখানো হ'য়েছে—একটি পৌণ্ড্রক আর একটি বংশক। আর সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৪৫ অধ্যায়ে এর শ্রেণী ১২টি ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। টীকাকার ডল্বন এটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষ মন্তব্য ক'রে ব'লেছেন—ইক্ষুর রস গাঢ় ও তরলাবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যেরও পার্থক্য হয়। এটি নব্য বিজ্ঞানীরাও স্বীকার ক'রে থাকেন।

পরিচিতি

ভারতের প্রায় সর্বত্র আখের চাষ হ'লেও উত্তর প্রদেশ ও বিহারের অঞ্চল বিশেষে

ব্যাপকভাবে চষ হয়, সেইজন্য চিনির কল ঐ অঞ্চলেই বেশী।

এই তৃণজাতীয় উদ্ভিদ সম্পর্কে পরিচিতির প্রয়োজন বিশেষ ব'লে মনে হয় না, তবুও বলি—আখের প্রতি পর্বে (গাঁটে) শিকড় বেরোয়, ঐ পর্বগুলিকে মাঝখানে রেখে ২/২½ ইঞ্চি টুকরো ক'রে কেটে নিয়ে চৈত্র-বৈশাখে ক্ষেতে বসানো হয়; ঐ পর্বের চোখ থেকেই গাছ হয়। এই জাতীয় গাছকে বৃক্ষায়ুর্বেদে বলা হয়েছে পর্বযোনি।

অঞ্চল বিশেষে আখের মিষ্টতার তারতম্য হয়, তাই লবণাক্ত অঞ্চলের আখের গুড়ে লবণ রসের মিশ্রণ ঘটে; সেটা দেখা যায় মাদ্রাজ অঞ্চলেই বেশী।

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসেই আখ মাড়াই আরম্ভ হয়, পৌষ-মাঘ মাসেই আখ গাছে কাশফুলের মত ফুল হয়।

আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ চরকের সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে পৌণ্ড্রক ও বংশক এই দুই প্রকার আখের কথা বলা আছে এবং সুশ্রুতে বলা আছে দ্বাদশ প্রকার আখের কথা। তার সবগুলি খাওয়ার উপযোগী না হ'লেও নিশ্চয়ই ঔষধার্থে তার উপযোগিতা ছিল।

তাদের নাম হ'লো—পৌণ্ড্রক, ভীরুক, বংশক, শতপোরক, কান্তার, তাপসেক্ষু, কাষ্ঠেক্ষু, সূচীপত্রক, নৈপালী, দীর্ঘপত্র, নীলপোর ও কোশকৃৎ। ষোড়শ শতকের ভাবপ্রকাশ নামক আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে এইসব ইক্ষুর গুণের পৃথক পৃথক বর্ণনা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে কোন্‌টির কি নাম সেটা আজও নির্ণয় করা সম্ভব হ'চ্ছে না, তাই প্রচলিত যে আখ, তারই নাম ও গুণাদির বর্ণনা দেওয়া হ'লো। এটির বোটানিকাল্ নাম Saccharum officinarum Linn., ফ্যামিলি Graminae. উড়িষ্যার অঞ্চল বিশেষে এটি আখু। ঔষধার্থে ব্যবহার হয় রস, তা থেকে প্রস্তুত গুড়, চিনি প্রভৃতি এবং গাছের মূল।

লোকায়তিক ব্যবহার

১। **রক্তপিত্তে**:— এই রোগটি সম্পর্কে আলোচিত হ'য়েছে 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডে। তবুও বিশেষ বক্তব্যটি এখানে লিখছি—যেখানে কফের প্রাধান্য থাকবে সেখানে চ'লবে না, যেখানে পিত্ত প্রাধান্যের লক্ষণ থাকবে, যেমন চোখ-মুখ জ্বালা, হাত-পা জ্বালা, বৈকালে জ্বর-ভাব অথচ জ্বর নয়, সকালের দিকে মুখে তিক্তাস্বাদ; এই ক্ষেত্রে আখের রস ৩/৪ চা-চামচ ক'রে দুইবার খেতে হয়।

২। **পৌরুষগ্রন্থির স্ফীতিতে (প্রোস্টেট্ গ্ল্যান্ড্)**:— অনেক সময় দীর্ঘদিনের পুরনো আমাশা বা গ্রহণী রোগেও এই স্ফীতিটা আসে, সেক্ষেত্রে আখের রস ৩/৪ চা-চামচ ক'রে বেশ কিছুদিন খেতে হবে; তবে যদি ডায়েবেটিস্ মেলিটাস (মধুমেহ) রোগ থাকে, এক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করা চ'লবে না।

৩। **পাণ্ডুরোগে**:— এটা কিন্তু ন্যাবা বা কামলা রোগ নয়। এর লক্ষণ—প্রস্রাব সর্বদাই সাদা হয়, গায়ের রং ফ্যাকাশে, উত্তাপও (বাহ্য) কম। এ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তির যদি মূত্রকৃচ্ছ্র হয়, তাঁরা আখের রস ৭/৮ চা-চামচ ১ কাপ জলে মিশিয়ে খেয়ে দেখুন; আরও চমৎকার উপকার পাওয়া যায়, যদি এর সঙ্গে খই-এ একটু ঘি মেখে খেতে দেওয়া যায়।

৪। **শর্করা রোগে**:— এই শর্করা শব্দের অর্থ কিন্তু চিনি নয়, দেখতে আকারে ছোট দানার চিনির মত। এটি রসবহ স্রোত দূষিত হ'লেই সৃষ্টি হয়; সেটা আমাদের রসস্রোতে যে পিত্তধাতু আছে, সেটাই ঘনীভূত হ'য়ে এই চিনির আকার সৃষ্টি হয়।

এক্ষেত্রে আখের রস মিষ্টি ব'লে তার জন্য কোন অপকার হয় না; যেহেতু আখের রস শীতবীর্য, তবে তার ক্রিয়াকারিত্বকে স্বাভাবিকতায় নিয়ে আসার জন্য প্রাচীনগণের উপদেশ—একটু উষ্ণগুণধর্মী গোলমরিচের (piper nigrum) গুঁড়ো মিশিয়ে খাওয়া। আখের রসের মাত্রা ২৫ থেকে ৩০ মিলিলিটার হওয়া উচিত, অর্থাৎ আধ ছটাক থেকে এক ছটাক আন্দাজ; তবে কম কি বেশী রস খাওয়ানো হবে, সে বিচারটা রোগ ও অগ্নিবলের অবস্থার উপর নির্ভর করে। আর মরিচের গুঁড়ো আধ বা এক গ্রাম মিশিয়ে খেলেই চলবে।

৫। **কৃশতা রোগে:—** গর্ভাবস্থায় মায়ের পেটে কোন পুষ্টিকর খাদ্য পড়েনি, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুও ভাল পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পায়নি, এ শিশুর শরীরের পুষ্টি আর কিছুতেই হ'চ্ছে না, যত ভিটামিনই খাওয়ানো যাক না কেন। এক্ষেত্রে আখের রস চা-চামচের ৪/৫ চামচ থেকে ৭/৮ চামচ পর্যন্ত ২/৩ চা-চামচ চূণের জল মিশিয়ে খেতে দিতে হয়।

এই চূণের জল তৈরী করারও একটা পদ্ধতি আছে—বাখারি অর্থাৎ শামুক, যাকে চলতি কথায় জোংড়া বলে অথবা সামুদ্রিক ঝিনুক পোড়া নিয়ে ১৬ গুণ জলে ভিজিয়ে যে চূণ হবে, সেই চূণের জল ব্যবহার ক'রতে হবে। প্রথমে অল্প গরমজল দিয়ে ঐ পোড়া শামুক বা ঝিনুকগুলোকে ফুটিয়ে নিয়ে, সেটাতে বাকী জল মেশাতে হবে। পরের দিন থেকে উপরের স্বচ্ছ জল খাওয়ানোর জন্যে নিতে পারা যাবে।

৬। **বুকে আঘাতজনিত কাসিতে:—** বুকে সর্দি নেই তবুও কাসি হয়, একটু ব্যথাও আছে, এটা যে সর্বদা থাকে তা নয়, অথচ মাঝে মাঝে হয়। এখানে চিকিৎসকের অনুসন্ধানের বিষয় থাকে—পূর্বে বুকে কোন জোরে আঘাত লেগেছিল কিনা, অথবা কোন জিনিস তুলতে বা টানতে গিয়ে ঐ ব্যথা সৃষ্টি হ'য়েছিল কিনা। পূর্বেকার এই ইতিহাস যদি থাকে, তবেই এই আখের রসে গরম ঘি মিশিয়ে খেলে কাসিটা সেরে যাবে। আখের রস নিতে হবে ৭/৮ চা-চামচ, আর ঘি নিতে হবে আন্দাজ ২ চা-চামচ।

৭। **পৌরুষগ্রন্থির ব্যথায়:—** আমের দোষ যাঁদের আছে, তাঁরা প্রস্রাব ক'রতে ব'সেই ভয়ে কেবল মলদ্বার সঙ্কুচিত করতে থাকেন পাছে গ'লে যায়। এই যে মলদ্বারকে সঙ্কোচনের অভ্যেস, এটা দীর্ঘদিন চ'লতে চ'লতে পৌরুষগ্রন্থির সঙ্কোচন আরম্ভ হয়; তার ফলে মূত্রত্যাগে কৃচ্ছ্রতা আসে। এই ক্ষেত্রে আখের রস ২৫ থেকে ৫০ মিলিলিটার অর্থাৎ আধ ছটাক থেকে আন্দাজ এক ছটাক পর্যন্ত রস সমান পরিমাণ জল মিশিয়ে খেতে হয়, দরকার বুঝলে বৈকালের দিকে আর একবার খাওয়া যায়। এটি সপ্তাহখানেক ব্যবহার করলে এই কৃচ্ছ্রতা ক'মে যাবে।

বাহ্য প্রয়োগ (External application)

৮। **নাসা রোগে:—** এ রোগের লক্ষণ হবে—প্রায়ই নাক বন্ধ হ'য়ে যায়, কোন Nasal drop নিলে সাময়িক নাকটা খুলে যায় বটে, আবার খানিকক্ষণ বাদে বন্ধ হ'য়ে যায়, এ'দের হাঁ ক'রে ঘুমনো অভ্যেস, এ'দের কোন কোন সময় নাক দিয়ে রক্তও পড়ে। এক্ষেত্রে আখের রসের নস্যি প্রত্যহ ২/৩ বার ক'রে নিতে হয়, এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যায়।

এর পর একটা কথা মনে আসা স্বাভাবিক যে, সব জিনিস নিংড়ালে তার বিশিষ্ট জিনিসটা নির্গমন কি হয়? বোধ হয় তা হয় না, সাপ নিংড়ালে কি গরল বেরোয়?

না তার ক্রুদ্ধ স্বভাবের ধর্মে ঐ গরলটা বেরোয়? গরুর স্তনে জোঁক ব'সলে কি দুধ বেরোয়? না আমাদের শরীরটা নিংড়ালে শুক্র বেরোয় অথবা রমণীকে ক্রুদ্ধ পীড়নে তার প্রেম উপছে পড়ে? এখানে তাঁদের স্বভাব প্রবৃত্তির জাগরণের প্রয়োজন, কিন্তু এই ইক্ষুটির বেলায় ব্যতিক্রম, তাকে নিংড়ালে সে মধু বর্ষণ ক'রবেই, তবে তার যৌবন পেরিয়ে গেলে তবেই না মধুস্রাবী রসের সঞ্চার হয়! এর ভূমিকা যেন বৃদ্ধ পণ্ডিতের মত।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Carbohydrate. (b) Mucilage. (c) Resin. (d) Fat. (e) Albumin. (f) Calcium oxalate.

এর্ব্বারু (কাঁকুড়)

কবি কালিদাসের কালের পরে একটা দোফলা কালিদাসের কাল এসেছিলো—সেটা বেদান্তের যুগ অর্থাৎ বেদে অনভিজ্ঞ তবুও ষণ্ড মনোভাব, এই রকম একটা দাম্ভিক পণ্ডিতের প্রশ্নোত্তরের গল্প আছে, সেটা হ'লো—(ভো ব্রাহ্মণ) ওহে ব্রাহ্মণ! (বিপ্রাস্মিন্ নগরে মহান্ কথয় কঃ?) এই নগরে সব চেয়ে বড় কে? (তালদ্রুমাণাং গণঃ) কেন? সব থেকে বড় হ'লো তালগাছের শ্রেণী। (কো দাতা?) দাতা কে? (রজকো দদাতি বসনং প্রাতর্গৃহীত্বা নিশি) সব চেয়ে বড় দাতা ধোপা (রজক), কারণ সকালে কাপড় নিয়েই সন্ধ্যেয় দেয়। (কো দক্ষঃ?) এখানে দক্ষ কে? (পরদার-বিত্তহরণে সর্ব্বোঽপি দক্ষঃ জনঃ) পরের স্ত্রী, পরের সম্পত্তি হরণ ক'রতে এখানে সবাই দক্ষ। (কস্মাৎ জীবসি

হে বদ সখে?) কি খেয়ে বে'চে থাক, বল বন্ধু। (উর্ব্বারুকৈ র্জীবিতঃ) উর্বারুই আমাদের জীবনরক্ষক।

এতক্ষণ যাহোক বেশ চ'লছিলো; কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা ক'রলেন (বালশ্চ বুধ্যোহ-থবা?) কাঁচা না পাকা? তখনই প্রমাদ গুনলেন, ষণ্ড পণ্ডিত জিজ্ঞাসা ক'রলেন (ক উর্ব্বারুকঃ?) উর্ব্বারুক কি? (বেদানভিজ্ঞোঽসি বেদে অনভিজ্ঞ তুমি বুঝবে কি করে?

সত্য কথা ব'লতে কি, যতদিন না দুর্গাচার্যের মত পণ্ডিত আমাদের না জানিয়ে যেতেন যে এটি এর্বারু (যার প্রচলিত নাম কাঁকুড়), অর্থাৎ যেটি ঋক্‌বেদের সেই একাদশ মন্ডলের ৩২ প্রপাঠকের ৪৬ সুক্তটি ও তার ভাষ্য না ক'রতেন—কেই বা জানতেন চরক সংহিতার চিকিৎসাস্থানের ২৬ অধ্যায়ে এবং সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রের ৫৫ অধ্যায়ে এবং ৫৮ অধ্যায়ে সেই এর্বারু বস্তুটি কী?

এইবার বিংশ শতকের লোকভাষ্যের কথা বলি—বিরক্ত হয়ে বলা হ'তো—খাবে কি, কাঁকুড়? অর্থাৎ এত তুচ্ছ যে সেটা যেন গরু ছাগলের খাওয়ার জিনিস, এই রকম ভাবটা; যা হোক, কালে সে খাদ্য হিসেবে জাতে উঠেছে।

এইবার দেখা যাক সেই বৈদিক সূক্তের মন্তব্য—

কস্ত্বা বিমুঞ্চতি নগশিরঃ, কস্মৈত্বা বিমুঞ্চতি সংবর্চসঃ পয়সঃ।
ত্বষ্টা উর্বারু র্বিদধাতু অনুমাষ্টূর্ন তন্বা নাদেয়ী।
(ঋক্‌বেদ ১১।৩২।৪৬ সূক্ত)

দুর্গাচার্য এই সূক্তটির ভাষ্য ক'রেছেন—

ত্বমেব উর্বারুঃ, উর্ব্বী পৃথ্বী, উর্ব্বশ্চ অরুঃ নীরুক্‌ সম্পৎ, কর্কট্যাং স্বার্থে কন্‌, উর্ব্বারুকর্মাপি। এর্বারুকশ্চ ত্রপুষভেদঃ। কঃত্বা বিমুঞ্চতি নগশিরঃ ইত্যুক্তিঃ, বালুকাজাতত্বাৎ কস্মৈ ত্বা বিমুঞ্চতি পয়সঃ সংবর্চসশ্চ। মলমূত্রাদি সরণাৎ। ত্বাং উর্বারুঃ অতঃ ত্বষ্টা বিদধাতি, অনুমাষ্টূঃ নাদেয়ী ভব তন্বা অনুমাষ্টূর্ভবতু॥
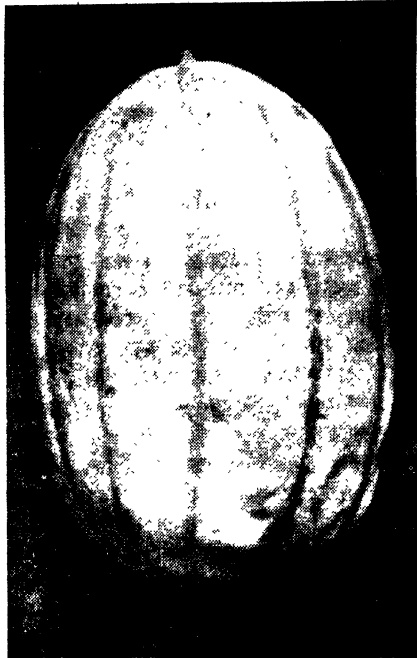
এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—

তুমি এই জন্য উর্বারু, কারণ পৃথ্বীর নীরুক্‌ (নীরোগ) সম্পৎ (সম্পদ) তুমি। লোকে কর্কটী বলে এবং উচ্চারণে উর্বারুকও বলে। এর্বারুকও ত্রপুষের একটি ভেদ। কে তোমাকে ছিন্ন করে? উত্তরে—পর্বতের শিরোভাগ, অর্থাৎ পর্বত তাকে সহ্য

করে না। নাদেয়ী (নদ নদী সম্পর্কে) বালুকাই তোমার গর্ভভূমি।

কেন তোমাকে ছিন্ন করে, উত্তর—আমার পয়সের ও মাংসের জন্য (অপরপক্ষে মলমূত্রের জন্য); ও! তাই তুমি উর্বারু? ত্বষ্টা তোমার শরীরের দ্বারা মার্জনা করেন, করুন। *(এই সূক্তটি ঋক্‌বেদের ব'লেই অত্যন্ত দুর্বোধ্য ভাষ্য, কারণ ঋকের ভাষা খুবই প্রাচীন।)*

বৈদ্যকের নথিতে

উর্বারু বা এর্বারুর পরিচয় বেদভাষ্যে প্রথম, তারপর চরক সুশ্রুতে, কিন্তু দ্রব্যটি কি, তা উভয় গ্রন্থের টীকাকার (চরকে চক্রপাণি, সুশ্রুতে ডল্বন) যদি লোক-পরিচিত নাম না ব'লতেন, তবে অন্য কোন উপায়ই ছিল না যে এটি আমাদের খুব পরিচিত ফল 'কাঁকুড়'। তাছাড়া চক্রপাণি দত্তই (একাদশ খৃষ্টাব্দের বৈদ্যগ্রন্থ চক্রদত্ত-লেখক) প্রথম ব'লেছেন—এই লতা গাছটির পাতার গুণ কি। চক্রপাণি দত্ত ব'লেছেন—এটি কচি অবস্থায় রুচিকর ও পিত্তপ্রশমনকারী এবং পাকলে বিপরীত। তবে এর মূলের রস মলভেদক, কিন্তু পাতার রস মূত্রকর, এর ফলেরও সেই স্বভাব, এর বীজ কিন্তু বিশেষভাবেই মূত্রকৃচ্ছ্র হরণ করে। এর বীজই যে মূত্রকৃচ্ছ্র হরণ করে, তার যে বর্ণনা চরকের চিকিৎসাস্থানে করা হ'য়েছে তা যথার্থ। চরকের বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ের ১৬০ সূত্রে উর্ব্বারুর একটি ভেদ "বনত্রপুষী" (ক্ষুদ্র কাঁকুড় বিশেষ), কারও মতে এটি শসা।

পরিচিতি

বর্ষজীবী লতা, জমিতে লতিয়ে লতিয়েই বৃদ্ধি পায়। পাতা গোলাকার কোণযুক্ত, গাছ উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট অর্থাৎ একই গাছে স্ত্রী ও পুং দুই প্রকারের ফুলই হয়, বাংলার বহুস্থানে এর চাষ তো হয়ই, তাছাড়া ভারতের বহু প্রদেশে বেলে (বালি-সংযুক্ত) মাটিতে এবং মজা নদ-নদীর চরে চাষ হ'য়ে থাকে। বাংলায় কাঁচা ফলকে কাঁকুড় ও পাকলে ফুটি বলে। মাঘের শেষে ক্ষেতে বীজ পুঁতে দেওয়া হয়, যাকে গ্রাম্য ভাষায় বলা হয় 'মাদা দেওয়া', ১০/১৫ দিনের মধ্যে চারা বেরোয়; সেই গাছে ২/৩ মাসের মধ্যেই ফল হ'তে সুরু করে। ফলের গায়ে ৮ থেকে ১২টি পর্যন্ত শিরা থাকে। এ ফল অল্পস্বল্প বারোমাসই পাওয়া যায়, কারণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঋতুর তারতম্যে কখনও এ-প্রদেশে কখনও ও-প্রদেশে চাষ হ'য়ে থাকে। লক্ষ্ণৌ ও জৌনপুর অঞ্চলে যেটি পাওয়া যায় তাকে আমরা বলি খরবুজা; এর সংস্কৃত নাম চির্ভিট। এরা প্রজাতিতে এক হ'লেও মাটি, জল ও বায়ুর পার্থক্যে তার গন্ধ ও স্বাদের পার্থক্য ঘটে। এই ফল পাকলে গায়ের রং হলদে হয় ও আপনা-আপনি ফেটে যায়। বিশেষতঃ বাংলায় একে ফুটি বলে। তাই গ্রাম্য লোককথা—ফুটি-ফাটা চৌচির। তবে এ ফলের মরসুম হ'লো বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে। কচি কাঁকুড় কাঁচাও খাওয়া যায় আবার তরকারি হিসেবে রান্না ক'রেও খাওয়া যায়; তবে কাঁচা ফল কোন কোনটা তিক্তাস্বাদেরও হয়, সেগুলি অখাদ্য। এই ফ্যামিলির গাছের প্রায় সব ফলের, বিশেষতঃ তরকারি হিসেবে যেগুলির ব্যবহার হয়, তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে তিক্তাস্বাদের ফলও জন্মে, এসব ফল পাকলেও এদের তিক্তাস্বাদ একেবারে যায় না। এটির বোটানিকাল্ নাম Cucumis melo Linn., ফ্যামিলি Cucurbitaceae. উড়িষ্যার অঞ্চল বিশেষে এটিকে কাঁকুড়ী

বলে। বাংলায় এর আর এক প্রজাতির চাষ হয়—একে গোমুখ বা গুমুক্ বলে। এটির বোটানিকাল্ নাম Cucumis utilissimus. এটি বর্ষায় চাষ হয়; কাঁচা খেতে তিতো (তিক্ত), পাকলে ফুটির মতই খেতে হয়। ঔষধার্থে ব্যবহার হয় বীজ, মূল ও পাতা।

এই এর্বারু (কাঁকুড়) আমাদের শরীরে রসবহ ও মূত্রবহ স্রোতে কাজ করে সত্যি, কিন্তু যেখানে সান্নিপাতিক ক্ষেত্র হয়, যেমন বায়ু ও পিত্ত দুটি ধাতুই কুপিত এবং একসঙ্গে জোট বেঁধেছে, সেখানে এটাতে বিশেষ উপকার দর্শায় না।

সংহিতাকালের এবং লৌকিক ব্যবহারে

১। **প্রস্রাবের স্বল্পতায়ঃ—** এই অসুবিধেটা এসেছে কিন্তু বায়ু (অপান বায়ু) বিকারগ্রস্ত হ'য়েছে ব'লে। (যে বায়ু আমাদের মল, মূত্র, শুক্র ও অধোবায়ুর নিঃসরণের স্বাভাবিকতা রক্ষা করে), সেক্ষেত্রে মিষ্টি কচি কাঁকুড়ের রস ২ চা-চামচ ৭/৮ চা-চামচ জল ও একটু মিছরি মিশিয়ে সরবতের মত ক'রে প্রত্যহ একবার খেলে প্রস্রাবটা স্বাভাবিক হয়।

২। **অগ্নিমান্দ্যজনিত মূত্রাল্পতায়ঃ—** এখানে চিকিৎসার একটু অসুবিধে আছে। জল খেলেই কি এই রোগে সুবিধে হবে? তার উত্তরে বলা যায়—বেশী জল প্রথমতঃ অগ্নিবল আরও ক'মিয়ে দেবে, আর প্রস্রাব ধ'রে রাখার ক্ষমতাও ক'মে যাওয়াতে অসুবিধে হবে। এক্ষেত্রে মিষ্টি কচি কাঁকুড়ের রস ৩/৪ চা-চামচ মিছরি দিয়ে সরবত ক'রে খাওয়া, নইলে পাকা কাঁকুড়ের বীজ ১০ গ্রাম নিয়ে, তাকে জল দিয়ে বেটে, কাপড়ে ছে'কে, একটু মিছরি দিয়ে সরবত ক'রে খেতে হবে।

আপনারা হয়তো অনেকে জানেন—এই ত্রপুষজাতীয় ফলের বীজগুলো খোসা ছাড়ানো অবস্থায় বাজারে বিক্রি হ'তে আসে। কাঁকুড়, শসা—এর সঙ্গে আসে লাউবীজ। এগুলো 'ঠাণ্ডাই মগজ' ব'লে ইউনানি সম্প্রদায়ের লোকেরা সর্বদা ব্যবহার করেন, সুতরাং প্রয়োজনবোধে আপনারা এই খোসা ছাড়ানো বীজগুলোকেও ব্যবহার ক'রতে পারেন।

৩। **অরুচি ও বমনেঃ—** কয়েকদিন থেকে কিছুই মুখে রুচছে না, বমি আসে, মুখ দিয়ে তিতো (তিক্ত) জল বেরোয়, এক্ষেত্রে বুঝতে হবে, তাঁর রসবহ স্রোত বিকারগ্রস্ত। তাই সেখানে কচি কাঁকুড়ের রস ৩/৪ চা-চামচ একটু মিছরি মিশিয়ে প্রত্যহ সকালে একবার খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৪। **উদাবর্ত রোগেঃ—** লোকে কথায় ব'লতো—"উদুরী-বাদুড়ী-যক্ষ্মা, তিনে নাই রক্ষা", এই বাদুড়ী হ'চ্ছে উদাবর্ত রোগ, কারণ অপান বায়ুর ক্রিয়া যখন একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে যায়, তখন মলমূত্রের নির্গমন আর হয় না, এর ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে মুখ দিয়ে বিষ্ঠাগন্ধযুক্ত দ্রব্য এমন কি বিষ্ঠাও উঠে আসে, তাই একে গ্রাম্য বৈদ্যরা ব'লে থাকেন বাদুড়ী রোগ। এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হ'লো—ঢেকুর ওঠা, সে ঢেকুরের এমন শব্দ যে, পাড়ার লোকে জেনে যায়; মনে হয় যেন মহিষের বাচ্চা ডাকছে; এর সঙ্গে থাকবে কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রস্রাবও ভাল হ'চ্ছে না, জল খেলেও পেটে আরও বায়ু, এটা রসবহ স্রোতের বিকার, তারই পরিণতিতে এসেছে অপান বায়ু কুপিত ও স্তম্ভিত; যদিও সাধারণের ধারণা এটা এমন কিছু নয়, তা যা হোক, এক্ষেত্রে কিস্‌মিস্ ৫ গ্রাম (আধ তোলা আন্দাজ) আধ পোয়া (প্রায় ১১৪ মিলিলিটার) জলে সিদ্ধ করে এক ছটাক (প্রায় ৫০ মিলিলিটার) থাকতে নামিয়ে, সেটাকে চ'টকে, ছে'কে সেই জলে

কাঁকুড় বীজ ৫ গ্রাম বেটে পুনরায় ছে'কে প্রত্যহ একবার খেতে হবে। এর দ্বারা দাস্তও পরিষ্কার হবে, তার সঙ্গে প্রস্রাবটাও সরল হবে এবং ঢেকুর ওঠাও ক'মে যাবে। এই যোগটি চরকীয় ব্যবস্থা।

এক্ষেত্রে সুশ্রুত সংহিতার মতবাদ হ'লো—

এ রোগের এসব উপসর্গ তো থাকবেই, তাছাড়া যেখানে দেখা যাচ্ছে এই উদাবর্ত জন্য প্রস্রাব আটকে যাচ্ছে, হ'তে চাচ্ছে না, সেখানে কাঁকুড় বীজ ৫/৬ গ্রাম (খোসা ছাড়ানো হ'লেও চ'লবে) জলে বেটে, আধ পোয়া আন্দাজ ক'রে (প্রায় ১১৪ মিলি-লিটার), তার সঙ্গে সৈন্ধব লবণ দেড় গ্রাম আন্দাজ মিশিয়ে, খেতে দিলে অপান বায়ুর অনুলোম হ'য়ে প্রস্রাব হ'য়ে যাবে।

এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি—সৈন্ধবের বিবন্ধতা নাশ করার শক্তি আছে ঠিকই, কিন্তু আসল সৈন্ধব (অকৃত্রিম) যদি না হয়, তা হ'লে কোন কাজই হবে না। এখন বাজারে আসল সৈন্ধব দুর্লভ বলা যেতে পারে। কারণ বর্তমানে এটা বৈদেশিক দ্রব্য।

৫। **মূত্রাঘাতে এবং মূত্ররোধেঃ—** মূত্রাঘাত আসে প্রোস্টেট্ গ্ল্যাণ্ড্ (Prostate gland) বড় হ'লে, মূত্ররোধ হয়, আবার অন্য কারণেও হয়, সেক্ষেত্রে উপরিউক্ত মাত্রায় কাঁকুড় বীজকে বেটে, ছে'কে, সেটায় সৈন্ধব লবণ না দিয়ে, ৭/৮ চা-চামচ কাঁজি মিশিয়ে খেতে হবে।

এখন এই কাঁজি পাওয়াটাই সমস্যা, তবে এর অনুকল্প এই করা যেতে পারে, আধ-সিদ্ধ ভাতের সঙ্গে ৮ গুণ জল মিশিয়ে, ৩ দিন ঢেকে রেখে দিয়ে ছে'কে নিলেও চ'লবে।

৬। **মূত্রনালীর ক্ষতেঃ—** এই মুষ্টিযোগটি একটু অসুবিধেজনক হ'লেও জেনে রাখা ভাল। বাংলার প্রাচীন বৈদ্যগণ কাঁকুড়ের বীজকে ঘানিতে ভাঙিয়ে তেল ক'রে রাখতেন, আর ঐ তেল ২/৫ ফোঁটা ক'রে অল্প দুধের সঙ্গে সমস্তদিনে ৩/৪ বার খেতে দিতেন, এর দ্বারা ঐ মূত্রনালীর ক্ষত সেরে যায়।

এতক্ষণ কাঁকুড়ের গুণ গাওয়া হ'লো বটে, কিন্তু একটি কথা এখনও বলা হয়নি, সেই গাঁয়ের শ্লেষ—

"বারো হাত কাঁকুড়ের ১৩ হাত বীচি"। এটা আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়—যেটা অসম্ভব এই রকম অস্বাভাবিক কোন ঘটনার পটভূমিকার বক্তব্য। এটা সমীক্ষকের বাস্তব দৃষ্টিতে তার যে শক্তির পরিচয় তাঁরা পেয়েছেন, তাইতেই এই উপমা সৃষ্টি করা হয়নি তো যে, এর এত গুণ?

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Fatty acids, protein. (b) Vitamin-A, Vitamin-B_1, Vitamin-B_2, Vitamin-C. (c) Sitosterol cetyl alcohol.

বলা (বেড়েলা)

মাজা-ভাঙ্গা সাপের ফণা তোলার মত আপনার গত যৌবনের ফোঁসফোঁসানি থাকলেও অসহায়ের মত আপনাকে মনঃকষ্ট কি পেতে হ'চ্ছে না, না হ'বে না?

তাই তো মুনিদের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ ছিল—এক বল্‌কা দুধ, বালা স্ত্রী, আর বলা ভেষজটির সেবন; এইগুলিই ছিল সে যুগের ন্যাচারাল্‌ ভিটামিন আর হরমোন্‌।

এইবার তাঁদের হিতোপদেশ শুনুন—দেহের বল একদিক থেকে আসে না, আর একভাবে ক্ষয়ও হয় না এবং একভাবে ধরে রাখাও যায় না।

এই যেমন দাঁতের বল, চোয়ালের বল যদি চান তো নিত্য সরষের তেলের গণ্ডূষ করুন; পায়ের বল চান তো পায়ে বেশ ক'রে তেল মাখুন; মাথায় টাক পড়া থেকে রক্ষে পেতে চান তো মুড়ি (মাথা), ভুঁড়ি (পেট) ঠাণ্ডা রাখুন; মাথায় রৌদ্র না লাগালে, আর জ্যাবজ্যাবে ক'রে তেল মাখলে, কিংবা স্যাম্পু ক'রলে অথবা জোলাপ নিয়ে দাস্ত পরিষ্কার রাখলেই কি টাক পড়া বন্ধ হবে? তবে হ্যাঁ, উত্তরাধিকারী হিসেবে টাকের মালিক হ'লে, তার কোন উপায় নেই।

আরও অনেক দেখার আছে—যেমন শরীর পরিষ্কার রাখলে দেহে দুর্গন্ধ হয় না এবং ভার বোধও হয় না, তন্দ্রা এসে আপনাকে শিবনেত্রও করে না, চুলকণাও আসে না। মনে রাখা উচিত—অরুচি এবং ঘাম, এরাও আমাদের হীনবল করে।

আমার কৈশোরকালে দেখেছি—তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁরা, তাঁদের স্নানের আদিকৃত্যই ছিল সুচারু তৈল ম্রক্ষণ, আবার তারও প্রাক্‌কৃত্য ছিল নবদ্বারে তৈল দান; তখনকার মন এটাকে নিয়ে কতই না রহস্য ক'রেছে। আজ আমার বৈদ্যকজীবনে এসে সেইটাই শরীরের ইন্দ্রিয়গুলি রক্ষার আদর্শ-কৃত্যে এসেছে, এইটাই লিখতে বাধ্য হচ্ছি। তাই ব'লছি—কানে নিত্য তেল দিলে কানের রোগ হয় না, নাভিতে তেল দিলে শীতে

ঠোঁট ফাটে না, চোখের কোণে তেল দিলে দৃষ্টিশক্তি ভাল থাকে ও চোখের আগন্তুক রোগও হয় না; এইভাবে তেল মাখার প্রাক্‌কৃত্যের উদ্দেশ্যটা কোন না কোন ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় রাখার একটা দিক।

তবু এসব মেনে চ'ললেও, স্বাভাবিক নিয়মে শরীরের ক্ষয়ক্ষতি তো হবেই; কিন্তু সেই ক্ষয়ের মধ্যেও যাতে শরীর ততটা বলহীন না হয়, তারই জন্য একটি উপমা আছে—

নগরী নগরস্যেব রথস্যেব রথী যথা।
স্বশরীরস্য মেধাবী কৃত্যেষবহিতো ভবেৎ॥

অর্থাৎ বুদ্ধিমান সর্বদাই মনে রাখেন—যেমন নগররক্ষার ভার নগরপালের, আর রথ চালনার ভার রথীর, সেইরকম এই দেহকে রক্ষা এবং সুরক্ষিত করার ভার দেহীর।

মোটকথা—দেহবল, মেধাবল ও মনোবলকে নিরুপদ্রবে রক্ষা করার চাবিকাঠি র'য়েছে দেহীর হাতে। বল যে কি জিনিস, সেটা অন্বয় ক'রে বলা যায় না, ব্যতিরেকেই বোঝান

যায়—যেমন দাঁতের গুরুত্বটা উপলব্ধি হয়, যখন সেটা পড়ে যায়। এতক্ষণ দেহরাজ্যের অনুশাসন পর্ব চ'ললো, এইবার নিবন্ধোক্ত ভেষজটির সমালোচনা করা যাক।

এ সম্বন্ধে অথর্ববেদ, ভৈষজ্যকল্পের ৫৬।৭৫।৩ সূক্তে একটি তথ্য পাওয়া যায়, সেটা হ'লো—

Sida Stipulata

"যা তে বলে শিবা তনূঃ বাট্যালকী ভেষজী শিবা।
বিকিরিদ্র বিলোহিতে শিবা রুতস্য ভেষজী মৃড় জীবসে।"

এই সূক্তটির মহীধর যে ভাষ্য ক'রেছেন, সেটা হ'লো—

মূলমাগত্য প্রার্থয়তে বলঃ বীর্য্যে, বল্যতে+অন্। যা তে ঈদৃশী তনূঃ=শরীরং তয়া তন্বা নো অস্মান্ জীবসে জীবিতুং মৃড়

> সুখয়। বাট্যালকী ত্বং বটঃ=পথ বাট্যঃ গৃহাঙ্গনং, তত্র অলাতি ভূষয়তি পীত-শ্বেত-কুসুমৈঃ অলকোহি শ্বেত-পীত-বর্ণেভ্যা। ত্বং ভেষজী বিকিরিদ্র=বিবিধং কিরিং উপদ্রবং দ্রাবয়তি ভেষজী, ত্বং বিলোহিতে লোহিতং কল্মষং বিগতং করোষি, তব তনূঃ রুতস্য শারীর মানসব্যাধেঃ শিবা।

এই মহীধর ভাষ্যের ব্যাখ্যা হ'লো—হে বলে! বলের অর্থ বীর্য। তোমার এইরূপ শরীর, তোমার শরীরের দ্বারা আমাদের শরীরের সুখ সন্ধান ক'রে দাও। তুমি বাট্যালকী। বটের অর্থ পথ, বাট্যের অর্থ গৃহাঙ্গন, সেখানে তুমি শ্বেত ও পীত কুসুমের দ্বারা শোভিত হও। সকলেই পীত ও শ্বেত কুসুমের শোভাবর্ধক।

অলক অর্থ শোভা। তুমি ভেষজী, বিবিধ উপদ্রব দূর কর, শরীরের, মনের পাপ (কল্মষ) ব্যাধি দূর করে তোমার দেহ, তাই তুমি শিবা।

বৈদ্যকের দূরবীণে

এখন দেখা যাচ্ছে, যাঁরা ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে ভৈষজ্য বিদ্যা অধিগত ক'রতেন এবং শিক্ষা দিতেন, তাঁরা চরক-ভিষক্। বেদের সেই চরক-ভিষকের ধারার নামই চরকীয় ধারা। এ ধারার সুপ্রাচীন সংহিতার নাম অগ্নিবেশ সংহিতা, এ সংহিতায় ভেষজকে তাদের রস-প্রাধান্য, বীর্য-প্রাধান্য ও প্রভাব-প্রাধান্যের দ্বারা চিহ্নিত ক'রে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার-প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে।

এই 'বলা' বা বাট্যালকীকে বলা হ'য়েছে—এটি বল্য, অর্থাৎ যেসব কারণের অভাব-বশতঃ দেহের ও মনের বল-শক্তি হ্রাস পায়, সেইসব ক্ষেত্রে বলার যোগ্যতা খুব বেশী।

তাহলে পরিষ্কার ধারণা করা যায়, প্রতিটি ব্যাধিতেই কোন না কোন ক্ষেত্রে স্বাভাবিক শক্তি বিনষ্ট হ'য়ে থাকে। তাঁদের সমীক্ষা হ'লো—'বলা' সেখানে তার অভাব পূরণ ক'রে থাকে। মনে হয় এই জন্যই চরকানুগামী প্রতিটি আয়ুর্বেদীয় সংহিতায় এই বলাকে শ্রেষ্ঠ ভেষজ হিসেবে উল্লেখ করা হ'য়েছে।

এছাড়া আরও দীর্ঘকাল পরে এই বলার কার্যশক্তি আরও ব্যাপকভাবে অনুবীক্ষিত হ'য়েছে; তা হ'লেও এই বলাকে নিয়ে এক সমস্যা সৃষ্টি হ'য়েছে; কারণ বেদে একক ভেষজ বলার উল্লেখ, পরবর্তীকালে চরক সংহিতার চিকিৎসাস্থান প্রথম অধ্যায়ে দেখা যাচ্ছে—রসায়নার্থে নাগবলার ব্যবহার করার উপদেশ এবং ঐ চিকিৎসিত স্থানের ১৬ অধ্যায়ে উরঃক্ষত ও ক্ষয়রোগে নাগবলা মূলের ব্যবহারের নির্দেশ, তাছাড়া বাতব্যাধিতে নাগবলা মূলের ব্যবহার (চিকিৎসিত স্থান ২৮ অধ্যায়), কিন্তু দেখা যাচ্ছে রক্তপিত্তে বলামূল সহযোগে ক্ষীরপাকের উপদেশ (চিঃ ৫ অঃ), রক্তার্শে বলামূল (চিঃ ৯ অঃ), কফজ বিসর্পে বলামূল (চিঃ ১১ অঃ), মদাত্যয়ের পিপাসায় বলামূল (চিঃ ১২ অঃ), ব্রণ নির্বাপনে বলামূল (চিঃ ১৩ অঃ), বাতরক্তে বলামূল (চিঃ ২৯ অঃ)—তাহলে বলা ও নাগবলা দুটি যে পৃথক গাছ, সেটা সমীক্ষীত হ'য়েছে।

তারপর সুশ্রুত সংহিতায়ও রসায়নার্থে বলামূলের প্রয়োগের কথা বলা আছে (চিঃ ২৭ অঃ), এভিন্ন স্বরভেদে বলামূল (উত্তরতন্ত্র ৫৩ অধ্যায়), জীর্ণজ্বরে বলামূল (বাগ্ভট, চিঃ ১০ অঃ), রাজযক্ষ্মায় বলামূলের ব্যবহারের উপদেশ। এই গ্রন্থে নাগবলা ব্যবহারের উপদেশ না থাকলেও অতিবলা বলে একটি ওষধির উল্লেখ আছে। একাদশ

শতকের গ্রন্থ চক্রদত্তে দেখা যাচ্ছে নাগবলা, বলা এবং অতিবলা তিন প্রকার নামের উল্লেখ।

তারপর ষোড়শ শতকের গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে বলা চতুষ্টয়—এই কথা বলা হ'য়েছে। সেখানে উপরিউক্ত তিনটি, তার সংগে মহাবলাকে যোগ ক'রে বলাচতুষ্টয় করা হ'য়েছে। আবার কারও মতে 'বলা পঞ্চক'—এখানে এই চারিটির সংগে রাজবলাকে যুক্ত ক'রে বলাপঞ্চক করা হ'য়েছে। এই সকলের পরিচিতি (identification) নিয়ে প্রচুর মতভেদ বর্তমান। আমি প্রচলিত বলা বনৌষধিটির বর্ণনা এখানে লিখছি।

পরিচিতি

বলার লোকায়তিক নাম বেড়েলা, হিন্দিতে বলে বরিয়ারা, বরিয়ার, বরিয়াল্, খরেটী, খরৈটী, খিরৈটী। উড়িষ্যায়ও এটিকে বলা বলে।

বর্ষজীবী ক্ষুপ জাতীয় গাছ, ২/৩ ফুট পর্যন্ত উঁচু হ'তে দেখা যায়। ভারতের উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের যত্রতত্র হ'য়ে থাকে। বর্ষার প্রারম্ভে গাছ বেরোয়, শ্রাবণ-ভাদ্র মাস থেকে ফুল-ফল হ'তে সুরু করে, ফাল্গুন-চৈত্রে বীজ পেকে প'ড়ে যায়। যেসব গাছে হ'লদে ফুল হয়, তাদের বলা হয় 'পীত বেড়েলা', আর যে গাছে সাদা ফুল হয়, তাকে বলা হয় 'শ্বেত বেড়েলা'; অবশ্য এই সাদা ফুলের গাছ বেশী উঁচু হ'তে দেখা যায় না। তবে সাদা ফুলের গাছ যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না, যত্ন ক'রে বাগানে লাগাতে হয়।

বর্তমানে বহু প্রজাতির বেড়েলা গাছ আমাদের নজরে আসে, এরা সকলেই একই গণভুক্ত, তবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি—যে গাছের পাতা পশমময় অর্থাৎ ভেলভেটের মত মসৃণ এবং তার আকার হৃদ্‌যন্ত্রের আকারের মত, সেইটি ঔষধার্থে বেশী কার্যকর এবং হৃদ্‌বলকারক। এটি বাঁকুড়া, বীরভূম, ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এর ফুল ও ফল ছোট। এটির বোটানিকাল্ নাম Sida Cordifolia Linn.,ফ্যামিলি Malvaceae.

আর দুই প্রকার হ'লদে ফুলের বেড়েলা গাছ আমরা সর্বদা দেখতে পাই—সে গাছের পাতার ধার (কিনারা) করাতের মত কাটা এবং আকারে বর্শাকৃতি, এটির বোটানিকাল্ নাম Sida rhombifolia Linn.; এর অন্য আর একটি ভেদ আছে—তার ফুল ঘিয়ে রংয়ের হয়, বোটানিকাল্ নাম Sida rhomboidea Roxb., এটিকে উপরিউক্ত গাছটির variety বলা হয়।

এই পুস্তকে আর একটি গাছের ছবি দেওয়া হ'লো, সেটির ফুল সাদা হয়। এর বোটানিকাল্ নাম Sida Stipulata., এদের সকলেরই ফ্যামিলি Malvaceae.

ঔষধার্থে ব্যবহার হয় মূল বা মূল সমেত সমগ্র গাছ।

লোকায়তিক ব্যবহার

বলার ফুলের রংয়ের তফাতে ক্রিয়ার পার্থক্য—এটা চরকীয় সিদ্ধান্ত, কিন্তু পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের মতে এর প্রজাতির পার্থক্যে গুণের পার্থক্যটা খুবই গৌণ, গুণের পার্থক্য নেই ব'ললেই হয় কিন্তু ফুলের রংয়ের তফাতে যে গুণের তফাত হয়, সেটা তো আমরা আকন্দেই (Calotropis gigantia) প্রত্যক্ষ করি।

১। **অপুষ্টিজনিত কার্শ্য রোগেঃ—** শুক্র ও ধাতু এই দুটো যে এক, এটাই শেষ

সিদ্ধান্ত নয়। রস, রক্ত, মাংস প্রভৃতি এগুলিও তো ধাতু; আয়ুর্বেদে বলা হ'য়েছে— শরীরের গঠন ও পোষণ হয় সপ্তধাতুর ক্রমপরিণতিতে, তার সর্বশেষ অর্থাৎ সপ্তম ধাতু হ'চ্ছে শুক্র। এইরকম ক্ষেত্রে শরীর যেখানে কৃশ হ'চ্ছে অথবা দুর্বল হ'চ্ছে, সেখানে পীতপুষ্প বলার মূলচূর্ণ দেড় গ্রাম (১৫০০ মিলিগ্রাম) মাত্রায় ধারোষ্ণ দুধ আধ কাপ ও একটু মিছরির গুঁড়ো মিশিয়ে দু'বেলা খেতে হবে।

২। **উরঃক্ষতে:**— কোন কারণে অকস্মাৎ বুকে আঘাত লেগে রক্ত উঠছে, সেক্ষেত্রে পীতপুষ্প বলার মূলের ৫ গ্রাম জল দিয়ে বেটে একটু দুধ মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। প্রথম দিন তিন বার, পরে প্রত্যহ ২ বার ক'রে খেতে দিতে হবে। এটাতে উরঃক্ষত সেরে যাবে।

৩। **অববাহুক রোগে:**— হাত ঘোরানো যায় না, পুরোপুরি উঁচু করাও যাচ্ছে না, এক্ষেত্রে দু'রকম ফুলের (সাদা এবং হ'লদে) বলামূল ১৫/২০ গ্রাম নিয়ে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে প্রত্যহ একবার ক'রে খেতে হবে; তবে সিদ্ধ করার পূর্বে একটু ভিজিয়ে রেখে থেঁতো ক'রে সিদ্ধ ক'রবেন। আবার এটাও ব'লে রাখি—যদি নিতান্ত সাদা ফুলের গাছ জোগাড় না হয়, অগত্যা হ'লদে ফুলের বলা (বেড়েলা) গাছের মূল নিতে হবে।

৪। **রক্তপিত্তে (হিমপ্‌টিসিসে):**— এটির বর্ণনা দেওয়া আছে 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩২১ পৃষ্ঠায়। এই রোগের ক্ষেত্রে ২০ গ্রাম বেড়েলার সমগ্র গাছকে ক্বাথ ক'রে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আধ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে রাখতে হবে, তবে মূলাংশ বেশী থাকলে ভাল হয়, তারপর এক কাপ দুধে ঐ ক্বাথ মিশিয়ে একটু গরম ক'রে ওটা খেতে হবে। এইভাবে দুধে ক্বাথে মিশিয়ে কিছুদিন খেলে ওটা সেরে যাবে।

৫। **রক্তার্শে:**— সে বহির্বলি হোক আর অন্তর্বলিই হোক, পীত বেড়েলার মূল ১০/১২ গ্রাম একটু থেঁতো ক'রে নিয়ে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে সেই ক্বাথে খৈ চূর্ণ মিশিয়ে অথবা খৈ ভিজিয়ে খেতে হবে। এটা ব্যবহার ক'রলে ২/৩ দিনের মধ্যে রক্তপড়া বন্ধ হ'য়ে যাবে। আরও কিছুদিন খেলে অর্শের বলিটাও চুপ্‌সে যাবে।

৬। **বাতরক্তে:**— এটির বর্ণনা 'চিরঞ্জীব বনৌষধি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩৩০ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। রোগটা খুবই কঠিন, এটা শরীরের কোন অংশকে বিকৃত (deformation) ক'রতে পারে অথবা সঙ্কুচিত ক'রতে পারে। এক্ষেত্রে বেড়েলার মূল ২০ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে সেই ক্বাথ খেতে হবে। আর বলার ক্বাথ দিয়ে তৈরী তেল (যাকে বলাতেল বলে) সর্বাঙ্গে মালিশ ক'রতে হবে। বৈদ্য ভিন্ন এই তেলটা তৈরী করা সম্ভব নয়।

৭। **স্বরভঙ্গে:**— যেখানে রসবহ স্রোত বিকারগ্রস্ত হ'য়ে স্বরভঙ্গ হয়, সে স্বরভঙ্গ সেরে যায়; কিন্তু যে স্বরভঙ্গ ক্ষয়রোগ থেকে আসে, যেমন যক্ষ্মার স্বরভঙ্গ —এ স্বরভঙ্গটি রোগ না সারলে সারবে না, সুতরাং উপরিউক্ত কারণে যে স্বরভঙ্গ হবে, সেক্ষেত্রে বেড়েলা মূলের ছাল আধ গ্রাম মাত্রায় নিয়ে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে রেখে দিতে হয়, সারাদিনে ৫/৭ বারে একটু একটু ক'রে চেটে খেতে হয়। এই রকম দুই তিন দিন খেলে ওটা প্রশমিত হবে।

৮। **হৃদ্‌যন্ত্রের বিবৃদ্ধিতে** (Dilated heart):— এ'রা অল্প খেলে ভাল থাকেন, একটু জোরে চ'ললেই হাঁপাতে থাকেন, দৌড়নো তো দূরের কথা, এই যে ক্ষেত্র—সেই ক্ষেত্রে শ্বেত বেড়েলার মূলের ছাল চূর্ণ আধ গ্রাম মাত্রায় সকালে ও বৈকালে আধ কাপ অল্প গরম দুধের সঙ্গে খেতে হয়, ২/৪ দিন খেলেই বিশেষ উপকারিতা উপলব্ধি ক'রতে পারবেন।

৯। **মূত্রকৃচ্ছ্রে**:— মেদস্বী লোক প্রস্রাব ক'রতে গেলে কষ্ট হয়, দাঁড়িয়েও সরলভাবে প্রস্রাব হ'চ্ছে না, যেন ভেতর থেকে একটা বাধা সৃষ্টি হ'চ্ছে, এ বাধাটা কিন্তু রসবহ স্রোতে বায়ুবিকার; এক্ষেত্রে বেড়েলার (পীতপুষ্প) মূল ১০ গ্রাম একটু থে'তো ক'রে ২ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে, এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সেই ক্কাথটা সকালে অর্ধেক ও বৈকালে অর্ধেকটা খেতে হবে, এর দ্বারা ঐ কৃচ্ছ্রতার কিছুটা উপশম হবে।

১০। **শ্বেত ও রক্তপ্রদরে**:— এই শ্বেত ও রক্তপ্রদর সম্পর্কে এই গ্রন্থে বহু ক্ষেত্রে বলা হ'য়েছে, তথাপি এই শ্বেত বা পীত বেড়েলার প্রয়োগের ক্ষেত্রটি হ'লো—যেসব মায়েদের অগ্নিবল কম, পুষ্টিকর কিছু খেয়ে হজম করারও সামর্থ্য নেই, অথচ তাঁদের সাদা বা রক্তস্রাবে (প্রদর রোগ, একে আয়ুর্বেদে বলা হয় অসৃগ্‌দর রোগ) এই বেড়েলার মূল ১০ গ্রাম একটু থে'তো ক'রে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে, এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, সকালের দিকে আধ কাপ দুধে মিশিয়ে তার অর্ধেকটা আর বাকী অর্ধেকটা বৈকালের দিকে দুধ মিশিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা তাঁর শরীরের বলাধান ফিরে আসবে এবং রোগেরও উপশম হবে।

বাহ্য প্রয়োগ

১১। **ফোড়ায়**:— যে ফোড়া উঠতে দেরী, পাকতে দেরী ও ফাটতে দেরী হয়, এমনকি বসাতেও দেরী হয়; মোটকথা এই ফোড়া মাংস ও মেদবহুল জায়গায় ওঠে, তখন বেড়েলার মূল (সাদা ফুলের হ'লে ভাল হয়) বেটে প্রলেপ দিলে ওর দাহ ও ব্যথা ক'মে যাবে, আর ব'সে যাওয়ার মত অবস্থা থাকলে ব'সে যাবে, নইলে ওটা পেকে ফেটে যাবে।

সর্বশেষে একটা কথা মনে আসছে—বিশ্বামিত্র ঋষি রাম-লক্ষ্মণকে বলা ও অতিবলা বিদ্যা শিখিয়েছিলেন। মহাকাব্যের এই কাহিনীটাকে যদি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করা যায়, তাহলে পূর্বরূপ, রূপ, সম্প্রাপ্তি এই তিনটি যদি আপনার মনে এসে যায়—এটা ভেবে দেখবেন তো—দক্ষিণ ভারতকে সুফলা করার কল্পনা নয় তো? এই অহল্যাটিকে যদি বলি, যে জমি হলকর্ষণ করা হয়নি সেই অহল্যা, তাকে উদ্ধার ক'রতে গেলেই তো লাঙ্গলের ফালের দরকার; সেইটাই যদি সীতা হয়, এই রূপ পরিগ্রহ ক'রতে যদি রামায়ণের কাহিনীকে কেউ বিচার করে, আর এই বলা অতিবলাকেও যদি ভৈষজ্যবিদ্যার অধিকারভুক্ত করা যায়, সেটা কেমন হয়? অমৃতমন্থনও তো কাব্যিক রূপ, কারণ পারদের আবিষ্কারই তো অমৃতমন্থনে। রস বা পারদই যে অমৃত, এ তো তান্ত্রিকদের স্পষ্টোক্তি। আর্যধারায় কৃষিবিদ্যা আর প্রাক্-আর্যধারায় প্রকৃতি বিদ্যা—এই নিয়েই তো "হেথায় আর্য হেথা অনার্য এক দেহে হ'লো লীন" (রবীন্দ্রনাথ); তাই ভাবছিলাম—আর্যধারায় বলা অতিবলা ভেষজটি রামায়ণে বিদ্যা নাম ধারণ করেনি তো?

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Alkaloid viz., ephedrine. (b) Terpenoids. (c) Glycosides. (d) Steroids, phytosterol, resin, acids, mucin.

চক্রমর্দ (চাকুন্দে)

গ্রাম-বাংলার প্রায় সর্বত্রই একটা ক'রে গাঁজানোর সব্যসাচী খুড়ো থাকতো; তাঁদের মুখে অনেক রসালো কথা পাওয়া যেতো; তারই একটা টুকরো হ'লো—জগতে যত রোগ আছে তার প্রত্যেকটিতে কোন না কোন যন্ত্রণা থাকবেই কিংবা দেবেই, সে শারীরিকই হোক আর মানসিকই হোক; কিন্তু একটি রোগ আছে—তার যে আরাম সেটা কেবলমাত্র নবাব-বাদশাহী চালে যাঁরা ওঠা-বসা করেন, তাঁরাই এ রোগের সুখানুভব ক'রে আনন্দটা উপভোগ ক'রতে পারেন।

এ কথা শুনে কার না ঔৎসুক্য জাগে—না-জানি কি সে রোগ, আর নবাব-বাদশাহী চালই বা কি? খুড়োর বাদশাহী পরিবেশের বর্ণনাটা হ'লো—শরতের আবেশে বৈকালিক পরিবেশে ভ্যাপসা গরম, তাকিয়া নিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থা, হাতে থাকবে গড়গড়ার নল, সেটা ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ ক'রে টানা, তার আবেশে হবে অর্ধনিমীলিত নেত্র, আর আধুলির আকার পরিমিত জায়গায় এ রোগটি ব'সবে, সেটি থাকবে মানুষের অগোচরে —যাকে বলে উপযুক্ত স্থানে (আর এ রোগ হয়ও সেখানে), মাঝে মাঝে রিমঝিম্ অনুভূতির পর মনের অগোচরে হাতছানি দিতে দিতে প্রথম পর্বের আরাম যিনি উপভোগ না ক'রেছেন, তিনি এ রোগের মর্মটা অনুভব ক'রতে পারবেন না।

খুড়ো গজালীর গল্প ক'রতে ক'রতে যে রোগের যেটি ওষুধ ব'লে যে গাছটি দেখিয়েছিলেন, আজ তাকে নিয়ে এই বৈদ্যক জীবনের উত্তরকালে লিখতে বসেছি। তবে এর তো একটা প্রামাণিক তথ্য চাই—সেটা আছে অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৫২।৩১। ৪৫ সূক্তে; সেটা হ'লো—

যদক্রন্দঃ প্রথমং জায়মানং পুন্নাড় উদ্যান্ দ্রুতং পুরীষাৎ।
এড়স্য অস্যাশনাৎ গজস্য অগৃভ্ণ্ বাহূ উপস্তুত্য নিরতষ্ট।

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

মর্ত্ত্যঃ যদা প্রথমং জায়মানং=দৃষ্টবা যদক্রন্দঃ=ক্রন্দিতবান্, তদৈব পুরীষাৎ সকাশাৎ উদ্যান্ (পশোঃ পুরীষাৎ)=উদ্যান্ দ্রুতং অগচ্ছৎ এড়স্য=মেষস্য গজস্য অশনাৎ ভক্ষণাৎ অগৃভ্ণ্ং=গৃহীতং বা বাহূ উপসৃত্য নিরতষ্ট=নিরাতঙ্কঃ অভবৎ। এড়গজঃ=চক্রমর্দ্দঃ পুন্নাড়শ্চেতি।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—মর্ত্য অর্থাৎ মনুষ্য যখন প্রথম দেখেছে পশুর পুরীষ থেকে পুন্নাড় এসে দেহে ব'সেছে, সে কাঁদলে। এড় এবং গজের মুখের খাবার থেকেই দ্রুত এসে তার বাহুতে উপনীত হ'লে পর সে নিরাতঙ্ক হয়। এড়গজ এবং পুন্নাড়ই চক্রমর্দ।

বৈদ্যকের নথি

সংহিতাকারগণের সমীক্ষণ

বৈদিক সূক্তে কাব্য এবং একটি রোগের উৎপত্তির কারণ এবং তার ভেষজ সবই বলা হ'য়েছে। এমন রোগও র'য়েছে যে, পশুর বিষ্ঠা থেকে জন্ম নেয়, অর্থাৎ মলিন দূষিত বস্তু থেকে উৎপন্ন হয়, সেটি আগন্তুক হ'য়ে সংক্রমিত হয়, দেহের কুক্ষি, জঘন, সন্ধি-স্থান প্রভৃতি মলিন ক্লেদ সঞ্চয়ের স্থানে যে রোগ উপসর্পিত হয় তার নাম দদ্রু; কিন্তু বৈদিক শব্দ দদ্রুটি যে রোগ তা বলে না, যে কোন ফাটা, ঘষা রেখাকে বোঝায়; তবে চক্র-দদ্রু ব্যাধি ব'ললেই দদ্রু রোগকে বোঝায়।

কেন এই নাম—রেখা ফাটা সৃষ্টি করে, তাই দদ্রুক্। পীড়িতও করে, ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। দেহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে দদ্রুর আবাস হয়। নিকৃষ্ট স্থানে জন্ম এবং সংক্রমণ শক্তির অর্থই তার রোগজীবাণু যে আছে এটাই স্বীকৃত।

দ্বিতীয়তঃ—এড়গজ—জগতের কোন প্রাণী এই চক্রমর্দ (চাকুন্দে) গাছ খায় না, কিন্তু মেষ এবং গজ (হাতি) এই দুটি প্রাণীরই প্রিয় ভক্ষ্য—এটা খুবই বিস্ময়কর মনে হয়, ঋষিদের এই ভেষজ নিরীক্ষণের পদ্ধতিটা দেখে।

এই প্রাণী দুটির এই কুৎসিত দদ্রু রোগের জন্মসূত্রেই তারা প্রকৃতি-প্রেরণায় এর পাতা খায়। এর আর একটি নাম পুন্নাড়—এর অর্থ যে পুরুষকে চঞ্চল করে, এখানে পুরুষ শব্দ নারীকেও বোঝায়, কারণ পুরুষ শব্দটি আকৃতি বা লিঙ্গবোধক নয়, দেহের মনোযুক্ত রাশি পুরুষ বা চেতনাকে বোঝায়।

চরকাদি সংহিতাগ্রন্থে এই জন্য এই চক্রমর্দকে বিশেষভাবে কুষ্ঠ রোগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে। কারণ প্রকৃতপক্ষে দেহে কুৎসিৎ আকার হয় যেসব রোগে, তাদেরই নাম কুষ্ঠ। কু=কুৎসিৎ তিষ্ঠতি কুষ্ঠ, এ রোগ প্রথমে বাইরের থেকে আসে। মালিন্য যেখানে সেইখানেই এর বসবাস, বৃক্ষেও কুষ্ঠ হয়, পশুপক্ষীতেও কুষ্ঠ হয়।

চরক সংহিতায় এই চক্রমর্দ ভেষজটির নাম বৈদিক সূক্তের নামকেই যথাযথ রক্ষা করা হ'য়েছে প্রথম সূত্রস্থানের তৃতীয় অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে আরগ্বধীয় অধ্যায়ে "এড়গজ" এবং দ্বিতীয়বার সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে ৭৬ শ্লোকে "প্রপুন্নাড়" ব'লে। তারপর এটির শাক এবং ফুলও যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, তারও উল্লেখ আছে যে সব ভেষজের শাক-পুষ্প ব্যবহার্য তাদের মধ্যে। এছাড়া কুষ্ঠরোগ চিকিৎসায় এর প্রশংসা ও প্রয়োগ কয়েকবারই দেখা যায়। তবে এর দ্বারা প্রলেপ কার্যই বেশী উপযোগী—এই অভিমতই যেন পরিলক্ষিত; তা হ'লেও অন্যান্য সংগ্রহগ্রন্থে এর বীজ, পাতা এবং মূলত্বকের (মূলের ছালের) ব্যবহার দেখা যায়।

পরিচিতি

এটিকে বৃক্ষ বলা হয় না, ক্ষুপ জাতীয় গাছ অর্থাৎ কালমেঘের মত ছোট ঝোপ গাছ, বর্ষজীবী। এর পাতার আকৃতি প্রায় গোল এবং ব্যাস প্রায় এক ইঞ্চি, কোমল

লোমযুক্ত এর পত্রকাণ্ডের দু'দিকে বিপরীতভাবে পাতা হয়, ৬টি পাতা থাকে, ফুলগুলির বোঁটাও জোড়া জোড়া, পাতার গোড়া থেকেই ফুল বের হয়, রং হলুদ। শুঁটি ২/৩ ইঞ্চি লম্বা হয়, ভিতরের বীজগুলি চ্যাপ্টা। বর্ষায় এর ফুল ও শীতে ফল হয়; এটি ওষধি গাছ, কারণ এর ফল পাকলেই গাছ ম'রে যায়, আরও বৈশিষ্ট্য হ'লো—দিবান্তে এর নিদ্রা আসে অর্থাৎ দিনের শেষে পাতাগুলি পরস্পর জুড়ে যায়। প্রদেশ ভেদে এর নামেরও ভেদ আছে—বাংলাদেশে একে চাকুন্দে বলে, হিন্দিভাষী অঞ্চলে একে বলে চক্‌বড়, উড়িষ্যার অঞ্চলবিশেষে চাকুন্ডা বলে। এটির বোটানিকাল্ নাম Cassia tora Linn., ফ্যামিলি Caesalpiniaceae. এই গণের আর একটি গাছ আছে, তাকে দাদমারির গাছ বলে। গাছগুলির পাতা বড়, গাছও ৪/৫ ফুট উঁচু হয়, এটির বোটানিকাল্ নাম Cassia alata Linn.

লোকায়তিক ব্যবহার

১। **বিষাক্ত পোকার কামড়েঃ—** অনেক সময় আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় কিংবা চলার পথে কোন পোকায় কামড়ে দিল, কিন্তু কোন কিছু দেখাও গেল না। দুই-এক দিন বাদে দেখা যাচ্ছে—সেখানটায় ফুলেছে এবং তার আশপাশের গাঁঠগুলিতে ব্যথা হ'চ্ছে, তখনই বুঝতে হবে যে, কোন বিষাক্ত কীট-দংশনের ফলেই এটি বিসর্পিত হ'য়েছে। এক্ষেত্রে এই চাকুন্দে বীজের গুঁড়ো আধ গ্রাম থেকে এক গ্রাম পর্যন্ত মাত্রায় (৪ রতি থেকে ৮ রতি পর্যন্ত) সকালে ও বৈকালে দু'বার জলসহ খেতে হবে। এটাতে দুই-একদিনের মধ্যে বিষুনিটা কেটে যাবে। এভিন্ন দংশস্থান যদি দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ কোন দাগ নজরে পড়ে, তা হ'লে ওখানে ঐ বীজ বেটে লাগিয়ে দিতে হবে।

২। **স্নায়ুগত বাতেঃ—** যাকে আমরা চল্‌তি কথায় ঝিন্‌ঝিনে বাত বলি। এ রোগের সাধারণ লক্ষণ হ'লো—চোখের পাতা নাচে, পা-নাচানো অভ্যেস, মাঝে মাঝে কানে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকার শব্দ শোনা যায়, একটু ব'সে থাকলেই পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে, অনেক সময় হাতের বা পায়ের পেশীগুলি নাচতে থাকে; এও দেখা গেছে—পেটের উপরটায় মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে, একটু হাত দিয়ে চেপে দিলেই ঐ কাঁপাটা (কম্পনটা) থেমে যায়; একে হালকা করে ভাবলে চ'লবে না। এটাকে উপেক্ষা ক'রলে পরিণামে চক্ষুরোগ হবেই। তাই এটাকে নিরাময় করার উপদেশ আয়ুর্বেদের মনীষী-গণ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ঔষধ হ'লো—চাকুন্দের বীজের গুঁড়ো এক গ্রাম, আধ কাপ গরম জলে ফেলে, আধ ঘণ্টা বাদ তাকে ছেঁকে নিয়ে, থিতিয়ে গেলে সকালে একবার ক'রে খেতে হবে; এটা একদিন অন্তর খাবেন, তবে অন্ততঃ মাসখানেক খেতে হয়, তারপর সপ্তাহে ১ দিন ক'রেও কিছুদিন খাবেন।

৩। **রক্তগুল্মেঃ—** অরুচি থেকে আরম্ভ ক'রে গর্ভের লক্ষণ সবই হবে এবং গর্ভের স্পন্দন দুটোতেই হবে, তবে গর্ভসঞ্চারে শূলের মত কোন ব্যথা হবে না। রক্তগুল্মে এই ব্যথাটা থাকবে। তবে বর্তমানে অনেক সহজ পদ্ধতিতে এটা গর্ভ কিনা তা নির্ণয় করা হ'চ্ছে। এক্ষেত্রে চাকুন্দের বীজ এক গ্রাম ও মুলের ছাল ২ গ্রাম দুই কাপ জলে ফুটিয়ে নিয়ে আধ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে, প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে দু'বার খেতে হবে; এর দ্বারা স্রাবও হ'য়ে যাবে, আর গুল্মের যন্ত্রণাও চ'লে যাবে।

৪। **ক্রিমিতেঃ—** অনেক সময় মুখ দিয়ে জল ওঠে, গা বমি-বমি করে, যাকে আয়ুর্বেদে বলে বিবমিষা। এটা যে ক্রিমির জন্যই সেটা মনে করা উচিত নয়, কারণ অম্লপিত্তেও তো এমন হয়। আবার মলম্বার চুলকোলেই যে ক্রিমি, এটা ভাবাও ঠিক নয়, কারণ অর্শ থাকলেও তো মলম্বার চুলকোয়—এই রকম ক্ষেত্রে এর বীজ চূর্ণ আধ গ্রাম মাত্রায় সকালে ও বৈকালে ২ বার খেতে হবে।

৫। **প্রবল হাঁপানিতেঃ—** যাঁদের এক্‌জিমার সঙ্গে হাঁপানি অথবা অর্শের রক্ত বন্ধ হওয়ায় হাঁপানি প্রবলাকার ধারণ ক'রেছে কিংবা অন্য কোন কারণে রক্তদুষ্টি হ'য়ে এক সঙ্গে যুক্ত হ'য়েছে—এক্ষেত্রে চাকুন্দে বীজ ১ গ্রাম একটু থে'তো ক'রে, এক কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আধ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে খেতে হবে। প্রয়োজন-বোধে সকালে ও বৈকালে ২ বার দুই-একদিন খাওয়ার পর কয়েকদিন একবার ক'রে খেতে হয়।

বাহ্য প্রয়োগ

৬। **ছুলিতেঃ—** এ রোগ দীর্ঘদিন শরীরে ব'সে থাকলে কারও কারও এ থেকে শ্বেতি (শ্বিত্র) পর্যন্ত হ'তে দেখা যায়। মনে রাখা উচিত যে, এই রোগ যাঁদের হয়, তাঁদের সাবান বা ক্ষারজাতীয় কোন জিনিস গায়ে মাখা উচিত নয়। এই ছুলির ক্ষেত্রে চাকুন্দের কাঁচা ফল (শিম্বী) গোমূত্রে দিয়ে বেটে লাগাতে হয়, তারপর এক ঘণ্টা বাদে ধুয়ে ফেলতে হয়; কাঁচা না পেলে ৪/৫ গ্রাম বীজ নিয়ে, সেই বীজ গোমূত্রে বেটে লাগালেও হবে। এটি ব্যবহারে কয়েকদিনের মধ্যেই এগুলি সেরে যাবে।

৭। **দাদেঃ—** যাকে সাধুভাষায় দদ্রু বলে। এই দদ্রু শব্দটির বিন্যাস করা হ'য়েছে, দদ্‌+রুক্‌, এর অর্থ হ'চ্ছে—ছোট ছোট দানা যেগুলি হবে, সেগুলি একটু চেরা আর মহিষে দাদ যেগুলি হয়, সেগুলির এই চেরা দাগ আরও লম্বা হয়, আর ঐ জায়গাটা একটু পুরু হ'য়ে যায়। এক্ষেত্রে চাকুন্দের বীজ জলে বেটে, একটু গরম ক'রে ঘ'ষে ঘ'ষে লাগাতে হয়। প্রত্যহ একবার ক'রে ২/৩ দিন লাগালে উল্লেখযোগ্য উপকার হবে; তারপর মাঝে মাঝে লাগালে ওটা সেরে যাবে।

দাদে এই চাকুন্দে বীজ ব্যবহারের সহজ পদ্ধতি হ'লো—এই চাকুন্দের বীজকে লেবুর রসে বেটে ওখানে লাগাতে হবে, তবে একটু জ্বালা ক'রবে। এখানে একটু সাবধান ক'রে দিই—বিশেষ কোমল অঙ্গে লেবুর রসে বাটা চাকুন্দে না লাগানোই ভাল; তাহ'লে হয়তো বা সেই রোষটা বৈদ্যগোষ্ঠীর উপরই বর্তাবে।

৮। **আধকপালে মাথা ব্যথায়ঃ—** একে আয়ুর্বেদে বলা হ'য়েছে "অর্ধাবভেদক" রোগ. এ রোগে চাকুন্দের বীজ ভাতের আমানিতে বেটে কপালে লাগাতে হবে। (আমানি হ'লো—ভাত দুই/তিন দিন ভিজিয়ে রাখলে যে টক জলটা তৈরী হয়, সেইটাই।) এই রোগকে হালকা ভাবা উচিত নয়, পরিণামে এ থেকে কঠিন চক্ষুরোগও আসতে পারে। এমন কি শঙ্খক রোগও হ'তে পারে।

৯। **অর্শ রোগেঃ—** চাকুন্দের বীজ আন্দাজ এক গ্রাম চন্দনের মত ক'রে বেটে অল্প মাখন (সাদা) মিশিয়ে অর্শের বলি বা তার চারপাশে লাগাতে হবে। এর দ্বারা যন্ত্রণার উপশম হবে।

উপসংহারে এইটুকু জানাতে চাই, প্রায় সাড়ে চার/পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে কি

দ্রব্যবিচার, কি রোগবিচারের একটি প্রধান মননকেন্দ্র ছিল প্রাণীকুলের আহার-বিহার, নিয়ম-নিষ্ঠার প্রকৃতি পদ্ধতি দেখে। তাঁদেরই সমীক্ষাটা আজ আমাদের পাথেয়। সেই প্রসাদটুকুই আমরা নাড়াচাড়া ক'রে সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে গেলে যে সাধনা ও নিষ্ঠা চাই—সেটা আজ উল্‌টে পুরাণ প'ড়ে উদ্ধার করা সম্ভব হবে কি? তাই প্রাণীজগতের কাছেই খুঁজি—তোমরা কি করো—তোমরা কি জানো!

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Emodin, glycoside, a pleasant smelling fixed oil. (b) Tannic acid, chrysophanic acid. (c) Flavonoid constituents.

কাসমর্দ (কালকাসুন্দে)

সংস্কৃত ভাষায় যাঁরা পণ্ডিত, বিশেষতঃ কাব্যে, অলংকারশাস্ত্রে ও সাহিত্যে যাঁদের বিশেষ অধিকার আছে, তাঁরা শব্দের সংযোজন এমন রসিকতার সঙ্গে ক'রতেন—যেটা দিনের বেলায় ঝি আর রাতের শয্যাসঙ্গিনী, অসতের চোখে শোভন আর সৎ-এর চোখে অশ্লীল। সামান্য একটু ইঙ্গিতেই আপনি বুঝবেন যে, শব্দের জট কিভাবে পাকিয়ে আছে। আচ্ছা—আপনিও বলে থাকেন ভগবান, ভগবৎ প্রেম। এই শব্দটির অন্বয়ের পূর্বরূপটা আপনার মনে কোনদিন অশ্লীল মনোভাব কি জাগিয়েছে? (আসলে এটির অর্থ হ'লো—যে কোন ইন্দ্রিয়বান প্রাণীকেই ভগবান বলা হ'তো।) এই রকম বহু শব্দই আছে যেগুলির সমন্বয়ে ও সংযোজনে তার অর্থ বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়।

এই দেখুন না, মর্দ একটি শব্দ—এর অর্থ মর্দন করা, এই শব্দটি আলংকারিক পণ্ডিতের কলমে এসে কি রূপ নিতে পারে দেখুন।

"মর্দ্দনে পীড়নে যস্য বর্ধনং চাপি হর্ষতা।
মর্দ্দপ্রিয় ধ্বজঃ সেব্যঃ ভগবৎ জন প্রেমদঃ॥"

এর একটি অর্থ হ'লো—সংভাবাপন্ন গুণী ব্যক্তি অন্য গুণীকে (তাঁর জ্ঞানকে যতই মর্দন ক'রবেন, ততই তার হর্ষ হবে এবং উভয়েরই জ্ঞানের বর্ধন হবে।আর ভগবৎ প্রেমের ক্ষেত্রেও ততই—যতই সেটি মথিত হবে, ততই হর্ষ এবং বর্ধন দুই-ই হবে। আর দ্বিতীয় অর্থটি বাৎসায়নের কামসূত্রের অন্তর্গত, সেক্ষেত্রে যৌনযোগে মর্দন ব্যতিরেকে বর্ধনও হয় না, হর্ষও হয় না; তাই মর্দ বা মর্দন ক্রিয়াটি বর্ধিতেরই প্রাক্‌কৃত্য।

অতএব মর্দ শব্দটি শুনলেই থমকে অর্থ ক'রতে হয়, নইলে কাসমর্দে এমন শব্দ-নিরীক্ষার তাৎপর্য থাকে না।

এই দেখুন না—সাবানও মাখা, হলুদও মাখা, আবার পাউডারও মাখা, কথাটাও গায়ে মাখা, তারপর তরুণ-তরুণীতে মাখামাখি, সবই কি আপনার একই অনুভূতি নিয়ে এলো? সেই রকম মর্দ বা মর্দন শব্দটিও এমনই সার্বজনিক—যেটা বরের ঘরের মাসী আবার কনের ঘরের পিসী। এই রকমই লৌকিক ভাষার একটি শব্দের পার্থক্যে তার অনুভূতির ক্ষেত্রও পার্থক্য সৃষ্টি করে, কিন্তু সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডারে সে ধরনের একই অনুভূতির অবকাশ একই শব্দের মাধ্যমে তাঁরা রাখেননি, তার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রের শব্দবিন্যাসও পৃথক ক'রেছেন; তাই তাঁরা ব'লেছেন—মার্জন, মজ্জন, বিম্লাপন, সিঞ্চন, ম্রক্ষণ, মর্দন প্রভৃতি; এইসব শব্দসৃষ্টি কিন্তু পৃথক অনুভূতির সৃষ্টির জন্য, সবারই বাস্তব ক্রিয়া পৃথক—এই কাসমর্দের ক্ষেত্রেও তাঁদের শব্দবিন্যাসটির লক্ষ্য "শ্লেষ্মা কঠিনীভূত হ'লে সেখানেই তার প্রয়োগ", সেইহেতু এর মর্দ বিশেষণটির প্রয়োগ।

এই নামটি কিন্তু প্রাচীন নাম নয়, এই নামের বিন্যাসে নবীনের ভাষার ছাপ আছে, তাই আদি নাম খুঁজতে খুঁজতে একাদশ শতকের চক্রপাণিদত্ত মহাশয় তাঁর কৃত চরকের টীকায় এর বৈদিক নামটি লিখে গিয়েছেন 'কারঙকত'। তারই আধুনিক নাম বলা হ'চ্ছে 'কাসমর্দ'। তাই অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৩।১১৯।৬ সূক্তে এই কারঙকতের উল্লেখ।

স ত্বং নঃ কারঙ্কত জাতং সোমস্য সদ্ভূম্যাদদে উগ্রং শর্ম মহিশ্রবঃ।

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> ত্বং কারঙ্কতঃ সোমস্য শ্লেষ্মনঃ জাতং উৎপন্নং কারং কুৎসিত-শব্দং কাসং কতয়সি, ঘাতয়সি ত্বং সদ্ভূম্যাঃ আদদে কাসমর্দ ইতি। উগ্রং উৎকৃষ্টং শর্ম সুখং গৃহ পুত্রাদি জন্যং মহি মহৎশ্রবঃ কীর্ত্তিঃ ধনম্।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—তুমি কারঙকত। সোম বা শ্লেষ্মা থেকে উৎপন্ন কুৎসিত শব্দোত্থিত কাসকে তুমি ঘাতন কর। তুমি সৎভূমি থেকে গৃহীত হও, (এইটি কাসমর্দ)। গৃহে পুত্র-পরিজনের জন্য তুমি আহৃত হও। তুমি শ্রেষ্ঠ ধন।

বৈদ্যকের নথি

[সংহিতার যুগে]

পিত্ত-শ্লেষ্মাজনিত যত প্রকার ব্যাধিরা সৃষ্টি হ'তে পারে, প্রায় ক্ষেত্রেই এই ভেষজটির ব্যবহার করা হ'য়েছে।

খুব লক্ষ্য করার বিষয়—চরক সংহিতায় বৈদিক সূক্তকেই অনুসরণ ক'রে তাকে রোগ নিরাময়ে প্রয়োগ করা হ'য়েছে। চরকের চিকিৎসাস্থানের ২১ অধ্যায়ে হিক্কা-শ্বাসে কাসমর্দ পত্রের যূষের ব্যবহার করা হ'য়েছে, এভিন্ন চরকের সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে শাকবর্গে এর পাতার গুণ সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে—ত্রিদোষঘ্ন অর্থাৎ এটি বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষনাশক, আর বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে এটির পাতার রস বমনোদ্রেককারী ব'লে বর্ণনা র'য়েছে, ওইখানেই স্পষ্ট ওকে 'কারঙ্কত' নামে পরিচিত করা হ'য়েছে। তাছাড়া চিকিৎসাস্থানের ২২ অধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকে (কাসরোগে) প্রচলিত কালকাসুন্দের (এখানে কাসমর্দ নাম) এবং বেগুন (Solanum melongena)

পাতার রস মধুর সংগে কাস নিরাময়ে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই ২২ অধ্যায়েই অবলেহরূপে (Linctus) ব্যবহারের জন্য হরীতকী (Terminalia chebula), মুথো (Cyperus rotundus)ও আকনাদি (পাঠা, যার বোটানিকাল্ নাম Stephania hernandifolia) প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্যের সংগে কাসমর্দের মূলের ব্যবহার।

সুশ্রুত সূত্রস্থানের ২৮ অধ্যায়ে সুরসাদিগণে কাসমর্দ সম্বন্ধে ব'লেছেন—এটি প্রতিশ্যায় (cold in the nose or coryza), অরুচি (Aversion to food), শ্বাস (Asthma) ও কাসে (cough) ব্যবহার্য। এর স্বতন্ত্র গুণ ব্রণ শোধন করে।

ষষ্ঠ শতকের প্রাচীন গ্রন্থকার বাগ্ভটাচার্য এটির একক ব্যবহার অপেক্ষা বহু ভেষজ মিশিয়ে ব্যবহারের রীতি দেখিয়েছেন। ইনি তাঁর গ্রন্থের উত্তরস্থানের ৩৪ অধ্যায়ে গুহ্যগত রোগেও এটি ব্যবহার ক'রেছেন।

একাদশ শতকের চক্রপাণি দত্ত তাঁর কৃত গ্রন্থ চক্রদত্তে দদ্রু (Ring-warm) ও কিটিম (psoriasis) কুষ্ঠে কাসমর্দের মূল কাঁজিতে পেষণ ক'রে প্রলেপ দেওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

এভিন্ন বিষচিকিৎসা অধ্যায়ের মধ্যে উল্লেখ ক'রেছেন যে, বৃশ্চিক (বিছে) দংশন ক'রলে দংশিত ব্যক্তির কানে কাসমর্দের মূল চিবিয়ে ফুঁ দিলে ঐ বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা ক'মে যায়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে এ কথাটার যৌক্তিকতা স্বীকার না করার যথেষ্ট কারণ আছে, তথাপি আমি গ্রামীণ বৈদ্যগণকে অনুরোধ ক'রবো—তাঁরা এটাকে পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, কারণ নগরজীবনে এ পরীক্ষার অবকাশ খুবই কম, তাই অনুরোধটা তাঁদের কাছেই রইলো; আর দ্বিতীয় কথা, এটা তো আর বিষ নয়, যার জন্য কৃত ব্যক্তির কোন ক্ষতি হবে। তারপর পরবর্তী স্তরে সপ্তদশ শতকের বৈদ্য বঙ্গসেন তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে, বায়ুজন্য যে শ্লীপদ (গোদ) রোগ হয়, সেখানে এই কাসমর্দের মূল চূর্ণ গাওয়া ঘিয়ে মেড়ে খেলে ঐ শ্লীপদ প্রশমিত হয়। এখানে মাত্রা সম্বন্ধে উল্লেখ না থাকলেও ব্যবহার করা উচিত মূলের ছাল, কারণ মূলটি কাষ্ঠগর্ভ (hard core) আর এই মূলের ছালের চূর্ণের মাত্রা নেওয়া উচিত ১০০ থেকে ২০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত।

এখানে একটি কথা ব'লে রাখি—চরকে এই ক্ষুদ্র ক্ষুপটির অংশবিশেষ অথবা সমগ্রাংশ পিত্ত-শ্লেষ্মজ ব্যাধিতে ব্যবহার করা হয়েছে সত্যি কিন্তু সূত্রস্থানের শাক-বর্গের মধ্যে এটা যখন সন্নিবেশিত হ'য়েছে, সেখানে এটিকে ত্রিদোষঘ্ন ও গ্রাহী বলে বর্ণনা করা হ'য়েছে। সেই তথ্যকে উপজীব্য ক'রলে এই বাতজ শ্লীপদে প্রয়োগ অযৌক্তিক হয় না, কারণ এখানে কফ অনুষঙ্গী হ'য়ে তো আছেই, সুতরাং প্রশমিত না হওয়ার কারণ আছে ব'লে মনে হয় না।

পরিচিতি

অযত্নসম্ভূত ক্ষুপ জাতীয় গাছ হ'লেও খুব ছোট ছোট নয়, ঝাড়দার গাছ, বর্ষার প্রারম্ভে বীজ থেকে গাছ বেরোয়; যদিও বর্ষজীবী গাছ, তা হ'লেও পুরানো গাছ ২/৪টি দেখা যায় না তা নয়, পাতা ১ থেকে ১½ ইঞ্চি লম্বা, পাতা চটকালে তীব্র কটুগন্ধ বেরোয়, একটা লম্বা বোঁটায় ২ থেকে ৬ জোড়া পাতা থাকে। ফুল হয় ভাদ্র-আশ্বিনে, রং লালি হ'লদে, তারপরে হয় চ্যাপ্টা শুঁটি, বীজ একসংগে ৪/৫টি, প্রতি শুঁটিতে ২০/২৫টি বীজ থাকে, ফাল্গুন-চৈত্রে বীজ পেকে আবার মাটিতে পড়ে। এটি হিমালয়ের পাদদেশ থেকে আরম্ভ ক'রে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত ভারতের সব প্রদেশেই

পাওয়া যায়। এটির বোটানিকাল্ নাম Cassia occidentalis Linn., ফ্যামিলি Leguminosae. এই গাছের পাতার শির, গাছের উপরের অংশটা একটু বেগুনে রঙের হয় ব'লেই একে বলে কালকাসুন্দে; এর আর একটি প্রজাতি যত্রতত্র আমরা দেখতে পাই—সেটির পাতাগুলি একটু ছোট এবং পাতার ডাঁটাও বেগুনে রং নয়, আর তার ফলগুলি (শুঁটিগুলি) হয় গোল। সেটির বোটানিকাল্ নাম Cassia sophera Linn., ঔষধার্থে ব্যবহার করা হয় পাতা, ফুল অথবা মূল সমেত সমগ্র গাছ।

বৈদ্যক ও লোকায়তিক ব্যবহার

১। **অরুচিতেঃ—** এ অরুচির ক্ষেত্রে থাকে পিত্ত-শ্লেষ্মার দোষ, তার প্রধান লক্ষণ থাকবে—জিভটা ফাটা-ফাটা এবং জিভের ধারটা লাল; কিছু খেলেই জ্বালা করে আর মুখে কিছুতেই যেন রুচি হয় না; এক্ষেত্রে কালো বা সাদা কাসুন্দের পাতা অল্প লবণ দিয়ে সিদ্ধ ক'রে (জল ফেলার দরকার নেই) ঘিয়ে সাঁতলে ৮/১০ গ্রাম আন্দাজ শাকের মত ভাতের সঙ্গে খেলে ২/৩ দিনেই অরুচিটা সেরে যাবে; কিন্তু বেশী খেলে পেটে বায়ু হওয়ার ভয় থাকে, সুতরাং অল্প খাওয়াই ভাল।

২। **গলা ভাঙ্গায়ঃ—** যে গলা ভাঙ্গায় মাঝে মাঝে ফাটা কাঁসির মত স্বর বেরোয়, আবার একদম ব'সে যায়, সেখানে বুঝতে হবে এটাতে কফের সঙ্গে পিত্তেরও যোগ আছে; এক্ষেত্রে এর পাতা ও ফুল (সম্ভব হ'লে) দুটোয় মিলিয়ে ১০ গ্রাম আর শুষ্ক হ'লে ৩ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে অর্ধেকটা ক'রে দুইবারে সমস্তটা খেতে হবে। তবে এর সঙ্গে এক চ-চামচ ক'রে মধু মিশিয়ে খেলে ভাল হয়।

৩। **গলা-বুক জ্বালায়ঃ—** চোরা অম্লরোগে কালোকাসুন্দের ফুল চূর্ণ এক বা দেড় গ্রাম মাত্রায় সকালে ও বৈকালে জলসহ খেলে এই খল ব্যাধিটা সেরে যাবে।

৪। **পাতলা দাস্তেঃ—** এ'দের দাস্ত বারে বারে হবে, গন্ধ বিশেষ নেই, রংও হ'লদে, নোন্‌তা জিনিস খাওয়ার ঝোঁক বেশী, এক্ষেত্রে কালো-কাসুন্দের পাতার রস এক চা-চামচ একটু গরম ক'রে খেতে দিলে ওটা সেরে যাবে। তবে সাবধানে না থাকলে আবার আসবে।

৫। **হুপিং কাসিতে (ঘুংড়ি কাসি)ঃ—** কালোকাসুন্দের পাতার মিহি চূর্ণ চিনির রসে পাক ক'রে ৩/৪ গ্রাম ওজনের লজেন্সের মত পাকিয়ে রাখুন। প্রত্যহ সকালে একটা ও বৈকালে একটা চুষে খেতে দিন, এটা চুষে খেলে দুই/তিন দিনের মধ্যে কাসির দমকটা ক'মে যাবে।

৬। **মূর্ছায়ঃ—** হঠাৎ কোন কারণে মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়লে (যে মূর্ছা রোগগ্রস্ত হয়নি), সেক্ষেত্রে কালোকাসুন্দের পাতার রস এক চা-চামচ খাইয়ে দিতে হয় আর ২/১ ফোঁটা রস নাকে দিতে হয়। এর দ্বারা তখনই মূর্ছা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৭। **বিষমজ্বরেঃ—** ঘুস্‌ঘুসে জ্বর হ'লেও খাওয়ায় অরুচি নেই, আর জ্বর আসার এবং সময়েরও ঠিক নেই, আস্তে আস্তে হাত-পা সরু হ'তে থাকে; পেটটাও বড় হয়, শিরা বেরোয়, গুঁঠলে মল, আয়না পেলেই তাঁরা দাঁতের ময়লা আর দাঁতের ফাঁক দেখে; এ'দের এই ঘুস্‌ঘুসে জ্বরে কালোকাসুন্দের শিকড়ের ছালকে বেটে,

মটরের মত বড়ি (বটিকা) ক'রে রাখতে হবে। প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে একটি ক'রে জলসহ খেতে হবে। কয়েকদিন খেলেই এইসব অসুবিধে চলে যাবে।

৮। **হাঁপানিঃ—** কালোকাসুন্দের মূলের ছাল শুকিয়ে সুরাসারে (রেক্‌টিফায়েড্ স্পিরিট) ভিজিয়ে এ্যালকোহল্ এক্‌স্‌ট্রাক্ট্ ক'রতে হবে। সেই টিঞ্চার ৫ ফোঁটা ক'রে প্রত্যহ জলসহ সকালে ও সন্ধ্যায় দুই বার খেতে হবে; যাঁদের এক্‌জিমা আছে, তার সঙ্গে হাঁপানি, সেক্ষেত্রে এটি ভাল কাজ করে।

৯। **গ্রীষ্মের ফসলঃ—** শরীরে লাল চাকা চাকা হ'য়ে ফুলে ওঠে, এক্ষেত্রে কালোকাসুন্দের পাতার রস ক'রে গায়ে মাখলে ওটা সেরে যায়, এমন-কি ছোটখাটো দাদও সেরে যায়।

১০। **নালী ঘায়েঃ—** নালী ঘায়ে অথবা পচা ঘায়ে বা এই জাতীয় দূষিত ঘায়ে কালোকাসুন্দের মূলের ছাল যতটা—তার ৩ গুণ পাতা নিতে হবে, আর গাওয়া ঘি এই দুইয়ের দ্বিগুণ আর জল নিতে হবে ঘিয়ের দ্বিগুণ অর্থাৎ মূলের ছাল যদি এক তোলা হয়, পাতা নিতে হবে ৩ তোলা আর ঘি নিতে হবে ৮ তোলা এবং জল ১৬ তোলা। প্রথমে ঘি আগুনে চড়িয়ে নিষ্ফেন হ'লে তারপর ঐ ঘি নামিয়ে, একটু ঠাণ্ডা হ'লে ঐ পাতা ও ছাল বাটা ঐ ঘিয়ে দিয়ে একটু নেড়েই ঐ জলটা দিয়ে পাক ক'রতে হবে। (এখানে একটু ব'লে রাখি, পূর্বে এই পাতা ও ছালটি শিলে মসল্লা বাটার মত বেটে রাখতে হবে।) তারপর মৃদু জ্বালে ওটাকে পাক ক'রে জলটা ম'রে গেলে, নামিয়ে ঘি ছে'কে নিতে হবে। এই ঘি তুলোয় ক'রে লাগাতে হবে।

সর্বশেষে আমার বক্তব্য এই যে, প্রথম বয়সে সর্বনাম প'ড়েছি, তারপর শব্দরূপ আর এই পরিণত বয়সে 'নাম' শব্দে প'ড়ে নাকানিচুবুনি খেতে হ'চ্ছে; এই ভেষজটির প্রারম্ভিক স্তরের আলোচনাটা হয়তো বা অনেকের রুচিকর নাও হ'তে পারে, কিন্তু বিষয়বস্তুর আলেখ্যের বাস্তবতার অনুধাবন করাই তো বৈদ্যের ধর্ম, তাই অরুচিকর হ'লেও দৃষ্টফল।

আচ্ছা, কাসমর্দ নামটাই বা তাঁরা কি হিসেবে দিলেন—বাস্তব না থাকলে কি আর মর্দন করা যায়? কারণ কাসির শব্দটাই আমরা শুনতে পাই, এখানে এই শব্দটা যে সৃষ্টি ক'রছে সে তো বায়ুর ধমকে শ্লেষ্মার শব্দ, তাকে মর্দন করাই এখানকার লক্ষ্য, বৈদ্যকের ভাষায় এইটাকেই বলা হয় লক্ষ্যে লক্ষণের সমন্বয়।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Emodin, oxymethyl anthraquinones, toxalbumin, mucilage, chrysarobin. (b) Tannic acid. (c) Fatty oil.

অশ্বগন্ধা

এককালে বৈদ্যরা ছিলেন 'কোবিদ্' অর্থাৎ যে শাস্ত্রজ্ঞানী; কারণ কো বললেই শাস্ত্র বোঝায়, এটা বৈদিক শব্দ; সেই বৈদিক সংস্কৃতির আমলেই কোবিদ্‌গণ আদরণীয় হ'য়ে ওঠেন, তখন তাঁদের সম্মানের সংক্ষিপ্ত নাম হ'য়ে যায় 'কবি'—কো-এর 'ক', আর বিদ্-এর 'বি' নিয়ে কবি।

আদ্যক্ষর নিয়ে নাম পরিচিতির প্রচলন কোন্ দেশে ছিল না? যদিও এটা ভারতেই প্রথম চালু হ'য়েছে, কিন্তু বহির্ভারতে তার প্রচলনও কম নয়, অতএব কবি বা কোবিদ্-গণের ভাষার মিল বিশ্বজুড়ে।

এই যেমন একটি শব্দ অশ্ব, অর্থাৎ যে সারাপথ দ্রুত ভ্রমণ ক'রতে পারে, আর তার খাদ্যগুলি স্তূপ করা থাকলে তবেই সে খেয়ে থাকে; তাই তার নাম অশ্ব—এইটি বৈদিক অভিধানকার যাস্ক ব্যাখ্যা ক'রেছেন। আবার এই অশ্বকেই দেখা যাচ্ছে ফারসী ভাষায় অপ্‌স্, পারসীদের আবেস্তায় অপ্‌প, গ্রীক ভাষায় হিপ্‌পস্, ল্যাটিনে অশ্‌ভ, ফরাসী ভাষায় রস্, আইস্‌ল্যান্ড ও ইংলণ্ডে হর্‌স্ (Horse); সকলের শব্দ-ব্যাকরণেই সেই একই ইঙ্গিত—যে দ্রুত গমন ক'রতে পারে এবং এদিকে বা ওদিকে যে সমানভাবে দৌড়তে পারে, সেই প্রাণীর নাম অশ্ব।

আমাদের ভাষার আদি সূত্র বেদ, সেই বেদের অংশবিশেষ হ'লো 'শুক্ল যজুর্বেদ', তারই ২০/১৪ সূক্তে একটি উপমা দেওয়া হ'য়েছে—জল, অগ্নি, বায়ু, ভূ, ব্যোম, মন ও বুদ্ধি—এরা যেন সাতটি অশ্ব; আর সেই সপ্তাশ্ব-চালিত রথে চ'ড়ে আমাদের দিবাকরও (সূর্য) যেমন ভ্রমণ করেন এই ভূমণ্ডলে, সেই রকম আমাদের দেহ ও মন সেই সপ্তাশ্বচালিত রথ, আর সেই রথে চ'ড়ে প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত কাটিয়ে চ'লেছেন আমাদের আত্মা, তিনিই আমাদের উপরিউক্ত ঐ সপ্তাশ্ব-চালিত রথের রথী, আমাদের

দেহরূপ রথের মৌল উপাদান তো ঐসব।

এখন দেখা যাচ্ছে—এই অশ্ব শব্দটি একটি প্রাণীর বোধক আবার ক্রিয়া-শক্তিরও বোধক, আবার বৈদিক যুগেই একটি ভেষজের নামকরণও করা হ'য়েছে এই শব্দটিকে যুক্ত ক'রে।

প্রাচীন বোটানি (Botany)

বর্তমান যুগে এটা অনেকের মনে আসতে পারে যে, তৃতীয়ার চাঁদ দেখিয়ে কাস্তের আকারটা বোঝানোর মত প্রাচীন বোটানি; কিন্তু না, তা নয়; গুরুমুখী বিদ্যের যে ধারা, তাতে তার স্বরূপ, প্রকৃতি ও ক্রিয়াকারিত্বের তুলনাবোধক নামই এই প্রাচীন

বোটানির অস্তিত্ব। আলোচ্য এই ভেষজটির অশ্বকন্দা নামকরণের পদ্ধতিটাও সেই রকমই। তার স্বরূপ, প্রকৃতি, ক্রিয়াকারিত্ব তারই তুলনাবোধক এই প্রাচীন বোটানির অস্তিত্ব।

আলোচ্য এই ভেষজটির নাম একটি বিশেষ প্রাণীর বোধক; আবার তার ক্রিয়া-শক্তিরও বোধক। একদিকে তার বস্তু-সত্ত্বার প্রকৃতিগত গুণের তুলনা এবং তারই পরিণতিতে তার বাস্তব সামর্থ্যের উপমাবোধক এই অশ্ব নামের সঙ্গে তুলনামূলক নামকরণ।

কেন—সেটা বলছি। অশ্বের একটি বিশেষ অঙ্গ মেঢ্র (লিঙ্গ) এবং তার শক্তিও অদম্য; আর এই ভেষজটি মানবের দেহে এনে দিয়ে থাকে অশ্বের মত চলৎশক্তি—কি কর্মশক্তিতে আর কি ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থের সামর্থ্যে। এখানে তার বীর্যশক্তি অশ্বের মত, আর মূলটা কন্দবৎ দেখতে ব'লেই তার নাম 'অশ্বকন্দা'। তবে এটা প্রত্যক্ষীকরণ করা গেছে যে, কাঁচা অশ্বগন্ধার গাছ-পাতা সিদ্ধ ক'রলে এমন একটা উৎকট গন্ধ বের হয়—ঠিক যেন 'অশ্বমূত্রের' মত, তাই কি প্রাচীন বৈদ্যগণ এর এই অশ্বগন্ধা নামকরণ ক'রেছেন অথবা শব্দটির রূপান্তরিত হ'য়ে অশ্বগন্ধা হ'য়েছে, সেটা নির্ণয় করা যায় না।

তবে বৈদিক যুগে এই ভেষজটিকে তাঁরা কোন্ চোখে দেখেছেন সেটাই দেখা যাক।

> "যুনক্ত মিত্রায় শুক্রং এতং জানাথ সধস্থাবিদ রূপমস্য।
> যদাগচ্ছৎ পীবরা তুরগী শুষ্মং সহদমনুং পুরূহূত"॥
> (অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প—১৩।২৪০।২)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> যা হি তুরগী তুর্ বেগেন গচ্ছতি, গম্ ড ঈ সা পীবরা=পীন লিঙ্গা শিফা অশ্বকন্দিকা, লোকেতু অশ্বগন্ধা, নতদ্ গন্ধা, কন্দিকাএব লিঙ্গাকৃতিরিতি। সা তুরগী অস্মিন্ বিদধাতি শক্তিং, তদ্ ভেষজং মিত্রায় শুক্রং রসং এতং জানীমঃ, সদস্থা বিদরূপমস্য বিদ্যুৎ প্রাখর্য্যেণ সহদমনুং শুষ্মং বলং অমুতিষ্ঠৎ যদিতি।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—তুরগী যেমন বেগসম্পন্ন, অর্থাৎ বেগ শব্দে তুর্, তাকেই ড ঈ প্রত্যয় ক'রে তুরগী, সেই রকম এই কন্দিকা অর্থাৎ যার মূলের আকৃতিও অশ্বের লিঙ্গের মত এবং তার বীর্য যেমন শক্তিধারণ করে তেমনি এই কন্দও মিত্রের জন্য বলাধান করে; বিদ্যুৎ প্রাখর্যের শক্তির অনুরূপ এই ভেষজের বল এতে বিধৃত, কন্দিকাই গন্ধিকার পূর্বরূপ।

এই সূক্তটির ভাষ্য যদি না থাকতো, তব বেদোত্তর যুগে কোন সংহিতাগ্রন্থে অশ্ব-গন্ধার সন্ধান পাওয়া যেতো না, কারণ অশ্বকন্দিকা ব'লে কোন ভেষজের নাম সেখানে উল্লেখ নেই।

বৈদ্যকের নথি

সংহিতার যুগে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে অশ্বগন্ধাকে চরক সংহিতায় ব্যবহার করা হয়েছে শ্বাসে, কাসে, বলাধানে, রসায়নে, অস্থিক্ষয়ে, হৃদ্‌দৌর্বল্যে এবং বিরেচনের মিশ্রক

ভেষজেও। এগুলিকে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যায়—হিক্কা, শ্বাস ও কাস রোগের আদি কারণ বিকারগ্রস্ত বায়ু ও শ্লেষ্মন ধাতু থেকে; আর সেটার উৎপত্তি ঘটে পিত্তস্থানে।

এটা বাগ্‌ভটের অভিমত—

'কফ বাতাত্মকা বেতৌ পিত্তস্থান সমুদ্ভবৌ।'

কিন্তু যার দেহে এই রোগগুলির বিকাশ হয়, তাদের শুধু কামের উদ্রেকই হয় না, তজ্জন্য মেঢ্রের উত্থান ও দৃঢ়তাও বলবৎ হয়; মোটকথা এই কামপ্রবৃত্তির প্রবণতা বেশী দেখা যায়, তারই পরিণতিতে শুক্রক্ষয় বেশী হয়, এইজন্য অগ্নিমান্দ্যও বেশ বাড়ে; আসলে হজমের ঘর নিস্তেজ হ'য়ে যায়। এইসব ক্ষেত্রে এমন ভেষজের প্রয়োগ করা উচিত—যাতে একইসঙ্গে ঐ দুটির ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়; তাই চরক সংহিতার চিকিৎসা-স্থানের ২১ অধ্যায়ের ৬৫ শ্লোকে বলা হ'য়েছে—অশ্বগন্ধার মূল, পত্র, কাণ্ড অর্থাৎ পঞ্চাঙ্গ নিয়ে একটি হাঁড়ির মধ্যে পুরে অন্তর্ধূমে দগ্ধ ক'রে সেই ভস্ম ঘৃতসহ সেবনের কথা। চিকিৎসাস্থানের ২৮ অধ্যায়ে বাতে ব্যবহার করা হয়েছে, আবার সিদ্ধি-স্থানের ১২ অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে বলা হয়েছে—যাঁরা সুকুমারপ্রকৃতি, অর্দিত রোগী (Facial paralysis), যৌন আসক্তিতে ক্ষীণদেহী, তাঁরা অন্যান্য ভেষজের সঙ্গে অশ্বগন্ধার মূলে প্রস্তুত রসায়ণ ব্যবহার ক'রবেন। যাঁদের ক্ষেত্রে অল্প বিরেচন প্রয়োজন, তাঁদের অশ্বগন্ধার চূর্ণ প্রয়োগ ক'রতে ব'লেছেন চরকের বিমানস্থানে।

এভিন্ন অশ্বগন্ধার বল্যশক্তিটি বাজীকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার উপদেশ দেওয়া আছে, অর্থাৎ কতকগুলি কারণে পুরুষের রতিশক্তির উদ্রেকই হয় না—শুধু যে কেবল প্রত্যক্ষ কারণেই হয় না, তা নয়; অপ্রত্যক্ষ কারণেও ইন্দ্রিয়শৈথিল্য উপস্থিত হয়; যেমন—(১) শঙ্কা বা উদ্বেগের কারণ হ'লে, (২) শোকগ্রস্ত হ'লে, (৩) স্ত্রীর প্রতি সন্দেহে—রোগজনিত অথবা চরিত্রঘটিত ব্যাপারে, (৪) যাঁর নির্জনতার অভাব, (৫) অকালে মানসিকতায় বৃদ্ধ, (৬) যিনি দীর্ঘদিন সঙ্গম বিরহিত, (৭) শুক্রস্তম্ভজ (দেহ-মনে সঙ্গমের শক্তি থাকা সত্ত্বেও শুক্রের বেগধারণ) প্রভৃতি।

এইসব পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প'ড়ে যাঁরা এই অসুবিধে ভোগ ক'রেছেন, তাঁদের এই ভেষজ-রসায়নটি খাদ্যে, পথ্যে ও ঔষধে ব্যবহার করাতে হয়।

সুশ্রুতে (সংহিতায়) ক্ষতক্ষীণ রোগে (Haemoptysis), শোষ রোগে (Consumption) অশ্বগন্ধার চূর্ণ দুগ্ধসহ ব্যবহারের উপদেশ আছে।

তারপর দেখা যাচ্ছে, চক্রদত্তের আমলে (একাদশ শতকে) অশ্বগন্ধার ভৈষজ্যশক্তির আরও গবেষণা হ'য়েছিল। যার ফলে তিনি শিশুর কৃশতায়, গর্ভিণীর দৌর্বল্যে (Deficiency in pregnancy) প্রয়োগ ক'রেছেন।

পরিচিতি

এই ভেষজটি ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই জন্মে, তবে উষ্ণপ্রধান দেশেই এর বৃদ্ধি বেশী, আর সাধারণ দেশেও হয়; কিন্তু এর বাড়বাড়ন্ত তত হয় না, তা হ'লেও এটি উষ্ণপ্রধান দেশে অযত্নসম্ভূত হ'য়েই জন্মে, তাছাড়া ভারত-সংলগ্ন দেশ সমূহেও। যত্ন না পেয়েও এদেশে যতটুকু হয়, সেটা প্রয়োজনানুপাতে খুব কমই, তাই এর চাহিদা থাকায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ করা হয়।

এটি ক্ষুপ জাতীয় গাছ, ৩/৪ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। এর পাতাগুলি দেখতে

অনেকটা অশ্বতর প্রাণীর (খচ্চরের) কানের আকারের মত হ'লেও ঝোপ-ঝাড় ও উচ্চতায় এবং কাণ্ডের গঠনে অনেকটা বেগুন গাছের মত, পাতার ও ডাঁটার গায়ে সূক্ষ্ম লোম আছে, ডাঁটার যে অংশে পাতা বেরোয়—সেখানেই টেপারির মত সবুজ বহিরাবরণে ঢাকা সবুজ মটরের মত ফল হয়, সেটা পাকলে লাল হয়; আর তার বীজগুলি বেগুনের মত। এর চাষ হয়—বেগুনের চাষ যেভাবে করা হয়। ঔষধার্থে প্রধানভাবে এই গাছের মূল ব্যবহারের কথা বলা আছে, তবে গাছেরও যে ব্যবহার হয় না তা নয়, কিন্তু আয়ুর্বেদিক গ্রন্থে ঔষধার্থে কাঁচা গাছ বা মূলের ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া আছে। এই গাছটির বোটানিকাল্ নাম Withania Somnifera Dunal., ফ্যামিলি Solanaceae.

এছাড়া বর্তমানে আর এক প্রকার অশ্বগন্ধার ব্যবহার প্রচলিত আছে, যেটি আশগন্দ নামে পরিচিত, অবশ্য এটি যে পৃথক শব্দ তা নয়—অশ্বগন্ধারই অপভ্রংশ বা প্রদেশান্তরের নাম। 'নাগরী' নামে গুজরাতের একটি অঞ্চলে এটির চাষ হয়। সেটি ভেষজ বাণিজ্যে খুবই উপযোগী, উদ্ভিদবিজ্ঞানীগণ বর্তমানে এটিকে একটি পৃথক প্রজাতি (species) ব'লে নির্ধারণ করেছেন। নামকরণ করা হয়েছে Withania ashwagandha Kaul., ফ্যামিলি ঐ Solanaceae. উড়িষ্যাতে এটি অশ্বগন্ধা নামে প্রচলিত। এই গাছটির মূলের বৈশিষ্ট্য হ'লো আঁশযুক্ত (Fibrous) নয়। শ্বেতসার অংশই বেশী।

লোকায়তিক ব্যবহার

প্রাচীনেরা এই অশ্বগন্ধার প্রয়োগ ক'রেছেন—যেখানে রসবহ, রক্তবহ ও শুক্রবহ স্রোতের দোষকে নিরসন করিয়ে তাকে স্বাভাবিক ক্রিয়ায় চালিত করাটা একান্তই প্রয়োজন।

১। **শিশুকালের কার্শ্য রোগে:—** যাকে Emaciation বলে। এর কারণ থাকে—তার অপুষ্টি, যেটা তার রসবহ স্রোত অথবা রক্তবহ স্রোতের স্বাভাবিক ক্রিয়াশালিতার অভাবেই হয়। আচ্ছা, সেটা না হয় ওষুধ-বিষুধ খেয়ে আর পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে স্বাস্থ্য ভাল হ'লো ঠিকই, কিন্তু একটি জায়গায় গলদ র'য়ে গেল—তার শুক্রবহ স্রোতের হীনবলত্ব তো থেকে যাবে। যখনই সে বিবাহিত হ'লো—তখনই তার ঐ হীনশুক্রের জন্য খুবই অসুবিধে হ'তে থাকবে; সেক্ষেত্রে অশ্বগন্ধামূল চূর্ণ দেড় গ্রাম মাত্রায় প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে আধ কাপ গরম দুধে মিশিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ শুক্রের অপুষ্টিটা চ'লে যাবে।

২। **শ্রমে ক্লান্তিতে:—** শরীরে এমন কোন রোগও নেই, হজমও হয়, দাস্ত পরিষ্কারও হয়; শরীর যে খারাপ তাও নয়, অথচ তারা একটু পরিশ্রম ক'রলেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে; তখনই ধ'রে নিতে হবে—তার রক্তবহ স্রোতে দুর্বলতা এসেছে, অর্থাৎ অল্পেই তার হৃদ্‌যন্ত্রকে অধিক পরিশ্রম ক'রতে হচ্ছে; এক্ষেত্রে অনেকের দেখা যায় ধমনীর স্পন্দন দ্রুত হ'য়েছে (যেটার চিরাচরিত প্রচলিত নাম নাড়ী)। এই যে হৃদ্‌যন্ত্রের অত্যধিক চালনা হ'চ্ছে—এর জন্যেই সে ক্লান্তি অনুভব ক'রছে, তাই এক্ষেত্রে অশ্বগন্ধামূল চূর্ণ দেড় গ্রাম মাত্রা ক'রে দু'বেলা আধ বা এক কাপ গরম দুধে মিশিয়ে খেতে হবে। কয়েকদিন খাওয়ার পর ঐ মাত্রাটা আস্তে আস্তে বাড়িয়ে ৪/৫ গ্রাম ক'রে প্রতি বেলায় খেতে পারবেন। এইভাবে সুরু থেকে মাস দেড়েক খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ ক্লান্তি আর থাকবে না।

৩। **শ্বাসে ও কাসে:—** যদি এ'দের শৈশবের ইতিহাসে শোনা যায়—এ'রা ছোট-বেলায় খুব ডিগ্‌ডিগে চেহারার ছিলেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চেহারার পরিবর্তন হ'য়েছে বটে, কিন্তু একটা গলদ তাঁদের শরীরে থেকে যাবে, সেটা হ'চ্ছে—অল্প ঠাণ্ডা লাগলে অথবা কোন ঋতু পরিবর্তনের সময় তাঁদের সর্দি-কাসি হবেই, তখনই বুঝতে হবে—শৈশবের অপুষ্টিই এই বিপাকে ফেলে দিয়েছে। এক্ষেত্রে অশ্বগন্ধা মূল চূর্ণ এক গ্রাম থেকে ২ গ্রাম মাত্রায় সকালে ও সন্ধ্যায় অল্প গরম জল সহ খেতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে—এটা প্রত্যক্ষভাবে শ্বাস-কাসের ওষুধ নয়; যাঁর পূর্ব ইতিহাস এই ধরনের ছিল, তাঁর ক্ষেত্রেই কাজ ক'রবে।

৪। **ফোড়ায়:—** অনেকে এটাতে ভুগে থাকেন। অনেকে ব'লে থাকেন যে, রক্ত খারাপ হ'য়েছে, কিন্তু জেনে রাখুন—রক্ত দূষিত হ'লে আরও কঠিন রোগ আসে, যেমন কুষ্ঠ ও বাতরক্ত। কোন কারণে রক্তবিকৃত হ'য়ে এই ফোড়া হ'য়েছে—এই বিকারকে সরিয়ে দিলেই ফোড়া আর হবে না, সেক্ষেত্রে অশ্বগন্ধামূল চূর্ণ এক থেকে দেড় গ্রাম মাত্রায় আধ কাপ গরম দুধের সঙ্গে সকালে ও বৈকালে দু'বার খেলে ঐ রক্তবিকারটা চ'লে যাবে, আর ফোড়াও হবে না। তবে প্রারম্ভিক মাত্রা কিন্তু এক গ্রামের (৭/৮ রতি) বেশী নয়।

৫। **শ্বেতী রোগে:—** এই শ্বেতী কত গভীরে প্রবেশ ক'রেছে সেটা বোঝার উপায়—দাগগুলি দুধের মত সাদা হ'য়ে গেলে বুঝতে হবে যে, এ রোগাক্রমণ মাংসবহ স্রোত পর্যন্ত হ'য়েছে; আর দাগগুলি একটু লাল্‌চে হ'লে বুঝতে হবে, এটা রক্তবহ স্রোতের এলাকায় আছে; আর যখন আব্‌ছা-আব্‌ছা সাদা দাগ দেখা যাচ্ছে—তখন বুঝতে হবে, এখন সে রসবহ স্রোতের এলাকায় আছে; এখন অশ্বগন্ধার মূল কাজ করে—যখন এই রোগ রসবহ ও রক্তবহ স্রোতের এলাকায় থাকে; এ অবস্থার ক্ষেত্রে অশ্বগন্ধার মূল চূর্ণ দেড় বা দুই গ্রাম মাত্রায় সকালে ও বৈকালে দু'বেলা দুধসহ খেতে হবে। আর কাঁচা অশ্বগন্ধার গাছ-পাতা ও মূল একসঙ্গে ১০ গ্রাম নিয়ে একটু থে'তো ক'রে, ২ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে সিকি কাপ বা তারও কম থাকতে নামিয়ে ছে'কে ঐ জলটা সমস্ত দিনে ৩/৪ বার দাগগুলিতে লাগিয়ে দিতে হবে। তবে ২/৪ দিন খেয়ে বা লাগিয়ে সারলো না ব'লে এটা ছেড়ে দিলে চ'লবে না; কমপক্ষে ৩ মাস ব্যবহার ক'রতে হবে। তবে এটা ঠিক, যে দাগ সাদা দুধের মত হয়ে গিয়েছে আর ৩ বৎসর হ'য়ে গিয়েছে, সেটা সেরে যাওয়া অর্থাৎ দাগ মিলিয়ে যাওয়া নিতান্তই দুঃসাধ্য; মনে করা যেতে পারে—প্রাচীন ঋষিরাও এ বিষয়ে সন্দিহান, তাই তাঁরা সুরুতেই অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যেই চিকিৎসা করার উপদেশ দিয়েছেন।

৬। **পায়ের ফুলোয়:—** প্রায়ই আমাশা হয় আর এটা-সেটা খেয়ে সাময়িক চাপা দেওয়া হ'চ্ছে, এর ফলে কিছুদিন বাদে আমরসের ফুলো পায়ে দেখা দিয়েছে, বুঝতে হবে—এ আমরস রসবহ স্রোতকে দূষিত ক'রেছে, এক্ষেত্রে অশ্বগন্ধার মূল চূর্ণ ১ গ্রাম মাত্রায় সকালে ও বৈকালে থানকুনীর (centella asiatica) পাতার রস ৪ চা-চামচ একটু গরম ক'রে সেই জলীয়াংশটার সঙ্গে খেতে হবে; অথবা শ্বেতপুনর্নবার (Trianthema portulacastrum) রসও নেওয়া চলে। এই মুষ্টিযোগটি ব্যবহার ক'রলে পায়ের ফুলোটা সেরে যাবে।

৭। **ক্রনিক্‌ ব্রঙ্কাইটিসে:—** এটার আয়ুর্বেদিক নাম তমক-শ্বাস। এই রোগের উপসর্গ হ'লো—রোগী কেসেই চ'লেছেন কিন্তু সর্দি ওঠার নামগন্ধ নেই। এক্ষেত্রে

অশ্বগন্ধার মূল চূর্ণ এক বা দেড় গ্রাম মাত্রায় নিয়ে গাওয়া ঘি এক চা-চামচ ও মধু আধ চা-চামচ মিশিয়ে সকালের দিকে একবার ও বৈকালের দিকে একবার একটু একটু ক'রে চেটে খেতে হবে।

৮। **দৈব ঔষধঃ—** এই ক্রনিক ব্রঙকাইটিসে অনেকে ভেল্‌কীবাজী দেখিয়ে থাকেন—এই অশ্বগন্ধার মূলকে অন্তর্ধূমে পুড়িয়ে ভাল ক'রে গুঁড়িয়ে নিয়ে আধ গ্রাম মাত্রায় একটু মধু মিশিয়ে চেটে খেতে বলেন। পোড়া দেওয়ার নিয়ম হ'চ্ছে—একটা ছোট মাটির হাঁড়ির মধ্যে মূলগুলোকে পুরে, মাটির সরা ঢাকা দিয়ে পুনরায় মাটি লেপে শুকিয়ে, ঘুঁটের আগুনে লঘুপুট দিতে হবে। আগুন নিভে গেলে ওটাকে বের ক'রে ঐ পোড়া অশ্বগন্ধার মূলগুলোকে গুঁড়ো ক'রে নিতে হবে।

৯। **কার্শ্য রোগেঃ—** এ রোগটা শিশুদেরই বেশী দেখা যায়। এই রোগের হেতু হ'লো—প্রথমে রসবহ স্রোত দূষিত হয়, ফলে যেটি সে খায়, সেটা থেকে তার পোষণ হয় না; তার পরিণতিতে রক্তমাংসও আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

অনেকের ধারণা, বাইরে থেকে কোন স্নেহজাতীয় পদার্থ মালিশ ক'রলে ওটার পুষ্টি হবে, আভ্যন্তরিক কোন কিছু খাওয়ানোর প্রয়োজন নাই; এর ফলে আরও খারাপের দিকে যেতে থাকে, অর্থাৎ অস্থিক্ষয় হ'তে থাকে। এক্ষেত্রে তাকে অশ্বগন্ধার মূল চূর্ণ আধ গ্রাম মাত্রায় দুইবার গরম দুধ ও চিনিসহ খেতে দিতে হয়। পরে শরীরে গঠন আরম্ভ হ'লে এটা এক গ্রাম পর্যন্তও দেওয়া যায়, কমপক্ষে ৩/৪ মাস খাওয়াতে হয়।

১০। **বুক ধড়ফড়ানিতেঃ—** হৃদ্‌যন্ত্রের কোন দোষ যন্ত্রে ধরা পড়ে না, পিপাসা বেশী, পেটে বায়ু একটু-আধটু যে হয় না তা নয়, তবে এটা তো অনেকেরই হয়; সেটা কিন্তু ঠিক কারণ নয়; আসলে রক্তবহ স্রোতের বিকার চ'লছে, তাই এই অসুবিধে। এই ধরনের ক্ষেত্রে অশ্বগন্ধার মূল চূর্ণ এক গ্রাম থেকে ১½ গ্রাম মাত্রায় দু'বেলা দুধসহ কয়েকদিন খেলে ওটা সেরে যাবে।

বাহ্য প্রয়োগ

১১। **শিশুদের দুধে-শ্বাসেঃ—** অশ্বগন্ধা মূলের ক্বাথ ক'রে, তেলে মিশিয়ে বুকে-পিঠে মালিশ ক'রলে ওটা সেরে যাবে। মাত্রা নিতে হবে—৫ গ্রাম অশ্বগন্ধামূল একটু থে'তো ক'রে এক কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে, ৩/৪ চামচ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে ঐ ক্বাথটা ২৫/৩০ গ্রাম স'রষের তেলের সঙ্গে মিশাতে হবে।

১২। **ফোড়ায়ঃ—** এ ফোড়া না পাকা না কাঁচা—যাকে বলে দরকচা মেরে আছে, সেক্ষেত্রে অশ্বগন্ধার মূল বেটে একটু গরম ক'রে ফোড়ার উপর সকালে বৈকালে ২ বার ক'রে লাগালে ওটা পেকে ফেটে যাবে।

এই অশ্বগন্ধা লেখার ছেদ টানতে ব'সে ভাবছি—এই অশ্ব একটি শব্দ, যেটিকে পৃথিবী মেনে চ'লেছে—এটি যেন কম্পাসের ৯০ ডিগ্রি; একেই মাঝখানে রেখে যোগ-বিয়োগ ক'রে চলেছে—যাকে বলা হয় 'হর্স পাওয়ার' (Horse power) । একটির/দু'টির/পাঁচটির শক্তি বেড়েই চ'ললো, নইলে বিয়োগ ক'রে আধ ঘোড়া বা সিকি ঘোড়া হ'য়ে গেল। এই যে শক্তির প্রতীক সমগ্র বিশ্ব মেনে নিয়েছে, এর আদি শব্দবিন্যাসটি কি বৈদিকযুগের আমলে হয়নি? তাই আমাদের গর্ব করা বোধ হয় অন্যায় হবে না।

যেমন ভারতের অঙ্কশাস্ত্রের আর একটি দান এই 0 শূন্যটি; এটি সংখ্যার পাশে বসিয়ে ভারতকে চিরজীবী ক'রে রেখেছে। এই অশ্ব নামটিও সেই রকম। এ তো গেল, আবার এটি যদি "ঘোড়া রোগে" দাঁড়ায় অর্থাৎ যদি এগিয়ে গেল, তবেই বরাত ফিরলো, নইলে দাঁড়িয়ে গেল তো আপনিও ব'সে গেলেন। রামায়ণের মহাকাব্যে অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বকেই বেছে নেওয়া হ'য়েছিলো; যেহেতু এটি শক্তির প্রতীক। তাই ভেষজটির নামও রাখা হ'য়েছে সেই শক্তির প্রতীককে আদর্শ ক'রে।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Alkaloids. (b) Withanolide. (c) Terpenoids.

শতাবরী (শতমূলী)

ব্রহ্মকে এ'টো করা যায় না—এটা তো বেদান্তেরই রূপান্তরিত কথা; কারণ তার সত্তা আছে রূপ নেই, অবস্থান ক'রে আছে কিন্তু প্রত্যক্ষ করা যায় না, শুধু তার অচিন্ত্য-শক্তিকে আমরা অনুভব করি, উপলব্ধি করি, সেটা তো প্রতিটি বস্তুতেই অনুপ্রবেশ ক'রে আছে। নীরূপ ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থান—তারই নাম বিষ্ণুশক্তি বা বৈষ্ণবী, সেই শক্তির ব্যাপকতাই প্রভাব। (এটা অবশ্য ঐতিহাসিক যুগের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নয়); আর বিষ্ণুর অর্থই তো ব্যাপক; তারই একটা বাস্তবের উপমাস্বরূপ বলা যায় ও প্রত্যক্ষ করা যায়—যদি কোন লোক দীর্ঘদিন তেঁতুল গাছের (Tamarindus indica) তলায় বাস করে, তা হ'লে ঐ গাছের স্পর্শলাগা বাতাস তার গায়ে চুলকণা সৃষ্টি করবে; আবার সেই লোকটিই যদি নিমগাছের (Azadirachta indica) তলায় কিছুদিন বাস

করে, তার গায়ের ঐ চুনকণা সেরে যাবে; এই হ'লো দ্রব্যশক্তির প্রভাব। আর একটা উপমা দিই—নিমকাঠের জ্বালে মাটির হাঁড়িতে ভাত রান্না ক'রে দেখুন—সেই ভাত তিতো (তিক্ত) লাগবে। আমাদের ভৈষজ্যশক্তির মধ্যেও প্রভাবশক্তিটিই সর্বাধিক অনুভূতিযোগ্য।

আলোচ্য এই ভেষজটির প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্যের সমীক্ষা হ'য়েছিল সেই বৈদিক-যুগে, তারই রূপালেখ্যটি একটু হালকা রসের অবতারণা ক'রে আপনাদের সামনে উপস্থিত ক'রছি। লোকপ্রচলিত একটি গ্রাম্য ব্যঙ্গোক্তি—"ইনি ন্যায়রত্ন" অর্থাৎ শুধু

নিতেই জানেন, আর বলা হয় "দেয় রত্ন" যাকে বলা যায় 'ঘর জ্বালানে পর ভোলানে'; আর-একরকম প্রকৃতির লোক আছে, সে শুধু সংগ্রহ ক'রে চলেছে তার স্বকীয় শক্তিতে, সে কারুর প্রভাবে প্রভাবিত হয় না বা কাউকে প্রভাবিতও করে না; তার ভূমিকা যেন বৈষ্ণবীয় মূর্তির প্রতীক, তাই তাকে বৈদিকযুগেই বিশেষিত ক'রে নামকরণ করা হ'য়েছিলো শতবীর্যা ও সহস্রবীর্যা। অন্তশ্চেতনাবতী গুল্মলতাটির এই সমীক্ষা সেই

যুগের একটি আদর্শ কাজ। তারই নজীর অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৬২২।৩২।৮৭ সূক্তে।

> তেজঃ সোমস্য হর্বিরিন্দ্রিয়াবৎ পরিস্রুতা পয়সা সারঘং মধু।
> অশ্বিভ্যাং দুগ্ধং ভিষজা চ সোম ইন্দুঃ শতবীর্য্যা বৃহস্পতিঃ।

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> ভিষগ্‌ভ্যাং=অশ্বিভ্যাং ভিষজাচ সোমস্য তেজঃ ইন্দ্রিয়াবৎ হর্বিরিব সারঘং মধু ইব পয়সা পরিস্রুতা ত্বং শতবীর্য্যা, শতাবরী মহাপুরুষ দন্তা বা। শো+উতচ্‌ শতং তীক্ষ্ণতায়াং, বীরঃ+অচ্‌ দেহস্থচরম ধাতোঃ প্রভাবেণ ইন্দুঃ ঐশ্বর্য্যপ্রদঃ সোমশ্চ দুগ্ধঃ বৃহস্পতিঃ ত্বাং সৌত্রামণী যাগে নিয়োজয়তি।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার যুগলের দ্বারা ও অন্য ভিষকের দ্বারা সোমের তেজ এবং ইন্দ্রের জন্য ঘৃত এবং সারঘ মধুর সমতুল্য শতবীর্যার পরিস্রুত দুগ্ধকে ঐশ্বর্যপ্রদ, বলপ্রদ ব'লে বৃহস্পতি সৌত্রামণী যাগে তোমাকে নিয়োগ করেন। এই শতাবরী বা শতবীর্যার অর্থভেদ ক'রতে যাস্ক ব'লেছেন শো+উতচ্‌। এর অর্থ—তীক্ষ্ণতায় এবং দেহের চরমধাতু বীর্যের প্রভাবেই গ্রহণীয়।

বৈদ্যকের নথি

সংহিতার কালে এসে আমরা এই নামটি পেয়েছি—ভারতের আয়ুর্বেদ সংহিতার শিরোমণি গ্রন্থ চরক সংহিতার চিকিৎসাস্থানের ১৪ অধ্যায়ে উন্মাদ রোগ চিকিৎসায়; ওখানে উন্মাদ রোগের প্রতিকারে যেসব ভেষজের সংক্রমণীয় যোগ দেওয়া আছে. তাদের মধ্যে আছে 'মহাপুরুষদন্তা' অর্থাৎ যার আকৃতি এক ধরনের বিশিষ্ট দন্তের মত। তবে সে দন্ত সাধারণ পুরুষের নয়, মহাপুরুষের। টীকাকারগণ একবাক্যেই স্বীকার ক'রেছেন—এ নাম যাস্ক বিধৃত শতাবরী বা শতবীর্যার একটি নাম। এরই প্রচলিত নাম শতমূলী। এর ভৈষজ্য শক্তির প্রভাব অসাধারণ। বায়ু, পিত্ত বা কফের বিকারে এই শতমূলী বা শতবীর্যের প্রভাব অচিন্তনীয়।

স্মৃতি-শাস্ত্রে একটি যুক্তি আছে—

> ন ভ্রাতা নৈব সুতশ্চ ন পিতা ভ্রাতরো ন চ।
> আদানে বা বিসর্গে বা স্ত্রীধনে প্রভবিষ্ণবঃ।

অর্থাৎ স্ত্রীধনে এরা কেউ প্রভাব বিস্তার ক'রতে পারে না; পুত্র, ভ্রাতা, পিতা বা অন্য কোন সম্পর্কীয় ভাই-ই স্ত্রীধনের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কোন প্রভাবই বিস্তার করে না। স্ত্রীধনের এমনি প্রভাব। তেমনি এই যে শতবীর্য বা শতাবরী কিংবা শতমূলী—এর ভৈষজ্যশক্তিতে এর কাছেপিঠে যে কোন ভেষজই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তার কোন শক্তি এ নেয়ও না, কারোর প্রতি নিজের শক্তির সংক্রমণও করে না; এই শতাবরী এমন স্বাধীন শক্তির অধিকারী। ভেষজকুলের মধ্যে শতাবরীর ক্রিয়াশক্তির তৎকালের এবং পরবর্তীকালের গ্রন্থকারগণ অন্ততঃ কুড়ি/পঁচিশটি নামকরণ ক'রেছেন—তাদের প্রকৃতি

গুণ কর্ম বিচার করে; তাদের মধ্যে বৈষ্ণবী নামকরণও দেখা যায়, আর বেদের সূক্তে পাওয়া গিয়েছে শতবীর্যা। অপরপক্ষে বিষ্ণুর সহস্র নামের মধ্যে সহস্রবীর্য, শতবীর্য নামও আছে।

এই অচিন্ত্যবীর্য শতাবরী ভেষজটিকে চরক সংহিতার সূত্রস্থানে এবং চিকিৎসা-স্থানের বহুস্থলেই ব্যবহার করা হ'য়েছে রোগ দূরীকরণে, যেমন—জ্বরে, ক্ষয়রোগে,

বায়ু বিকারে, রসায়নের ক্ষেত্রে; তা ছাড়া রক্তপিত্তে এবং অতিসারেও এর প্রয়োগবিধির উল্লেখ, এর পরেও বিসর্পরোগে, অপস্মারে, বাতব্যাধিতে শতাবরীর ব্যবহার।

আবার সুশ্রুতের সূত্রস্থান থেকে আরম্ভ ক'রে চিকিৎসাস্থানের বহুস্থলে অর্শে, কফরোগে, শিশুর আকস্মিক রোগে, বাতজ্বরে, স্বরভেদে এই শতাবরীর প্রয়োগ সব

চেয়ে বেশী। এ ভিন্ন বাগ্‌ভট, চক্রদত্ত, হারীত সংহিতায় পূর্বোক্ত রোগগুলি ছাড়া শূল-রোগে, রক্তপিত্তে, বাতরক্তে এবং অন্যান্য ক্ষয়জাতীয় রোগে শতমূলীর ব্যবহার প্রচুর।

পরিচিতি

শতাবরী বা শতমূলী লতাটির প্রকৃতি স্বাভাবিক ভাবেই লতানে। তবে বলা যায় এটি বৃক্ষাশ্রয়ী এবং শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে। পাতাগুলি দেখলে মনে হয় যেন সবুজ সুতোর ঝিলিমিলি মালা-গাঁথা, এইজন্য বহু সৌখীন লোক বাড়ীর উদ্যানের শোভাবর্ধন করার জন্য রোপণ করেন। আর যে কারণে এর নাম শতাবরী বা শতমূলী তা কিন্তু এর মূলের পরিচয়ে; কারণ এর শিকড়গুলি গুচ্ছবদ্ধ সরু মুলো (Raphanus Sativus) এবং গাজরের (Daucus carota) মত। এর লতায় বাঁকা কাঁটা হয়। ফুলের মঞ্জরী হয়, সেগুলি ১ থেকে দেড় ইঞ্চি লম্বা; সে দণ্ডটি সরুও হয়। শরতেই এর ফুল ও ফল হয়, পাকে মাঘ-ফাল্গুনে। ফলে একটা সুগন্ধও থাকে। ছোট মটরের মত সবুজ ফল, পাকলে লাল হয়, গাছ বহুদিন বাঁচে, সাধারণতঃ বেলে বা দোআঁশ মাটিতে এর মূলগুলি খুব পুষ্ট হয়। এক একটি পুরনো গাছে ১০/১২ কিলোগ্রাম পর্যন্ত মূল পাওয়া যায়। এটির বোটানিকাল্ নাম Asparagus recemosus Willd., ফ্যামিলি Liliaceae.

ঔষধার্থে ব্যবহার হয় মূল ও পাতা। এখানে আরও একটু জানবার আছে—আয়ুর্বেদে শতাবরী ও মহাশতাবরী নামে দুটি প্রকারভেদের উল্লেখ রয়েছে, তবে অনেকের মতে এটির বোটানিকাল্ নাম Asparagus Sarmentosus Linn. এই মহাশতাবরীর জন্ম বেশীর ভাগই দক্ষিণ ভারতে; এর লতাও বেশ বড় হয়, এমনকি বড় গাছের উচ্চতা যতখানি প্রায় ততদূর এর বৃদ্ধি।

লৌকিক ব্যবহার

প্রথমেই জানাই যে, রসবহ স্রোত এবং রক্তবহ স্রোত দূষিত হ'য়ে যে যে রোগ হয়, সেখানে শতমূলে উপকার হয় এবং সেখানে শতমূলের অচিন্ত্য প্রভাবই (immense strength) কাজ করে।

১। **রক্তামাশয়ে:**— রোগটি সহজ ভেবে ওষুধ দেওয়াটা সম্ভব হয় না, যদিও ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ ক'রে আমের সঙ্গে একটু রক্ত যাচ্ছে। এখানে কোন ঠাণ্ডা জিনিস খেলেও যে রক্তপড়া বন্ধ হবে তাও নয়, আবার কোন উষ্ণগুণসম্পন্ন যেমন—আদা, মরিচ প্রভৃতি খেলে যে সেরে যাবে তাও নয়; যে দ্রব্যের প্রকৃতিটা বীর্যবত্তায় শীত-উষ্ণ, সেই শীতোষ্ণ দ্রব্যই এক্ষেত্রে বেশী উপযোগী; তাই শতমূল বেটে রস ক'রে ৪ চা-চামচ আন্দাজ নিয়ে ৭/৮ চা-চামচ দুধ মিশিয়ে প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে ২ বার খেলে দুই-এক দিনের মধ্যেই ওটা সেরে যাবে।

২। **রক্তমূত্রে:**— এটা তিন/চারিটি কারণে হ'তে পারে। (ক) অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস ক'রলে, (খ) কোন গরম জিনিস এক নাগাড়ে দীর্ঘদিন খেতে থাকলে, (গ) অত্যধিক উষ্ণ জায়গায় দীর্ঘদিন কাজ ক'রতে থাকলেও হয়; আবার উষ্ণপ্রধান দেশে উপস্থিত হ'লে, সে-দেশের প্রচলিত আহার-বিহার না মেনে চ'ললেও রক্তবর্ণ প্রস্রাব হ'তে দেখা যায়; সেক্ষেত্রে ১০/১৫ গ্রাম শতমূলী বেটে, দুধের সঙ্গে জল

মিশিয়ে পাক ক'রে (দুধ ১১৪ মিলিলিটার/আধ পোয়া আন্দাজ আর জল ৫০০ মিলিলিটার/আধ সের আন্দাজ) দুগ্ধাবশেষ থাকতে নামিয়ে ছে'কে সকালে অর্ধেকটা ও বৈকালে অর্ধেকটা ক'রে খেতে পারলে ভাল হয়। এর দ্বারা ঐ রক্তবর্ণ প্রস্রাব আর হ'বে না।

৩। **অপস্মার রোগে (এপিলেপ্‌সিতে)ঃ—** এ রোগের লক্ষণ 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩২৯ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। এই রোগটি আয়ুর্বেদের চিন্তাধারায় রক্তজন্য মূর্ছা রোগ। এক্ষেত্রে শতমূলীর রস ৩/৪ চা-চামচ সিকি কাপ কাঁচা দুধে মিশিয়ে সকালে ও বৈকালে ২ বার খেতে হবে। কিছুদিন ধ'রে না খেলে এটা সারবে না, কমপক্ষে ৩/৪ মাস খেতে হবে। অবশ্য আস্তে আস্তে এই আক্রমণের তীব্রতা ক'মে যাবে। এটা চরক সংহিতার ব্যবস্থা (চিঃ ১৫ অঃ)।

৪। **ফাইলেরিয়ায়ঃ—** এর সঙ্গে জ্বর—এটা অনেক সময় প্রথমে আসে রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় কাঁপুনি দিয়ে; তার সঙ্গে অনেকের মুষ্কটি ফুলে যায়, কারও কারও রসও গড়ায়। শুধু তা' কেন—হাতে, পায়ে, লিঙ্গে, জননেন্দ্রিয়েও হ'য়ে থাকে। এইসব যে ক্ষেত্র—এখানে শতমূলীর রস ২ চা-চামচ, তার সঙ্গে এক চা-চামচ আখের (ইক্ষু) গুড় মিশিয়ে সরবত ক'রে প্রত্যহ একবার ক'রে খেতে হয়। আর এটা ২/৪ দিন খেলে হবে না, দীর্ঘদিনই খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৫। **স্বরভঙ্গেঃ—** বারোমাসই একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলা আর একটু চে'চালে তো কথাই নেই; কোন ওষুধেই কিছু হয় না। তখন ধ'রে নিতে হবে—এ রোগ রক্তবহ স্রোত দূষিত হ'য়ে হ'য়েছে, এটা কোন গরম বা ঠান্ডার জন্য হয়নি। এক্ষেত্রে শতমূলী চূর্ণ আধ গ্রাম মাত্রায় এক চা-চামচ গোমূত্রের সঙ্গে (ছোট বাছুরের) খেতে পারলে ভাল হয়। এই রোগকে যদি পুষে রাখা যায়, তা হ'লে গ্রীবাভঙ্গ (Spondylitis) রোগও হ'তে পারে (যে রোগে বর্তমানে গলায় প্যাড্ প'রতে দেওয়া হয়); তবে সেদিককার ভয়াবহতা চিন্তা ক'রলে গোমূত্র সেবনটা তুচ্ছ নয় কি?

এখানে আমার বৈদ্য বন্ধুগণকে জানাচ্ছি—আপনারা এই শতমূল চূর্ণকে গোমূত্রে ভাবনা দিয়ে তৈরী ক'রে ব্যবহার ক'রবেন। এর দ্বারা রোগীর মানসিকতা বিকারগ্রস্ত হবে না। এটা সুশ্রুত সংহিতার ব্যবস্থা।

৬। **রাতকানা রোগে (নক্তান্ধতায়)ঃ—** এই রোগটির আয়ুর্বেদীয় বিজ্ঞান হ'চ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মে সন্ধ্যায় তেজগুণের হ্রাস হয় এবং সোমগুণের আধিক্য ঘটতে থাকে, এটাতে স্বভাবতঃই কফের কাল এসে প'ড়লো, তার উপর সূর্যের আলোও চ'লে গেল, এদিকে অক্ষিগোলকের বিন্দুটি কফাবৃত হ'য়ে প'ড়লো।

এখন মনে এ প্রশ্ন আসতে পারে—আলোর অভাব যদি এর মুখ্য কারণ হয়, তাহ'লে দিনের বেলায় অন্ধকার ঘরে তার কি এই রাত্র্যন্ধতার অসুবিধে আসবে? হ্যাঁ আসবে—যদি দুপুরবেলা ভাত খাওয়ার পর কোন ঘর অন্ধকার ক'রে ঘুমুনো যায়, তারপর ঘুম থেকে উঠলে তার ঐ অসুবিধেটা যে হ'য়েছে, সেটা খানিকটা বোঝা যাবে। যেহেতু সে খেয়ে ঘুমিয়েছে, তার জন্য তার শরীরে শ্লেষ্মার প্রাধান্য এসেছে, তাই এই অসুবিধেটা। এখানের মৌলিক কারণ হ'চ্ছে রক্তবহ স্রোতটাই শ্লেষ্ম-বিকারগ্রস্ত। এক্ষেত্রে প্রত্যহ ৫/৭ গ্রাম শতমূলীর পাতা গাওয়া ঘিয়ে ভেজে খেতে হবে। এর দ্বারা কয়েকদিনের মধ্যে আর রাতকানার দোষ থাকবে না। এটা হ'লো বাগ্‌ভটের ব্যবস্থা, আছে উত্তরতন্ত্রে ৩৯ অধ্যায়ে।

৭। **বিরক্তিকর স্বপ্নদোষে:—** স্বপ্নসুখের আবেশ কোন কিছু ঘ'টলো না, সম্ভাব্য রূপও কিছু মনে রেখা কাটলো না, অথচ এই অবস্থা; ফলে শরীরে আসছে জড়তা, ঠাণ্ডা গরম কোন কিছুই খাওয়াও নয়, সমস্ত দিন মনের কোণে যৌন কোন রেখাপাত যে ক'রেছে তাও নয়—তা সত্ত্বেও নিদ্রাকালে যে ক্ষরণ হ'য়ে যায়, সেক্ষেত্রে শতমূলীর রস দিয়ে ঘি পাক ক'রে, সেই ঘি সকালে ও বৈকালে এক চা-চামচ ক'রে সিকি কাপ বা আধ কাপ অল্প গরম দুধে মিশিয়ে খেতে হবে। অবশ্য এটা কোন বৈদ্যের স্বারা করিয়ে নেওয়াই উচিত।

৮। **মূত্রকৃচ্ছ্রে:—** পাথুরী যে হ'য়েছে তাও নয়, অথচ কষ্টে প্রস্রাব হ'চ্ছে, তখনই বুঝতে হবে যে, রসবহ ও রক্তবহ স্রোত দূষিত হ'য়েছে; এক্ষেত্রে শুষ্ক শত-মূলীকে চূর্ণ ক'রে ১ গ্রাম মাত্রায় সকালে ও বৈকালে ঠাণ্ডা জলসহ খেলে ২/৪ দিনের মধ্যে মূত্রের কৃচ্ছ্রতা চ'লে যাবে।

৯। **পিত্তশূলে** (Biliary colic):— এই রোগটা সাধারণতঃ শরৎকালে দেখা দেয়, আবার শীতের সময় ক'মে যায়, কোন ঠাণ্ডা জিনিস অথবা কোন মিষ্টি সরবত খেলেও ক'মে যায়; এ ব্যথা কিছু খাওয়ার পরেই আসে, আবার এটা বমি হ'লেও ক'মে যায়—এক্ষেত্রে সকালবেলা খালিপেটে শতমূলীর রস ২/৩ চা-চামচ একটু কাঁচা দুধ মিশিয়ে (আধ কাপ আন্দাজ) খাওয়ালে ওটার শান্তি হবে; তবে কোন পিত্তকর দ্রব্য, যেমন লঙ্কা, টক, ডিম, শাক প্রভৃতি যতদূর সম্ভব বর্জন ক'রে চলাই ভাল।

১০। **রক্তপিত্ত রোগে:—** এটা দীর্ঘদিন পুষে রাখলে যক্ষ্মা পর্যন্তও হ'তে পারে। এটা দেখা দিলে শতমূলীর রস ৩/৪ চা-চামচ, দুধ ১১৪ মিলিলিটার (আধ পোয়া আন্দাজ) আর দুধের সমান পরিমাণ জল নিয়ে একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে ঐ দুধটা অবশিষ্ট থাকতে নামিয়ে ঐটা সকালে খেতে হবে। যদি অগ্নিবল কম থাকে, তবে ঐটাকে সকালে ও বৈকালে দু'বারে ভাগ ক'রে খেতে হবে। এর স্বারা রক্তপিত্তের শান্তি হবে। এ ব্যবস্থাটা ভাবপ্রকাশকার ভাবমিশ্রের।

১১। **স্তন্য শুষ্কতায়:—** স্বাস্থ্য যে খারাপ তাও নয়, অথচ স্তনে দুধ নেই—এক্ষেত্রে শতমূলীর রস ২ চা-চামচ, দুধ ১১৪ মিলিলিটার (আধ পোয়া আন্দাজ) আর চিনি এক চা-চামচ, একসঙ্গে সরবত ক'রে সকালে একবার ও বৈকালের দিকে একবার খেতে হবে; এর স্বারা ৩/৪ দিন পর থেকে বুকে দুধ আসবে।

বাহ্য ব্যবহার

১২। **বিসর্প রোগে (ইরিসিপ্লাস্):—** এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে অনেক অমোঘ ওষুধ বেরিয়েছে সত্যি, কিন্তু যখন সাধারণ লোক নিরুপায় ছিলো, তখন এই রোগ এসে পড়েছে দেখলে শতমূলী বেটে, সকালে ও বৈকালে দু'বার লাগানো হতো। এটা কিন্তু সুশ্রুতের ব্যবস্থা; আছে চিকিৎসাস্থানের ১১ অধ্যায়ে।

এই আলোচনাটা ইতি ক'রতে চাই—তবে এই শতাবরীর শতবীর্যা, সহস্রবীর্যা, অনন্তবীর্যা নামকরণগুলির তাৎপর্য আমাদের মন কতটা অনুধাবন ক'রতে পারলো তা জানি না, আমি কিন্তু টিয়াপাখীর মতই প'ড়ে গেলাম; তবে এইটুকু ব'লছি—বিভিন্ন রোগ-প্রতিকারে তার ক্রিয়াকারিত্বর শক্তি প্রমাণিত। সেটা বিশেষ ক'রে শুক্রধাতু ক্ষীণ হ'য়ে যেখানে কোন রোগ সৃষ্টি হ'য়েছে, আর ওটাকে মেরামত ক'রলে সেটা চ'লে

যাবে, সেই মেরামতের কাজে এই শতমূলী অদ্বিতীয়া, তাই তার এই বীর্যকেন্দ্রিক বিশেষণ।

নিরাময়ের (আরোগ্য) ধাত্রী আয়ুর্বেদজননী আজ কালরূপী গাজীর পাল্লায় প'ড়ে ইউনানি ধারার কাছে লুণ্ঠিত, পাশ্চাত্য চিকিৎসাধারার কাছে অপহৃত। আজ তার অবস্থা হ'লো—"ছেলে বিয়োলাম বৌকে দিলাম, মেয়ে বিয়োলাম জামাইকে দিলাম; আপনি হ'লাম বাঁদী, পথে বসে কাঁদি"।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Essential oil. (b) Asparagin. (c) Tyrosin.

দ্রাক্ষা (আঙুর)

আলো, বাতাস, জল ও মাটির এমনি স্বভাব যে, মাত্র দু'-তিন বংশের পর আরবের টাট্টু ঘোড়া এদেশে এসে গাধার আকারে পরিণত হয়, শিলং-এর কমলালেবুও এদেশে এসে গোঁড়ালেবু হয়, সেই রকম আঙুরও এই বাংলায় চাষ ক'রলে হয় আমড়ার মত টক।

একবার কার্যব্যপদেশে এলাহাবাদে এক বাড়িতে গিয়ে দেখি থোলো থোলো আঙুর ঝুলছে, টক যে একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু তার প্রিয় খাদ্যের কথা শুনে একটু আশ্চর্যই লাগলো; এই আঙুর গাছের গোড়ায় রক্ত দিলে নাকি তার ফলন হয় বেশী, আর গাছও তেজালো হয়, তখন ভাবলাম যে গাছও রক্ত খায়? জানি না, যে

দেশে এটি বেশী জন্মে সে দেশের মাটিতে রক্তেরই কোন উপাদান আছে কিনা? এখন প্রশ্ন এই, দ্রব্যটি কি বৈদিক? অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে—এটির যে আর এক

নাম মৃদ্বীকা, সেটার উল্লেখ আছে অথর্ববেদ বৈদ্যককল্পের ৭।১৪৬।৩ সূক্তের ভাষ্যে। সেটার ভাষ্যকার মহীধর। এর বৈদিক নাম মৃদ্বীকা।

আদি সূত্র

শ্বাত্রাঃ পীতা মৃদ্বীকা অস্মাকং অন্তরুদরে সুশেবাঃ।
অস্মভ্যং অযক্ষ্মা অনমীবাঃ অনাগসঃ স্বদন্তু॥
(অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ৭।১৪৬।৩)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

শ্বাত্রাঃ ক্ষিপ্রপরিণামাঃ পীতাঃ সত্যঃ মৃদ্বীকাঃ (শ্বাত্রং ইতি ক্ষিপ্রং দ্রাক্ বা যাস্ক) অন্তরুদরে জলপাকস্থানে সুশেবাঃ শোভন সুবাঃ কিংভূতাঃ অযক্ষ্মা কাস সমন্বিত যক্ষ্মণ্ যৎ, অনমীবা। রোগনিবর্ত্তকাঃ অন্যত্রাপি চ, মৃদ্বীকা কোমল বত্যঃ অনাগসঃ নাস্তি-আগোযাভ্যঃ ক্ষয় হারিণ্যঃ ইতি স্বদন্তু অস্মাকং তা এব আস্বাদয়ন্তু।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—তুমি মৃদ্বীকা বলেই শ্বাত্রা অর্থাৎ শীঘ্র পরিণাম প্রাপ্ত হও; তোমার দেহ মৃদু, তাই নাম তোমার মৃদ্বীকা; তুমি জলপাকস্থানে (উদরে) অত্যন্ত শোভন হ'য়ে থেকে কাস সমন্বিত যক্ষ্মাকে (ক্ষয় রোগকে) দূর কর—তুমি ক্ষয়হারিণী, তোমাকে আমাদের আস্বাদন ক'রতে দাও।

পরে, আরও পরে এসেছে—

ভ্রাম্যমাণ চরকীয় সম্প্রদায়—তাঁরা রেখে গিয়েছেন বিক্ষিপ্ত অগ্নিবেশ তন্ত্রের অংশবিশেষ, মাঝখানে চ'লে গিয়েছে বৌদ্ধতন্ত্রযুগ, তাই বর্তমান চরক সংহিতার অংশ-বিশেষ ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের দৃঢ়বল সংযোজিত। এই ভ্রাম্যমাণ চরকীয় সম্প্রদায়ই এই মৃদ্বীকাকে অনুশীলন ক'রেছেন।

বৈদ্যকের নথি

আয়ুর্বেদসম্মত ভেষজ এবং পথ্য ব'লতে আহার্যের মাধ্যমে পুষ্টি এবং রোগ-নাশক দ্রব্য যতগুলি আছে, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দ্রব্য দ্রাক্ষা বা আঙুর; তার আর একটি প্রাচীন নাম মৃদ্বীকা অর্থাৎ মৃদু বা কোমল অঙ্গ ব'লেই এই নাম।

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় দেখা যাচ্ছে—ফলটি শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয় ব'লেই এর পরবর্তী নাম দ্রাক্ ক্ষণ অর্থাৎ দ্রুত এই অর্থে—সে শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয় উদরে। তার আকারের ও রংয়ের ভিন্নতা থাকলেও তার প্রজাতির পার্থক্য পাশ্চাত্য ভেষজ-বিজ্ঞানীরা বলেননি। এই ধরুন—আম টকই হোক আর মিষ্টিই হোক, লম্বা হোক আর গোলই হোক, তারা প্রজাতিতে কিন্তু এক।

সংহিতার দূরবীণে

চরক সূত্রস্থান ৪র্থ অধ্যায়ে একে প্রথম দেখা যায় সপ্তকষায়বর্গে 'দ্রাক্ষা কাশ্মর্য্য পরূষ'। দ্রাক্ষা এখানে স্নেহোপগ দ্রব্যের মধ্যে প্রধান, এই উপগ শব্দের অর্থ হ'লো—

অন্বিত বা সহিত, স্নেহের আকর নয়; অর্থাৎ শরীরের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক শুষ্কতা এলে এই মৃদ্বীকা বা দ্রাক্ষা সেখানে স্নেহ সন্নিধান ঘটায়।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি বিরেচনোপগ দ্রব্যের মধ্যে প্রধান দ্রব্য অর্থাৎ দ্রুত বিরেচনে সাহায্য করে। এখানে কিন্তু মৃদ্বীকা ব'লে উল্লেখ নেই, দ্রাক্ষা নামের উল্লেখ, অর্থাৎ বিরেচন ক্রিয়াটি দ্রুত না হ'লে বায়ুর চিকিৎসা ক'রতে হয়।

তৃতীয় ক্ষেত্র কাসহর হিসেবে, এখানে দ্রাক্ষা শব্দের প্রয়োগ অর্থাৎ এখানেও চাই দ্রুততা; কারণ কাসহরণে বিলম্ব ক'রলে ধমনীতে আঘাত লাগে, তার ফলে রক্ত সংবহনে ব্যাঘাত হয়।

চতুর্থ ক্ষেত্র শ্রমহর হিসেবে—মানুষের শ্রমহরণে বিলম্ব হ'লে, অবসাদ অথবা বায়ুর তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায়, দ্রাক্ষা সেখানে উভয়ক্ষেত্রে শ্রম হরণ করে। মৃদ্বীকা বা দ্রাক্ষা ঔষধ ও পথ্য হিসেবে প্রয়োগ বেশী দেখা যায় কাস রোগেই। তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বৈদিক সূক্তে।

কাস নামকরণের তাৎপর্য

'কসনাৎ কাসঃ'—কাস শব্দটির বর্ণগত ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়, দুটি ক্রিয়ার প্রতিঘাত মানেই 'কসতি'।

এই ক্রিয়ার প্রতিঘাত কোথায়? সেখানে বলা হ'য়েছে—সমান বায়ু (নাভিস্থিত বায়ু) এবং অপানস্থিত বায়ু বা গুহ্যস্থিত বায়ু যদি কোন কারণে প্রতিঘাতপ্রাপ্ত হয়, তবে তার প্রধান গতি হয় ঊর্ধ্বগত স্রোতসমূহে এবং তার ফলে দ্রুত উদানবায়ুর (কণ্ঠগত বায়ু) অনুগত হ'য়ে কণ্ঠে ও বক্ষে ব্যাকুলিত হ'য়ে পড়ে বা কুণ্ডলী পাকিয়ে যায়, তাতে বক্ষের শ্লেষ্মাকে এমন গ্রাস ক'রতে থাকে যে, সেই প্রতিহত বায়ু বার বার বাইরে আসার জন্য ছটফট ক'রতে থাকে, তখনই হয় প্রতিঘাত, সেই প্রতিঘাতেই শব্দ ওঠে ঘং ঘং; তাই চরকে বলা হ'য়েছে—

> প্রতিঘাত বিশেষেণ তস্য বায়োঃ সরংহসঃ।
> বেদনা শব্দ বৈষম্যং কাসানাং উপজায়তে॥

কাসরোগ এক প্রকার নয় ব'লেই বলা হ'য়েছে 'কাসানাং' অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা-প্রধান তো বটেই, ক্ষয়জ কাসিও হয়, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই বায়ু তার অনুগামী। তবে প্রতিটি কাসির হেতু কিন্তু পৃথক। তা হ'লেও এক কথায় বলা যায়—যাঁরা প্রতিদিন নানা কারণে বা অকারণে একই ধরনের খাবারে অভ্যস্ত অথবা রুক্ষ দ্রব্য বেশী খেতে ভালবাসেন, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থে আসক্তি কিংবা তার বেগকে ধারণ করেন, এক্ষেত্রে যেমন কাস রোগ আসে, আবার মাংসাদি আমিষ দ্রব্য বা পুষ্টিকর আহার্য গ্রহণ না ক'রে মেধার শ্রম অথবা শারীরিক শ্রম ক'রে যান, তাঁরাই এই দুরন্ত কাস রোগে আক্রান্ত হ'য়ে থাকেন; তাছাড়া আরও বহু কারণ থাকে কাস রোগে আক্রান্ত হওয়ার।

এই কাসরোগের প্রাথমিক প্রতিরোধ এবং প্রতিষেধ দ্রব্য দ্রাক্ষা বা মৃদ্বীকা। যাঁরা ছাগমাংস এবং দ্রাক্ষা নিত্যই আহার্যের অন্যতম দ্রব্যরূপে আহার করেন। তাঁরা সর্ব-প্রকার কাস রোগকে প্রতিহত ক'রতে পারেন।

ক্ষয়, ক্ষত, রক্তপিত্ত, দৌর্বল্যজনিত, অত্যধিক ধূমপানজনিত, অগ্নিমান্দ্য বা

অপুষ্টিজনিত যে কোন কারণে উদ্ভূত কাসি হোক না কেন, একমাত্র নিরুপদ্রব ভেষজ ও পথ্য এই দ্রাক্ষা। তবে দ্রাক্ষা সম্বন্ধে চরকে যে যে ক্ষেত্রে এর ব্যবহার দেখিয়েছেন, বিশেষভাবে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর প্রভৃতির ক্ষেত্রে, তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্রব্যান্তর বা ভেষজান্তর সহ এর প্রয়োগ দেখানো হয়েছে; অবশ্য সেটা বহুক্ষেত্রেই।

সুশ্রুত সংহিতাকার আঙ্গুরের দ্রাক্ষা এবং মৃদ্বীকা এই দুটি নামই প্রধানভাবে গ্রহণ ক'রেছেন। প্রথমে সূত্রস্থানের ৩৮ অধ্যায়ের ২১ গুচ্ছে পরুষকাদিগণে, সেখানে ব'লেছেন পরুষক, যার বাংলা নাম ফলসা (Grewia asiatica), আঙ্গুর প্রভৃতি ফলগুলি বায়ুনাশক, মূত্রদোষ নিবারক, হৃদয়ের প্রফুল্লতা-বিধায়ক, রুচিকারক এবং পিপাসাহারক। টীকাকার ডল্বন সর্বদাই এই গণের ফলগুলিকে গ্রহণ ক'রতে ব'লেছেন। তবে চরকের মত এত বিস্তৃত ক'রে দ্রাক্ষার পরিচয় দেননি। এ ভিন্ন দেখা যায় সূত্রস্থানের ৪২ অধ্যায়ের (রসবিশেষ বিজ্ঞানীয়) ১৫ গুচ্ছে মধুর বর্গের মধ্যে

'কাশ্মর্য্য মধুক দ্রাক্ষা খর্জ্জুর...সমাসেন মধুরবর্গঃ।'

এবং এই সূত্রস্থানের দ্রব দ্রব্যবিধির প্রসঙ্গে ১৫৬ গুচ্ছে—

মৃদ্বীকমবিদাহিত্বান্মধুরান্বয়তস্তথা।
রক্তপিত্তেঽপি সততং বুধৈর্ন প্রতিষিধ্যতে।
মধুরং তদ্ধি রুক্ষঞ্চ কষায়ানুরসং লঘু।
লঘুপাকি সরং শোষ-বিষম-জ্বরনাশনম্॥

এই সূত্রটির অর্থ হ'লো—এই মৃদ্বীকা (মুনাক্কা) সর্বদাই অবিদাহী অর্থাৎ পিত্তকর নয়, এটি মধুর রসের আয়তন ক্ষেত্র, এমন-কি রক্তপিত্ত রোগেও বৈদ্যগণ একে নিষিদ্ধ করেন না। এটি স্বাভাবিক মধুর, তবে অল্প রুক্ষ, কিন্তু লঘুপাক আর কষায় রসের লেশও আছে, তবে দেহে এর রস দ্রুত সঞ্চারশালী, তাই ক্ষয়রোগ, বিষম জ্বর এবং ঘুসঘুসে জ্বরও দূর করে।

এই আঙ্গুরের বা দ্রাক্ষার মদের সঙ্গে খেজুরের (পিণ্ড খেজুরের) মদের কিঞ্চিৎ তফাত, এই কথা প্রাচীন গ্রন্থে লেখা আছে। এর পর সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ে দ্রাক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি মিষ্ট ফলের নামোল্লেখ ক'রে তাদেরও গুণের পরিচয় এবং ঔষধার্থে ব্যবহারের ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হ'য়েছে।

"দ্রাক্ষা কাশ্মর্য্য মধুক প্রভৃতি।"

তারপর ১৮৮ শ্লোকে শুধু দ্রাক্ষাটিকে পৃথক ক'রে তার বিশেষ গুণ ও বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহারের উল্লেখ করা হ'য়েছে।

সেখানে বলা হ'য়েছে—

তেষাং দ্রাক্ষা সরা স্বর্য্যা মধুরা স্নিগ্ধ শীতলা।
রক্তপিত্ত জ্বরশ্বাস তৃষ্ণাদাহ ক্ষয়াপহা॥

এটির অর্থ হচ্ছে—দ্রাক্ষা হ'লো সর্বস্রোতগামী, স্বরপ্রসাদক, মধুর রস এবং স্নিগ্ধ ও শীতল গুণসম্পন্ন; এটি রক্তপিত্ত, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা, দাহ ও ক্ষয় দূর করে। সুশ্রুতে আর

একটি বৈশিষ্ট্যের কথা লেখা হ'য়েছে, সেটা হ'চ্ছে শিশুর পুষ্টির জন্য দ্রাক্ষার ব্যবহারের কথা—এ প্রসংগটি শারীরস্থানের দশম অধ্যায়ের ৩৬ গদ্যে। সেখানে বলা হ'য়েছে—শিশু যখন দুগ্ধান্নভোজী হবে, সেই সময় (বয়সে) দশমূল প্রভৃতি কয়েকটি ভেষজের সংগে দ্রাক্ষাকে সংযুক্ত ক'রে, যথানিয়মে ঘৃত পাক ক'রে শিশুকে খাওয়াতে হবে। মাত্রামত এই ঘৃত সেবনে শিশুর বল, মেধা ও আয়ু বৃদ্ধি হবে। এরপর রক্তপিত্তে (Haemoptysis) ও শোষ রোগে এবং বিষমজ্বরে (উত্তরতন্ত্রের ৩৯ অধ্যায়ের ১১৫/১১৬ শ্লোকে, ৪১ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে এবং ৪৫ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে) দ্রাক্ষার ব্যবহার দেখিয়েছেন; তাছাড়া সুশ্রুতের কল্পস্থানের ৫ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিষচিকিৎসায় একটি উৎকৃষ্ট যোগে দ্রাক্ষার ব্যবহার দেখিয়েছেন—সেটি দ্রাক্ষা, নাকুলী, শল্লকী নির্যাসের সংগে; শ্লোকটি হ'চ্ছে—

দ্রাক্ষা সুগন্ধি নগবৃত্তিকাচ...।

রোগোপশমে বা পথ্য হিসেবে কাঁচা বা পাকা কোনটি ব্যবহার্য? চরক সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ের ফলবর্গে ৯৮ ও ১০৪ শ্লোকে দ্রাক্ষার পাকা ও কাঁচা অবস্থার গুণ ও দোষ কি, তা বর্ণনা করা হ'য়েছে—

তৃষ্ণাদাহ জ্বর শ্বাস রক্তপিত্ত ক্ষতক্ষয়ান্।
বাতপিত্ত মুদাবর্ত্তং স্বরভেদং মদাত্যয়ম্॥
তিক্তাস্যতামাস্য শোষং কাসঞ্চাশু ব্যপোহতি।
মৃদ্বীকা বৃংহণী বৃষ্যা মধুর স্নিগ্ধ শীতলা॥

আংগুর পাকা হ'লে—তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, শ্বাস, রক্তপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয়, বাতপিত্ত, উদাবর্ত, স্বরভেদ, মদাত্যয় ও মুখের তিক্ততা এবং শোষ ও কাস দূর করে। এটি বৃংহণ, বৃষ্য, মধুর, স্নিগ্ধ ও শীতল।

কিন্তু এই দ্রাক্ষা যদি অপক্ব হয়—তবে তা হবে অম্লরসাত্মক (টক) এবং পিত্ত-শ্লেষ্মার প্রকোপক।

সুপক্ব আংগুর, খেজুর (পিন্ড) ও সুপক্ব বদর (কুল) দিয়ে (অবশ্য পৃথক্ পৃথক্) যদি পানা (পানক বা সরবত) করা হয়, তবে তা হবে গুরু এবং বিষ্টম্ভী (পেট ফাঁপানো বায়ু)। তাই বলা হ'য়েছে—

'দ্রাক্ষা খর্জ্জুর কোলানাং গুরু বিষ্টম্ভী পানকম্।'

পরিচিতি

উদ্ভিদটি লতানে। এই লতা থেকে পাকানো আঁকড়ি বেরিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে অন্য গাছে বা মাচায় (মাচানে) বিস্তৃত হয়। এই লতা বেশ শক্ত, এর পাতার উপরটা লোমযুক্ত, দেখতে অনেকটা করলা উচ্ছের পাতার মত, তবে নীচের বা গোড়ার দিকটা হৃৎপিন্ডাকৃতি, পাঁচ ভাগে বিভক্ত এবং কিনারাগুলি দাঁতযুক্ত; ফুল সবুজবর্ণ, সৌগন্ধময়, লতার অগ্রভাগেই প্রধানভাবে মুকুল হয়; ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত ফুল ও গুচ্ছবন্ধ ফল হ'তে দেখা যায়, আর শীতপ্রধান দেশে আরও পরে ফুল ও ফল হ'য়ে থাকে। উত্তর-পশ্চিম হিমালয় প্রদেশের জংগলে হ'তে দেখা গেলেও ব্যবসায়িক

ভিত্তিতে চাষ হ'য়ে থাকে, সেটা হয় উত্তর-পশ্চিম ভারতে। বাংলায় এর গাছ যে হয় না বা তার ফল যে হবে না তা নয়, কিন্তু এত টক হয় যে, তা আমড়াকেও হার মানায়। এর প্রচলিত নাম আঙ্গুর (ফারসী ভাষা)।

আমরা বাজারে ২/৩ প্রকারের আঙ্গুর দেখতে পাই—একটি আকারে ছোট, যেগুলি শুকিয়ে গেলে কিস্‌মিস্‌ হয়; আর এক প্রকার আঙ্গুর দেখা যায়, সেটা আকারে বড় এবং তার মধ্যে ২/৩টি বীজ থাকে, এই আঙ্গুরগুলি শুকিয়ে মুনাক্কা হয়। যেগুলি আমরা পাই—সেগুলি খুব পাকা নয়, খুব পুষ্ট হ'লে সবুজ ফলই হরিদ্রাভ সবুজ হয়, আবার এই দুই সাইজের আঙ্গুর বেগুনে রংয়েরও দেখা যায়। পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মতে এই ফলের আকারের বা রংয়ের তফাত দেখা গেলেও প্রজাতিতে পৃথক নয়। এদের বোটানিকাল্‌ নাম Vitis vinifera Linn., ফ্যামিলি vitaceae. উড়িষ্যাতেও এটি দ্রাক্ষা নামেই পরিচিত।

এই ফল মিষ্টি বা টক—এর হেতু মাটি, জল ও বায়ুর প্রভাবের তারতম্য। ঔষধার্থে ব্যবহার হয় শুষ্ক ফল (কিস্‌মিস্‌ বা মুনাক্কা), কাঁচা ফল (আঙ্গুর) ও গাছের পাতা।

রোগ প্রতিকারে

প্রথমেই বলে রাখি, ঔষধ হিসেবে যখন প্রয়োগ করা হয়, তখন কিস্‌মিস্‌ বা মুনাক্কা ব্যবহার করাই বিধেয়। আঙ্গুর শুকিয়ে কিস্‌মিস্‌ বা মুনাক্কা হয় সত্যি, কিন্তু সুপক্ক না হ'লে তো ওগুলিকে শুকানো যায় না, সেইজন্যই রোগের ক্ষেত্রে কিস্‌মিস্‌ বা মুনাক্কার ব্যবহার করার বিধি।

১। **মূত্রকৃচ্ছ্রতায় ও কোষ্ঠকাঠিন্যেঃ—** বেশী পরিমাণ তরকারির স্থূলাংশ খাওয়ার অভ্যেস অথচ ঘি, দুধ এক ফোঁটা পেটে পড়ে না, তার ওপর বয়েস হয়েছে, এইজন্য পেটে বায়ুও হয় প্রচুর, তাই তার দাস্তেও সঙ্কোচ, প্রস্রাবেও সঙ্কোচ, এই রকম ক্ষেত্রের মূত্রকৃচ্ছ্রতায় ২০ গ্রাম কিস্‌মিস্‌ ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে (আন্দাজ তিন পোয়া) এক কাপ (আন্দাজ এক পোয়া) থাকতে নামিয়ে, চটকে, সিটেগুলি ফেলে দিয়ে সকালে ও বৈকালে দু'বারে ঐ জলটা খেতে হবে। এর দ্বারা ২/১ দিনের মধ্যেই ঐ কৃচ্ছ্রতা চ'লে যাবে।

২। **ক্ষীণতায়ঃ—** খায়-দায় শুকিয়ে যায়, হাড়-সার অথচ ক্ষিধেও কম নেই, বিশেষ কোন রোগও নজরে প'ড়ছে না; এ রকম ক্ষেত্রে দুধ এক পোয়া, কিস্‌মিস্‌ ১২ গ্রাম, জল আধ সের (৫০০ মিলিলিটার) একসঙ্গে পাক ক'রে, ঐ দুধের পরিমাণ অর্থাৎ আন্দাজ এক পোয়া থাকতে নামিয়ে ঐ কিস্‌মিস্‌গুলি ওর সঙ্গে চটকে নিয়ে, সিটে ফেলে দিয়ে, ঐটা প্রত্যহ সকালে বা বৈকালের দিকে খেতে হবে; তবে সকালের দিকে খেলে ভাল হয়, পেটে বায়ু হওয়ার ভয় থাকে না।

৩। **পিপাসায়ঃ—** গুরুপাক জিনিস কিছু খাওয়া হয়নি, গরমও নেই অথচ পিপাসা, একবার জল খাওয়ার খানিকক্ষণ পরে আবার পিপাসা, এই রকম যে ক্ষেত্র—সেইটাকে ধরা হয় তৃষ্ণা রোগ, এখানে পলতার পাতা (পটোলের পাতা) ৩/৪টি, ঐ পলতার ডাঁটা ৫/৬ ইঞ্চি, কিস্‌মিস্‌ ৫/৬ গ্রাম একসঙ্গে থে'তো ক'রে ১ গ্লাস গরম জলে ৩/৪ ঘন্টা, অন্ততঃ ২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে, ওটা ছে'কে, দুইবারে খেলে ঐ তৃষ্ণা রোগের নিবৃত্তি হয়। এই তৃষ্ণা রোগটা বেশীদিন চ'লতে থাকলে তারা অল্পায়ু হয়।

৪। **ভ্রম রোগে :—** সকালের কথা বৈকালে ভুলে যাচ্ছে, এইসব লোকের আর একটা বিশেষ উপসর্গ থাকে, সর্বদা শরীরে দাহ, এক্ষেত্রে কিস্‌মিস্ ১০/১২ গ্রাম ও দুরালভা * (Alhagi pseudalhagi) ৫/৬ গ্রাম একসঙ্গে থে'তো ক'রে ১ গ্লাস গরম জলে ১০/১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে, তারপর তাকে ছে'কে, সকালে অর্ধেকটা ও বৈকালে অর্ধেকটা খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ ভ্রমরোগটা সেরে যাবে। তবে এটা বেশ কিছুদিন না খেলে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকার বোঝা যায় না।

৫। **নেশাই পেশা :—** মদই যাকে খেয়ে ফেলেছে, সেই মদের হাত থেকে রেহাই পেতে গেলে একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র হ'লো সকালে ও বৈকালে দু'বেলাই ১০/১২ গ্রাম ক'রে কিস্‌মিস্ চিবিয়ে খাওয়া, সে ওকে ত্যাগ ক'রবেই; তবে চেলা-চামুণ্ডার হাত থেকে যদি রেহাই পায় তবেই।

৬। **সন্তান লাভার্থে :—** যাকে চলতি কথায় বলা যায় বাঁজা না নপুংসক?—এ সন্দেহটা দুজনের মনেই দোলা খাচ্ছে—কার দোষে আমরা নিঃসন্তান? যাক্ সে কথা, এখন এর সাধারণ উপায় হ'লো—মূল সমেত বলা গাছ (যাকে আমরা চল্‌তি কথায় বেড়েলা গাছ বলি) ২০/২৫ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে ঐ ক্বাথ দিয়ে ৮/১০ গ্রাম কিস্‌মিস্ বেটে সরবতের মত খাবেন। এটা স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই পৃথক পৃথক খেতে হবে। এক মাস কোন দৈহিক সংস্রব রাখবেন না, পরে দুই-এক মাসের মধ্যেই আপনাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে। তবে একটা কথা ব'লে রাখি—যদি শারীরিক কোন বৈকল্য থাকে অর্থাৎ যেটায় অস্ত্রোপচার প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে এটা বিফল হবে। আর একটা ক্ষেত্র আছে—যদি বেশী মেদস্বী হ'য়ে থাকেন, তা হ'লে সেটাকে প্রথমেই মেরামত ক'রে নিতে হবে।

৭। **শ্লেষ্মার ধাতে :—** সে বালক বা বৃদ্ধ যে বয়সেরই হোক না কেন, একটি পিপুল ও ৮/১০টি কিস্‌মিস্ একসঙ্গে বেটে খাওয়ার অভ্যাস ক'রতে হয়; তবে বালকের ক্ষেত্রে পিপুল ও কিস্‌মিস্ সিকি ভাগ নিতে হবে, এটাতে ঐ দোষটা চ'লে যাবে; তবে একটা কথা বলা দরকার—যদি বংশের (সে পিতার বা মাতার যে কুলেরই হোক) তিন পুরুষের মধ্যে কারও হাঁপানি বা এক্‌জিমা ছিল, হাতের তালু বা পায়ের তলা ঘামতো, এর কোন একটি থাকলে সেটা কিন্তু জন্মসূত্রে পাওয়া, তবে এটাতে প্রকোপটা ক'মে যাবে, একেবারে নিরাময় হবে না।

৮। **উদাবর্তে :—** বেশী খেলেই বা কি, আর কম খেলেই বা কি—পেটটা যেন সর্বদা স্তম্ভিত হ'য়ে আছে জয়ঢাকের মত, আর দুই/এক মিনিট অন্তর সশব্দে ঢেকুর ওঠে, অনেক সময় দেখা যায় একটু ঝাল বা লবণ জাতীয় জিনিস খেলেই বমি হয়; এক্ষেত্রে ৮/১০টি কিস্‌মিস্ বেটে সরবত ক'রে (বিনা চিনিতে) সকালে ও বৈকালে দুইবার খেতে হয়। এটাতে ৮/১০ দিনের মধ্যেই উপশম হ'য়ে থাকে।

৯। **শোষ রোগে** (Wasting disease):— পিপাসা যে লেগেছে তাও নয়, অথচ ঠোঁট (ওষ্ঠ), জিভ, গলা শুকিয়ে যায়; সেটা চ'লতে থাকলে বুঝতে হবে ক্ষীণ রোগ

---

* এই দুরালভার গাছে খুব কাঁটা, উটে খেতে খুব ভালবাসে। এলাহাবাদ থেকে আরম্ভ ক'রে পশ্চিমে মরু অঞ্চল পর্যন্ত যেখানে সেখানে ঝোপ হ'য়ে আছে। ঐ অঞ্চলে একে বলে 'যবাসা', 'উটকাটারা'। গাছ-গাছড়া বিক্রেতাদের দোকানে পাওয়া যায়। যবস=ঘাস (ঋক্‌বেদ্)।

(খেলেও শরীরে পুষ্টি হয় না) ভবিষ্যতে আসছে, এক্ষেত্রে কিস্‌মিস্‌ ১০/১২ গ্রাম সামান্য লবণজলে কয়েক ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে খেতে হবে, এর দ্বারা ঐ শোষরোগের ক্ষয়টা পূরণ হবে।

১০। **পিত্তবিকারে:—** এটা আসে উল্টোরথের পর থেকে, থাকে শারদোৎসব পর্যন্ত। এটাকে বলা যায় ঋতুজ ব্যাধি, এই সময় তিতো (তিক্ত) না খেয়েও সকালের দিকে মুখ তিতো হয়; এক্ষেত্রে নিত্য ১০/১২টি ক'রে কিস্‌মিস্‌ বেটে একটু জ'ল গুলে খেলে ঐ অনুভূতিটা থাকবে না বটে, তবে প্রকৃতির দান থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

১১। **ক্ষতক্ষীণ রোগে:—** রোগটার গোড়াপত্তন হয় কোনো কারণে গুরুতর আঘাত লেগে। বাইরে থেকে তার অভিব্যক্তি হ'লো না বটে, কিন্তু ভিতরে কোন শিরা হয়তো জখম হ'য়েছে বা ছিঁড়ে গিয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় সাময়িকভাবে সেটা সেরে গেলেও মাঝে মাঝে সেখানটায় ব্যথা অনুভব করেন, এই থেকে অনেকের একটু জ্বরভাবও হয় এবং রোগা হ'তে থাকেন; সেইটাই দেখা যায় পরিণামে ক্ষয়রোগে পরিণত হয়েছে। ঠিক এইরকম ক্ষেত্রে প্রত্যহ ৮/১০ গ্রাম ক'রে কিস্‌মিসের সরবত খাওয়ার অভ্যাস করুন, তাহ'লে ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

১২। **রক্তপিত্তে:—** এই রোগ সম্বন্ধে বহুবার আলোচনা করা হ'য়েছে, এখানে আর আলোচনা ক'রলাম না, তবে এক্ষেত্রে শালপর্ণী (এই ক্ষুপ জাতীয় গাছের প্রচলিত নাম শালপাণি আর বোটানিকাল্‌ নাম (Desmodium gangeticum) গাছের সমগ্রাংশ ২০ গ্রাম নিয়ে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে, ঐ ক্বাথে কিস্‌মিস্‌ বেটে সরবত ক'রে খেলে ঐ রক্তস্রুতিটা (রক্ত পড়া) বন্ধ হ'য়ে যায়।

১৩। **নবজ্বরে:—** কিস্‌মিস্‌ লবণজলে ভিজিয়ে সেই কিস্‌মিস্‌ কয়েকটি ক'রে খেলে জ্বর চ'লে যায়।

এই লেখাটার শেষ আঁকড় টানতে যাওয়ার সময় সেই ছোটবেলাকার পড়া "আঙ্গুর ফল টক"—শৃগালের এই হতাশ মন্তব্যের কথা মনে পড়ে। তারপর পণ্ডিতের খপ্পরে প'ড়ে মন যখন রসে-বশে হ'লো, তখন মনে ঢুকলো—অধরের সুধাই শরীরে দ্রুত রসসঞ্চারী। আবার জীবনের পথে হাঁটতে হাঁটতে যখন ক্লান্ত, তখন বৈদিকের পাঁতির পাঠ নিতে হ'লো, সেখানে দেখা গেল জীবনের রসসঞ্চারী এই একটি অমোঘ ফল; তাই তাঁদের সমীক্ষিত নাম 'দ্রাক্-ষা' অর্থাৎ যে দ্রুত রস সঞ্চার করে। তখনই মনে হ'য়েছিল—এইটাই বুঝি শেষ সম্বল।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Acids, viz., oxalic acid, malic acid, tartaric acid and other racemic acids. (b) Sucrose.

ধন্যাক (ধনে)

সে যে ধনই হোক না কেন—একটা না পেলে ধন্য হয় না, সে বিদ্যাই হোক আর কীর্তি'ই হোক; আর পার্থিব ধনে ধনবান হ'লে তার পশ্চাতে থাকে পরস্বাপহরণের কলঙ্ক, সে সংগ্রাম ক'রেই হোক আর লুণ্ঠন ক'রেই হোক; এ নজির স্বয়ং ধনঞ্জয়ই রেখেছেন, অধিক আর কি! সে তথ্যটি দেওয়া আছে মহাভারতের ৪।৪৪।১৩ শ্লোকে, তাঁরই উক্তি—

> সর্ব্বান্ জনপদান্ জিত্বা ধনমাদায় কেবলম্।
> মধ্যে ধনস্য তিষ্ঠামি তেনাহুর্মাং ধনঞ্জয়ম্॥

অর্থাৎ অনেক জনপদ, অনেক ধন জয় ক'রে এখন আমি প্রচুর ধনাধিকারী, তাই আমার নাম ধনঞ্জয়। আপাতঃদৃষ্টিতে ধনই মানুষকে ধন্য করে। স্বনামধন্য কেবলমাত্র বিদ্যা এবং কীর্তিতেই হয়—এ বিষয়ে কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতগণ একটু কটাক্ষ ক'রেছেন—

> স্বনাম্না পুরুষো ধন্যঃ পিতৃনামাচ মধ্যমঃ।
> অধমঃ মাতৃনামাচ শ্বশুরেণাধমাধমঃ॥

অর্থাৎ বিদ্যা আর কীর্তিতে স্বনামধন্য হওয়া যায়, আর যদি কেহ পিতৃ নামে পরিচিত হ'তে চান—সেটা মন্দের ভাল, আর মাতৃনামে যাঁর পরিচয় দিতে হয়—তিনি অধমের পর্যায়ে পড়েন, আর শ্বশুরের নামে যাঁর পরিচয়—তিনি অধমের থেকেও অধম।

তা যাক, এখন কথা এই যে—যদি স্বাভাবিকভাবেই কোন দ্রব্যের নামকরণ করা হ'য়ে থাকে ধন্য বা ধন্যা—তা হ'লে নিশ্চয়ই মনে ক'রতে হয়—এ নিছক নিজের অন্তঃ-

শক্তির গুণেই সে ধন্য, তাই দেখতে পাই—বেদে একটি আহার্য ও ভেষজের নাম ধন্যাক।

অন্তরগ্নে রুচা তপন্ উখায়া ধন্যাকং সদনে স্বে।
সীদ ত্বং মাতুরস্যা বিশ্বান্যগ্নে বয়ুনানি বিদ্বান্॥
(অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ১২১।৫।৫৬)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

ত্বং ধন্যাকং উখায়াঃ স্থালী পাত্রে স্বে সদনে চ রুচা তপন্ সীদ, মাতুরিব উৎসঙ্গে বয়ুনানি বিশ্বানি আহার্য্যাণি ইতি, ততোহি বিদ্বান্ ভিষক্ তপসা অভিচেষ্টয়া ত্বাং দীপয়তি ইতি ধন্যাকং. ধন+আকন্ পিণ্যাক্যাদিত্বাৎ।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হলো—তুমি ধন্যাক, তোমাকে স্থালীপাত্রে নিজ সদনে রক্ষা করেন। তুমি তোমার দীপ্তিকর কান্তিতে মাতৃক্রোড়ে অবস্থান কর এবং আহার্যগুলিকে অভিষিক্ত কর, তাই বিদ্বান ভিষক্ চেষ্টার দ্বারা তোমাকে অর্চনা করে।

বৈদ্যকের নথি

বেদের সুস্তানুশীলন ঋষি-মেধাতেই ঘ'টেছিল, তারপর তাঁদের অনুসৃত পন্থায় অগ্রসর হ'য়ে সংহিতাকারগণ সেই মন্ত্রার্থগুলিকে সংহত ক'রে ভৈষজ্যবিদ্যাকে প্রসারিত ক'রেছেন।

আমরা আয়ুর্বেদের সংহিতামালায় যেসব ভেষজের ভৈষজ্যশক্তির দ্বারা মানবের শারীর-মানস-বিকারের উপশম-সাধন করি, সেগুলি সংহিতাকারদের বিশেষ অনুভূতির অবদান।

চরক সংহিতাকার হয়তো এককালে একজনই ছিলেন, পরবর্তীকালে বহু ভিষকের অনুভূত সংগৃহীত তথ্যাদির দ্বারা চরক সংহিতার অধ্যায়গুলি পূর্ণ হয়েছে। ধন্যাক শব্দটি আমাদের বহু পরিচিত ধনেরই পূর্ব শব্দ। ধন্যাককে চরকের বহুস্থানেই দেখা যায়—প্রধানতঃ অগ্নিবিকার বা পিত্তবিকারজ ব্যাধি নিরাময়ের ক্ষেত্রে, এর সর্বপ্রথম কাজ তৃষ্ণানিগ্রহ ও শীত প্রশমনে।

তৃষ্ণা রোগটির আদি সূত্র বায়ু-পিত্তবিকার, এটির পরিণাম রসাদি সৌম্য ধাতু, রসবাহিনী নাড়ী, জিহ্বামূল, তালু ও ক্লোম (দুটি বাহুর মধ্যভাগে বক্ষ, তার মধ্যে হৃদয়, তার দক্ষিণদিকের নীচে পিপাসার স্থানের নাম ক্লোম) শোষিত হয়, তখনই হয় পিপাসা, অর্থাৎ বার বার জলপানের ইচ্ছা। এর নিকটবর্তী ব্যাধি অনেকপ্রকার ঘটলেও পরিণামের ব্যাধি নিদ্রানাশ এবং শিরোঘূর্ণন। এই দুটিই কিন্তু বহু রোগের উপসর্গ হিসেবেও দেখা দেয়।

চরক সংহিতার নির্দেশ—এই ধনের ব্যবহারের ক্ষেত্রটি এখানে খুব উপযোগী। দ্বিতীয় ক্ষেত্র শীত প্রশমনে—এই শীত প্রশমন কথাটি একটু জটিল, কারণ বেদের (ঋক্ ১০।৩৪।৯) শীত শব্দটি শিশির শব্দের পর্যায়বাচী অর্থাৎ যে সময় সূর্যের তেজ মলিন হয়। এদিকে দেহের অগ্নিবল মলিন হ'লেও শীত বা শিশির কাল—

> তৈল, তুলা, তনূনপাৎ, তাম্বুল, তপন।
> করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥ (তনূনপাৎ=অগ্নি)

পরিচিতি

শুধু বাংলায় নয়, প্রায় সব প্রদেশের লোকেই ধনিয়া বা ধনে ব'ললেই চিনতে পারে। বর্ষজীবী ক্ষুদ্র ক্ষুপ গাছগুলি ১½/২ ফুটের বেশী উঁচু হয় না। ভাদ্রমাসে মাঠে ধনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, চারাগাছের পাতার ধার কাটা, অসমান কোণ, তবে অনেকটা গোলাকার; গাছ যত লম্বা হয় তার পাতার আকার পরিবর্তিত হয়ে লম্বা হয়। সোজা একটি দণ্ডের চারিদিকে শাখাপ্রশাখা বেরোয়, শীতকালে সাদা ছোট ছোট ছত্রাকার ফুল হয়, তবে পুষ্পদণ্ডে বিশেষ পাতা থাকে না, থাকলেও দুই/একটা, খুব ছোট। শহর ছাড়া গ্রামবাংলার লোকের কাছেও ধনে গাছ অপরিচিত নয়। এই গাছের ফল-গুলিই আমাদের ব্যবহার্য ধনে, যার সংস্কৃত নাম ধন্যাক। যেটা আমরা সর্বদা ব্যবহার

করি, এর থেকে আকারে বড় এক প্রকার ধনে বাজারে পাওয়া যায়। তবে এটি কোন পৃথক জাতি বা প্রজাতি নয়, যেমন দেশী গর্ আর পাঞ্জাবের গর্। এর বোটানিকাল্ নাম Coriandrum Sativum Linn., ফ্যামিলি Umbelliferae.

আহার্য ও ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় পাতা ও বীজ।

লোকায়তিক ব্যবহার

এটির প্রধান কাজ রসবহ ও রক্তবহ স্রোতে, পিত্তবিকারজনিত রোগগর্লির উপর প্রধানভাবে কাজ করে।

১। **দেহে জ্বালা:—** দিবা-রাত্র শরীরের ভিতরে বা বাইরে জ্বালা বোধ হয়, চোরা অম্বল (অম্লরোগ) হয়, সেক্ষেত্রে ধনে ৫/৬ গ্রাম এক কাপ গরম জলে রাত্রে ভিজিয়ে রেখে সকালে ছে'কে খালিপেটে খেতে হবে। এর দ্বারা দাহ প্রশমিত হবে। এটা কিন্তু মাঝে মাঝে খেতেই হবে; তবে চোরা অম্বলটা কি ক'রে বন্ধ হয়, তার ব্যবস্থা করা সর্বপ্রথম দরকার।

২। **অতিসারে:—** যে অতিসার পিত্তবিকারজনিত হয়, এর লক্ষণ—স্বল্প প্রস্রাব ও মলটা খ্বই তরল হবে, মলত্যাগ করার সময় মলদ্বার জ্বালা ক'রবে, আর এই মলের রং প্রতিবারেই যেন ব'দলো যায়—কখনও ঘাসের রং, কখনও হলদে, কখনও বা পচা পাতার রং; এক্ষেত্রে ২৫ গ্রাম ধনে বেটে নিয়ে ২৫ গ্রাম গাওয়া ঘি, জল ১১৪ মিলিলিটার অর্থাৎ প্রায় আধ পোয়া একসঙ্গে একটি পাত্রে পাক ক'রে, জলটা ম'রে গেলে (অথচ ভেজে যাবে না) ওটা নামিয়ে, ছে'কে, সকালে ও বৈকালে দ্'বারে অর্ধেকটা আর বাকী অর্ধেকটা পরের দিন দ্'বারে খেতে হবে, এর দ্বারা ঐ পিত্তবিকারের অতিসার সেরে যাবে।

৩। **শ্ল ব্যথায়:—** এই প্রয়োগটি আমাজীর্ণের জন্য শ্ল ব্যথায়। এ শ্ল কিন্তু সে শ্ল নয়, ডেকে শ্ল যেসব ক্ষেত্রে আমরা নিয়ে আসি, এর প্রয়োগ সেখানেই। যেমন এক বাটি আমজারানো নিয়ে ব'সে লেগে যাওয়া, আধখানা কাঁঠালের শ্রাদ্ধ করা, বিষবোড়া টোকো পাকা আম ২/৪ গন্ডা গৌয়ারতমি ক'রে খাওয়া—এইসব অত্যাচারের পরিণতিতে আসে আমাজীর্ণ, সেই অপক্ক জিনিসগর্লি পেটে ত্রিশ্লের খোঁচা মারতে থাকে—এই যে ক্ষেত্র, এখানে ধনে ১০ গ্রাম ও শ্ঠ (আদা শ্কনো) ৫ গ্রাম একট্ থে'তো ক'রে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রতে হবে, সেটা ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, এক ঘণ্টা অন্তর ৩/৪ বারে খেতে হবে।

৪। **শিশ্দের কাসি ও দ্ধে শ্বাসে:—** দেখা যায়—কাসতে কাসতে শিশ্র চোখ-ম্খ লাল হ'য়ে যায়, মনে হয় যেন দম বন্ধ হ'য়ে গেল, এইরকম অবস্থায় ২ চা-চামচ আতপ চাল ১০/১২ চা-চামচ জলে ভিজিয়ে সেই জল ৭/৮ চা-চামচ নিয়ে, ঐ জলে আধ চা-চামচ ধনে বেটে, ওটাকে ছে'কে নিয়ে সেই জলটি আধ চা-চামচ ক'রে ৩/৪ ঘণ্টা অন্তর সমস্তদিন ধ'রে খাওয়ালে ঐ কাসিটা বন্ধ হ'য়ে যাবে।

৫। **পিপাসায়:—** এটা বার বার লাগছে, পিছনে কারণ অনেক রকম থাকতে পারে, যেমন—হাই ব্লাডপ্রেসার, খাদ্য ভোক্তা বেশী অথচ হজমের ঘরে তত আগ্ন নেই, হয়তো জ্বর আসছে অথবা নতুন জ্বর হ'য়েছে—যতই জল খাচ্ছেন পিপাসা আর মিটছে না, কিংবা টায়ফয়েড্ পিছনে আসছে; এ সবের ক্ষেত্র কিন্তু রসবহ স্রোতের

যে পিত্ত বা অগ্নি, যাকে বর্তমানে বলা হয় "মেটাবলিজম্", সেটা স্বাভাবিক কাজে অপারগ হ'য়েছে—তাই এই পিপাসা হ'চ্ছে। এক্ষেত্রে শুধু ধনে দিলে চ'লবে না, এর সংগে পলতার পাতা তিনটি এবং ঐ পলতার ডাঁটা (stem) ৭/৮ ইঞ্চি, ধনে এক চা-চামচ, এগুলোকে একটু থে'তো ক'রে এক কাপ গরম জলে ৩/৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখার পর ২/৩ চা-চামচ খেতে দিলে পিপাসার শান্তি হয়।

৬। **বাতরক্তে:**— এ রোগটার গুরুত্ব কতখানি, তা 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩৩০ পৃষ্ঠায় বলা হ'য়েছে।

এই বাতরক্তের ক্ষেত্রে ধনে ও সাদাজীরে(Cuminum cyminum—যেটা আমরা তরকারিতে সর্বদা খাই)—ঐ দুটো সমান পরিমাণে নিয়ে, জলে বেটে, ঐ দুটোর দ্বিগুণ পরিমাণ গুড়ের সংগে নারকোল (নারিকেল) সন্দেশ যে রকমে ক'রে, সেই রকম পাক ক'রে রাখতে হবে। (সেটার পাক ঠিক হ'লো কিনা জানার উপায়—সেই পাক করা জিনিসটি জলে ফেলে দিলে আর এলিয়ে যাবে না।) সেই জিনিসটি প্রত্যহ ১০/১২ গ্রাম ক'রে জলসহ খেতে হবে। এর দ্বারা আপাততঃ উপশম তো হবেই; তবে দীর্ঘদিন তার চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়।

৭। **নবজ্বরের পিপাসায়:**— ১০/১২ গ্রাম ধনে একটু কুটে (কুট্টিত) নিয়ে, ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সমস্তদিন ৩/৪ বারে ঐ জলটা খেতে দিতে হবে, এর দ্বারা জ্বরের তাপটা ক'মে যাবে এবং পিপাসারও নিবৃত্তি হবে।

৮। **পেটে বায়ু:**— যাঁদের খাওয়ার ৩/৪ ঘণ্টা বাদে পেটে বায়ু জ'মতে থাকে (এটা বর্ষাকালেই বেশী হ'তে দেখা যায়, আবার যেদিন আকাশে মেঘ হয়, সেদিন আর কথাই নেই) অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্যটি যখন অন্ত্রে গিয়ে উপস্থিত হয়, তখনই সমুদ্রের নিম্ন-চাপের মত বায়ুর সঞ্চার হ'তে থাকে; সেক্ষেত্রে ১০/১২ গ্রাম ধনে থে'তো ক'রে এক গ্লাস গরম জলে রাত্রে ভিজিয়ে রাখতে হবে, পরের দিন সকালের দিকে অর্ধেকটা ও দুপুরবেলা খাওয়ার ২ ঘণ্টা বাদে বাকী জলটা খেয়ে নিতে হবে; এর দ্বারা পেটে আর বায়ু হবে না। তবে কিছুদিন খেলে এটাতে স্থায়ী ফল পাওয়া যাবে। আর একটা কথা—তরকারির স্থূলাংশ খাওয়া কমানো দরকার, তবে তরকারির ঝোলটা খেলে ক্ষতি নেই। এই খাওয়ার ব্যাপারেও সাবধান হ'তে হবে।

বাহ্য প্রয়োগ

৯। **পেট কামড়ানিতে:**— সে যে কোন কারণেই হোক, ধনে আর যব সমান পরিমাণে নিয়ে জলে বেটে, পেটে প্রলেপ দিতে হবে। এর দ্বারা পেট কামড়ানির উপশম হবে।

১০। **কেশপতন ও খুস্কিতে:**— প্রথমোক্তটির হেতু কি, সেটা চিকিৎসকের কাছে আজও ধাঁধা, তবু যেটায় প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়, সেটাই লিখছি—২০০ গ্রাম খাঁটি তিল তেল নিয়ে তার সংগে ৭/৮ চা-চামচ ধনে (নতুন ধনে হ'লে ভাল হয়) একটু কুটে নিয়ে ঐ তেলে ভিজিয়ে ৭/৮ দিন রেখে সেই তেল মাথায় মাখলে চুল ওঠা বন্ধ হ'য়ে যাবে। এই তেলের পাত্রটি অনেকে সমস্তদিন রৌদ্রে বসিয়ে রাখেন, এটাতে তেলে একটা মিষ্টি গন্ধও হয়।

তবে একটা কথা—খুব কঠিন অসুখে ভোগার পর অথবা সন্তান হওয়ার ৭/৮

মাস বাদে চুল উঠতে সুরু ক'রেছে, এইসব ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি চুল ওঠা বন্ধ করা যায় না; আর মানুষের বয়সের পরিণতিতে অর্থাৎ প্রৌঢ়কালে আস্তে আস্তে চুল ফাঁকা হওয়াটা শরীরের স্বভাবধর্ম, তবে যে হারে চুল উঠে যাচ্ছিল সেটা যাবে না।

এই নিবন্ধের পরিসমাপ্তিতে একটা কথা ভাবছি—যদি কেউ প্রশ্ন করেন—মহাশয়, রোজই তো তরকারিতে ধনে খাচ্ছি, কিন্তু এর যে এতটা দ্রব্যশক্তি আছে, তা তো বুঝি না! আপনার কথাটাও অস্বীকার করি না, তবে প্রত্যহ যে দ্রব্য আমাদের শরীরে সাত্ম হ'য়ে আছে, যাকে বলে হাড়ে-নাড়ে (নাড়িতে) জড়িয়ে আছে, তার শক্তির প্রভাব ততটা নাও হ'তে পারে, তবে তার কিছুটা তো হবেই; তা না হ'লে আফিং-এ অভ্যস্ত যিনি, সেটা তাঁর মারক হয় না বটে, তবে উপকার কি হয় না? নইলে একদিন না পেলে পেটটা নরম হয় কেন? যে-যুগে এসব জিনিসের গুণাগুণ লেখা হ'য়েছিলো, সে-কালে তো মসল্লার ব্যবহার ছিল না। এটা আমাদের হে'সেলে ঢুকেছে মুসলমানগণ যখন থেকে এদেশে প্রবেশ ক'রেছেন। তবে দ্রব্যশক্তি যা ছিল প্রায় তাই-ই আছে, তবে ঋতু ও জলমাটির গুণে যতটা মাত্র পাল্টায়। আমাদের শরীর যেমন নতুন নতুন রোগকে হজম ক'রছে, সেই রকম ওষুধকেও। তাই আমরা বলি— "শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াও তাই সয়।"

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Essential oil, coriandrol, oxalic acid, calcium content, vitamin-C, carotene, fatty oil.

চাঙ্গেরী (আমরুল)

বর্তমান যুগে কি জপে কি তপে আর কি কর্মে—নামই সর্বস্ব; সেটা বৈদিক যুগেও যে ছিল না তা নয়, তার মধ্যে তফাত দেখা যাচ্ছে—সে-যুগের নামে ছিল বস্তু-সত্ত্বা আর এ-যুগের নামে আছে ভাব-সত্ত্বা; তাই কোন্ সত্ত্বার নাম এটি, সেটার উৎস খুঁজতে খুঁজতে ছোট নাগপুর অঞ্চলে এর একটু সূত্র পাওয়া গেল—সে দৃষ্টিটা কিন্তু ভাষা-তত্ত্বের ঐতিহাসিকদের; সেই সূত্র থেকেই যে কোন ওষধির নাম আসতে পারে, সে কথাটা যখন ভাবি, তখন অভিভূত হই আমার পূর্বপুরুষদের সমীক্ষার এবং তাঁদের নামকরণের চাতুর্যের কথা ভেবে; যদিও এইটাই ছিল সে-যুগের বোটানী।

আসল কথাটা খুলে বলি—ঐ ছোট নাগপুর অঞ্চলে প্রাক্-আর্যগোষ্ঠীর (সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা) সামাজিক এক বিশেষ ধরনের নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান আজও হয়, তাতে অংশগ্রহণ ক'রে থাকে উচ্চতায় সমান বালক-বালিকারা, দলে থাকে চারজন ক'রে; সে ঋতুকালটা হ'লো পিছনে ফেলে আসা বসন্ত, আর গ্রীষ্মও যাই-যাই, প্রাবৃট্‌ও অর্থাৎ বর্ষাঋতুর আনাগোনা আরম্ভ হ'য়েছে, সবুজের আগমনী গান ও নৃত্য, সবজি বোনার কাজ সুরু, এইসব ভাবই ভাষায় নিয়ে নাচ ও গানের রেওয়াজ। আদিবাসীদের সামাজিক অনুষ্ঠানের এই যে নাচ, সেইটাকেই বলা হয় 'চাঙ্গু'—এই যেমন ছো, ছলি, হলি সেই রকমই। দেখা যাচ্ছে—একের মধ্যে সমষ্টিগত কোন দ্রব্যের বা কোন কর্মের অথবা কোন বস্তু-সত্ত্বার সমাবেশ থাকলে বা ঘটলে সেখানেই চাং শব্দের প্রয়োগ, এই যেমন চাংদোলা (প্রচলিত চ্যাংদোলা), এক চাঙ্গরা—এই রকম।

এই বনৌষধিটির পত্র-বৃন্ত (বোঁটা) মূল থেকে গুচ্ছবন্ধভাবে ওঠে। ৩/৪ ইঞ্চি লম্বা, সুতোর মত দণ্ডের মাথায় ছত্রাকার ত্রিধা বিভক্ত পাতা, প্রায় ক্ষেত্রেই এর সংখ্যা থাকে ৪ (চার), তার চাঙ্গেরী নামকরণের উৎস এই সূত্র ধ'রেই।

এই পৌরাণিক ভারত জন্ম নেওয়ার ঢের ঢের আগে, সুদূর উত্তর-পশ্চিমের ভূখণ্ডের নাম যখন পক্তিদেশ (তখন ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মাবর্ত, আর্যাবর্ত নামও হয়নি), পাশেই কুভা নদী (পরে হ'য়েছে কাবুল)—সেই অঞ্চল থেকে আর্যরা এই ভূখণ্ডে এসেছেন গোষ্ঠী-বদ্ধ হ'য়ে, আর প্রাক্-আর্যরা তাঁদের বসতিভূমি ত্যাগ ক'রতে বাধ্য হয়েছেন দলবদ্ধ আর্যদের সঙ্গে লড়াই ক'রতে না পেরে; যে যেদিকে পেরেছেন নূতন নূতন অরণ্যের মধ্যভূমিতে এসে নিজেদের গোষ্ঠী বেঁধেছেন।

আর্যদের কিছু কিছু ভাষা তাঁরা আয়ত্ত ক'রে আসেননি—এ কথাও তো বলা যায় না; হয়তো বা দীর্ঘকালের ব্যবধানে সে সব ভাষার মূলসূত্র হারিয়ে গিয়েছে অথবা
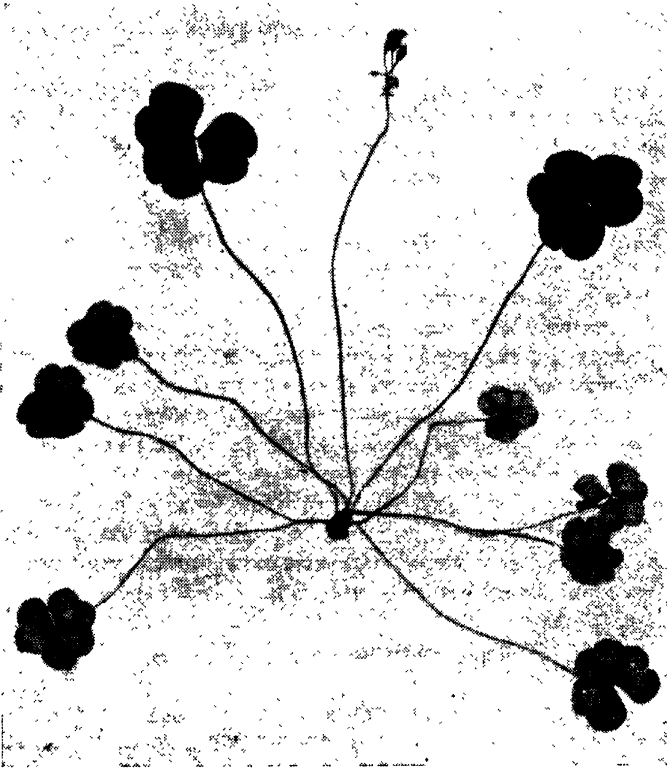
তাদের অপভ্রংশ হ'য়েছে, কিন্তু তাদের কিছু কিছু নমুনা তাঁদের সামাজিক জীবনের সংস্কারের মাধ্যমে জড়িয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক। তারই একটি উদাহরণ 'চাঙ্গু' এই শব্দটি, যেটা নাচে ও গাছে জড়িয়ে আছে। বৈদিকের দৃষ্টিতে তার শোভন অঙ্গ, কোমল গঠন, অম্লমধুর রস, ৪টি বৃন্তদলের গোষ্ঠীসমন্বিত বনৌষধিটির কি সম্পূট ভাষানাম চাঙ্গেরী? নাকি প্রাক্-আর্যদের সংস্কৃতির ছোঁয়াচ লেগেছে এই নামটিতে?

[illegible] সেই বৈদিক [illegible] বিভিন্ন কালের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে আজ শুধু স্মৃতি বহন ক'রে চলেছে বেদে ও ভৈষজ্যবেদে অর্থাৎ আয়ুর্বেদে।

অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ১৬।৬৫।২৭ সূক্তে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—

> পৃথিব্যা স্বদস্থাদগ্নিং পুরীষ্যং চাঙ্গেরী স্বদাভরা অগ্নিং পুরীষ্যং অচ্ছেমঃ।

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> পৃথিব্যা ভূমেঃ স্বদস্থাৎ সহস্থানাৎ পুরীষ্যং অগ্নিং ত্বং চাঙ্গেরী স্বদ=তিষ্ঠন্তী, আভর=আহর। বয়ং=অচ্ছেমঃ=অভিমুখং গচ্ছামঃ চাঙ্গেরীতি চাঙ্গং শোভনং মীরয়তি ইর=অন্ ঙীপ্ ক্ষুপ্ ভেদে।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—তুমি চাঙ্গেরী অর্থাৎ শোভন অঙ্গ তোমার, তাই শোভন অগ্নিকে প্রেরণ কর, পুরীষের মধ্যে অগ্নিবল আন, পৃথিবীর সঙ্গে তুমি অবস্থান ক'রে পৃথিবীর বল আহরণ কর; আমরা তোমার আভিমুখ্য আনয়ন করি।

এই আভিমুখ্য কথাটার সার্থক ব্যঞ্জনায় বলা যায় যে, তোমার অদৃশ্য বস্তুসত্ত্বায় ভৌতিক-ক্রিয়াশালিতাকে আনয়ন করি।

বৈদিক ভাষ্য থেকে অনুশীলনের তিনটি সূত্র পাওয়া গেল—(১) শোভন অগ্নিকে প্রেরণ কর, (২) পুরীষের মধ্যে অগ্নিবল আন ও (৩) পৃথিবীর সঙ্গেই তুমি অবস্থান ক'রে পৃথিবীর বল আহরণ কর।

প্রথম বক্তব্যটির বিচার্য বিষয় থাকে—এই শোভন অগ্নিকে কোথায় প্রেরণ কর? সেটা কোথায়? এটা কি রস-রক্তাদি ধাতুগত অগ্নিকে বলাধান করার সামর্থ্য বাড়ায়? না পাচক রসের সহায়ক হয়? কোন্‌টির ইঙ্গিত দেওয়া হ'য়েছে?

দ্বিতীয় ইঙ্গিতের তাৎপর্য কি যে, সে অপক্ব মলকে (পুরীষকে) তার অগ্নিবলের দ্বারা সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্তির সহায়ক হয়? এটাই কি প্রতীয়মান হয় না—যে দোষ রক্তের মলাংশের সৃষ্টির কারণ হয়, সেই দোষকেই জন্মাতে দেয় না?

তৃতীয় বক্তব্যের ইঙ্গিত—দ্রব্যটি পৃথ্বীগুণের আধিক্য থাকায় পুরীষকে সংহত করে আর দ্রব্যের অন্তর্নিহিত রসের বিচারে দেখা যায়—এটি অম্লরস এবং তেজোগুণের আধার; আর পৃথ্বীগুণের বাহুল্য থাকায় মধুর রসের সংযোগও ঘটেছে, তাই সে পুরীষকে অগ্নিক্রিয়ায় পরিপাক ঘটিয়ে গ্রথিত করায়।

নামাবলী (যুগে যুগে)

বেদের সেই চাঙ্গেরী নামকরণের লক্ষ্য ছিল তার দেহকে কেন্দ্র ক'রে, আর ভাষ্যের বক্তব্যেও তার শোভন অঙ্গ, অগ্নিবল ও পুরীষের অগ্নি অর্থাৎ আমাশয়ের ও পক্বাশয়ের অগ্নির বলবৃদ্ধিকারক—এটারও ইঙ্গিত; পরবর্তী সংহিতা যুগের খাতায় নাম উঠলো—তার গুণবত্তার বিচার ক'রে, সেখানে হ'য়ে গেল আম্লরোলিকা (টীকাকার ডল্বনের উক্তি)। এই আম শব্দ কাঁচ অর্থকে বোঝায়, রোগকেও বোঝায়, আবার অপক্ব দ্রব্যকেও বোঝায়; আর তাকে যে ধ্বনিত করে অর্থাৎ যে আঘাত করে—সেই তো আম্লরোলিকা, সেইটাই লোকায়তিক সহজিয়া ভাষায় ডাকনাম আমরুক্ বা আমরুলে হ'য়ে গিয়েছে; আবার এটাও নিরর্থক নয় যে, এই ক্ষুপটি যখন বারমাসই কাঁচ হ'য়ে

থাকে আর রোগ বা রুক্ নাশ করে—তাই তাকে আমরুক্ বলা হ'তো (রুক=রুজা =রোগ) অর্থাৎ আম রোগ নষ্ট করে বলেই আমরুক্, সেইটাই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে আমরুল। বেদোক্ত নামেই চরক/সুশ্রুত/বাগ্‌ভটে চাঙ্গেরী নামের উল্লেখ।

বৈদ্যকের নথি

(সংহিতা যুগের গুণের অনুশীলন)

সুশ্রুত শাকবর্গে চাঙ্গেরীর (আমরুলের) উল্লেখ ক'রেছেন এবং ঔষধার্থে ব্যবহার ক'রেছেন; তাছাড়া সুশ্রুত সংহিতায় বলা হ'য়েছে—অনন্ত দ্রব্যের পরিচয় দেওয়া সম্ভব

নয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্রব্যগুলির আস্বাদ এবং উৎপত্তিস্থানের রসবীর্য দেখে দ্রব্য-স্বভাব জানবেন। সুশ্রুত সংহিতার সূত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ের ৩৬৭ সূত্রে বলা হয়েছে—

ধান্যেষু মাংসেষু ফলেষু চৈব।
শাকেষু চানুক্তমিহাপ্রমেয়াৎ॥

আস্বাদতো ভূতগণেষু মত্বা।
তদাদিশেৎ দ্রব্য মনল্পবুদ্ধিঃ॥

অর্থাৎ ধান্য, মাংস, ফল এবং শাক—এদের গুণ, রস কি বলা যায়? এ তো অপ্রমেয় ব্যাপার। তবুও এদের জানতে হবে—আস্বাদন ক'রেই বুঝতে হবে কোন্ দ্রব্যে কোন্ ভূতের (ক্ষিত্যাদি) প্রাধান্য আছে।

প্রাণীজ দ্রব্য, যাবতীয় ফল, শাক ও কন্দমূলাদি এবং যাবতীয় আহার্যদ্রব্যের, এমন কি ভৈষজ্যেরও অনন্ত গুণ আছে এবং দোষও আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ভৈষজ্য সত্তার প্রমাণ করার কোন ক্রম নেই; তাই আস্বাদনের দ্বারা এবং উৎপত্তির স্থান, কাল, ঋতু এদের গুণ বিচারের দ্বারা এদের রসাদির (মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায়) বিচার ক'রে দ্রব্যের মৌল উপাদানের হিতাহিত নির্ণয় করাই সাধারণ চিকিৎসকদের পক্ষে সহজ পন্থা; এখানে লক্ষ্য করার বিষয়টি বেদেও দেখা যাচ্ছে। বেদেও দ্রব্যের উৎপত্তি-স্থানের ভূমির প্রাধান্য দেওয়া হ'য়েছে এবং সুশ্রুতেই তার প্রতিধ্বনি করা হ'য়েছে।

এখন, আমরা চরক-সুশ্রুতের দৃষ্টিতে আমরুলের রসবিচারে মধুর এবং অম্লের প্রাধান্য দিয়ে থাকি, কারণ এর জন্মস্থান কখনও মরুভূমিতে এবং সাধারণতঃ পার্বত্য দেশে হয় না, তবে একটি প্রজাতি পার্বত্য দেশেও জন্মে।

আনুপ দেশ ও জাঙ্গল দেশই এর উৎপত্তি ভূমি। তাই সে পিত্তকর কোন সময়েই হয় না। এইজন্যই পিত্তপ্রধান শ্লেষ্মানুগামী গ্রহণীরোগে (Chronic dyspepsia) এটি প্রয়োগের উপদেশ, কারণ আমরুল স্বভাববীর্যে মধুর ও অম্লরস এবং কষায় তার অনুগামী রস। তাই অনেক বৃদ্ধ বৈদ্য সংগ্রহগ্রহণীতে পাকা আম খেতে নিষেধ করেন না, কারণ আম্র অপক্বে অম্লরস হ'লেও যখন পাকে অর্থাৎ তার পরিণামে (পরিণতিতে) হ'য়ে যায় মধুর-অম্লরস। আর একটা কথা ব'লে রাখি—অতিসারে আম (আম্র) কোন সময়েই চলে না কিন্তু আমরুল দেওয়া চলে।

সুশ্রুত সংহিতার উত্তরতন্ত্রে ৪০ অধ্যায়ে আমরুল শাকের রস একক ব্যবহারের এবং দধির সঙ্গে মিশিয়েও ব্যবহারের বিধি দেওয়া আছে। সুশ্রুতের টীকাকার ডল্বন আরও পরিষ্কার ক'রে ব'লেছেন—এই ব্যবহার ছাড়াও গুদভ্রংশে (Prolapse of the rectum —যাকে চল্তি কথায় হারিশ বেরোন বলে), মূত্রাঘাতে, আমদোষে, কোমরের ব্যথায়—এইসব ক্ষেত্রেও আমরুলের প্রয়োগ, তাই শ্লোকাকারে বলা হ'য়েছে—

প্রবাহেন গুদভ্রংশে মূত্রাঘাতে কটিগ্রহে।
মধুরাম্ল শৃতং তৈলং সর্পি বাপ্যনুবাসনম্॥

তবে সেটা আমরুলের রস দিয়ে পাক করা তেল কিংবা ঘৃত দিয়ে অনুবাসন (Enema with oil) দিতে হয়। এ সম্পর্কে প্রাচীন বৈদ্যদের অভিমত ঐ তৈল বা ঘৃতের দ্বারা পিচুধারণ (Plugging procedure) ক'রলে গুদভ্রংশ (Prolapse of the rectum) দূর হয়।

এইবার অত্রি সংহিতার মতবাদটি আলোচনা করা যাক। এই সংহিতায়ও একে চাঙ্গেরী বলা হ'য়েছে (১৬ অধ্যায়) এবং গুণ সম্পর্কে উক্ত আছে—

"উষ্ণা কষায়া মধুরা অগ্নিদীপনী চ"।

অত্রির মতে আমরুলের গুণ উষ্ণ, এর রস কষায় মধুর এবং এটি অগ্নির দীপক।

এই চাঙ্গেরী সম্পর্কে চরক সংহিতায় সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ের ৭২ শ্লোকে এর গুণ সম্পর্কে বলা হ'য়েছে—এটি বীর্যে উষ্ণ, অগ্নির দীপক কিছুটা সংগ্রাহীধর্মী, আর যে গ্রহণীরোগে বায়ু পিত্ত দোষদুষ্ট হয়, সেটাকে চাঙ্গেরী সংশোধন করে; তাই শ্লোকাকারে বলা হয়েছে—

দীপনী চোষ্ণবীর্য্যাচ গ্রাহিণী কফ মারুতে।
প্রশস্যাম্ল চাঙ্গেরী গ্রহণ্যর্শো হিতা চ সা॥

এইবার বাগ্‌ভটের (৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থ) অনুশীলন দেখা যাক—ইনি সূত্রস্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে চাঙ্গেরীর (আমরুল) উল্লেখ ক'রেছেন; তিনি ব'লেছেন—এটি রসে অম্লপ্রধান এবং অগ্নিন্দীপক। তারপর চক্রপাণি দত্ত মহাশয় চক্রদত্ত সংগ্রহে (একাদশ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থ) যে আলোচনা ক'রেছেন, সেটা হ'লো—চাঙ্গেরী ঈষৎ কষায় ও মধুর রসবিশিষ্ট এবং অগ্নিন্দীপক; এর বিশেষ প্রয়োগক্ষেত্র গ্রহণীরোগে, তবে এটি একটু কচি বেলের শাঁসের সংযোগে খেলে আরও চমৎকার উপকার হয়। আর অর্শরোগে এর প্রয়োগবিধিতে খাওয়ার উপদেশ আছে খৈয়ের সঙ্গে। এইবার শার্ঙ্গধরের মতবাদটা দেখা যাক—তাঁর গ্রন্থ (১১—১২ খৃষ্টাব্দে) শার্ঙ্গধর সংহিতার মধ্যখণ্ডের নবম অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে চাঙ্গেরীঘৃতের উল্লেখ দেখা যায়, সেখানে ঘৃতের ৪ গুণ রস দিয়ে পাক করার উপদেশ; সেই শ্লোকটি হ'লো—

"ঘৃতাচ্চতুর্গুণং দেয়ং চাঙ্গেরী স্বরসং বুধৈঃ।"

ইনিও উপরিউক্ত ক্ষেত্রগুলিতে ব্যবহার করেছেন।

এখানে প্রসঙ্গতঃ চরক, বাগ্‌ভট ও চক্রপাণির উল্লেখ্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলির একটি তালিকা দেওয়া হ'লো—চরকের দৃষ্টিতে চাঙ্গেরী (আমরুল) দীপনী, উষ্ণবীর্যা এবং কফযুক্ত বায়ুবিকারে উপশমকারক, তাই চরক সম্প্রদায় ব্যবহার ক'রেছেন গ্রহণী ও অর্শরোগে। বাগ্‌ভটের দৃষ্টিতেও আমরুল চরকীয় সম্প্রদায়ের অনুগামী; কিন্তু চক্রপাণি একটা নূতন কথা ব'লেছেন যে, মধুর রস-প্রধান আমরুল শাক পেলে জ্বরেও ব্যবহার করা যাবে।

এইবার লোকে কোন্ চোখে দেখে কিভাবে ব্যবহার ক'রেছেন সেইটাই বলি।

একটা কথা এখানে ব'লে রাখি—একথা হয়তো মনে হ'তে পারে, এই আঁস্তাকুড়ের ধারের জিনিস নিয়ে এতটা যুগ-যুগের প্রমাণের দরকার কি?

হ্যাঁ, দরকার এইজন্যে আছে—চোগা-চাপকান প'রে সওয়াল করা আর ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে সওয়াল করা—বিচারকের মনে একই গুরুত্ব আরোপ করে কি? তাই এখানে এতটা প্রমাণের প্রয়োজন—এই পতিত জমির উপেক্ষিত জিনিসকে নিয়ে।

পরিচিতি

বাংলা দেশ তো বটেই, ভারতের বহু প্রদেশেই এটি জন্মে; সরু লতানে এবং ছোট ছোট উদ্ভিদ, মাটিতেই প্রসারিত হয়। এর প্রচলিত নাম আমরুল শাক। সাধারণতঃ এটিকে দেখা যায় পোড়ো জমির ও বাড়ির আনাচে-কানাচে। ৩/৪ ইঞ্চি সুতোর মত সরু ডাঁটার মাথায় তিনটি পাতা হয়, স্বাদে টক (অম্লাস্বাদ), ডাঁটার গোড়া থেকে ফুল বেরোয়, পাপড়ির রং হ'লদে, ফল হয় আকারে যবের মত, মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু

[illegible] সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফ্লু ও ফল হয়। অনেকে সুষনী শাক (Marsilea quadrifolia) ব'লে ভুল করেন; এই দু'টি শাকের তফাত হ'লো—সুষনীর চারটি পাতা এবং স্বাদেও টক (অম্লাস্বাদ) নয়। এটির বোটানিকাল্ নাম Oxalis corniculata Linn., ফ্যামিলি Oxalidaceae. আর একটি প্রজাতি কাশ্মীর, সিকিম ও হিমালয়ের অঞ্চল-বিশেষে ৮ থেকে ১২ হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যে পাওয়া যায়, সেটির নাম Oxalis acetosella Linn.; তাছাড়াও আরও একটি প্রজাতি এখানে পাওয়া যাচ্ছে—তার নাম Oxalis Corymbosa. তবে একটা কথা জানিয়ে রাখি—সমগ্র পৃথিবীর উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে এই গণের প্রায় ২০০ প্রজাতি (species) পাওয়া যায়। তার মধ্যে ভারতের ৩টি প্রজাতি ঔষধার্থে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

লৌকিক ব্যবহার

লক্ষ্যভেদের মত প্রথমেই বিচার্য বিষয়—এটি শরীরের কোন্ স্রোতের উপর কাজ করে। আমাদের পূর্বসূরিগণের সমীক্ষায় এটির উপযোগিতা রসবহ স্রোতের উপর। আর একটা বিষয়ও জেনে রাখা দরকার—শিশুদের রসবহ স্রোত বিকৃত হয় প্রাকৃতিক কারণে, আর বিকৃত হ'তে পারে মায়ের রসবহ স্রোত্র যদি বিকারগ্রস্ত হয় তবেই। যেহেতু এরা স্তন্যপায়ী।

১। **সর্দি ব'সে গেলেঃ—** শিশুদের বুকে সর্দি ব'সে গিয়েছে অথবা অল্প কাসছে, সেক্ষেত্রে মূল সমেত আমরুল শাকের রস এক চা-চামচ একটু গরম ক'রে খাওয়াতে হয়, দরকার হ'লে দু'বেলাই খাওয়ানো যায়, এটাতে জমা সর্দি উঠে যায়। আরও ভাল হয়—যদি সরষের তেলে আমরুলের রস মিশিয়ে গরম ক'রে অথবা রৌদ্রে দিয়ে সূর্য-পক্ক ক'রে ঐ তেল বুকে-পিঠে মালিশ করা যায়। আর একটা কথা ব'লে রাখি—অনেক সময় শিশুদের দুধে-শ্বাস হয় অর্থাৎ স্তন্যপানের পর হাঁপের মত টানতে থাকে, সেক্ষেত্রে এই রস খাওয়ালে কাজ হয়।

২। **অম্লপিত্ত রোগেঃ—** যাঁরা অম্লপিত্ত রোগে ভুগছেন—একটুও টকের আস্বাদ নিতে ভয় পান অথচ খাওয়ার জন্য মনটা আঁকুপাঁকু করে, এর দ্বারা কিন্তু একটা দোষের সৃষ্টি হয়—পরিণামে আসে অরুচি, একেবারে এই অম্লরসকে বর্জন ক'রলেও তাঁদের দেহে ক্ষারধর্মিত্ব বেড়ে যেতে থাকে, আবার খেলেও জ্বালা; "মারীচ বধের" অবস্থার মত টক আর অম্লপিত্ত রোগের সম্পর্ক। সেক্ষেত্রে এই ভেষজটি, যার মধ্যে আছে মধুর, অম্ল, কষায় এই তিনটি রসের সমন্বয়, যা কোন ভেষজেই নেই, তাই অম্লপিত্ত রোগীর এই আমরুল শাকটি রোগ না বাড়িয়ে অতৃপ্ত রুচিকে রক্ষা ক'রে থাকে।

৩। **কটিতে ব্যথায়ঃ—** একে অনেকে ফিক্ ব্যথাও বলেন। স্ফিক্ অস্থি যেখানে থাকে, সেখানে ব্যথা হয় ব'লেই সেইটাই ফিক্ ব্যথা। ঐস্থান ভিন্ন অন্য জায়গার ব্যথাকে ফিক্ ব্যথা বলা ঠিক হবে না। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে—রোগা-লোকের বড় একটা এ ব্যথা হয় না, আর আমদোষ যার না আছে তারও হয় না; তবে রোগা লোকের আমদোষ থাকলে তাঁরও হ'তে পারে।

এইসব লোকের আমরুল শাকের রস ২ চা-চামচ একটু গরম ক'রে দু'বেলা খাওয়ার অভ্যেস করা খুব ভাল। এ রোগ যার কিছুতেই সারছে না, এটাতে নিশ্চয়ই সেরে যাবে।

৪। **মূত্রগ্রহ রোগেঃ—** প্রস্রাব ক'রতে যাওয়ার পূর্বে ভাবনা—দাঁড়িয়ে না বসে? যাহোক, যেভাবে চেষ্টা করা যাক না কেন—কোন রকম কসরতে সুবিধে হয় না, এমন-কি সুড়সুড়ি দিলেও হয় না; তখন শল্য-চিকিৎসকের শরণাপন্ন অনেককেই হ'তে হয়; এটা কিন্তু সে ব্যাপারই নয়, এরকম একটা ক্ষেত্র উপস্থিত হ'লে আমরুল শাকের রস ২ চা-চামচ ক'রে (১০ মিলিলিটার) প্রত্যহ চার বার আধ কাপ জল মিশিয়ে খেতে হয়, এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটার সুরাহা হবে।

৫। **চুলকণায়ঃ—** গায়ে হ'য়েছে, সেটা চাপ্‌ড়া হ'য়ে যাচ্ছে—মনে হয় যেন দাদ হ'য়েছে, সে ক্ষেত্রে আমরুল শাকের রস গায়ে মাখলে ওটার উপশম হবে; এমনি কুষ্ঠের পূর্বাবস্থায়ও প্রাচীন বৈদ্যগণ ব্যবহারের উপদেশ দিতেন।

৬। **আমের বাসাঃ—** পেটে বেঁধে ব'সে আছে, ইচ্ছে হয় উগ্র নুন-ঝাল দিয়ে তরকারি খাওয়ার অথচ এদিকে পা দুটো একটু রসা-রসা ও চিকচিকে। তাঁরা আমরুল বেটে পায়ে লাগিয়ে দেখুন আর তার সঙ্গে এর রস একটু ক'রে খাবেন। এটায় কমবে বটে, সেটা হবে মেক-আপ্‌ (Make-up) দেওয়া; আসলে এখানে ভালভাবে আম-দোষের চিকিৎসা করা দরকার।

এই নিবন্ধের শেষে একটা কথা মনে আসছে—অন্তর মধুর হ'লেও বাহ্যতঃ অমিষ্টভাষী, অন্য দিকে কিন্তু তার সংগঠনী শক্তি আছে, এ ধরনের লোক সমাজেও যেমন পাওয়া যায়, উদ্ভিদ জগতেও যে আছে, এই আমরুল তার একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তবে প্রকৃতির সত্ত্বায় যদি সেটা বর্তমান না থাকে, তবে বস্তুসত্ত্বার অস্তিত্বটা আর ধোপে টেকে না।

কেন, তা বলছি—এটি যখন অম্লরসের ক্রিয়া ক'রছে, তখন সে প্রকাশ করে উষ্মা; আবার যখন তার অন্তরে মধুর রসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তখন তার সংগঠনী শক্তি বেড়ে যাচ্ছে; আবার কষায় রস যখন আসছে, তখন তার মূর্তি বায়ুর সমধর্মী; তাই সে বৈদিক দৃষ্টিতে গ্রহণীরোগের একমাত্র পাশুপাত অস্ত্র আর এটা আমাদের চোখে যেন খদ্যোতের রোশনাই।

CHEMICAL COMPOSITION

Oxalic acid and potassium salt of oxalic acid.

স্নুহী (মনসা)

বাস্তবের সঙ্গে কার্যকারণের সম্পর্ক বিচার ক'রে যে কোন দ্রব্যের নামকরণ—এ যেন আর্যযুগের ধারা, কিন্তু পরবর্তীকালে মনসা নামকরণের অন্তর্নিহিত তথ্যে কি সেইটাই বিচার্য! আবার তা নিয়ে পৌরাণিক যুগে উপাখ্যান সৃষ্টির মূলে রহস্যই বা কি? সেটাও অনুধাবনযোগ্য; তবে এই মনসা নামটি দ্রব্যবোধক না হ'য়ে যদি কর্মবোধক হয়, তাহলে স্নুহী ও মনসাবৃক্ষ অভিন্ন হ'য়ে যায়: এই হিসেবে যে, স্নুহীর বীর্যশক্তি অর্থাৎ বিরেচনের শক্তিও মনের বেগের মতই দ্রুত কার্য করে, তাই তার নাম মনসা রাখাটা বোধ করি নিরর্থক হয়নি।

'একে মনসা তাতে ধুনোর গন্ধ'—কেন এ কথাটা বলা হ'লো? এর অন্তর্নিহিত তথ্যটি কি মনের কোন গতির দ্রুতকারকতারই ইঙ্গিত, না আর কোন রহস্য এই প্রচলিত লোককথায় লুকিয়ে আছে?

মনসা উপাখ্যানের সংহতি

কোন এককালে ব্রহ্মার কাছে উপদেশ লাভ ক'রেছিলেন পুত্র কশ্যপ। সেই উপদেশই মন্ত্র। সেই মন্ত্র হ'লো—সর্পনামক বিষাক্ত সরীসৃপের অকস্মাৎ দংশনে মনের চেয়েও দ্রুতগতিতে জীবের প্রাণনাশ যাতে না হয় তার উপায় এবং সর্পবিষ দূর করার ঔষধসহ মন্ত্র বা বাক্-পদ্ধতি। এদিকে তাঁর ব্যক্তি-প্রকৃতিও এত তীক্ষ্ন ছিল যে, কোন প্রকারে কোথাও কারও প্রতি সন্দেহ হওয়া মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ রক্ষা-মন্ত্রের প্রয়োগের দ্বারা তাকে প্রতিরোধ ক'রতেন। এ'র প্রকৃতি অনুযায়ী যদি কোন রমণী জ'ন্মে থাকেন, তবে তাঁকে ছাড়া আর কাউকে তিনি এ-মন্ত্র দান ক'রবেন না, অর্থাৎ যিনি এমন দ্রুত

মনঃসমীক্ষক ঋষির মন বুঝতে পারবেন, তিনি হবেন তাঁর যোগ্যা ছাত্রী। ঘটনাক্রমে এমন এক রমণীকে তিনি জন্ম দিলেন—যিনি তাঁর মনেরই যোগ্যা। যিনি কশ্যপমুনির মনের চেয়ে আরও অধিক মনস্বিনী। তিনিই তাঁর কাছে নাম পেলেন মনসা, যেহেতু কশ্যপের মনের মতই দেহ পেলেন। সেই মানস-সৃষ্ট কন্যা কালে যুবতী হ'লেন। তিনিও বহু মন্ত্রের অধিকারিণী হ'লেন। মনসাদেবীকে তাঁর মনোমত বর খুঁজে নেওয়ার অনুমতি দিলেন। তিনি পছন্দ করলেন আর এক মুনিকে, তার নাম জরৎকারু অর্থাৎ জরাজীর্ণ হ'লেও যিনি দ্রুত সুন্দর করে দিতে পারেন, যাঁর মন্ত্রবল অথবা বিদ্যাবল মনসাদেবী অপেক্ষা আরও চমৎকার।

জীর্ণকে সুন্দর করার দক্ষতা মনসার ছিল না, তিনি শুধু প্রাণ দিতে পারতেন; তাই, এই স্বামীটিকে পেয়ে বুঝলেন—আমি দ্রুত প্রাণসঞ্চার ক'রবো আর আমার স্বামী তার নবরূপ গঠন ক'রবেন। তাই হ'লো—অচিরেই সেই জরৎকারু মুনির গৃহিণী হ'লেন মনসাদেবী, তবে একটি প্রতিজ্ঞা রইলো—সৌন্দর্য-সৃষ্টির সামর্থ্য হারালেই তৎক্ষণাৎ স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রবেন তিনি; আর স্বামীও প্রতিজ্ঞা ক'রলেন—প্রাণ-

সঞ্চার ক'রতে না পারলেই তৎক্ষণাৎ পত্নীকে পরিত্যাগ করবেন।

কালে তাঁদের একটি পুত্র হ'লো—নাম রাখলেন আস্তিক। মনসার একটি ভাইও ছিল—নাম তাঁর বাসুকী, তিনিও কশ্যপের অন্যতম পুত্র, তবে মনসার মত এত তীক্ষ্ণধী নন; তবে অযোগ্যও নন, তিনিও মন্ত্রশক্তির অধিকারী। এই উপাখ্যানটি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের।

উপাখ্যানটিতে যেটি পাওয়া গেল, সেটির তাৎপর্য বড়ই সুন্দর। মৃতপ্রায় ব্যক্তির প্রাণসঞ্চার এবং তাকে জীর্ণতা থেকে মুক্ত ক'রে নূতন ক'রে সঞ্জিত করার শক্তিই মনসা ও তাঁর স্বামী জরৎকারু নামের মধ্যেই নিহিত। অপরদিকে স্বাভাবিক কারণেই কৌতূহল জাগে—আমাদের বহু পরিচিত স্নুহী বা মনসা বৃক্ষটিকে কি অর্দিন উপাখ্যানের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্দেশ্য তার কার্যশক্তিকে নামের ও উপাখ্যানের মাধ্যমে প্রচার করা? না নিছক গালগল্প? এই স্নুহী বা মনসা বৃক্ষটি কি ভারতে আগত আর্যদের নজরে এসেছিল? তার উত্তর পাওয়া যাবে অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ২২৭।১২।৩ সূক্তে; ওখানে বলা হয়েছে—

> স্নুহ্যর্কৌ শ্বাত্রা পীতা ভবত যূয়মাপো অস্মাক মন্তরুদরে সুশেবাঃ।
> তাং অস্মভ্যং অযক্ষ্মা অনমীবা অনাগমঃ স্বদন্তু॥

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> স্নুহী চ অর্কশ্চ শ্বাত্রা=ক্ষীররূপা পীতা যূয়ং শীঘ্রং জীর্ণা ভবত। শ্বাত্রমিতি আপো=রসং। উদরে জলপাকস্থানে সুশেবাঃ সুষ্ঠু শেবং সুখ নাম। অযক্ষ্মা=উদররোগরহিতাঃ। অপঃ স্বদন্তু আস্বাদয়ন্তু মালিন্য রাহিত্যং কুর্বন্তু।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—স্নুহী এবং অর্ক, তোমাদের ক্ষীর পান ক'রে আমাদের উদরের জলপাক স্থানে সুখ হোক্। উদর রোগসমূহ থেকে আমাদের মালিন্য দূর ক'রে দাও।

বৈদ্যকের নথি

অথর্ববেদের এই সূত্র ধ'রেই আত্রেয় তার প্রিয়তম ছাত্র অগ্নিবেশকে উপদেশ দিয়েছেন—স্নুহীক্ষীরের গুণ ও আময়িক প্রয়োগের ক্ষেত্রটি কি।

আত্রেয় ব'লেছেন—মানুষ এমন একটি রোগে আক্রান্ত হয়, যেটিতে তার মুখ শুকিয়ে যায়, শরীরও শুকিয়ে যায়, উদরে ও কুক্ষিতে বায়ু ভ'রে যায়, কাতর হ'য়ে পড়ে; মন্দাগ্নি, মন্দবাক্, মন্দাহারের জন্য সমস্ত চেষ্টাই বিকল হ'য়ে প'ড়ে, যে সময়ে তার জরৎ দেহটি একেবারে জীর্ণ হয়—তখন একই সঙ্গে প্রাণের উজ্জীবন এবং জীর্ণতায় কারুতার প্রয়োজন হয়, এই যে রোগ—তার নাম উদর রোগ।

তাই তাঁরা শ্লোকাকারে ব'লেছেন—

> ভগবন্! উদরৈর্দুঃখৈ র্দৃশ্যন্তে হ্যর্দ্দিতাঃ নরাঃ
> শুষ্ক বক্ত্রা কৃশৈঃ গাত্রৈঃ দৃশ্যন্তে হ্যর্দ্দিতাঃ নরাঃ

প্রণষ্টাগ্নিবলাহারাঃ সর্বচেষ্টা স্বপ্বীশ্বরাঃ
দীনাঃ প্রতিক্রিয়াঽভাবাৎ জীর্ণা কারুতাহ্যাপ্সতে॥

এর ফলে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, প্রাণ-বায়ু, অগ্নি ও অপানবায়ু দূষিত হয়; যার জন্য ঊর্ধ্ব ও অধোদেশস্থ পথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়, তারই পরিণতিতে সঞ্চিত দোষ ত্বক্ ও মাংসের মধ্যস্থলের কুক্ষিকে অত্যন্ত আধ্মাত করে, যাকে বলে হাপরের মত ফুলে যায়; তার ফলে জলপাক স্থানটিও দূষিত হ'য়ে পড়ে এবং অতি সত্বর মল-মূত্রের সমস্ত পথ রুদ্ধ হ'য়ে জীবন বিপন্ন হয়; এর সঙ্গে অজস্র উপসর্গ উপস্থিত হয়। এই ব্যাধির নাম উদর ব্যাধি। এর চিকিৎসাক্রমে বলা হ'য়েছে—স্নেহ দ্রব্য সেবনে দেহকে কোমল করা এবং স্নুহী ক্ষীরের (মনসার ক্ষীর অর্থাৎ আঠা, একে সুধাও বলা হয়) দ্বারা প্রস্তুত ঘৃত দিয়ে তার বিরেচনের ব্যবস্থা করানো। এটা চরক সংহিতার কল্প-স্থানের দশম অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হ'য়েছে। এখানে স্নুহীবৃক্ষের নাম দিয়েছেন মহাবৃক্ষ কল্প।

এর সুধা এত শক্তি সঞ্চার করে যে, শুধু মনসা-ক্ষীরের সঙ্গে মাংস পাক ক'রে সেই মাংস ভোজন ক'রলেও ভীষণ উদরীরোগ (Ascites) দ্রুত প্রশমিত হয়। তাই চরকের চিকিৎসাস্থানের ১৮ অধ্যায়ের ৯৫ শ্লোকে বলা হ'য়েছে—

"মাংসং বা ভোজনং ভোজ্যং সুধা ক্ষীর ঘৃতান্বিতম্।"

চরক ও সুশ্রুত সংহিতার মতবাদ একই। সেইজন্যই আমাদের বিশেষভাবে অভিনিবেশ করার প্রয়োজন পৌরাণিক মনসার উপাখ্যান ও চরক-সুশ্রুতের চিকিৎসাবিধান।

এখন এ বিষয়ে দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত মনসা বৃক্ষের অন্যান্য অংশের দ্বারা রোগ-প্রশমক রীতি কিভাবে চ'লে আসছে, সে সম্পর্কে পরে বক্তব্য রাখছি।

পরিচিতি

স্নুহীর প্রচলিত বাংলা নাম মনসা, সমগ্র পৃথিবীতে এই গণের প্রায় ৬০০টি প্রজাতি আছে; বাংলায় এটি একটি পূজ্য বৃক্ষ, ভারতের বহুস্থানে এমন-কি সিকিম, ও ভুটানেও এটি পাওয়া যায়; বাংলার পলিমাটিতে এর বাড়-বৃদ্ধিও যেমন, তেমনি পাথুরে ও কাঁকুরে মাটিতেও এ বেঁচে থাকতে পারে। গাছ বেশী উঁচু ও ডালপালা-বিশিষ্ট হয় না, সোজা হ'য়ে ওঠে। আকারে গোল, গাছের গায়ে ও ডালে ছোট ছোট ঘন কাঁটা হয়। ৭/৮ ইঞ্চি লম্বা মাংসল পাতার মাথার দিকটা ১/১½ ইঞ্চি চওড়া, কিন্তু গোড়ার অর্থাৎ বোঁটার দিকটা ক্রমশঃ সরু, গাছ কাটলে বা পাতা ভাঙলে প্রচুর পরিমাণ দুধের মত আঠা বের হয়, এটা শুকিয়ে গেলে রবার সল্যুসনের মত চিট্ হয়। ডাল (শাখা) কেটে পুঁতলেই গাছ হয়, ছোট ছোট হ'লদে ফুল হয় বসন্তকালে। এটির বোটানিকাল্ নাম Euphorbia neriifolia Linn., ফ্যামিলি Euphorbiaceae. হিন্দিভাষী অঞ্চলে একে বলে 'সেহুন্দ', উড়িষ্যার অঞ্চল বিশেষে একে বলে 'কণ্টা সিজু'। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় মূল, কাণ্ড, শুষ্ক আঠা (ক্ষীর) এবং পাতার রস।

এই স্নুহীক্ষীর সংগ্রহ সম্পর্কে একটি বক্তব্য রেখেছেন প্রাচীন আচার্য বৈদ্যরাজ "দৃঢ়বল" (ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের)—"প্রবরো বহু কণ্টকঃ" অর্থাৎ যে মনসা গাছে বেশী ঘন কাঁটা, সেই গাছের আঠাই (ক্ষীর) গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ; আর ব'লেছেন—দুই বা তিন

বৎসরের মনসা গাছে শীতের শেষে অর্থাৎ বসন্তের প্রারম্ভে কাটারি দিয়ে আঘাত ক'রে ক্ষীর সংগ্রহ ক'রতে হয়।

আকারে ঠিক একই রকম এর আর একটি প্রজাতি পাওয়া যায়, তার পাতা অপেক্ষাকৃত পাতলা, এভিন্ন গাছের গায়ে কাঁটাও কম। তাকে বলে সেহুণ্ড।

সাবধানতা— স্নুহীক্ষীর ও পত্রস্বরস প্রয়োগবিদ্ বৈদ্যের কাছ থেকে ব্যবহারের উপদেশ নিতে হবে। নিজেদের মতে প্রয়োগ ক'রতে গেলে বিপজ্জনক হ'তে পারে।

রোগ প্রতিকারে

প্রথমেই এটা জানা দরকার যে, মনসার ব্যবহার্য অংশগুলি কাজ করে—আহারের দোষে বিকৃত পিত্ত যেখানে রসবহ স্রোতকে দূষিত ক'রে যকৃৎকে (লিভার) পীড়িত ক'রে রক্তবহ স্রোতকেও দূষিত করায়; যার পরিণতিতে সমগ্র কলাংশ (Interior Smooth covering of the organs) রোগগ্রস্ত হয়।

১। **রসবাতে:—** এই বাতগুলির লক্ষণ হ'লো—গাঁট ফুলে যায়, কন্‌কন্ করে, শিরাগুলি মোটা হ'তে থাকে, তার জন্য যন্ত্রণা ও ব্যথা; এক্ষেত্রে মনসার পাতাকে ঝ'লসে নিয়ে, তার রস ২/৩ ফোঁটা অল্প দুধে মিশিয়ে দু'বেলাই খেতে হবে, আর ঐ পাতা তেলে ভেজে, ঐ তেল লাগাতে হবে।

তেল তৈরীর নিয়ম— মোটামুটি হিসেব হ'লো—যদি তেল ১০০ গ্রাম হয়, পাতা ১০০ বা ১৫০ গ্রাম নিতে হবে এবং ঐ পাতা টুকরো টুকরো ক'রে ঐ তেলে ভেজে ও ছে'কে নিলেই চ'লবে; তবে তেল চড়িয়ে নিষ্ফেন হ'লে পাতা দিতে হবে। এর দ্বারা ঐ রস বাতটার উপশম হবে।

২। **প্রমেহ রোগে:—** এই প্রমেহের প্রধান লক্ষণ—প্রস্রাব করার পূর্বে অল্প কিছু ক্ষরণ হয়, আর তার প্রধান উপসর্গ থাকে কোষ্ঠকাঠিন্য; এক্ষেত্রে মনসার ক্ষীর (আঠা) ৩/৪ ফোঁটা নিয়ে বাতাসার মধ্যে পুরে খেতে হয়, এর দ্বারা ১৫/২০ দিনের মধ্যে ঐ দোষটা চলে যাবে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যও দূর হবে।

৩। **সর্পদষ্ট সন্দেহে:—** সাপে কামড়েছে কিনা জানা নেই অথচ সেখানে জ্বালা ক'রছে, সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের আওতায় আসার পূর্বে মনসা আঠা ১৫/২০ ফোঁটা অল্প দুধে মিশিয়ে খাওয়ালে জ্বালাটা ক'মে যাবে। তবে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থাও ক'রতে হবে।

৪। **হুপিং কাসিতে:—** এমন কি ফেরিন্‌জাইটিস্ হ'লে আগুনে সে'কা মনসার পাতা হাতে চেপে রস ক'রে সেই রসে একটু চিনি বা লবণ মিশিয়ে খেলে দুই / তিন দিনেই উপশম হবে এবং ৪/৫ দিনের মধ্যে এই কাসির ধমকটা চ'লে যাবে; এর মাত্রা হ'লো—পূর্ণবয়স্কের এক বা দেড় চা-চামচ, ১০/১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত ৪০/৪৫ ফোঁটা, ৬/৭ বৎসর বয়সের হ'লে ১০/১৫ ফোঁটা আর তার কম বয়সের ৫/৭ ফোঁটা অল্প দুধের সঙ্গে খেতে দিতে হবে।

বাহ্য প্রয়োগ

৫। **এক্‌জিমায়:—** এমন-কি খোস-পাঁচড়া ও চুলকানি হ'লেও এই মুষ্টিযোগটা ব্যবহার করা হ'তো। গ্রামাঞ্চলে যাঁরা থাকেন, তাঁদের পক্ষে করা সুবিধে হবে—মনসা

গাছের একটা বা দুটো ডালের পাতাগুলি যে পর্যন্ত আছে তার নিচে থেকে কেটে অর্থাৎ ডালের অগ্রভাগটা বাদ দিয়ে ঐ ডালের মাঝখানটায় গর্ত ক'রে ওর মধ্যে ৩/৪ চা-চামচ বাটা সরষে পুরে রেখে আসতে হবে। ১ দিন বাদে (২৪ ঘণ্টা) পুনরায় ঐ ডালের খানিকটা অর্থাৎ যতটুকুর মধ্যে বাটা সরষে ভরা ছিল, সেই পর্যন্ত পুনরায় ঐ গাছ থেকে কেটে নিয়ে একটা হাঁড়ির মধ্যে মুখ বন্ধ ক'রে পোড়া দিতে হবে। তার পরের দিন ঐটাকে (কালো কয়লাটাকে) মিহি গুঁড়ো ক'রে নিলেই তৈরী হ'লো ঔষধটা। সেই গুঁড়ো একটু নারকেল তেলে মিশিয়ে দিনে একবার ক'রে লাগাতে হবে। ২/৩ দিনের মধ্যেই উপশম হয়। এছাড়া স্নুহীর কাণ্ডটার ক্বাথ দিয়ে সরষে তেল পাক ক'রে লাগালেও কাজ হবে। (তেলের ৪ গুণ কাণ্ড নিয়ে তাকে ৪ গুণ জলে সিদ্ধ ক'রে একভাগ থাকতে নামিয়ে ছে'কে তেল পাক করতে হবে।)

৬। **অর্শে ঃ—** মলদ্বারে চোপ্‌সানো ছোট ছোট মটরের মত দানা, রক্ত পড়ে না, এক্ষেত্রে শিকড় বাদে মনসা গাছের মূল, (গোড়ার অংশটা) টুকরো টুকরো ক'রে কেটে কাঁচা অবস্থায় লোহার কড়ায় রেখে পোড়াতে হবে; তবে এর সংগে কিছুটা মনসার আঠা (ক্ষীর) মিশিয়ে দিতে হবে। ওটা জ্ব'লে কয়লা হ'য়ে গেলে সেইটাকে গুঁড়ো ক'রে পোড়া ঘিয়ে মিশিয়ে (মলমের মত ক'রে) লাগাতে হবে। এটা গাওয়া ঘি হওয়া দরকার।

৭। **আঁচিলে ঃ—** উপরিউক্ত মলমটি লাগালে আঁচিলটা মিলিয়ে যাবে।

৮। **বিক্ষিপ্ত টাকে** (এলোপেসিয়া এরিয়েটা) ঃ— মাথায় এই টাক বিক্ষিপ্ত ভাবে হয়, এমন-কি 'ভ্রু'তে, গোঁফেও হ'তে দেখা যায়, এতে মনসার আঠা দিয়ে তৈরী তেল লাগালে সেরে যাবে।

তেল তৈরীর নিয়ম— ২০/২৫ গ্রাম তিল বা নারকেল তেল একটা লোহার হাতায় ক'রে আগুনে চড়িয়ে, গরম হলে তার সংগে ২৫/৩০ গ্রাম মনসার আঠা অল্প অল্প ক'রে মিশিয়ে নাড়তে নাড়তে যখন ওটা চট্‌চটে হয়ে যাবে, তখন ওটা নামিয়ে শিশিতে বা কৌটোতে পুরে রাখুন। যেখানে টাক হ'য়েছে—কেবল সেখানেই লাগাতে হবে, তবে ১ দিন অন্তর; কিছুদিনের মধ্যেই ওখানে নতুন চুল বেরোবে।

৯। **বেতো চুলে ঃ—** মেয়েদের বেতো চুল (এই চুলগুলি সাধারণতঃ বে'কে যায়, বাড়তে চায় না এবং একটু মোটা) তুলে ফেলার কুঅভ্যাসের ফলে মাথার তালু বা সিঁথি ফাঁক হয়, ওর জন্যে বিশেষ বয়েস অপেক্ষা করে না, সেক্ষেত্রে অল্প দিনেই আবার নতুন চুল বেরোবে—মাথার ঐখানটায় মনসার আঠা দিয়ে তৈরী তেলটা ১ দিন অন্তর লাগাবে।

১০। **শিশুদের চোখে পিচুটি পড়ায় ঃ—** মনসার পাতায় কাজল তৈরী ক'রে চোখে লাগালে ওটা যে সেরে যায়—এটা সব মায়েদের জানা আছে।

সর্বশেষে একটা কথা জানিয়ে রাখি—এই গাছের পাতা ছাগলের প্রিয় খাদ্য এবং এটি খেয়ে বেশ হৃষ্টপুষ্টও হয়। আরো শোনা যায়—রাজস্থানের কোন কোন সম্প্রদায় এর কচি পাতা সিদ্ধ ক'রে জল ফেলে দিয়ে তার সংগে লবণ, লংকা, হিং প্রভৃতি মিশিয়ে মুখরোচক ক'রে খেয়ে থাকেন।

স্নুহী নিবন্ধটির শেষ মন্তব্যে এসে লোক-প্রচলিত কুটিল রাজনীতির একটি বাঁধা গৎ লিখছি—

"মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ"

অর্থাৎ যেটা মনে ভাবা যায়—সেটা কথায় প্রকাশ ক'রতে নেই; আচ্ছা, আমাদের বৈদ্য-বৃত্তিতে এটা কি করা উচিত? যেটায় বুঝছি আপনার ভবিষ্যতে অকল্যাণ হবে অথবা যেটা কল্যাণকর, সেটাকে আপনার কাছে প্রকাশ ক'রবো না?

এই মনসা বৃক্ষকে প্রতীক ক'রে পূজা—সেটা নিম্ন বাংলায় বেশী প্রচলিত, মূলে সর্পভয়, যেহেতু এই মনসা দেবী সর্পভয় ত্রাণকারিণী। আচ্ছা, এই বৃক্ষকে জনপদে রোপণ এবং তাকে পূজা—এর প্রধান কারণ তার ওষধি-গুণ নয়তো? এখানে বৈজ্ঞানিক-গণ একবার নেড়েচেড়ে দেখুন—এই বৃক্ষের কোন অংশ-বিশেষে কোনরূপ প্রতিষেধক সত্ত্বা পাওয়া যায় কিনা!

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Euphorbin, euphorbon, euphorbia. (b) Resin. (c) Essential oil.

বর্হি (কুশ)

জগতে এত জিনিস থাকতে কুশ তৃণটিকে এত পবিত্র ক'রে সমাজ কেন মেনে নিল? এর মূলে একটি উপাখ্যান আছে ব্রহ্মপুরাণে, সে উপাখ্যানটি হ'লো—এককালে ঋক, যজু, সামবেদী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কার মান্যতা বেশী, এই নিয়ে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে কোঁদল বেধে যায়, যার ফলে যজ্ঞকার্য স্তব্ধ হ'য়ে যায়; পরে এই তিন বেদী ব্রাহ্মণের

মধ্যে একটা সন্ধি হয়—যে তৃণকে তাঁরা সামনে দেখেছিলেন তাকেই ব্রাহ্মণের প্রতিভূ ক'রে, তারই মুখ্যত্ব প্রদান ক'রে নিজেদের কোঁদল মিটিয়ে ফেললেন। সেই সময় থেকে কুশের মান্যতা সব যজ্ঞকার্যে এবং কি ঐহিক কি পারত্রিক সব কার্যেই তার

স্পর্শ না পেলে দেহ পবিত্র হবে না বা কার্য সিদ্ধ হবে না, এই সন্ধিপত্র রচিত হ'লো। তাই ব্রহ্মপুরাণে বলা আছে—

"বিষ্টরাস্তু কুশা এতে ব্রাহ্মণা প্রতিরূপকাঃ।
যজ্ঞকার্যেষু দৈবেষু পৈত্রেষু শুভকর্মসু॥"

অর্থাৎ—এই যে সম্মুখে "কুশ" নামে তৃণরাশি দৃষ্ট হচ্ছে, এরাই ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি। সমগ্র যজ্ঞে, দৈব ও পৈত্রিক কার্যে এবং সর্বপ্রকার শুভকার্যে এরাই সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণ্য-সম্মান লাভ করবে।

পরবর্তীকালে পুরোহিততন্ত্র সেই কুশগুচ্ছের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যে আহূত ব্রাহ্মণের প্রতীক হবে এবং তার ভিন্ন নামও করা হবে, এ নির্দেশও তাঁরা দিয়ে গিয়েছেন, যেমন ব'লেছেন—

'পঞ্চাশদ্ভিঃ ভবেৎ ব্রহ্মা, তদর্দ্ধেন তু বিষ্টরং ভবেৎ।
তদর্দ্ধেং চোপযমনং তদর্দ্ধৈশ্চ কুশৈর্দ্বিজঃ॥'

অর্থাৎ পঞ্চাশটি কুশাগ্রের দ্বারা যেটি প্রস্তুত হবে, তিনি ব্রহ্মা পদবাচ্য হবেন; তার অর্ধেক কুশাগ্র দ্বারা প্রস্তুত করলে তার নাম হবে 'বিষ্টর', তার অর্ধেক দ্বারা প্রস্তুত যেটি—সেটির নাম করা হবে উপযমন আর তার অর্ধেক সংখ্যার কুশ দ্বারা প্রস্তুত—সেটি শ্রাদ্ধাদি কার্যে ব্রাহ্মণের প্রতীক। এ ভিন্ন এই কুশের দ্বারা প্রস্তুত বহু জিনিসই তাঁরা কি যজ্ঞকার্যে কি শ্রাদ্ধাদি কার্যে ব্যবহার ক'রেছেন, যেমন ত্রিপত্র, মোটক, পবিত্র প্রভৃতি।

পুরোহিততন্ত্রে আর একটি জিনিসের বিধি দেওয়া আছে, সেটি হ'লো 'কুশ-পুত্তলিকা দাহ', সে ক্ষেত্রটি হ'লো—কোন অজ্ঞাতস্থানে মৃত্যু হ'য়েছে, অথবা দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরেও (১২ বছর) সন্ধান পাওয়া যায়নি, কিংবা বিষ, রজ্জু বা অন্য কোন অবৈধ হেতুর দ্বারা মৃত্যু হ'য়েছে, সেক্ষেত্রে তার প্রতিরূপক একটি মূর্তিকে দাহ করার পর শ্রাদ্ধাধিকার লাভ হয়। সেই প্রতিরূপকটি কুশগুচ্ছের দ্বারাই নির্মাণ করা হয়, অদ্যাবধি পুরোহিততন্ত্রে সেটি প্রচলিত। তবে বর্তমান যুগে এমনি কুশপুত্তলিকার দাহ কাজটি কোন রাজনৈতিক নেতার কার্যের প্রতিবাদ জানানোর জন্যও প্রচলিত হয়েছে। তিনি স্বশরীরে বর্তমান থাকা অবস্থাতে ভারতের সেই প্রাচীন পদ্ধতিটির নবীকরণ করা হয়ে থাকে। অন্যান্য দিক থেকেও কুশের মান্যতাকে স্বীকৃতি দেওয়া আমাদের দেশে খুব প্রাচীন। এত প্রাচীন যে রামায়ণের কুশ নামটি রামের পুত্রের নামকরণের জন্য স্থান পেয়েছে, তবে অথর্ববেদী ব্রাহ্মণগণ জনকল্যাণের দিক থেকে বিচার ক'রে তার ভৈষজ্যশক্তির বিষয়টিকেও অনুশীলন ক'রেছেন; সেটা স্থান পেয়েছে বৈদ্যককল্পের ৫৩।২।৬১ সূক্তে—

অক্রন্ কর্ম কর্মকৃতঃ সহ বাচা ময়োভুবা।
ভেষজ মসি ভেষজং বর্হি পুরুষায় ভেষজম্॥

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

ঋত্বিজঃ স্তুতি রূপয়া বাচা মনোভুবা ময় ইতি সুখঃ ময়োভুবা সুখমাত্রক ভবনশীলাঃ অক্রন্ কর্ম বাচয়তি ইতি কর্ম কৃতঃ বারুণ-শুদ্ধি কর্ম কৃৎ তস্য কৃতঃ। ত্বং বর্হি দীপ্তিমান্ কুশঃ কুং মলিন-কর্ম পাপং বা তৎশ্যাতি দূরী করোতি, উপদ্রবান্ নিরাকরোতি তৎ ভেষজং কুশঃ অপিচ সুহিতং পুরুষায় সেব্যং প্রাণেভ্য অপি ভেষজম্।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—

ঋত্বিকের মনোজাত সুখময় বাক্যে এই সূক্তটি পাঠ করা হ'য়েছে, যাঁরা সুখমাত্রেক মননশীল, যাঁরা বারুণ শুদ্ধিকৃৎ, অনাক্রান্ত কর্ম যাজনশীল, তাঁদের কৃত এই সূক্তি তুমি বর্হি অর্থাৎ দীপ্তিমান কুশ অর্থাৎ কু বা মলিন অথবা পাপ কর্মকে দূরীকরণ কর, তুমি ভেষজ, দেহ ও মনের ভয় দূর কর, প্রাণেরও ভেষজ ব'লেই পুরুষের সেব্য তুমি।

অতএব সুপ্রাচীন বেদ ও সংহিতাকারগণের অনুশীলনের দ্বারাই আমাদের ভারতে একাধারে শুভকর্মে ও ভৈষজ্যকর্মে কুশের ব্যবহার।

কুশের ব্যবহার কিন্তু দুই প্রকারে—এক এর পত্র, অপরটি এর মূল; শুভকার্যে এর পত্রই ব্যবহৃত হয়, আর ভৈষজ্যকর্মে এর মূলের ব্যবহারই প্রধান।

এই কুশটি কিন্তু স্বগোত্র-ভেদে কাশ, শর ও দর্ভ এবং স্বতন্ত্র স্বনাম কুশেই প্রখ্যাত হ'য়ে আছে। এই চারটি ভেদও ব্রাহ্মণ্যবাদে এবং বৈদ্যকবাদে স্বীকৃত। অর্থাৎ পুরোহিত-তন্ত্রে যেমন কুশাভাবে অপর তিনটির যে কোন একটি নেওয়া যায়, ভৈষজ্যবাদেও কুশ-মূলাভাবে অপর তিনটির একটি নেওয়া যায় এবং সুবিধা হ'লে একত্রই চারটিকে নেওয়া যায়।

বৈদ্যকের নথি

চরক সংহিতার এবং সুশ্রুত সংহিতার সূত্রস্থানে এবং চিকিৎসাস্থানে অনেক রোগেই কুশমূলের উল্লেখ দেখা যায়। চরকের সূত্রস্থানে নির্বাপণ (২য় অধ্যায়) এবং তৃতীয় অধ্যায়ে কুশমূলকে অতি উৎকৃষ্ট ধরনের শোধনকার্য করার উপযোগী ব'লে উল্লেখ করা হ'য়েছে। এভিন্ন ব্রণ শোধনার্থ (চিকিৎসাস্থান, তৃতীয় অধ্যায়) ক্ষত ধৌত করার কথা বলা আছে। তাছাড়া সুশ্রুতের শারীরস্থানে নির্দোষ শব পরীক্ষার ব্যাপারে কুশকে অগ্রাধিকার দেওয়া হ'য়েছে; পরবর্তীকালে **চক্রদত্ত** প্রদর রোগে (menorrhagia) কুশমূলকে আভ্যন্তরীণ ব্যাধিতে প্রয়োগ ক'রেছেন। **ভাবপ্রকাশ**কার কপোতাদি মাংস ভোজনজনিত অজীর্ণে এর মূলের ক্বাথ সেবনের ব্যবস্থা দিয়েছেন। **বঙ্গসেন** রক্তার্শ রোগে কুশমূল সেবনের ব্যবস্থা দিয়েছেন। স্তন্য শোধন ও মূত্র বিরেচনে কুশমূলের ব্যবস্থা—এটা চরকের উদ্ধৃতি।

লোকায়তিক ব্যবহার

প্রথমেই ব'লে রাখি—কুশের ব্যবহার করা হ'য়েছে পিত্তবিকারে, তার সংগে বায়ু অনুগামী হলে সেখানেই ব্যবহার করার বিধি।

১। **রক্তপ্রদর রোগেঃ—** যে প্রদরের স্রাব পিচ্ছিল, মাছ-মাংস ধোয়া জলের মত স্যালচে, দুর্গন্ধ, তার সংগে শরীরে দাহ—এই প্রকার রক্তপ্রদরের ক্ষেত্রে ক্ষত হয়, তবে দ্রুত ছড়িয়ে দেয় না। এক্ষেত্রে ৫/৭ গ্রাম (১০ গ্রাম পর্যন্ত) কাঁচা কুশমূল বেটে, সেটা ছে'কে নিয়ে (সেটা অন্ততঃ এক কাপের মত হওয়া চাই), এইভাবে ৪/৫ দিন খেলে স্রাব উল্লেখযোগ্যভাবে ক'মে যাবে, তার সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গেরও উপশম হবে। যদি সম্ভব হয়, তাহ'লে এই কুশমূল ২০/২৫ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সেই জল দিয়ে প্রত্যহ একবার ডুস্ নিতে হবে। এর দ্বারা আরও তাড়াতাড়ি সেরে যাবে।

২। **জ্বালামেহ রোগেঃ—** এই রোগ সম্পর্কে বলি—এটা যৌবনকালে হয়, প্রৌঢ়ে আসে না। প্রধান লক্ষণ হ'চ্ছে—এ'দের কোষ্ঠবদ্ধতা আসে, দাস্তের সময় কোঁথ দিলে সাদা সর্দির মত খানিকটা প'ড়ে যায়, মনে হয়—বোধহয় শুক্রপাত হ'লো; না, তা নয়—এটি প্রোস্টেট্ গ্লাণ্ড থেকে ক্ষরণ হ'লো, তখন বুঝতে হবে—এই গ্রন্থিটি রোগাক্রান্ত হ'য়েছে। এই ক্ষরণের সঙ্গে জ্বালাও থাকে, আবার প্রস্রাব করার সময় জ্বালাও করে—এক্ষেত্রে কুশমূল ১০ গ্রাম একটু থে'তো ক'রে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে একটু চিনি বা মিছরি দিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা ৪/৫ দিনের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য উপকার হবে।

৩। **পিপাসায়ঃ—** এ পিপাসাটা আসে যখন রসবহ স্রোত বিকারগ্রস্ত হয়, অল্প একটু পরিশ্রমেই তাঁর পিপাসা হয়, ঘামও বেশী; এই ক্ষেত্রের আর একটি উপসর্গ হ'লো কোষ্ঠবদ্ধতা, তাঁরা দাস্ত পরিষ্কারের জন্য ২/৩ গ্লাস জলও খেয়ে ফেলছেন। এক্ষেত্রে ১০/১২ গ্রাম কুশমূল ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে সকালে-বৈকালে দু'বারে খেতে হবে। ৪/৫ দিন খাওয়ার পর যদি উল্লেখযোগ্য উপকার না হয়, কুশের মাত্রা দেড়গুণ নিয়ে সিদ্ধ ক'রে দু'বেলায় খাবেন।

৪। **পিত্ত পাথুরীতে** (Gall-stone):— পিত্তথলিতে পাথুরী হ'য়েছে এটা নিশ্চিত হয়েছেন—এক্সরে ফটো তুলে নতুবা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভিমতে এটা পাথুরী, সেক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করার পূর্বে কুশমূল ১২ গ্রাম গোক্ষুর (Tribulus terrestris) ৬ গ্রাম ও বরুণছাল (Crataeva religiosa) ৬ গ্রাম একসঙ্গে থে'তো ক'রে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে ঐ জলটা সকালে অর্ধেকটা ও বৈকালে অর্ধেকটা পর পর ১০/১২ দিন খেয়ে দেখুন। পিত্তথলিতে যেসব পাথর কঠিনীভূত (hard) হয়নি, সেগুলি এর মধ্যেই দ্রবীভূত হ'তে থাকবে, আর যেগুলি শক্ত হ'য়ে গিয়েছে, সেগুলি আস্তে আস্তে ক্ষয় হ'তে থাকবে। এইভাবে অন্ততঃ ৪/৫ সপ্তাহ ব্যবহার করার পর পুনরায় এক্সরে ক'রে দেখতে পারেন। এটির ব্যবহারে অপারেশনের হাত থেকে বে'চে যাওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রইলো। এসব ব্যবস্থা সেই আয়ুর্বেদ-ভাস্কর গঙ্গাধরের আমল থেকে চ'লে আসছে।

৫। **অর্শরোগেঃ—** এই কুশমূলের প্রয়োগক্ষেত্র কেবল বিকৃত পিত্তাশ্রিত অর্শরোগে। এ'দের অর্শের বলি দিয়ে রক্ত প্রায়ই প'ড়তে থাকে, সে বলি ভিতরে বা বাইরে যেখানেই হোক, একটু মল কঠিন হ'লে তো আর কথাই নেই। এই রক্ত পড়ার প্রধান কারণ—এই পিত্তদোষাশ্রিত অর্শের বলির মুখের ক্ষত শুকোয় না, যেহেতু পিত্তের স্বভাবধর্ম ক্ষতকারক, সেইজন্য এই বিপর্যয়। এক্ষেত্রে কুশমূল ১০ গ্রাম আতপ চাল ধোয়া জলে চন্দনের মত ক'রে বেটে, পাতলা ন্যাকড়ায় বা ছাঁকনিতে ছে'কে নিয়ে (সেটা অন্ততঃ এক কাপ হবে) সকালে ও বৈকালে ঐ জলটাকে দুইবারে খেতে হবে। ৩/৪ দিন ব্যবহারের পর উল্লেখযোগ্য উপকার হ'চ্ছে না বুঝলে কুশমূলের মাত্রা ১৫ গ্রাম ক'রে নিতে হবে।

বাহ্য প্রয়োগ

৬। **ঘা বা ক্ষতেঃ—** ঘা বা ক্ষত হ'য়েছে দেখলেই যে কুশমূল ব্যবহার করা যাবে, তা নয়। কেবলমাত্র যে ক্ষতের প্রকৃতিটা দেখা যাচ্ছে যে, বহুমুখী অথচ সেখানে পু'জের ভাগ কম এবং সারতে বা পুরতেও চাচ্ছে না, সেখানে বুঝতে হবে—এখানে

বিকৃতপিত্তের প্রভাব বর্তমান, কেবল সেই ক্ষেত্রেই কুশমূল সিদ্ধ জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া, আর কুশমূল চন্দনের মত ক'রে বেটে ওখানে লাগানো—এই প্রক্রিয়া ক'রলে কয়েক দিনের মধ্যেই ওটা সেরে যাবে।

৭। **গায়ের দুর্গন্ধে:—** এটা সকলের গায়ে যে হয়, তা হয় না। এরা গেঞ্জি গায়ে দিলে বগলের গেঞ্জির কাছে হ'লদে দাগ হয়। আর এই প্রকৃতির লোকের যৌবনটা কিন্তু বেনো জলের মত তাড়াতাড়ি আসেও যেমন, আবার স'রে যায়ও তাড়াতাড়ি। অল্পতেই এ'রা রেগে ওঠেন। এই ধরনের লোকের প্রকৃতি পিত্তপ্রধান। এখন এই দুর্গন্ধ ও দাগটা চ'লে যায়, যদি কুশমূল বাটা মাঝে মাঝে চন্দনের মত গায়ে মাখেন। আপাতঃদৃষ্টিতে এটা সারানো হলো বটে, তবে প্রকৃতি বদলায় না, সুতরাং মাঝে মাঝে মাখতে হবে।

এতটা লেখার পরে ভাবছি—এতদঞ্চলে কুশ কি পাওয়া যাবে? এখানে আমরা সাধারণতঃ যেগুলি পাই ওগুলি কাশ (Saccharum spontaneum); কুশ হবে নিটোল গোল, তার পাতার গায়ে কোন ধার নেই। এই কুশ ভারতের উষ্ণ ও শুষ্ক অঞ্চলে পাওয়া গেলেও বিহারের গয়া এবং দ্বারভাঙ্গা জেলার অঞ্চলবিশেষে কোশী নদীর ধার বরাবর প্রচুর জন্মে। এইজন্যই এই নদীর নাম কোশী। এটির বোটানিকাল্ নাম Desmostachya bipinnata stapf., ফ্যামিলি Gramineae.

৮। **ফোড়া বসাতে:—** যাঁদের ফোড়া উঠতেও দেরী আবার পাকতেও দেরী—বুঝতে হবে এখানে বায়ু ও শ্লেষ্মার যোগ আছে। আবার এটা যদি কোমলস্থানে হয়, এক্ষেত্রে কুশমূল বেটে সামান্য গরম ক'রে ঐ ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ওটা ব'সে যায়। তবে সেটা কোমল জায়গায় না হয়ে অন্য জায়গায় হ'লে সেখানে সেক দেওয়াও চলে।

এছাড়া বিহারের আরও বহু স্থানে এটা পাওয়া যায়। তবে কুশ না পেলে তার অনুকল্প কাশমূল ব্যবহার করা ভিন্ন গত্যন্তর কি? তবে গ্রন্থে নিবদ্ধ না থাকলে আসল-নকলের চিন্তার ধারাই তো চ'লে যাবে, তাই এই মন্তব্য। যেমন, মৃগ-কস্তুরীর (Musk) যে কাজ, বনৌষধিজাত লতাকস্তুরী দিয়ে কি সেই কাজ হয়? যাক, জ্ঞাতার্থে এই আলোচনা।
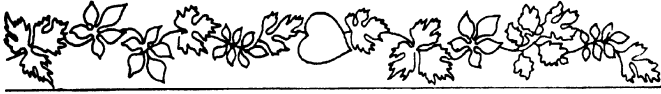
পুনর্নবা

কথাটার জট ছাড়াতে গেলে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের নিয়ে একটু নাড়াচাড়া ক'রতে হয়।

সমাজে একটা কথা চালু আছে—সধবা, বিধবা ও অধবা। প্রথমোক্তটি অবিসম্বাদী; দ্বিতীয়টি স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের করুণায় আজ বহু চোখের জল মুছে যাচ্ছে; তৃতীয়টির জট ঐ দ্বিতীয়তেই জড়িয়ে আছে, সেইটাই হ'লো পুনর্নবা বা পুনর্ভবা; তিনি যেটা ব'লেছিলেন সেটা হ'লো—অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে পুনর্বিবাহ নিশ্চয়ই দেওয়া যেতে পারে; অবশ্য সেটাও বর্তমান সমাজ এবং সরকারও মেনে নিয়েছেন; তাই সেই পুনর্নবার জীবনারম্ভকে উপলক্ষ্য ক'রেই বোধ হয় সে-যুগের সমাজ-সংস্কারের নথি-ভুক্ত যাজ্ঞবল্কে ও পরাশর সংহিতায় নির্দেশ দেওয়া আছে। এ সম্বন্ধে গাঁয়ের খুড়োর অবোধ পুরাণের ভাষ্য হ'লো— 'আছে গরু না বয় হাল', সেই হ'ল অধবা।

আমার বর্তমানের বক্তব্য কিন্তু সেই পুনর্নবা বা পুনর্ভবা শব্দটির তাৎপর্য নিয়ে, তাও সেটা ভৈষজ্যবিধানের একটি বনৌষধিকে কেন্দ্র ক'রে, সামাজিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে নয়। ভৈষজ্যবিধানেও সেই তুলনাকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করা হ'য়েছে; আজ থেকে কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে, সেটার নজির হ'লো—

> ত্বং বর্ষকেতুঃ সূর্য্যস্য আহ্নিকগতেঃ বর্ষসংজ্ঞায়াঃ কেতনং কেতুরিতি
> শেষে মাতুর্যথোপস্থেঽন্তরস্যাং পুনরায়ুষা॥
> (অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ১২।৪।১৫)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> ত্বং বর্ষকেতুঃ সূর্য্যস্য আহ্নিকগতেঃ বর্ষসংজ্ঞায়াঃ কেতনং কেতুরিতি
> সূর্য্যরশ্মিঃ (ঋক্ ১।৫০।২) ত্বং অপশ্চ পৃথিবীং চ সদনমাসদ্য

জলভূমিরূপং প্রাপ্য পুনরপি জাগ্রতা পুনশ্চ মাতুর্যথোপস্থে=উৎসঙ্গে অস্যাং অন্তঃ=শেষে স্বপিষি, পুনরায়ুষা সহ ভবসি অতঃ পুনর্নবা ইতি—

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—তুমি সূর্যের আহ্নিকগতির বর্ষসংজ্ঞাকে সূচিত কর, তাই তুমি বর্ষকেতু; কেতু যে সূর্যরশ্মি একথা ঋক্‌বেদে আছে (১।৫০।২), তুমি

জল ও পৃথিবীর গৃহে আগমন কর—যেমন মাতৃঅংকে আগমন ক'রে নিদ্রিত হয়, আবার নিজের আয়ুর সঙ্গেই জেগে ওঠে, তেমনি তুমিও পুনর্নবা হ'য়ে এসো বর্ষারম্ভে।

বৈদিক তথ্য থেকে কি পাওয়া গেল—

(১) তুমি বর্ষকেতু অর্থাৎ সূর্যের আহ্নিকগতির মধ্যে থেকেই বর্ষ-পরিক্রমা কর,

তারই বিবর্তনে আসে জীবজগতের ও বৃক্ষজগতের নবজীবন।

এর আর একটি অর্থ সূচিত করে যে, তুমি সূর্যের আহ্নিকগতির বর্ষসংজ্ঞাকে সূচিত কর, তাই বর্ষকেতু।
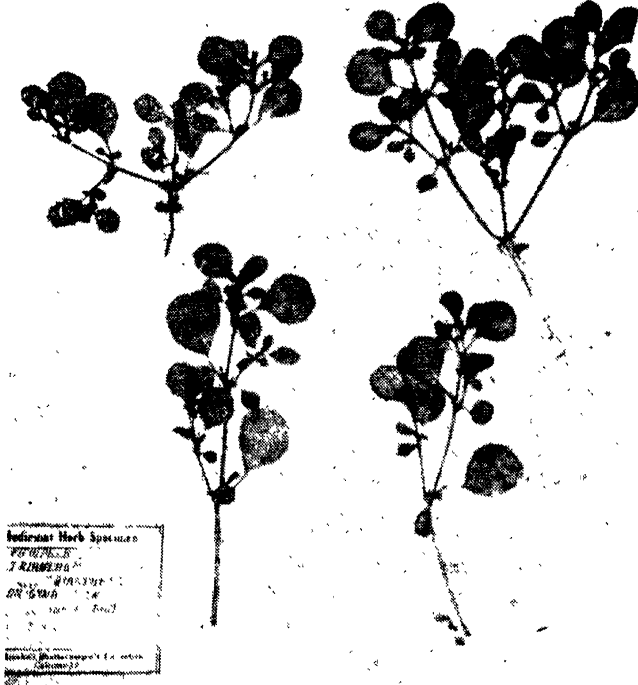
(২) তুমি জল ও পৃথিবীর গৃহে আগমন কর, যেমন মাতৃঅঙ্কে আগমন ক'রে নিদ্রিত হয়। এইখানেই চরকীয় চিন্তাধারায় তার উৎসের সন্ধান পেয়েছিলেন সংহিতাকারগণ; তাই তাঁরা অপ্‌ধাতু ও পৃথিবগুণের বিকারে যেখানে রোগ সৃষ্টি হয়, সেই সেই রোগে এই পুনর্নবা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত ক'রেছেন। আর ব্যবহার ক'রেছেন শোথে (oedema), কাসরোগে, রসায়নে, কুষ্ঠে, বিরেচনে, মূত্রকৃচ্ছ্রে, হৃদ্‌রোগে ও বিষরোগে। এ সবের উল্লেখ আছে সুশ্রুতের সূত্রস্থানে, সমগ্র চিকিৎসাস্থানের উপরিউক্ত রোগোৎপত্তির ক্ষেত্রে।

পরিচিতি

পুনর্নবা ব'ললে কোন্ গাছটিকে গ্রহণ করা হবে এইটাই প্রথম বিচার্য। ভারতের বাংলা দেশে পুনর্নবা ব'লে যেটির ব্যবহার হয়, সেটি প্রধানভাবে বর্ষারম্ভে বের হয়; এই কালেই তার বাড়-বাড়ন্ত; স্বল্প প্রসারণী এবং ভূলুণ্ঠিতা লতা, পাতা প্রায় গোল, নরম ও মাংসল, গাছের ডাঁটাও খুব শক্ত নয়, নরমই বলা যেতে পারে। সাদা ও হালকা গোলাপী রংয়ের ২ রকম ফুল হ'তে দেখা যায়। গাছ ২/৩ বৎসরও বেঁচে থাকে—যদি জমি সরস ও উর্বর হয়। এর বীজ দেখতে অনেকটা পাটের বীজের মত। নিচু (নিম্ন) জমিতে এ গাছ হয় না, যে জমিতে ঘাস বেশী সেখানেও এর বৃদ্ধি হ'তে চায় না; তবে বেলে বা দো-আঁশ মাটিতে দেড়/দু'হাত ব্যাস নিয়ে এক-একটা গাছ হ'তে দেখা যায়।

একটু শীতপ্রধান জায়গায় গাছের ডাঁটায় ও পাতায় খুব সূক্ষ্ম রোমাবৃত হ'তে দেখা যায়। বাংলার বৈদ্যকগণ পরম্পরায় এইটিকেই পুনর্নবা ব'লে ব্যবহার ক'রে আসছেন প্রস্রাবকারক ও শোথনাশক ওষধি হিসেবে। বর্তমানে এই গাছটির বোটানিকাল্ নাম Trianthema portulacastrum Linn., পূর্বে এটির নাম ছিল Trianthema monogyna., ফ্যামিলি Ficoidaceae.

আর এক প্রকার রক্তপুনর্নবার গাছ সারা বৎসরই দেখা যায়—এর পাতা ও ডাঁটা লালচে, এমনকি ফুলও লালচে (রক্তাভ) হয়; এটি ফলপাকান্ত গাছ নয় অর্থাৎ বীজ হ'লেই ম'রে যায় না। অনেক সময় লতাগুলি শুকিয়ে গেলেও মূল শুকিয়ে যায় না, গাছের গোড়ার উপরাংশ থেকে পুনরায় নূতন লতা গজিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার ক'রলে পুনর্নবা নামকরণটা একেবারে যে নিরর্থক—একথা বলা যায় না। তবে এটা ঠিক—বর্ষাভূর মত এর পাতা পুরু নয় এবং গোলও নয়।

পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের প্রতিবেদনে দেখা যায়—এই রক্তপুনর্নবার প্রধানতঃ ৩টি Var. অর্থাৎ Variety আছে, আসলে এগুলি দেখতে প্রায় একই রকম। ঘন শাখাযুক্ত লতানে গাছ, শিকড় মোটা, মূল শিকড় বেশ শক্ত। লতাটির প্রত্যেক শাখাসন্ধিতে জোড়া জোড়া ডিম্বাকৃতি পাতা হয়, তবে সর্বভারতীয় ভেষজ কমিটির সিদ্ধান্ত হ'লো—পুনর্নবার ক্ষেত্রে এই রক্তপুষ্পটাই ব্যবহার করা উচিত। এই গাছটির বোটানিকাল্ নাম Boerhaavia diffusa Linn., ফ্যামিলি Nyctaginaceae.

ঔষধার্থে ব্যবহার—সমগ্র উদ্ভিদ, বিশেষতঃ মূল; স্বরসের মাত্রা ৪ থেকে ৬ চা-চামচ। ক্বাথ ক'রে খাওয়ার দরকার হ'লে ১৫/২০ গ্রাম শুষ্ক গাছ ৪ কাপ জলে সিদ্ধ

ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে সেই ক্বাথটা ব্যবহার ক'রতে হবে।

রোগ প্রতিকারে

১। **পুরাতন বাত-কাসিতে:—** এই কাসির বৈশিষ্ট্য হ'লো—কফ ওঠে না অথচ কাসি হ'তে থাকে, এক্ষেত্রে পুনর্নবার রস ৪ চা-চামচ গরম ক'রে সেই রস সকালে খেতে হয়, এটা বৈকালেও আর একবার খেলে ভাল হয়। এটাতে কয়েকদিনের মধ্যে নিরাময হবে।

২। **শুক্রতারল্যে:—** আসন্ন যৌবনের পথে একটু হাঁটার পর স্বকৃত দোষে যদি এই অসুবিধেটা আসে, তাহ'লে এই পাতার রস উপরিউক্ত মাত্রায় দু'বেলা একটু গরম ক'রে খেতে হবে। তা হ'লে ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৩। **অশ্মরী রোগে**(Calculi):—মূত্রথলীতে পাথুরী হলে শুষ্ক পুনর্নবা ১০/১২ গ্রাম, জল ৫/৬ কাপ দিয়ে সিদ্ধ ক'রে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে ঐ ক্বাথটা সকালে-বৈকালে দু'বারে খেতে হবে।

৪। **শোথে:—** সে হৃদ্‌রোগজনিতই হোক আর মূত্রকৃচ্ছ্রতাজনিতই হোক, সেক্ষেত্রে মূল সমেত সাদা পুনর্নবা ২৫ গ্রাম আর আদা ৩/৪ গ্রাম একসঙ্গে ৩/৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সকালে ও বৈকালে দু'বারে খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ ফুলো ক'মে যাবে।

৫। **ই'দুর বা ক্ষ্যাপা কুকুরে কামড়ালে:—** পুনর্নবার মূল আন্দাজ ১০/১২ গ্রাম ও শোধিত ধুতরো বীজ মাত্র দু'টি (বীজ দুধে সিদ্ধ ক'রে, সেটা রৌদ্রে শুকিয়ে নিলেই শোধন করা হ'লো) একসঙ্গে বেটে খাইয়ে দিতে হয় (এই শোধিত বীজ কোন বৈদ্যের কাছ থেকে সংগ্রহ করা উচিত)।

৬। **বেতালা নেশায়:—** মদের নেশা, আর তাল সামলানো যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে মূল সমেত পুনর্নবার রস ৭/৮ চা-চামচ, একটু গরম ক'রে তার সঙ্গে ৭/৮ চা-চামচ দুধ ও ৩/৪ চা-চামচ গাওয়া ঘি মিশিয়ে খেতে দিলে ঐ নেশা ছুটে যাবে।

৭। **উরঃক্ষতে:—** বুকে ব্যথা, মাঝে মাঝে রক্তও ওঠে, সেক্ষেত্রে মূল সমেত পুনর্নবা ১২ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে প্রত্যহ খাওয়ালে বুকে ব্যথাও ক'মবে, রক্তওঠাও বন্ধ হবে।

৮। **অনিদ্রায়** (Insomnia):—বহু কারণে অনিদ্রা হ'তে পারে কিন্তু তার মূলে থাকবে কোন না কোন স্রোতপথে বায়ুর খরতা; সে মূত্রগ্রন্থিতে বিকারপ্রাপ্ত হ'লেও হবে, আবার রক্তস্রোতে বিকারগ্রস্ত হ'লেও হবে, আবার মনোবহ স্রোত বিকারগ্রস্ত হ'লেও হবে; সুতরাং মূল সূত্র একটিই থাকলো—বায়ু বিকারগ্রস্ত হওয়া।

এক্ষেত্রে মূল সমেত পুনর্নবা ১৫/২০ গ্রাম নিয়ে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে, এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সকালে ও বৈকালে দুইবারে সবটা খেয়ে দেখুন। এটাতে বায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে; তার ফলে অনিদ্রাও দূর হবে।

৯। **ঘুস্‌ঘুসে বা চাতুর্থক জ্বরে:—** যে জ্বর তিন সপ্তাহের মধ্যে আসছে, যাচ্ছে বা থাকছে—এ সংজ্ঞায় সে পড়ে না, কিন্তু জ্বর যদি মাঝে মাঝে হ'তে থাকে

বা চাতুর্থক জ্বর বা পালাজ্বরে (যে জ্বর তিন দিন বাদে আসে) দাঁড়ায়, সেখানে বুঝতে হবে—বায়ু রসবহ স্রোতে বিকারগ্রস্ত হ'য়েছে, সুতরাং এই বায়ুকে স্বাভাবিক ক'রে দিলেই এই জ্বর সেরে যাবে, তারই জন্য মূল সমেত গাছ কুচিয়ে থেঁতো ক'রে, কাঁচা হ'লে ২০/২৫ গ্রাম, আর শুকনো (শুষ্ক) হ'লে ১০/১২ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে সকালে ও বৈকালে দুইবারে খেতে হবে। এর দ্বারা বিকৃত বায়ু আবার স্বাভাবিক হ'য়ে ঐ জ্বরকে নিরাময় ক'রবে।

১০। **শীতপিত্তে** (Urticaria):— হঠাৎ সমস্ত গায়ে ছোট-বড় চাকা চাকা হ'য়ে ফুলে ওঠে, চুলকোতে থাকে এবং দেখা যায় গরম কোন কিছু গায়ে চাপা দিলে আরাম হয়, চুলকোনো ও ফুলো দুই-ই ক'মে যায়, এই যে ক্ষেত্র—এক্ষেত্রে ১৫/২০ গ্রাম মূল সমেত পুনর্নবা ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে কিছুদিন খেলে ঐ এলার্জি হওয়ার প্রবণতাটা চ'লে যাবে।

১১। **সর্বাঙ্গ শোথে:—** কিড্‌নী (বৃক্ক) ভাল কাজ না ক'রলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শোথটার কারণ হয়; এর মূলে থাকে অগ্নিমান্দ্য; তারই পরিণতিতে শরীরে আমরস অর্থাৎ অপক্করসের সৃষ্টি, যার ফলে বায়ুর সঞ্চরণশীলতা ব্যাহত হয়, তাই দেখা দেয় ফুলো, সেটা শরীরের যেকোন স্থানেই হ'তে পারে। এক্ষেত্রে পুনর্নবার পাতার গুঁড়ো, অথবা এর ক্বাথ, আর কাঁচা পেলে তার রস আটায় মিশিয়ে রুটি করে খাওয়া। পাতার গুঁড়ো নিলে অন্ততঃ ৭/৮ গ্রাম আর ক্বাথ ক'রে নিলে ১০/১৫ গ্রাম ৩ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আধ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে নিয়ে সেই ক্বাথ দিয়ে আটা মাখা, অথবা যদি কাঁচা গাছের রস পাওয়া যায় তো ৭/৮ চা-চামচ নিতে হবে। এই সময় ভাত না খাওয়াই ভাল, আর লবণটা বর্জন ক'রলে আর কথাই নেই।

১২। **বাতকণ্টক রোগে** (Sprain of the ankle joint):— এটা মাংসবহ স্রোতপথে বায়ুর বিকারে সৃষ্টি হয়। প্রকুপিত বায়ু গুলফ্ দেশে আশ্রয় নিলে এবং অসতর্কভাবে চলাফেরা বা অধিক পথ একসঙ্গে হাঁটলে গোড়ালিতে খুব বেদনা হয়, চলাফেরায় খুব কষ্ট হয়, মাঝে মাঝে মোচড় দিচ্ছে; এক্ষেত্রে মূল সমেত শ্বেত পুনর্নবা, কাঁচা হ'লে ১০/১৫ গ্রাম আর শুষ্ক হ'লে ৫/৭ গ্রাম, ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে ঐ ক্বাথটা সকালে ও বৈকালে দু'বারে খেতে হবে, আর সম্ভব হ'লে ঐ ক্বাথ দিয়ে তেল তৈরী ক'রে ঐ সব পেশীতে আস্তে আস্তে মালিশ করলে ওটা সেরে যাবে।

১৩। **সুতো ক্রিমিতে** (Thread worms) :— এ কোন বয়সের অপেক্ষা করে না, সব বয়সেই এই ক্ষুদ্র প্রাণীটি বিব্রত করে—না বের ক'রে দেওয়া যায়, না তাকে মারা যায়। তাই উচিত হ'লো দাস্ত যাতে পরিষ্কার থাকে তার ব্যবস্থা করা; মিষ্টি বেশী না খাওয়া আর পুনর্নবা (গাছে মূলে) ৫/৭ গ্রাম ৩ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে ৭/৮ দিন খেতে হয়, তবে কাঁচা হলে দ্বিগুণ মাত্রা আর বালকের মাত্রা বয়সানুপাতে।

বাহ্য প্রয়োগ

১৪। **হুলের জ্বালায়:—** বিছে বা ভীমরুল অথবা বোল্‌তা এমন-কি বিষাক্ত কীটে হুল ফুটিয়েছে—এই হুলের জ্বালার অভিজ্ঞতা হয়তো অনেকের আছে, যাঁর এ

অভিজ্ঞতা হয়নি, তিনি যদি কখনও বিপাকে পড়েন, তা'হ'লে পুনর্নবার রস ক'রে ওখানে লাগিয়ে দিয়ে দেখবেন, জ্বালার তীব্রতাটা ক'মে যাবে।

১৫। **ফুলোয়ঃ—** প্রস্রাব পরিষ্কার করানোটা দরকার—সেটা ঠিকই, এর সঙ্গে এই পুনর্নবা বেটে, একটু গরম ক'রে ঐ ফুলোয় লাগিয়ে দিলে ফুলোর আড়ষ্ট ভাবটা চ'লে যাবে। তবে বেলা ৯টার পর তিনটের মধ্যে প্রলেপ ব্যবহার করার বিধি।

এই নিবন্ধটি প'ড়ে আপনি নবীন হবেন কি নবীনা হবেন সেকথা ব'লছি না, তবে একটা কথা ভাবছি—সাপ খোলস ছেড়ে নবীন হয়, গাছপালার পাতা ঝ'রে সেও নবীন সাজে সাজে, বর্ষার পরে মাছেরও রূপ ফেরে, আর আমরাও রোজই ইচ্ছে করি নতুন হই; তাইতো নিত্য নতুন সাজে সাজি ও মাখি, সেটাই তো আমাদের অন্তরের চাহিদা; তাই আজীবনই চেষ্টা থাকে পুনর্নবার প্রয়াস—কি আহারে কি বিহারে; তবে হ্যাঁ, ক্ষেত্র অনুকূল হ'লেই তবে না তার বিকাশ! তবে যে অকালে সেটাকে দিতে পারে, সেই তো পুনর্নবা—বৈদিক সমীক্ষার রহস্য এইখানেই।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Alkaloid, viz., punarnavine, other unidentified bases. (b) Fatty alcohol. (c) Sterols, β-sitosterol, α-sitosterol.

মূলক (মূলা)

প্রতি যোজনে (অন্যূন ৩০ কিলোমিটার) মানুষের ভাষা কিছু না কিছু রূপান্তরিত যে হ'য়েছে, এটা তো আমরা সর্বদা দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু কিছু না হ'লেও উচ্চারণের

বিভিন্নতা তো উপলব্ধি করি।

এ প্রশ্ন মনে জাগে—বৈদিক সভ্যতা যখন এদেশে পেণছেছে, তখন এদেশে লোক ছিল না তাই বা হয় কি ক'রে; তা'হলে যে ভাষায় আমাদের মন জয় ক'রেছিলেন সে ভাষাকে আমরা বলি বৈদিক ভাষা, অবশ্য এদেশে তাঁরা মুষ্টিমেয়ই তো এসেছিলেন; যার জন্য প্রতি প্রদেশে প্রাকৃত ভাষার আদান-প্রদান বন্ধ হয়নি; যার ফলে বৈদিক শব্দনামগুলি সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হ'লেও তাঁরা প্রাকৃত ভাষাকে উপেক্ষা করেননি, তাই আমাদের বৃক্ষলতাদির নামগুলি এক এক প্রদেশে এক এক রকম।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্র যখন থেকে এদেশে শিকড় গেড়েছে, সেটার মাধ্যম ছিল বেদভাষা; সেটাও কিন্তু সংস্কার করে সংস্কৃত হ'য়েছে, কিন্তু সে ভাষা শিক্ষা ক'রেছিলেন প্রতি প্রদেশের কিছু সংখ্যক লোক; তাই আমরা এখন প্রতি পদে অসুবিধেয় প'ড়ে যাই, যখন আমাদের এই বনৌষধির পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করি। তবে একথা অস্বীকার ক'রতে পারি না যে, নাগার্জুনের কালে এসে তাঁদের ব্যবহৃত দ্রব্যগুলি একই নামে প্রচারিত হ'য়েছে, যেমন পারদ, গন্ধক সর্বভারতেই একই নাম। কিন্তু একটা গাছকে নিয়ে প্রতি প্রদেশে ঘুরে বেড়ালে দেখবেন পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিচিত, তবে ইদানীন্তন যুগে যখন থেকে পাশ্চাত্য প্রভাব আমাদের উপর পড়েছে, তখন থেকে

আমরা এক নামেই বনৌষধিটিকে চিনতে আরম্ভ ক'রেছি এবং চিনে নেওয়ার সে বিজ্ঞানটার ধারাও একেবারে পৃথক। এই শাস্ত্রের নামই বোটানী, আর আমাদের প্রাচীন বোটানীটার উৎকর্ষ সাধিত হ'য়েছে সংহিতার যুগে।

যাক, আলোচ্য বনৌষধিটির একটি বৈশিষ্ট্য যে আছে, সেটা কবির চোখ এড়ায়নি, তাই কবি নির্বাক মূলোকে দেখে অকৃতজ্ঞ লোকের সঙ্গে তুলনামূলক উপমা দিয়েছেন—

বীজাৎ জন্ম বিলভ্যাপি সর্ব্বেষাং মূলতঃ স্থিতিঃ।
তথাপি ভিন্ন নামানি মূলকং তু মমৈবহি॥

এই শ্লোকটির অর্থ হ'চ্ছে—সবারই জন্ম বীজ থেকে, অথচ মূলে স্থিতিও সবারই, কিন্তু এমনি তারা অকৃতজ্ঞ যে, মূলের নামে কেউই পরিচিত হ'তে চায় না, সবাই ভিন্ন নামে নিজের পরিচয় দেয়; আমি কিন্তু অকৃতজ্ঞ নই, তাই আজও আমার নাম মূলকম্।

সত্যই তো, সেই যে কত অতীতে অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পে এই ভেষজটির নাম মলকং বলে চিহ্নিত করা হ'য়েছে, তা আজও ভারতের আর্যধারার অনুবর্তিগণ মূলকং বা মূলা ব'লেই তাকে জানেন। বেদে যদিও মলকং অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে আদি সংজ্ঞা ভূমিই মল এবং তাই যখন বিশেষ দ্রব্য হয়, তখন তার নাম 'মলকং'। সেই মলকংই পরে মূলকং বা মূলা নামে খ্যাত হ'য়েছে।

পরবর্তী সংহিতাকারগণ ঐ মূলকং নামেই রোগের ক্ষেত্রে উল্লেখ ক'রেছেন।

আদি বেদসূক্ত

উর্জো নর্পাৎ সুশস্তিভিঃ মলকং মন্দস্ব ধীতিভির্হিতম।
ত্বে ইষঃ সন্দধুর্ভূমিং মাতরা বিচরণ্ ভানুনা অনুন বর্চা॥
(অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ৫।৩৯২।৬২)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

ন পাৎ ইতি ন পাতয়তি নাশয়তি, উর্জো উর্ক্ অন্নস্য ন পাৎ, ধীতিভিঃ=কর্মাভিঃ=শক্তিভিঃ স্তুতিভিঃ কৃত্বা ত্বং মন্দস্ব=মোদস্ব =হৃষ্টঃ ত্বে ত্বয়ি ইষঃ হৃষ্টঃ কার্য্যঃ, সন্দধুঃ জুহুবঃ ভূমিং ভানুনা বিচরণ্ অনুন বর্চা, অহীনং বর্চঃ যস্য পূর্ণশক্তিঃ রসস্রোতসাং ত্বং বিচরণ্ এব তিষ্ঠসি, তত এবং মলং মূলকমিতি, অতঃ অপি মলং সংজ্ঞায়াং কন্। ভানুনা বর্চ অনুনবর্চা ইতি প্রাশস্তাৎ। স্মৃতৌতু বর্জনীয়ং সদা মাঘে মূলকং মদিরা-সমম্। বিষজাত মদ্যমিব।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—অন্নের বলকে তুমি বিনষ্ট কর না, এই প্রশস্তির দ্বারা তুমি হৃষ্ট হও। তোমাতে ভানুর পূর্ণ শক্তি, তোমার রস স্রোতে বিচরণ করে; তোমার মলই সংজ্ঞাবিধায়ক, তাই সেটির মূলশক্তির কর্ম থাকে রসধারায়। ভানুর হ্রাস-বৃদ্ধি তোমার প্রাশস্তি সম্পন্ন করে।

স্মৃতি গ্রন্থে এইজন্য মাঘে মূলক বর্জনীয়, তখন মূলক রস বিষজাত মদিরার ন্যায়।

এই সূক্ত ভাষ্যটিতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে—আহার্যে ও ভৈষজ্যে মূলোর ব্যবহার খুব প্রাচীন। সংহিতাকারদের মধ্যে চরক সংহিতাকার এই মূলক ভেষজটিকে আহারীয় ও ভেষজীয় ক্ষেত্রে সমভাবেই গ্রহণ ক'রেছেন। মাঘ মাসের সূর্যকিরণে মূলোর একটা বিশিষ্ট প্রভাবশক্তি সঞ্চারিত হয়—যার ফলে স্মৃতির ব্যবস্থায় এই মাসে মূলো খেতে নেই। অবশ্য আমাদের অনেকেই সেটা পালন করি। এখন দেখা যাচ্ছে—এটা খুবই বিজ্ঞানসম্মত প্রচলিত রীতি। এই মাসে সূর্যের কিরণে প্রতিটি মৌলধর্মে তার রসের মধ্যে বিবর্তন নিশ্চয়ই আসে। বসন্ত ঋতুর সর্বাধিক প্রভাব এই সময়েই সুরু হয়ে যায়। বৃক্ষলতাদির মধ্যে তার বিশেষ বিবর্তন না এলে নতুন ক'রে ফুল, ফল ও কচি পাতার সমাগম হয় কি ক'রে? এই জন্য চরকের অভিমত (কল্পস্থান) পৌষের পর গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত এই সময়ের অধিকাংশ দিনে ভেষজের মূল নেওয়া উচিত নয়। নিশ্চয়ই কোন মৌল কারণ থাকাটা অসম্ভব নয়।

তাছাড়া এই মূলোর যে একটা নিজস্ব শক্তির বিবর্তন ঘটে ঋতু বিশেষে, তা স্পষ্ট বোঝা যায় চরকের আর একটি উক্তিতে—

> বালং দোষহরং বৃদ্ধং ত্রিদোষং। স্নিগ্ধসিক্তং, মারুতাপহম্।
> বিশুষ্কং তু মূলকং কফবাতজিৎ।

অর্থাৎ কচি মূলো ত্রিদোষ নাশক, পাকা মূলো তার বিপরীত (মাঘেই সেটা পাকতে সুরু হয়); স্নেহযুক্ত সিদ্ধ মূলো বায়ুনাশক আর (শুষ্ক) শুক্নো মূলো বাত-শ্লেষ্মা দূর করে। এই শ্লোকেই নিহিত আছে—মূলোর রসের রাসায়নিক বিবর্তনের ধর্ম কখন কি ভাবে হয়।

এই মূলোর মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ শক্তির বিবর্তন হয় তার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে—সুশ্রুত সংহিতার সূত্রস্থানের ৪০ এবং ৪৫ অধ্যায়ে।

এই মূলোর ভৈষজ্য শক্তি সম্পর্কে চরকের চিকিৎসাস্থানের নবম অধ্যায়ে অর্শে (piles), দশম অধ্যায়ে প্রবাহিকায় (Dysentery), একাদশ অধ্যায়ে গ্রন্থিবীসর্পে, ১৭ অধ্যায়ে শোথে (oedema) ব্যবহারের উল্লেখ। তবে সর্বত্রই শুকনো মূলোর ব্যবহার অর্থাৎ কচি মূলো শুকিয়ে রেখে সেটাকেই ভৈষজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া আছে।

পরিচিতি

এই কন্দ শাকটির পরিচিতির প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না, যেহেতু এটি ভারতের প্রায় সর্বত্রই শাক ও তরকারি হিসেবে ব্যবহারের জন্য চাষ হয়। শীতপ্রধান অঞ্চলে ১২ মাস চাষ হয়, ৮/১০ হাজার ফুট উচ্চতায়ও চাষ হ'য়ে থাকে; তবে উষ্ণ-প্রধান অঞ্চলে কেবল মাত্র শীতকালেই চাষ হয়। জৌনপুর অঞ্চলের এক একটি মূলো মানুষের উরুর মতও মোটা হতে দেখা যায়; হয়তো আবহাওয়া ও মাটির জন্যই এর এতটা বাড়-বৃদ্ধি। পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিজ্ঞানীগণ বলেন—লাল রংয়ের মূলো নাকি বৃটেন থেকে এসেছে।

শীতের শেষে মূলো গাছে ফুল, তারপর সরষের মত শুঁটি ও বীজ হয়। এই বীজ

থেকে পুনরায় চাষ হ'য়ে থাকে। এটির বোটানিকাল্ নাম Rephanus Sativus Linn., ফ্যামিলি, Cruciferae. হিন্দিভাষী অঞ্চলে একে মূলী বলে।

ব্যবহারোপযোগী অংশ—পাতা, মূল, ফুল ও বীজ।

লোকায়তিক ব্যবহার

১। **শোথে:—** শোথ হ'লেই যে মূলোয় উপকার হবে তা নয়; যে শোথে কফের প্রাধান্য থাকবে, সেখানেই কেবল এটায় উপকার হয়। এটা যে কফজ শোথ, তার লক্ষণ হ'লো—যেখানে শোথ হ'য়েছে, সেখানে টিপে দিলে ব'সে যায় আর সেটা স্বাভাবিক হ'তে একটু দেরী হয়। এই শোথে শুকনো মূলো ২০ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে, সেই ক্বাথটা দু'বেলায় খেতে হবে। একটা কথা জেনে রাখুন—এলার্জি ব'লে এখন যেটা প্রচলিত, সেটা আমাদের সংসর্গজ শোথ, এক্ষেত্রে উপরিউক্ত মুষ্টিযোগটি বিশেষ উপকারী।

২। **হিক্কায়:—** খাদ্যনালীতে কোন উত্তেজক দ্রব্যের সংস্পর্শ হলেই হিক্কার উদ্রেক হয়, যাঁদের হৃদ্‌দৌর্বল্য থাকে, তাঁদের এই হিক্কার সঙ্গে শ্বাসেরও টান দেখা দেয়, যদিও সেটা সাময়িক। এই সময় একটু শুকনো মূলার ক্বাথ ক'রে চুমুক দিলে ওটা ক'মে যাবে; শুকনো মূলার পরিমাণ ৫/৭ গ্রাম, জল ২ কাপ, সিদ্ধ হওয়ার পর থাকবে এক কাপ। সেটা ছেঁকে নিয়ে ৫/৬ বারে একটু একটু ক'রে খেতে হবে।

৩। **আমাশায়:—** এর সঙ্গে প্রবল কোঁথানি, এক্ষেত্রে শুকনো মূলো ১০ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে সমস্তদিনে ৪/৫ বারে ঐ ক্বাথটা খেতে হবে, এর দ্বারা ঐ কোঁথানি সেইদিনই চ'লে যাবে আর আমাশাটা দুই-একদিনের মধ্যেই আরোগ্য হবে।

৪। **বাতজ্বরে:—** এ জ্বরে কাঁপুনি থাকবে আর তার সঙ্গে বক্‌বক্ করার প্রবণতা ও চেঁচামেচিও বাড়ে এবং সঙ্গে থাকে মুষ্কে যন্ত্রণা (অবশ্য পুরুষ হ'লে)।

এক্ষেত্রে কচি মূলো ৫০ গ্রাম আন্দাজ ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে সেই যূষটা কয়েকবারে একটু একটু ক'রে খেতে দিলে ঐ বাতজ্বরের উপসর্গগুলির উপশম হবে। তবে জ্বরের চিকিৎসা পৃথক ক'রতে হবে।

৫। **মূত্রকৃচ্ছ্রে:—** যে কৃচ্ছ্রতা বায়ু জন্য এসেছে, সেক্ষেত্রে এর লক্ষণ হ'লো—অল্প অল্প প্রস্রাব হয়, দাঁড়িয়ে বা ব'সে যেভাবে প্রস্রাব ক'রতে যান না কেন, কোনটাতেই সুবিধে হ'চ্ছে না, এক্ষেত্রে মূলার বীজচূর্ণ এক বা দেড় গ্রাম জল দিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে। এটি ব্যবহার ক'রলে আর একটি রোগকে আটকে দেওয়া যায়—সেটি হ'লো পাথুরী রোগ।

৬। **কষ্ট রজে:—** মাসিক ঋতুস্রাব হওয়ার প্রাক্‌কালে কোমরে বা তলপেটে অসম্ভব যন্ত্রণা এবং স্রাবের স্বল্পতা, কোন কোন সময় মাথায় যন্ত্রণা, মুখেও অরুচি, এই অবস্থায় পড়লে মূলোর বীজচূর্ণ এক বা দেড় গ্রাম জলসহ সকালে ও বৈকালে কিছু খাওয়ার পর খেতে হবে।

৭। **পাথুরী রোগে:—** মূত্রথলিতে হবে যে পাথুরী, কেবলমাত্র সেইখানেই কাজ ক'রবে; এই মুষ্টিযোগটি আরও ভাল হয় যদি মূলাশাক বেটে রস ক'রে সেটাকে

একটু গরম ক'রে সকালে ও বৈকালে দু'বার জল মিশিয়ে খাওয়া যায়, রসের মাত্রা ৩/৪ চা-চামচ।

৮। **ছুলিতে :—** দেশগাঁয়ে একে বলে ধুলোটে ছুলি, একটু র'গড়ে দিলে ধুলোর মত পড়ে, এই রোগকে আয়ুর্বেদে বলা হয় "সিধ্ম কুষ্ঠ"। এক্ষেত্রে মূলো বীজ ৫/৭ গ্রাম জলে বেটে গায়ে চন্দনের মত লাগাতে হয়, এর দ্বারা আপাতঃদৃষ্টিতে ঐ ছুলিটা মিলিয়ে যাবে।

৯। **কান কট্‌কটানিতে :—** এ রোগ ঊর্ধ্বগত বায়ুতে পুঁজ শুকিয়ে গিয়েও হয়, আবার কানের পরদায় যে স্নেহপদার্থ থাকে—সেটাও এই বায়ুবিকারে শুকিয়ে তার জন্যও হয়। এই পরিস্থিতিতে মূলার রস একটু গরম ক'রে দুই / এক ফোঁটা ক'রে দু'বেলা কানে দিতে হয় আর কাঁচা মূলো না পাওয়া গেলে শুকনো মূলো জলে সিদ্ধ ক'রে একটু চেপে অথবা একটু থে'তো ক'রে, নিংড়ে ঐ রস দুই / এক ফোঁটা কানে দিলে ঐ কট্‌কটানি সেরে যাবে।

আজ এই ভেষজটার সমীক্ষার ইতি ক'রতে ব'সে মনে হ'লো—মূল থেকে মূলো আর তুল থেকে তুলো, তা'হলে ছুঁচ থেকে কি ছুঁচো হ'লো? এ প্রশ্ন খুড়ো যে আমায় করেনি তা নয়, তবে যখন বদ্যি হইনি তখন রাঙা মূলার তুলনা ঝুড়ি ঝুড়ি শুনেছি, যখন বদ্যি হ'লাম তখন মূলা শুকিয়ে গেল—দেখলাম এইটাই তো আমার আসল রূপ। তাই বৈদ্যকের কাছে রাঙার থেকে শুকনোর কদর বেশী।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Carbohydrates, Protein. (b) Glucoside, enzyme and methyl mercaptan. (c) Ascorbic acid, Vitamin-A, Thiamine, Riboflavin, Nicotinic acid, Vitamin-C.

আত্মগুপ্তা (আলকুশী)

"আত্মনাং সততং রক্ষেৎ" ব'লে আমরা প্রায়ই আওড়ে থাকি কিন্তু কোথা থেকে কথাটা এলো এবং কেন এলো সেটা আমরা অনেকেই তো জানি না।

তবে সমাজ-জীবনে তিনটি নীতিকে মেনে চলা উচিত—(১) আত্মরক্ষা, (২) আত্মগুপ্তি ও (৩) আত্মকর্ম। প্রাণীজগতে এমন-কি জড়জগতের সকলেই প্রকৃতিদত্ত নির্দেশেই চালিত হ'য়ে থাকে এবং প্রকৃতিই তাকে আত্মরক্ষার অস্ত্রও দান ক'রে থাকে; কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রাণী ব'লে মানুষ নিজেকে ছাড়া সকলকেই অবজ্ঞা করে।

আর একটা কথা—প্রাণী মাত্রেরই স্বভাব-প্রবৃত্তি ভোজন, রমণ ও শয়ন; কয়েকটি প্রাণী ভিন্ন অধিকাংশ প্রাণী, কি অন্তশ্চেতনাবান আর কি বহিশ্চেতনাবান, সকলেরই রমণের একটা নির্দিষ্ট মান আছে এবং সময়ও আছে। এইসব তথ্য আপনিও গভীর-ভাবে সমীক্ষা ক'রলে বুঝতে পারবেন।

তবে এটা সত্যি যে, আমাদের সভ্যতা যখন গ'ড়ে উঠেছিল, তখন প্রাণীজগতের কাছ থেকেও অনেক তথ্য পাওয়া গেছে, যেগুলিকে সমাজ-জীবনে কাজে লাগানো হ'য়েছে মানব-কল্যাণে। ঋষি-চিকিৎসক সম্প্রদায় তাকে আমাদের কল্যাণে কাজে লাগিয়েছেন—এ সম্পর্কে সামান্য একটি তথ্য আপনারা অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, বিড়ালের গরহজম বা অগ্নিমান্দ্য হ'লে সে ঘাস চিবিয়ে বমি ক'রে শরীর শোধন করে। চরকীয় যুগে এই আমাশয় (Stomach) শুদ্ধির জন্য বমনের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। আমরা বিড়ালের intuition -এ তা লক্ষ্য ক'রেছি, বিড়াল তো আর চরক পড়েনি, এগুলি এক প্রকারের আত্মরক্ষা।

জড়াজড় প্রাণীরা বংশ যাতে এই সৃষ্টি থেকে লুপ্ত না হয়, তার জন্য কোন না কোন প্রকারে এমন ব্যবস্থা করা আছে—যার জন্য সে ভূপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়নি বা

হবে না; তবে হয়তো সেটা দুর্লভ হ'তে পারে।

এইবার আলোচ্য বনৌষধিটিকে আত্মগুপ্তা বলার তাৎপর্যটা দেখুন—এটি কিন্তু এর বৈদিক নাম, অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৭৫।৪১।৩১২ সূক্তে বলা হ'য়েছে, সেটি হ'লো—

শবাগ্রং বীজং নেতুর্মর্ত্তো বুরীত সখ্যমাত্ম গুপ্তাম্।
বিশ্বো রায়ঃ ইষুধ্যতি দ্যুম্নং বৃণীত পুষ্যসে॥

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

আত্মগুপ্তামিতি আত্মনা গোপায়তি অঙ্গ কচ্ছুভিঃ তদ্বীজং বুরীত=প্রার্থয়তে, যতোমর্ত্তো মনুষ্যঃ নেতুঃ ফলপাকস্য=গুণ-যুক্তস্য সখ্যং=বন্ধুভাবং বৃণীত=প্রার্থয়তে, রায়ঃ=চরমধাতুরেব ধনং তদ্ধিরায় তদ্‌দ্যুম্নং দ্যোতয়তে ফলং=বীর্য্যং তং ইষুধ্যতি=প্রার্থয়তে।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—যে নিজের অংশের কচ্ছুর দ্বারা নিজেকে গোপন করে। মর্তের মনুষ্য এর ফলপাক হ'লেই এর বধূতা প্রার্থনা করে, কারণ দেহের চরম-ধাতু শুক্র দীপ্তিশীল সেই ধনকে রক্ষা করে, তাই তাকেই মানুষ প্রার্থনা করে। পূর্বেই ব'লেছি, প্রাণীজগতের Instinct (স্বভাব-প্রেরণা) মানব কাজে লাগিয়েছে। এই তথ্যকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে গেলেই প্রথমেই ভাবতে হবে—এ সন্ধানের সূত্র কোথায়?

যে পশু সর্বাধিক রমণপ্রিয় অথচ বাহ্যতঃ সে ফলমূলভোজী, গৃহহীন, উদাসী, নগ্নদেহ-বৈরাগীর মত বাস করে, তার প্রবৃত্তি কিন্তু সর্বদাই রমণীর সঙ্গলিপ্সা, বার বার রমণ ক'রেও একটিতে সে সন্তুষ্ট থাকে না এবং অন্য কোন পুরুষ তার সঙ্গিনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রবে, তাও সে চায় না; কোন একটা পুরুষ উপস্থিত হ'লেই তার সঙ্গে সংগ্রাম; তাই তো তার লোকায়তিক আখ্যা 'পালের গোদা', একে সমাজের মনীষীগণ আখ্যা দিয়েছেন বা-নর কিংবা নর; যাস্কের নির্দেশ—বনে রমতি বানরঃ, অর্থাৎ লোকালয়ে নয়, বনেই রমণপ্রিয়। তাই তো আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে—"মর্কট বৈরাগ্য"।

এ তো গেল একটি প্রাণীচরিত্রের কথা। এখন প্রশ্ন ভেষজটির সঙ্গে এই বানরের যোগসূত্র কি?

সূত্রটা এই যে, এরা এর বীজকে ভালবাসে, যেহেতু এটি বাজীকর। এই বাজীকর কথাটি দুটি অর্থ বহন করে, একটি হ'চ্ছে—বাজং=শুক্রং করোতি অর্থাৎ শুক্রকে যে সৃষ্টি করে, আর একটি অর্থ হ'চ্ছে—"যদ্ দ্রব্যং পুরুষং কুর্য্যাৎ বাজীব সুরতক্ষমম্" অর্থাৎ যে দ্রব্যের শক্তি অশ্বের মত রমণে প্রবৃত্ত ক'রতে পারে, সেই দ্রব্যই বাজীকর। এই আত্মগুপ্তা বীজ যে বাজীকর এই তথ্যটি বানরের স্বভাব-প্রেরণায় কোন কালে কারোর অনুভূতিতে এসেছিল, যার জন্য তাইতে সে অনুরক্ত, কিন্তু প্রকৃতির এমনই দান—তেঁতুলের আকারের মত এর ফলের গায়ে এমন বিষ মাখানো শুঁয়ো সৃষ্টি ক'রলেন যে, যতক্ষণ সে পেকে ফেটে মাটিতে প'ড়ে না যায়, ততক্ষণ তাকে (তার বীজকে) সংগ্রহ করে কার সাধ্য; এমন-কি যখন ঐ ফল পাকে, তখন যে গাছে এই লতা জন্মে—তার তলায় যায় কার সাধ্য! ওর শুঁয়ো উড়ে যেখানে লাগবে, তখনই চুলকে ফুলে উঠবে এবং ২ দিন তার যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হবে। সেইজন্য এই ফল গাছে ঝুলছে দেখতে পেলেই বানর সে বন ছেড়ে পালিয়ে যায়; কারণ ঐ ফলের গায়ের শুঁয়োগুলো তার (বানরের) গায়ে লাগলেই চুলকোতে চুলকোতে সে পাগলের মত হয়ে যায় আর ছুটতে থাকে; এইজন্যেই এই আত্মগুপ্তার নাম "কপিকচ্ছু"; প্রশ্ন হ'লো—এটার দ্বারা কিন্তু নামটি যে সার্থক—সেটা বোঝানো গেল না, কারণ সে শুঁয়ো সকলের গায়ে লাগলেই তো চুলকোয়। আর একটি তথ্য আপনাদের জানাই—তেঁতুলের মত এর ফলগুলি দেখতে অনেকটা বানরের কালো মুখের এবং গায়ের মত রং হয়, তার সঙ্গে রোমশ, তাই এর নাম "কপিকচ্ছু"; যদি প্রকৃতি ওর গায়ে এই শুঁয়ো সৃষ্টি না ক'রতো তাহ'লে বানরকুল এর বংশ আর রাখতো না, তাই তার এই Protection সৃষ্টি করেছে প্রকৃতি। এইটাই সংস্কারানুরাগী মানুষের মনশ্চিন্তা। অবশ্য বানর এখানে হনুমান।

বৈদ্যকের নথি

চরক সূত্রস্থান ৪ অধ্যায়ে বল্যবর্গে ঋষভী নামের উল্লেখ আছে; টীকাকার চক্রপাণি এই ঋষভী শব্দের অর্থ ক'রেছেন শূকশিম্বী (আলকুশী)। এভিন্ন চরকের চিকিৎসা-

স্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়োক্ত বাজীকরণ যোগে আত্মগুপ্তা বীজের ভূরিপ্রয়োগ করা হ'য়েছে। সুশ্রুতে বলাধান ও বাজীকরণার্থ মাষকলাই সহযোগে এই বীজের ক্বাথ পান করার উপদেশ। বাগ্‌ভট রক্তপিত্তে আত্মগুপ্তাবীজ ও শাক ভোজনার্থ ব্যবহার ক'রেছেন। চক্রপাণি দত্ত বাতব্যাধিতে আত্মগুপ্তার মূলের ক্বাথ পান করার উপদেশ দিয়েছেন। এভিন্ন ভাবপ্রকাশকার (ষোড়শ শতকের গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে) বিবৃদ্ধ যোনিকে সংকীর্ণ করণার্থ এই আত্মগুপ্তা মূলের ক্বাথে তুলো বা পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজিয়ে ধারণ করার উপদেশ দিয়েছেন, তবে এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ ভিন্ন কিছু করা সমীচীন নয়।

পরিচিতি

সাধারণতঃ বর্ষজীবী লতা হ'লেও কখনও কখনও বহুদিন বেঁচে থাকতে দেখা যায়। এর পাতার আকৃতি ও বিন্যাস্ আমাদের দেশে প্রচলিত শাঁখ আলুর গাছের পাতার মত, সেইরকম একই বৃন্তে ৩টি পাতা, লতাগাছে ও পাতায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোম আছে। পুষ্পদণ্ড সর্বদাই অবনত থাকে, সেগুলি লম্বা ৭/৮ ইঞ্চি, ফুলের রং গাঢ় বেগুনে, পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ শুঁটি হয়, সেগুলি লম্বা হয় প্রায় ৫/৬ ইঞ্চি, শুঁটির গায়ের লোমগুলির রং বানরের গায়ের রংয়ের মত, এই ফলগুলি যখন পাকে, তখন বাতাসে এই লোমগুলি উড়তে থাকে, কিছুদিন বাদে ঐ শুঁটি ফল ফেটে বীজগুলি তলায় প'ড়ে যায়; অবশ্য এটি অযত্নসম্ভূত বৃক্ষাশ্রয়ী লতা। এর প্রচলিত নাম আলকুশী, হিন্দিভাষী অঞ্চলে একে বলে কেঁওয়াজ বীজ আর উড়িষ্যার অঞ্চল বিশেষে একে বলে বাইডঙ্ক। দেশগাঁয়ে এই ফলের গায়ের লোমগুলিকে 'দয়ার গুঁড়ো' বলে. যখন এই ফল পাকে—তখন ঐ গাছের তলায় গেলে কোন রকমে শরীরে ঐ লোম লাগলে চুল্‌কোতে থাকে আর ফুলে যায়।

পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের সমীক্ষার প্রতিবেদন হ'লো—পৃথিবীর উষ্ণপ্রধান দেশাঞ্চলে এই গণের (genus) ২০টি প্রজাতি আছে, তার মধ্যে ভারতে ১০টি পাওয়া যায়; তবে আলোচ্য বনৌষধিটি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, পূর্ব নেপালের তরাই অঞ্চলে তো বটেই, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম ভারতের বনাঞ্চলে এর অভাব নেই; তবে সাধারণতঃ এটা তিন হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যেই দেখা যায়। এটির বোটানিকাল্ নাম Mucuna prurita Hook., ফ্যামিলি Leguminosae.

ঠিক একই রকম গাছ অথচ ফুলে যে তফাত, সেটা আমাদের মত সাধারণের চোখে ধরা পড়ে না, তবে তার শুঁটিফল হ'লেই তার পার্থক্য নজরে আসে, সেই পার্থক্যটা হ'লো—এই ফলগুলোর গায়ে রোম (রোঁয়া) হয় না বল'লেই হয়, আর সেটা গায়ে লাগলেও চুলকোয় না। এটির চাষ হয় উত্তর প্রদেশে। প্রাচীনগণের মতে চরক সংহিতায় এইটিই কাকাণ্ডোল নামে পরিচিত, এর বোটানিকাল্ নাম Mucuna utilis Wall. ঔষধার্থে ব্যবহার হয় মূল ও বীজ, তবে শেষোক্ত গাছটির বীজ আলকুশীর বীজ ব'লে বিক্রি হ'য়ে থাকে।

লোকায়তিক ব্যবহার

১। **দর্শনে ক্ষরণঃ—** অল্প বয়সে কুঅভ্যাসজনিত শুক্রক্ষয়ে, যার পরিণতিতে শুক্রতারল্য, সেক্ষেত্রে আত্মগুপ্তার (আলকুশী) বীজ ৪/৫টি প্রত্যহ আধ কাপ গরম

দুধে ভিজিয়ে রেখে, পরের দিন সকালে খোসা ছাড়িয়ে, শিলে বেটে, ২/৩ চা-চামচ ঘিয়ে অল্প ভেজে ঐটা একটু চিনি বা মিছরির গুড়ো মিশিয়ে খেতে হবে; তারপর একটু দুধ খেতে পারলো ভাল হয়। উপরিউক্ত পদ্ধতিতে এই বীজ ব্যবহার ক'রলে শুক্রের গাঢ়ত্ব ফিরে আসবে।

২। **রক্তপিত্তেঃ—** এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হ'য়েছে 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩২১ পৃষ্ঠায়, সুতরাং এখানে রোগের লক্ষণের বর্ণনা আর করা হ'লো না। এক্ষেত্রে ২০ গ্রাম আন্দাজ আলকুশীর বীজ পূর্বদিন রাত্রে ভিজিয়ে রেখে পরদিন তার খোসা ছাড়িয়ে, একটু থে'তো ক'রে, ৫/৬ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আন্দাজ ৩ কাপ থাকতে নামিয়ে রেখে দিতে হবে এবং জলটা থিতিয়ে গেলে, উপর থেকে জলটা ঢেলে নিয়ে সমস্ত দিনে ৩/৪ বারে ঐ জলটা খেতে দিলে ২/৪ দিনের মধ্যে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে। আরও ভাল হয়—যদি এর সঙ্গে আলকুশী গাছের কচি পাতা শাকের মত রান্না ক'রে ৮/১০ গ্রামের মত খাওয়ার সুবিধে হয়।

৩। **অববাহুক রোগেঃ—** উপরে জিনিস আছে (একটু উ'চু জায়গায়), অন্যকে ডাকতে হ'চ্ছে পেড়ে দিতে; হাত অর্ধেকটা কোন রকমে উঠলো বটে, কিন্তু বহু কষ্টে, সে ডান বা বাঁ যে কোন হাতই হ'তে পারে। এটা প্রৌঢ়কালেই বেশী হ'তে দেখা যায়। সাধারণতঃ ৩০/৩৫ বৎসর বয়সের নীচে এ রোগটা বড় হ'তে চায় না। এক্ষেত্রে আলকুশী গাছের মূল জল দিয়ে বেটে, আন্দাজ এক চা-চামচ রস ক'রে, পর পর কয়েকদিন খেলে ওটা ক'মতে থাকে; বেশ কিছুদিন খেলেই ওটা সেরে যায়। যদিও জানি এই লতাগাছটি গ্রামাঞ্চলে মাঝে মাঝে দেখা গেলেও, লোকে এ গাছ বাড়ির নিকটে রাখতে চায় না, তাই দুষ্প্রাপ্য বা দুর্লভ হয়ে ওঠে এই ধরনের বনৌষধি।

৪। **ভগ্নধ্বজেঃ—** যৌবনের উন্মাদনায় অতিরিক্ত সঙ্গ ক'রলে পরিণামে কি শারীরিক কি মানসিক সবই ম্রিয়মাণ হয়। এক্ষেত্রে এই আলকুশী বীজকে রাত্রে জলে ভিজিয়ে রেখে, সকালে খোসা ছাড়িয়ে, ঐ ছাড়ানো বীজগুলোকে সমান পরিমাণ দুধে-জলে মিশিয়ে সিদ্ধ ক'রে, ঐ বীজ শিলে পিষে, তাকে ঘিয়ে ভেজে, চিনি মিশিয়ে হালুয়ার মত ক'রে রাখতে হবে, একসঙ্গে বেশী করার দরকার নেই, ৪/৫ দিনের মত একসঙ্গে ক'রাই ভাল।

ঔষধার্থে মাত্রা হ'লো ৫ গ্রাম ক'রে সকালে-বৈকালে দু'বেলা খাওয়া, আর এইটি খাওয়ার পর একটু দুধ (১ কাপ) খাওয়া দরকার। এক সপ্তাহের পর থেকে কিছুটা উন্নতি হ'চ্ছে বুঝতে পারবেন আর অল্প কিছুদিনের মধ্যে ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৫। **মাংসপেশীগত বাতেঃ—** এই রোগ সাধারণতঃ শিশু বা বালকদের বেশী দেখা যায়। এদের চেহারা হবে থস্‌থসে, এরা ছুটতে পারে না, দেহের ভারসাম্য রে'খে চলার ক্ষমতা কম; পায়ে হ'লে হাঁটু ভেঙ্গে প'ড়ে যেতে দেখা যায়। আর পেশীগুলি ঢিলঢিলে ক'রছে, বর্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা যাকে বলে থাকেন এট্রোপি অফ্ দি মাস্‌ল্ (Atrophy of the muscle); এদের ক্ষেত্রে আলকুশী বীজের গুঁড়ো আধ গ্রাম ক'রে গরম দুধে মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। এর দ্বারা ঐ পেশীগত বাত নিরাময় হয়। এদের ক্ষেত্রে নিষেধ হ'লো—যে কোন মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া (একেবারে বন্ধ); এদের পক্ষে তিক্ত রসের খাদ্যই বেশী উপকারী আর কোন প্রকার মালিশ বা সেক দেওয়ার দরকার নেই, এই প্রক্রিয়াতে অপকারই হবে।

৬। **মাসিক ঋতুর কৃচ্ছ্রতায়ঃ—** সাধারণতঃ দুটো কারণে এই রোগ হ'তে দেখা যায়—যাঁরা মেদস্বিনী, আর যাঁদের রক্তাল্পতা এসেছে; আরও একটা কারণে দেখা যায়—যাঁদের হরমোনে অসাম্য র'য়েছে। এ'দের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত কারণ দুটির জন্য আলকুশীর বীজ চূর্ণ আধ গ্রাম মাত্রায় খেলে ওটার রেহাই যে একেবারে হবে—তা নয়; প্রথমোক্তটির জন্য তাঁর মেদকে কমাতে হবে, আর দ্বিতীয়টির জন্য তাঁর রক্তকণিকা যেসব ঔষধে বৃদ্ধি হয়—সেটার ব্যবস্থাও ক'রতে হবে; সুতরাং এসব ক্ষেত্রে রোগের চিকিৎসা যুগপৎ না হ'লে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হবে না। আর তৃতীয় ক্ষেত্র আরও কঠিন। এক্ষেত্রে আরও গভীরে চিকিৎসা ক'রতে হবে।

৭। **ক্ষীণ শুক্রেঃ—** কথায় আছে—জাতও যায়, পেটও ভরে না। মনের অবস্থাটা যেন সেই রকম—যেন চাতকপাখির ফটিক জলের কামনার মত। যাক, এই অবস্থাটায় নিজেকে অসহায় বোধ ক'রতে হয়। মন চায় কিন্তু ক্ষমতার অভাব বাস্তবে। এই ক্ষেত্রটিতে এই আলকুশীর বীজ চূর্ণ (মৃদু অগ্নিতে ঘিয়ে অল্প ভেজে রেখে দিতে হবে) ১ চা-চামচ মাত্রায় নিয়ে সকালে ও বৈকালে এক কাপ দুধের সঙ্গে অল্প চিনি মিশিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা মাসখানেকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপকার যে হ'য়েছে তা বাস্তবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

এতক্ষণ পরচ্ছিদ্রান্বেষণ ক'রে তার গুপ্ত রহস্য সকলের কাছে হাজির ক'রলেও আমার সম্প্রদায়ের তো বটেই, কোন্ সম্প্রদায়ের এ দোষ নেই? বৈজ্ঞানিকের কাছে যান—তিনিও আত্মগুপ্ত, জ্যোতিষীর কাছে যান—তিনিও আত্মগুপ্ত, আমাদের দীক্ষা-গুরুর কাছে যান—তিনিও আত্মগুপ্ত; সুতরাং সংসারে এই এমনই একটি নাম বা শব্দ—যেটি সার্বজনিক। অন্তরের ও অন্দরের রহস্য সকলেই গুপ্ত রাখতে চায়; এ তো সেই ইন্দ্রের কাল থেকেই চ'লে আসছে, সে ভালই হোক, আর মন্দই হোক। সেইরকম এই ভেষজটির অন্তরে অমূল্য সম্পদকে এমনভাবে লুকিয়ে রেখে বহিরাবরণটা এতই জ্বালাময় ক'রে দিয়েছে প্রকৃতি, সে দুষ্পৃশ্যাকে নর-বানরের কাছেও গুপ্ত রাখা যায়নি—এই তো ছিল সে যুগের গবেষণা, কিন্তু আজ তাঁদের উপেক্ষা ক'রে ব'লে চ'লেছি—জ্ঞানের আলোক তাঁরা পাননি। আমরাও তাঁদেরই তো বংশধর, তাই আমরাও অজ্ঞ। তাই ব'লছিলাম—

চালুনি ছুঁচের বিচার করে।
তার তলা ঝর্ ঝর্ করে॥

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Alkaloids, viz., mucunine, nicotine, mucunadine, prurieninine.
(b) Reddish viscous oil. (c) C-3:4-dihydroxyphenylalanine.

সমঙ্গা (লজ্জাবতী)

যুগে যুগে 'সমঙ্গা' নামটাই তো তোমাকে চিনিয়ে দিয়েছে যে, তুমি কি ক'রো; আর সে কথাটা জানা গিয়েছে মহাভারতের বনপর্বের ১৩৩ অধ্যায়ের উক্তিতে। অ-গভীর ভাবনায় হয় তো হোক না সেটা আগাগোড়াই কথামালা, কিন্তু রটনার মূলে ঘটনা যে কিছুই থাকবে না অথবা আদৌ তার মূলে কোন ভিত্তি নেই, এমন উপাখ্যান কি মহাভারতে থাকবে?

যাক সে কথা, নীচে থেকে স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার মত উপাখ্যানটা বলি—

অষ্টাবক্র নামে যে এক মুনি ছিলেন, এটা তো সকলেরই জানা; তাঁর মাতামহ উদ্দালক, মামা শ্বেতকেতু, আর বাবা হ'লেন কাহোড় ও মা সুজাতা; পিতা কাহোড়ের ধারণা হ'য়েছিলো যে, সুজাতার গর্ভস্থপুত্র তাঁর (কাহোড়ের) বেদপাঠে ভুল ধ'রছে। ক্রুদ্ধ কাহোড় দিলেন অভিশাপ। এদিকে সুজাতা কিছুকাল পরেই হ'লেন আসন্ন-প্রসবা, এখন অর্থের প্রয়োজন, তাই কাহোড় রাজদরবারে উপস্থিত। সে রাজা হলেন জনক। সে-যুগের চিরাচিরত রীতিতে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের রাজসভার দ্বার-পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হ'তে হ'তো; তাই ক'রতে হ'লো, কিন্তু সভাপণ্ডিতের কাছে কাহোড় পরাজিত হ'লেন। অদৃষ্টের পরিহাস—তারই পরিণতিতে তিনি কারাগারাবদ্ধ হ'লেন।

সুজাতার গর্ভ থেকে যথাকালে প্রসূত হ'লেন একটি পুত্র; কিন্তু পিতা কাহোড়ের অভিশাপে সন্তান হ'লো অষ্টাবক্র। মাতামহ উদ্দালকের আশ্রমে সেই অষ্টাবক্র লালিত-পালিত হ'য়ে শিশুকাল অতিক্রম ক'রলেন। প্রসঙ্গক্রমে বালক অষ্টাবক্র যখন শুনলেন তার পিতা বেদার্থের বাদে পরাজিত হ'য়ে কারাগারে বন্দী, তখনই সেই কিশোর যাত্রা

ক'রলেন রাজদরবারে; ঘটনাচক্রে রাজার সঙ্গে পথেই তার সাক্ষাৎ হ'য়েছিলো; কিন্তু তিনি জানতেন না তাঁরই সঙ্গে দেখা ক'রতে যাচ্ছেন এই কিশোর; তবুও কৌতূহল-বশে রাজা জনক পুনরায় প্রত্যাবর্তন ক'রলেন রাজদরবারে। এদিকে কিশোর অষ্টাবক্র পিতার কারারুদ্ধ হওয়ার মূলো যে বেদবিদ্যার তর্কে পরাজিত হওয়া এবং তার জন্য যে বাদীকে তর্কে পরাজিত করলেই পিতা মুক্ত হবেন তা জানতেন, কিশোর অষ্টাবক্র তাই করলো।
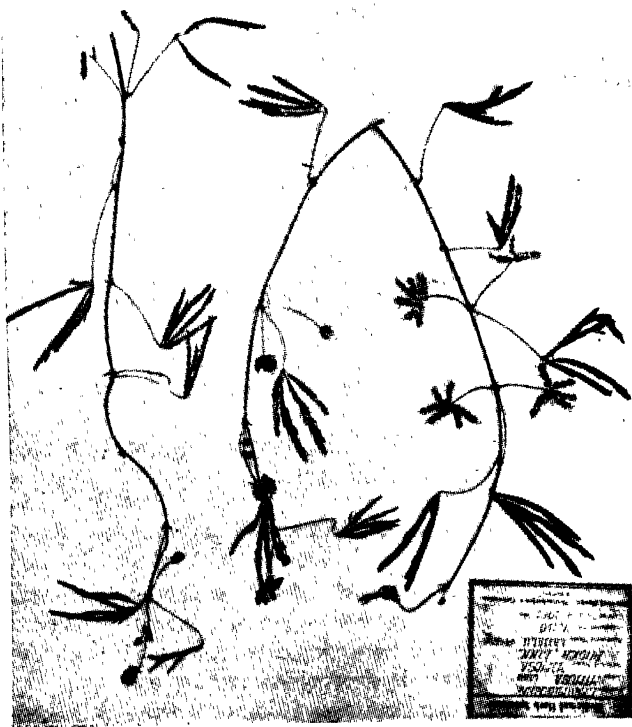
তাই তো বলা আছে—

> ততোঽষ্টাবক্রং মাতুরথান্তিকে,
> পিতা নদীং সমঙ্গাং শীঘ্রমিমাং বিশস্ব।
> প্রোবাচ চৈনং সতথা বিবেশ
> সমৈ রঙ্গৈশ্চাপি বভূব সদ্যঃ॥

এখন মনে প্রশ্ন—এই সমঙ্গা কি কোন নদী? না কোন ভেষজ? যদিই ধরা যায় মহাভারতের যুগে হয়তো বা কোন নদী ছিল, তারই জলের সমশক্তিসম্পন্ন কোন

ভেষজকেও তো এই নামকরণ করার সম্ভাব্যতার একটা যুক্তির ক্ষেত্র থাকতে পারে, কিন্তু যে যুগের দ্রব্যগুণের উপাখ্যানগুলির ভাবধারা অনুশীলন ক'রলে দেখা যায়—এটা ভেষজের গুণের চমৎকারিত্বেরই উপমা সৃষ্টির কাহিনী। এই যেমন সমুদ্রতরঙ্গের ধাক্কায় বিষ্ণুর দেহের লোম উঠে তীরে লেগে, তা থেকে দূর্বা ঘাসের জন্ম হ'লো, সেই রকমই।

এখন দেখতে হবে সমঙ্গা ভেষজটির সঙ্গে আর্যদের কোন পরিচয় ছিল কিনা; অবশ্যই ছিল; তার প্রমাণ পাওয়া যায় অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৫২/৬১/৩৭৩ সূক্তে, সেখানে বলা হ'য়েছে—

সুমিত্রয়া সমঙ্গা তে পুরীষং তেন বর্ধস্ব চা চ
প্যায়স্ব বর্ধিষীর্মহি চ বয়সা চ প্যাসিষীর্মহি।

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

সমঙ্গা মার্জয়ন্তে সপত্নীকা সুমিত্রয়া ইতি, পত্ন্যা মন্ত্রপাঠঃ। সমঙ্গা=সমজ্যতে=অনয়া, সমজ+ঘঙ্। সা তু করাঞ্জলি কারিকা তস্যাঃ পত্রাণি দুগ্ধেন পূরয়তি তানি পিন্বনে=উপযমনে। তব পত্রাণি পুরীষং পূরয়তি, তেন পয়সা বর্ধস্ব। আপ্যাযস্ব, তব প্রসাদাৎ বয়ং বর্ধিষীর্মহি=আপ্যাসিষী র্মহি চ ইতি।

এটি পত্নীর পাঠ্যমন্ত্র। পতিসহ আগমন ক'রে সমঙ্গার মূলদেশে দুগ্ধ সেচন ক'রতে ক'রতে ব'লবেন—তোমার পত্র আমার দেহ পুষ্ট ক'রবে। তুমি তোমার রস দিয়ে আমার অন্নরসের সহিত পুরীষকে পূর্ণ কর। আমি তোমাকে প্রীণিত করছি। এই দুগ্ধসহ বারিগ্রহণে তৃপ্ত হও।

সংঘাত

গাজনে বিস্তর সন্ন্যাসী নাচলে সে গাজন গেঁজিয়ে যায়, সেইরকম এই লজ্জাবতীর প্রসঙ্গ ·

প্রাচীন বৈদ্যদের মতভেদে দেখা যায়—সমঙ্গা মঞ্জিষ্ঠা (Rubia cordifolia), অনেকের মতে সমঙ্গা বরাহক্রান্তা, বর্তমানে এটি সন্দিগ্ধ ভেষজ, কারণ Polygonum barbatum Linn., এই প্রজাতিটি বরাহক্রান্তা ব'লে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার বৈদিকমতে সমঙ্গা লজ্জাবতী লতা।

এখন, কার কথা কতটা বাস্তবসহ?

চরক সংহিতায় দেখা যাচ্ছে (সূত্রস্থানের ৪র্থ অঃ ৫ সূঃ) এটি "সন্ধানকরণীয়" বলা হ'য়েছে, কিন্তু চরকের টীকাকার চক্রপাণি দত্ত ব'লেছেন এটি মঞ্জিষ্ঠা। এভিন্ন চিকিৎসাস্থানের ১৫ অধ্যায়ের ২১০ এবং ২৩০ শ্লোকে সমঙ্গার উল্লেখ থাকলেও, এক্ষেত্রে চক্রপাণি কোন মন্তব্য করেননি, তবে অর্শোরোগের দুটি শ্লোকে সমঙ্গার উল্লেখ, আর দেখা যায় ১৯৪ শ্লোকে (চিঃ) রক্ত-আমাশা এবং রক্তাতিসার রোগে এর ব্যবহার।

এখন প্রশ্ন হ'চ্ছে—অর্শোরোগে সন্ধানকরণীয় কোন দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত

কিনা? এই হিসেবে নয় যে, এর দ্বারা স্তম্ভন হয় সেইজন্যই এক্ষেত্রে বর্জনীয়। দ্বিতীয়তঃ মঞ্জিষ্ঠার গুণবিচারে দেখা যাচ্ছে এটি মধুর, কষায় রস, উষ্ণগুণ ও গুরু, আর রোগনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হ'য়েছে ব্রণ, মেহ, জ্বর, শ্লেষ্মা ও বিষদোষে।

তা'হলে এখানে কি ক'রে সমর্থনযোগ্য হয় যে, অর্শে উষ্ণবীর্য দ্রব্যের ব্যবহার! সেই হিসেবে এটা সন্দেহের অবকাশ রাখে।

তৃতীয়তঃ সমঙ্গা যে বরাহক্রান্তা—একথা পর্যায় মুক্তাবলীতে পাওয়া যায় (এটি দ্বাদশ / ত্রয়োদশ শতকের গ্রন্থ), এখানে বরাহক্রান্তা নামকরণের যুক্তি হ'লো—এর প্রধান শিকড়ের পার্শ্বে যে সূক্ষ্ম ঘন শিকড়গুলি হয়, সেগুলি বরাহের লোমের মত শক্ত। এই "ক্রান্ত" শব্দের অর্থ "লক্ষণ", এই লক্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখে তার এই নামকরণ।

সুশ্রুত সংহিতার টীকাকার ডল্বন ব'লেছেন—

'সমঙ্গা অঞ্জলিকারিকা লজ্জালু ইতি লোকে'—

এখানে একটা কথা ব'লে রাখি—মালাবার অঞ্চলে অর্শরোগে এই গাছের মূল ও পাতা ব্যবহার করা হয়, সুতরাং চরকোক্ত সমঙ্গাও যে লজ্জাবতী, সেটারও একটা সমর্থন পাওয়া গেল—এ তথ্যটি আছে ওয়াট সাহেবের "ইকনোমিক্ প্রডাক্টস্ অব্ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে।

এর লৌকিক নাম লজ্জালু বা লজ্জাবতী, এর আর একটি নাম 'অঞ্জলিকারিকা'। বর্তমান আলোচ্য ক্ষেত্রটি লজ্জাবতীকে কেন্দ্র করে।

পরিচিতি

গুল্ম হ'লেও লতাটি মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়ে যায়, এর লতার গায়ে অসম্ভব বাঁকা বাঁকা কাঁটা—সেটা আবার নীচের দিকে। সব থেকে মজার ব্যাপার হ'লো—এই লতাগাছ যেখানে থাকে, সাপ সেখানে প্রবেশ করে না; তবে এটা দেখেছি—উত্তরবঙ্গ ও আসামে এই লজ্জাবতী লতার প্রাচুর্য। পাতার বোঁটা এক থেকে দেড় ইঞ্চি লম্বা, পাতাগুলি ঠিক বিপরীতভাবে সন্নিবেশিত, পাতা স্পর্শ ক'রলেই বিপরীত দিকের পাতাটি নেমে এসে জুড়ে যায়, মনে হয় যেন করজোড় ক'রেছে—তাই এর নাম করপত্রাঞ্জলি। পুষ্পদণ্ড ২ থেকে ৩ ইঞ্চি লম্বা, ফুল তুলোর ন্যায় নরম ও ফিকে লালবর্ণ, পাতার গোড়া থেকে (পত্রবৃন্তের ও লতার সংযোগস্থল) পুষ্পদণ্ড বের হয়। বারমাসই ফুল ও ফল হয় তবে সাধারণতঃ জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ফুল ও ফল বেশী হয়। প্রত্যেক শুঁটিতে ৩/৪টি বীজ থাকে, ফলে ধূসরবর্ণ ছোট ছোট কাঁটা আছে। এটির বোটানিকাল্ নাম Mimosa pudica Linn., ফ্যামিলি Leguminosae.

হিন্দিভাষী অঞ্চলে একে বলে লাজবন্তী, লাজ্‌লু; উড়িষ্যার অঞ্চল বিশেষে বলে লাজকুলি লতা।

ঔষধার্থে ব্যবহার হয় মূল ও সমগ্র লতাপাতা।

প্রয়োগ ক্ষেত্র

১। **হাত-পা জ্বালায়ঃ—** অনেক সময় তার সঙ্গে জ্বরও থাকে, এটা সাধারণতঃ বর্ষা ও শরৎকালে পিত্তবিকারে দেখা দেয়। এক্ষেত্রে লজ্জাবতীর সমগ্রাংশ (গাছ, মূল,

পাতা) ১০ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে এই ক্বাথটা খেলে ঋতুগত পিত্তবিকারে ও তজ্জনিত উপসর্গের উপশম হয়।

২। **অর্শ রোগে:—** অর্শের বলিতে জ্বালা বেশী, লঙ্কা না খেয়েও যেন সেই রকম জ্বালাবোধ, তার সঙ্গে রক্তস্রাবও প্রচুর হ'তে থাকে। এক্ষেত্রে গাছে ও মূলে ১০ গ্রাম আন্দাজ ১ কাপ দুধ ও ৩ কাপ জল একসঙ্গে মিশিয়ে একত্রে সিদ্ধ ক'রে (ছাগদুগ্ধ হ'লে ভাল হয়) এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে নিয়ে এটা প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে দুইবারে খাওয়া; এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৩। **রক্তপিত্তে:—** গলাটায় মনে হয় কাঁটা ফুটেছে, এর সঙ্গে একটা কাসি আসে আর রক্ত পড়ে অথচ বুকে-পিঠে যে ব্যথা আছে তা নেই, এমন-কি অর্শ নেই, দাস্ত হওয়ার পর জ্বালা-যন্ত্রণাও হয় না অথচ টাটকা রক্ত পড়ে; এক্ষেত্রে উপরিউক্ত পদ্ধতিতে মাত্রামত তৈরী ক'রে ঐ ক্বাথটা সকালে-বৈকালে দুইবারে খেলে রক্তস্রুতি বন্ধ হয়।

৪। **যোনি ক্ষতে:—** এটার প্রাথমিক স্তরে মাঝে মাঝে অথবা প্রায় রোজই অল্প অল্প স্রাব চ'লতে থাকে, একটা আঁশটে গন্ধ, কখনও বা একটু লালচে স্রাব; এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসক সাবধান ক'রে থাকেন—এটার পরিণামে ক্যান্সার হ'য়ে যেতে পারে; এই রকম ক্ষেত্রে দুধে-জলে সিদ্ধ করা লজ্জাবতীর ক্বাথ খেলে ওটা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। এই সঙ্গে আর একটা কথা ব'লে রাখি—এই গাছের ক্বাথ দিয়ে উত্তরবস্তি দিলে অর্থাৎ ডুস্ দিয়ে ধোয়ালে ওটা আরও শীঘ্র সেরে যাবে।

৫। **নাড়ী স'রে আসায়:—** বহু সন্তানের জননী অথবা প্রসবের সময় ধাত্রীর অসাবধানতায় নাড়ী স'রে এসেছে, উ'চু হ'য়ে ব'সতে গেলে অস্বস্তি বোধ, এক্ষেত্রে গাছে মূলে ১০ গ্রাম আন্দাজ গাছপাতা নিয়ে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে প্রত্যহ খাওয়া, আর ঐভাবে ক্বাথ তৈরী ক'রে উত্তরবস্তি বা ডুস্ দেওয়া; এর দ্বারা ওটি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবে।

৬। **আঁধারযোনি ক্ষতে:—** এই বিচিত্র রোগটি কৃষ্ণপক্ষে বেড়ে যায় আর শুক্ল-পক্ষে শুকোতে থাকে; এই ক্ষতটি হয় সাধারণতঃ হাঁটুর নিচে (নিম্নাংশে) আর না হয় কু'চকির দু'ধারে। এক্ষেত্রে গাছ ও পাতা (মূল বাদ) ১০ গ্রাম শুধু জল দিয়ে ক্বাথ ক'রে খেতে হয় এবং ঐ ক্বাথ দিয়ে মুছতে হয়, এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যায়।

৭। **আমাশয়:—** অনেকদিনকার পুরনো, বেগ হ'লে আর দাঁড়ানো যায় না, গিয়ে প্রথমে যা হ'লো তারপর আর হ'তে চায় না; আবার অনেকের আছে শক্ত মলের গায়ে সাদা সাদা জড়ানো আম। তাঁরা লজ্জাবতীর ডাঁটা পাতা মিলিয়ে ১০ গ্রাম সিদ্ধ ক'রে ছে'কে সেই ক্বাথটা খেয়ে দেখুন, কেমন কাজ হয়, আর যাঁদের আমযুক্ত গাঁজলা দাস্ত হয়, তাঁরা শুধু পাতা ৫/৬ গ্রাম সিদ্ধ ক'রে ছে'কে ঐ জলটা খাবেন

৮। **দম্‌কা ভেদ:—** ২/৩ দিন পেট স্তব্ধ হ'য়ে থাকে (যাকে আমরা চল্‌তি কথায় বলি পেট থুম মেরে আছে), হঠাৎ একদিন দম্‌কা ভেদ হয়, একে বলা যেতে পারে অগ্নিমান্দ্যজনিত অজীর্ণ; এক্ষেত্রে লজ্জাবতীর শিকড়ের ছাল ২/৩ গ্রাম, এর সঙ্গে শুধু পাতা ৪ গ্রাম একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে ছে'কে জলটা খেতে হবে।

৯। **মল কাঠিন্যে:—** মল গু'ঠলে হ'য়ে যায়, দমদম বুলেটের মত কয়েকটা

বেরিয়ে গেল, আবার আর কিছুই নাই; এক্ষেত্রে মূল ৭/৮ গ্রাম আন্দাজ থে'তো ক'রে সিদ্ধ ক'রতে হবে এবং ছে'কে ঐ জলটা খেতে হবে। জলের মাত্রা পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

১০। **বিসর্পেঃ—** ক্ষত কিছুতেই সারছে না, বরং বেড়ে যাচ্ছে, লোকের সন্দেহ হয়তো বা ক্যান্‌সার; এই রকম ক্ষেত্রে ৪/৫ গ্রাম পাতা মিহি ক'রে বেটে এক পোয়া আন্দাজ দুধে মিশিয়ে ওটা ছে'কে নিয়ে খেতে হয়, ১৪ দিন এইভাবে খাওয়ার ব্যবস্থা; এটাতে খুব দূষিত ক্ষতও ভাল হয়, এটা এক ফকিরের ব্যবস্থা, তবে এই সময় লবণ বর্জন ক'রে, দুধ-ভাত খেয়ে থাকতে হয় এবং জল দিয়ে পাতা বেটে ঘায়ে লাগাতে হয়।

১১। **দাঁতের মাড়ির ক্ষতেঃ—** ১০/১২ গ্রাম আন্দাজ লজ্জাবতী গাছপাতা সিদ্ধ ক'রে, ছে'কে ঐ ক্বাথ কবল ধারণ ক'রতে হয়, অর্থাৎ মুখে ১০/১৫ মিনিট রেখে ফেলে দিতে হয়, এর দ্বারা ঐ মাড়ির ক্ষত সেরে যাবে।

১২। **বগলে দুর্গন্ধঃ—** কারও কারও জামায় বা গেঞ্জিতে হ'লদে দাগ লাগে, এক্ষেত্রে লজ্জাবতী গাছের ক্বাথ ক'রে বগল ও শরীরটা মুছে ফেলা; এর দ্বারা ঐ দোষ ও দুর্গন্ধটা চ'লে যাবে।

১৩। **দুষ্ট ক্ষতেঃ—** মাংস প'চে খসে যাচ্ছে, এক্ষেত্রে লজ্জাবতীর ক্বাথটাকে একটু ঘন ক'রে দিনে অন্ততঃ ৩/৪ বার দিতে হবে, এই রকম কয়েকদিন ব্যবহারে ঘায়ের পচানিটা উঠে যাবে এবং পু'জও জ'মতে দেবে না।

১৪। **পোড়া নারেঙ্গায়ঃ—** প্রথমে গায়ে ফোস্কার মত হয়, অত্যন্ত জ্বালা থাকে, এর সঙ্গে জ্বরও হয়। এক্ষেত্রে ঐ লজ্জাবতীর ক্বাথ দিয়ে ঘি (ঘৃত) পাক ক'রে সেই ঘি লাগালে ওটা সেরে যায়।

১৫। **হারিশেঃ—** মলত্যাগের সময় যাদের সরলান্ত্র (Large intestine) বেরিয়ে আসে, এই লজ্জাবতী গাছ সিদ্ধ ক্বাথে তেল পাক ক'রে সেই তেল ঐ সরলান্ত্রে লাগিয়ে দিতে হয়, কয়েকদিন লাগালে ওটা আর বেরিয়ে আসে না। এই রোগটা সাধারণতঃ শিশু বা বালকদের বেশী হ'তে দেখা যায়।

১৫। **কানের পু'জেঃ—** এই তেল কানে ফোঁটা দিলে কানের পু'জ পড়া বন্ধ হবে এবং ক্ষত সেরে যাবে।

১৬। **রমণে অতৃপ্তিঃ—** কয়েকটি সন্তান হওয়ার পর প্রসবদ্বারের শৈথিল্য হ'য়েছে, সেটার অনেকটা মেরামত ক'রে দিয়ে থাকে এই লজ্জাবতীর ক্বাথের ডুস্‌ নেওয়ায় আর ওর গাছ পাতা সিদ্ধ ক্বাথ দিয়ে তৈরী তেলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে পিচুধারণ করানো (Vaginal plugging).

১৭। **মিথুন দণ্ডের শৈথিল্যেঃ—** লজ্জাবতীর বীজ দিয়ে তৈরী তেল লাগিয়ে আস্তে আস্তে মালিশ ক'রলে ওটা দৃঢ় হয়।

১৮। **গ্রন্থিবাত ও কুব্জতায়ঃ—** এই লজ্জাবতীর ক্বাথ ও দুধ দিয়ে আয়ুর্বেদোক্ত বিধানে ঘি পাক ক'রে সেই ঘি খেলে ও মালিশ ক'রলে এটি সেরে যায়।

১৯। **সংগ্রহ গ্রহণী রোগেঃ—** দিনেই বার বার দাস্ত হ'তে থাকে, রাত্রে প্রায়

যেতেই হয় না; একেহ বলা হয় সংগ্রহ গ্রহণী; এক্ষেত্রে লজ্জাবতীর ক্বাথ খাওয়ালে ঐ দোষটা চ'লে যাবে। ক্বাথ প্রস্তুতের বিধি এই নিবন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে।

এই নিবন্ধের প্রারম্ভে অষ্টাবক্রের কাহিনীকে উপজীব্য ক'রে বনৌষধিটির অন্তর্নিহিত শক্তির আভাস; তারই সূত্র ধ'রে এই গাছটিকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহারে দেহের কুব্জতা, শিরা সঙ্কোচন যে বিকলাঙ্গেরও কারণ হয়, এই লজ্জাবতী সেখানে কাজ করে একথা আয়ুর্বেদের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক গঙ্গাধরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় চ'লে আসা মুষ্টিযোগগুলি পাওয়া গেল ৺বারাণসীনাথ গুপ্ত মহাশয়ের উত্তরসূরীর সৌজন্যে।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Alkaloids viz., mimosine, other bases. (b) Steroidal components. (c) Waxy material. (d) Crocetin dimethyl ether tannin, mucilage, fatty acids.

বৃশ্চিকালী (বিছুটি)
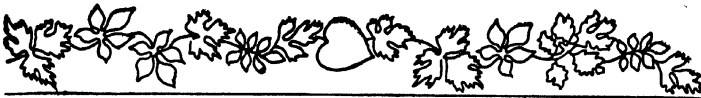
মনস্তাত্ত্বিকের কড়চার প্রতিবেদন হ'লো—আমার দাঁত প'ড়ে গেছে ব'লে আমার দুঃখ হয় না, চুলে পাক ধ'রেছে তাতেও আমার মনে ক্ষোভ নেই, আমার নিটোল মুখের আদলটায় এখন পাহাড়ী জমির স্তরের মত খাঁজ নেমেছে, তাতেও আমার মনে দাগ দেয় না, কিন্তু আমি বড় দুঃখ পাই ও হতাশ হই—যখন কোন ষোড়শী আমাকে 'দাদু' ব'লে ডাকে।

এমনি ধরনের আর একটা মনঃকষ্টের কথাও শুনেছি, সোনা (স্বর্ণ) একদিন দুঃখ ক'রে ব'লছে—

'ন দুঃখং দহনে ঘর্ষে ন দুঃখং তাড়নেঽপিচ।
একং মে বিষমং দুঃখং গুঞ্জয়া সহতোলনে॥'

অর্থাৎ আমাকে স্বর্ণকার যে পোড়ায়, পেটায়, ঘষে, তাতে দুঃখ নেই; কিন্তু একটি দুঃখ অসহ্য, সেটা হ'লো—যখন গুঞ্জার (কুঁচের Abrus precatorius) তুলনায় আমার মূল্য দেয়। মূর্খ সমাজে যেমন একজন পণ্ডিতের অবস্থা।

সেই রকম আর একটি ভেষজ লতারও মনঃকষ্টের কথা বলি—

"কুল্যা পার্শ্বে হি মে জন্ম, ন সঙ্গং কুরুতে জনঃ।
ন দুঃখং তত্র মে কিঞ্চিৎ দুঃখং বৃশ্চিক নামতঃ॥"

অর্থাৎ—হায়, আমার জন্ম যে নালার ধারে তাতে আমার মনঃকষ্ট নেই, আমার কাছে যে কেউ আসে না, মেশে না, তাতেও আমার কষ্ট হয় না, কিন্তু খুব কষ্ট পাই—যখন ঐ বৃশ্চিকের (বিছের) নাম দিয়ে বিছুটি ব'লে আমায় ডাকে।

আচ্ছা, দোষগুণ তো সকলেরই থাকে, আমার কি কোন গুণ নেই? আছে কিনা এবং আমি বৈদিক কিনা এবং আমার আভিজাত্য আছে কিনা, দেখতে দোষ কি—

সেটা তো পাওয়া যাবে অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৩।৭।১৫২ সূক্তে—

'যা স্বেদং উপশৃণ্বন্তি যাশ্চ দূরং পরাগতাঃ।
সর্বাঃ সংগত্য ভাসুরীং বীর্য্যং সন্দত্ত ভোগিনম্॥'

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য করেছেন—

যা ওষধয়ঃ সমীপস্থাঃ শৃণ্বন্তি, যাশ্চ অন্যা দূরং ব্যবস্থিতা শৃণ্বন্তি তাঃ সর্বা ওষধয়ঃ ভাসুরীং বৃশ্চিকালীং ভোগিনং বীর্য্যং সন্দত্ত প্রযচ্ছত। ব্রশ্চ+কিকন্, ছেদনে দাহে, বৃশ্চিক ইব আলাতি পর্য্যাস্নো, অতঃ ভোগিনং বীর্য্যং সন্দত্ত।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—যে সব ওষধী নিকটে আছে, যারা দূরে থেকে শুনছে, তারা একত্র এসে এই ভাসুরী অর্থাৎ বৃশ্চিকালীকে বীর্য দান করুক। এটি ভোগির বীর্য ধারণ করে।

ব্রশ্চ ধাতুর উত্তর কিকন্ প্রত্যয় করেই বৃশ্চিক, এটি দাহ ও ছেদন অর্থেই নিষ্পন্ন হয়।

বৈদিক সূক্তের গভীর ইঙ্গিতটি বহন ক'রছে একটি বিশেষ মন্তব্যে, সেটি হ'লো—ভোগির (সর্পের) বীর্যধারণ করে, তাহলে সর্পবিষের যে গুণ ও বীর্য তা কি আছে এই বৃশ্চিকালীতে?

বৈদ্যকের নথি

পৃথিবীতে দুই প্রকার বিষ—স্থাবর ও জঙ্গম, স্থাবর বিষ আবার দুই প্রকার—একটি খনিজ আর একটি বৃক্ষজ, সর্বসমেত ভেষজ বিষ ৫৫ প্রকার। আর জঙ্গম বিষ মানে সর্প ও অন্যান্য প্রাণীজ। তাদের সংখ্যা অসংখ্য।

স্থাবর বিষের মধ্যে বৃশ্চিকালী বা বিছুটিতেও জঙ্গম বিষের কার্য নিরূপিত ক'রেছেন বৈদিক ঋষি। জঙ্গম বিষের মধ্যে সর্পবিষের স্বভাব ব্যবায়ি ও বিকাশি এবং আগ্নেয়। কিন্তু সে যোগবাহি এবং বায়ুবিকার ও কফবিকারে প্রযুক্ত হয়। এ অভিমত সুশ্রুতের কল্পস্থান তৃতীয় অধ্যায়ে আর বাগ্‌ভটের উত্তরতন্ত্রের ৩৫ অধ্যায়ে।

আয়ুর্বেদীয় সংহিতার যুগে সেই স্থাবর বিষের মধ্যে যে শক্তি নিহিত রয়েছে, তাকে আরও সহজ সরল পদ্ধতিতে স্বরূপ নির্ণয় ক'রে জানানো হ'লো—

জঙ্গম স্যাদধোভাগং ঊর্দ্ধ্বভাগং তু মূলজম্।

অর্থাৎ জঙ্গম বিষের গতিই অধোভাগে এবং মূলজ বিষের গতি ঊর্ধ্বদিকে।

এই সিদ্ধান্তটি প্রত্যক্ষ করার জন্যই তাঁদের সংহিতা গ্রন্থগুলিতে মূলজ বিষকে ঊর্ধ্বজত্রুগত রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া হ'য়েছে। বিছুটি ভেষজটির ব্যবহার যে তার মূলত্বক্ নিয়ে তা সুস্পষ্ট ক'রে বলা হ'য়েছে চরকের বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ের ১৭৩ সূত্রে—বৃশ্চিকালী অতিবিষা মূলানি।

আর ঊর্ধ্বজত্রুগত রোগ ব'লতে স্কন্ধ থেকে শিরোভাগ পর্যন্ত দেহের যে কোন স্থানের রোগের নামই ঊর্ধ্বজত্রুগত রোগ।

এই বিছুটির মূলত্বক্ সুশ্রুতের চিকিৎসাস্থানে উন্মাদ রোগের জন্য ব্যবহারের

উপদেশ এবং সূত্রস্থানের ৩৮ ও ৩৯ অধ্যায়ে বাত রোগে প্রলেপ ও ঘৃত যোগে পাক ক'রে ব্যবহারের উপদেশ।

অর্থাৎ ঊর্ধ্বজত্রুগত রোগের যতগুলি ক্ষেত্র, তাদের মধ্যে প্রধানভাবে বায়ুবিকারই উল্লেখযোগ্য। এ ভিন্ন বাগ্‌ভটের সূত্রস্থানে এবং হৃদ্‌গত বায়ু রোগে, রক্তপিত্তে, মলবন্ধতায়, কাসে, বাতে, অরুচিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিছুটির মূলত্বক্ দ্বারা প্রস্তুত
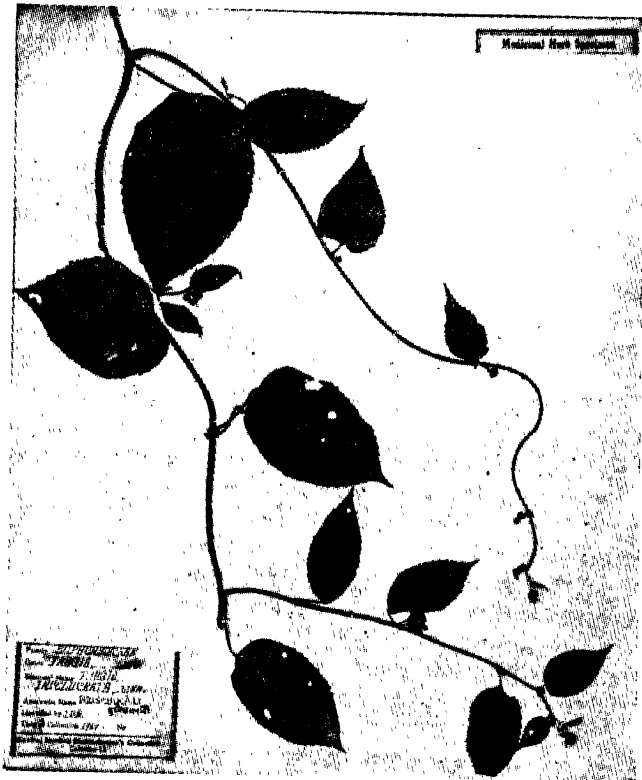
করা ঔষধ ফলপ্রদ। চক্রদত্তও ব্যবহার ক'রেছেন এইসব ক্ষেত্রে। সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষেত্রে বিছুটি মূলের ব্যবহার দেখা যায় চরকের চিকিৎসাস্থান ১৫ অধ্যায়ে উন্মাদে, বাতব্যাধিতে, অপস্মারে এবং ঐস্থানের ১৮ অধ্যায়ে উদর রোগে (যেটির ক্ষেত্র সর্পবিষের ঔষধেরও)। প্রধানতঃ বিছুটি মূলের আস্বাদ কটু ও তিক্ত এবং গুণে সেটি লঘু আর প্রভাবে ও বীর্যে সেটি যথাক্রমে হৃদ্‌রোগ, উন্মাদ ও অপস্মারে কাজ করে। এখানে একটা বক্তব্য রাখছি যে, বিভিন্ন প্রদেশের মুদ্রিত চরকের অধ্যায়গুলির ভেদ দেখা যায়।

পরিচিতি

এই পরাশ্রয়ী রোমাবৃত লতাগাছটি ভারতের শীতোষ্ণপ্রধান অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই পতিত জমিতে দেখা তো যায়ই, এমন-কি হিমালয়ের পাদদেশেও ইতস্ততঃ হ'য়ে থাকে। সমাজের বহু লোকের সঙ্গে এই লতাগাছটির পরিচয় আছে, কারণ তার অঙ্গস্পর্শ ক'রলেই সঙ্গস্পর্শের জ্বালা ২/৩ ঘণ্টা ভোগ ক'রতে হয় এবং সেখানটায় ফুলেও ওঠে; ইনি যদি ভিজে গায়ে সঙ্গ দেন (জলবিছুটি) তা হ'লে আর কথাই নেই। এর প্রচলিত নাম বিছুটি, হিন্দিভাষী অঞ্চলে একে বলে 'বারহন্ত্', উড়িষ্যার অঞ্চলবিশেষে বলে বিছুয়াতি।

যাক্, এইবার এর আকৃতি সম্পর্কে আরও একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করি—এই লতাগাছটি বিশেষ লম্বা হয় না, পাতার আকার গাঁদালপাতার মত হ'লেও তার কিনারায় করাতের মত কাটা। লতা ও পাতার সন্ধিস্থল অর্থাৎ গোড়া থেকে ফুল ও পরে ৩টি কোষযুক্ত রোমাবৃত ফল হয়, এই ত্রিকোষযুক্ত ফল হওয়াটা যেমন এই ফ্যামিলির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, তেমনি ফল পাকলেই ফেটেও যায়। এই লতাগাছ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। এটির বোটানিকাল্ নাম Tragia involucrata Linn., ফ্যামিলি Euphorbiaceae.

ঔষধার্থে ব্যবহার হয় মূল ও ফল।

আর একটা কথা এখানে জানিয়ে রাখি, পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিজ্ঞানী হুকার সাহেবের মতে এই প্রজাতিটির (species) আরও তিনটি variety (প্রকারভেদ) আছে; (১) তার পাতা চওড়া, ডিম্বাকৃতি আর বোঁটার দিকটা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পাতার ধারটা চওড়া দাঁতের করাতের মত কাটা; (২) এর পাতা ঘাসের ন্যায় লম্বা এবং সরু ধরনের, কিন্তু বোঁটার দিকটা হৃৎপিণ্ডাকৃতি (Heart Shaped); (৩) এটির পাতাগুলি তালপাতার মত হ'লেও সেটা তিন ভাগে বিভক্ত এবং দাঁতযুক্ত। তাছাড়াও আর এক রকম লাল বিছুটি আছে, যার বোটানিকাল্ নাম Fleurya interrupta Gaud., ফ্যামিলি Urticaceae.

বিচিন্তার অন্তরালে

প্রচলিত বৃশ্চিকালীর বর্ণনা ও গুণাদি লেখা হ'লো বটে, কিন্তু মানসিকতায় দৈন্য থেকে গেল। তাই আর একটি দৃষ্টিকোণ দিয়ে একে বিচার করার জন্যে আমার উত্তরসূরিগণের কাছে বক্তব্য রেখে যাচ্ছি।

এর আদি-সূত্র বৈদিক সূক্তে, তার গাছের বর্ণনা সম্পর্কে যেটুকু ইঙ্গিত দেওয়া আছে, তার দ্বারা গুরু-পরম্পরায় ভিন্ন পরিচিতি (Identification) করা সম্ভব নয়। সেই রকমই সংহিতার যুগেও। তাই ভাবছি—এইটিই কি চরক সুশ্রুত প্রভৃতি সংহিতা গ্রন্থোক্ত রোগ প্রতিকারে বর্ণিত সেই ওষধিটি? এই সন্দেহের কারণ হ'লো—চরকের বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ের ১৭৩ গদ্যে "বৃশ্চিকালী অতিবিষা মূলানি" বলা হ'য়েছে। এ ভিন্ন চিকিৎসাস্থানের ১৪ অধ্যায়ে উন্মাদে, বাতব্যাধিতে, ১৫ অধ্যায়ে অপস্মারে এবং ১৮ অধ্যায়ে উদররোগে বিছুটির মূলত্বকের ব্যবহার; তাছাড়া সুশ্রুতের চিকিৎসাস্থানের উন্মাদ রোগের জন্য ব্যবহারের উপদেশ এবং সূত্রস্থানের ৩৮ ও ৩৯ অধ্যায়ে বাতরোগে প্রলেপের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের উল্লেখ; এ ভিন্ন মূলত্বক্‌কে ঘৃতযোগে পাক ক'রে ব্যবহারের উপদেশ; বিশেষতঃ বায়ুবিকারের রোগের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ

যেন কেন্দ্রবিন্দু। এদিকে দেখা যাচ্ছে—ষষ্ঠ শতকের বাগ্‌ভটের গ্রন্থে (অষ্টাঙ্গ হৃদয়) সূত্রস্থানে, হৃদ্‌গত বায়ুরোগে, রক্তপিত্তে, মলবন্ধতায়, কাসে, বাতে, অরুচিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিছুটির মূলত্বক দ্বারা প্রস্তুত করা ঔষধের প্রয়োগ ব্যবস্থা; আবার দেখা যাচ্ছে—চক্রপাণি দত্ত মহাশয় তাঁর চক্রদত্ত সংগ্রহেও (একাদশ শতকের গ্রন্থ) ঔষধার্থে প্রয়োগ ক'রেছেন ঐ সব ক্ষেত্রে। সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষেত্রে বিছুটি মূলের ব্যবহার দেখা যায় চরক সংহিতায়।

আমার বক্তব্য হ'লো এই যে—চরকীয় সম্প্রদায়ের বিচরণ ক্ষেত্র যেখানে, সেখানে Urticaceae ফ্যামিলির আর একটি গাছ বিছুটি ব'লে পরিচিত, যেটির পাতা গায়ে লাগলে ৩ দিন তার যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হয়।

দাঁড়ানো গাছ, এই গাছের পাতার আকার অনেকটা আমাদের দেশের প্রচলিত কাক-ডুমুরের (Ficus hispida) পাতার মত হ'লেও এর মত খস্‌খসে নয়, মসৃণ। ৫/৬ ফুট উঁচু গাছ। তা ব'লে এটি বৃক্ষও নয় আবার ক্ষুপও নয়। এই গাছের মূলের ছাল বেশ পুরু। আসাম অঞ্চলের কোন কোন বৈদ্য এটাকে উন্মাদে ব্যবহার করেন এবং এটা তাঁদের গুপ্ত। ও অঞ্চলে এটা চোত্‌রা ব'লে পরিচিত। এটির বোটানিকাল্‌ নাম Laportea crenulata Gaud., ফ্যামিলি Urticaceae. হিন্দিতে একে বলে উটি-গুণ, আসামে 'শিরনাথ'ও বলে আর কামাখ্যা অঞ্চলে একে বলে 'ডোমাসরাত্‌'। এইটি চরকীয় ও সৌশ্রুতীয় সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত বৃশ্চিকালী নয়তো?

লোকায়তিক ব্যবহার

১। **বুক ধড়ফড়ানিতে:—** পেটে বায়ু হ'লে মাঝে মাঝে বুক ধড়ফড় করা, কোন কারণে উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত হ'লে বুক কাঁপা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিছুটির কাঁচা মূল আন্দাজ ৫ গ্রাম নিয়ে ২ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে খেতে হবে। অনেকে ১০ গ্রাম পর্যন্ত ব্যবহারের কথা ব'লে থাকেন। তবে ৫ গ্রাম ব্যবহার করাই শ্রেয়। এটাতেই ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

২। **রক্ত ওঠা বা পড়া:—** ভূতেও ঘাড় মটকায়নি, রক্তপিত্তও হয়নি; দেখা যায় হঠাৎ হঠাৎ নাক দিয়ে রক্ত প'ড়ছে; কোন সময়ে মুখ দিয়েও আসে, অনেক সময় চোখের কোণেও রক্ত জ'মে যায়। এই রকম যে ক্ষেত্র, আয়ুর্বেদমতে এটি ঊর্ধ্বগত বায়ুর চাপে রক্তক্ষরণ। এক্ষেত্রে বিছুটির মূল ৫/৬ গ্রাম, তার সঙ্গে শালপর্ণী যার চল্‌তি নাম শালপানি (Desmodium Gangeticum) ৫/৬ গ্রাম একসঙ্গে ৩ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে, আধ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সকালে অথবা বৈকালের দিকে সিকি কাপ দুধ মিশিয়ে খাওয়া। এর দ্বারা ঐ বায়ুর চাপটা ক'মে যাবে।

৩। **কোষ্ঠবদ্ধতায়:—** অপরিষ্কার দাস্তজনিত অসুখী মনের রুচি নেই খাওয়ার; তাই ব'লে অরুচি নয়। এই ধরনের ক্ষেত্রে বিছুটি মূলের রস ২০/২৫ ফোঁটা ২ চা-চামচ দুধ মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। এর দ্বারা সাধারণ কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হবে।

৪। **বলাধানে:—** প্রৌঢ়কাল—ওজনও ক'মছে, বলও ক'মে যাচ্ছে—কি শারীরিক কি মানসিক, অথচ বিশেষ কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এক্ষেত্রে বিছুটির মূল ৩/৪ গ্রাম বেটে এক/দেড় কাপ দুধ আর এক কাপ জল একসঙ্গে ঐ বাটা মূলটা মিশিয়ে জ্বাল

দিতে হবে, তারপর জলটা একটু ম'রে গেলে, ঐ দুধ নামিয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'লে সকালে অথবা বৈকালের দিকে একবার খেলেই হবে। এটির ব্যবহারে এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনার দেহের ও মনের বল উল্লেখযোগ্যভাবে ফিরে আসবে। অবশ্য যদি কোন ক্ষয়জাতীয় রোগ না থাকে।

৫। **হৃদ্‌রোগে কাসিঃ—** এ'দের কাসি হয় কিন্তু কিছু ওঠে না, অনেকটা বায়ু-জনিত কাসির মত, এক্ষেত্রে ১ গ্রাম মূল চূর্ণ প্রত্যহ সকালে গরম জলসহ খেতে হয়।

৬। **হাঁপানিঃ—** হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগলে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়, এমন-কি ঠাণ্ডা জল খাওয়া, ঠাণ্ডা ঘরে ব'সে থাকা, যাকে বলা যায় কোন কারণে সামান্য ঠাণ্ডা লাগায় যে হাঁপানি হয়, সেক্ষেত্রে বিছুটির মূল চূর্ণ ও কুড় চূর্ণ (Saussurea lappa) সমপরিমাণ মিশিয়ে তা থেকে আধ গ্রাম মাত্রায় প্রত্যহ একবার ঈষদুষ্ণ জলসহ খেতে হয়। তবে প্রাচীন বৈদ্যগণ কুড়ের পরিবর্তে ভাগীমূল, যার এদেশে প্রচলিত নাম বামুনহাটি মূলের ছাল চূর্ণ (Clerodendrum indicum) ব্যবহার করেন। তবে ভাগী ব'লে যেটি এদেশে প্রচলিত, সেটি সন্দিগ্ধ ভেষজ।

৭। **গাঁটে বাতঃ—** বিছুটির মূল (৫ গ্রাম থেকে ১০ গ্রাম পর্যন্ত) ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে, এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে, প্রত্যহ হয় সকালের দিকে নতুবা বৈকালের দিকে খেতে হয়। আরও ভাল হয় ঐ সঙ্গে যদি মূলটা বেটে গাঁটে প্রলেপ দেওয়া যায়।

৮। **মামুস্ (কর্ণমূল) হ'লেঃ—** পাশ্চাত্য মতে এটি ভাইরাস ইন্‌ফেক্‌শন্—যাহোক, প্রাচীন বৈদ্যগণের সহজ ওষুধ ছিল—বিছুটির মূল চন্দনের মত ক'রে বেটে, অল্প গরম ক'রে ঐ কানের পাশে লাগিয়ে দেওয়া।

এই বিছুটি নিবন্ধের শেষ অঙ্কে এসে, তার বাহ্য রূপটিকে আপনারা মনে এ'কে নিয়েছেন, কিন্তু তার অন্তরে যে কত প্রেম—রোগের ক্ষেত্রে তার উপযোগগুলি প'ড়লেই বুঝতে পারবেন; প্রেমের প্রগাঢ়তায় তো জ্বালা থাকবেই, আবার ঐ জ্বালার মধ্যেই তো আসক্তি ঘনীভূত, তাই না মা সন্তান হওয়ার যন্ত্রণা পেয়েও আবার মা হ'তে চায়! এও তো দেখছেন যে, চোখ দিয়ে জল প'ড়ছে তবুও ঝাল খায়; তার প্রতি প্রেম না থাকলে কি রোজ খেতে পারে? সুতরাং বাহ্যটাই সব নয়, তার অন্তরের রসাস্বাদ ক'রলেই তার অস্তিত্বটাই উপলব্ধি হবে।

CHEMICAL COMPOSITION

Cellulose

দ্রোণপুষ্পী (ঘলঘসে)

যে বস্তুর নামটি তার স্বরূপ নির্ণয়ের ধারাটাকে অপ্রত্যক্ষে নিরূপিত ক'রেছে, এমন দ্রব্যটিকে চিহ্নিত ক'রতে গেলে গুরুমুখী বিদ্যের প্রয়োজন হয়, কিন্তু দুর্বিপাকে প'ড়ে এই বৈদ্যকগোষ্ঠীর সংসারটা যেন "হেলার মা'র ঠেলার সংসার" হ'য়ে পড়েছিল এবং সেটা আছেও গত ১২শত বৎসর ধ'রে। সুতরাং আজকের প্রচলিত একটি ভেষজের ঠিকুজীকোষ্ঠী নিয়ে পূর্বপুরুষদের দেওয়া নামের বিচার ক'রতে ব'সে হাড় হিম হ'য়ে যায়। আলোচ্য এই ভেষজটির আদিনাম কি ছিল—সেটা ঠিক ক'রতে তেমনি একটা সমস্যা হ'য়েছে। "ঘলঘসে" যে দ্রোণপুষ্প এ কথাটা পরম্পরায় না পেলে সেটা জানা যেমন সম্ভব হ'তো না, সেই রকম ঘলঘসে নামকে সামনে রেখে, বিচার ক'রে তার সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা বোধ হয় অসম্ভবই।

কেন তা ব'লছি—আচ্ছা, অশ্বত্থামার বাবার নামও তো দ্রোণ; এটা নিশ্চয়ই সার্থক নাম, আবার পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রলাম দ্রোণ শব্দে আর কি হ'তে পারে? তিনি একটা শ্লোক আওড়ে ব'ললেন—শোন তবে পণ্ডিতী হেঁয়ালি—

কেশবং পতিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণো হর্ষমুপাগতঃ।
রুদন্তি পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে হা কেশব হা কেশব॥

এটা শুনে কে না অর্থ ক'রবেন—কেশবকে পতিত দেখে দ্রোণ হর্ষের সঙ্গে এগিয়ে আসেন এবং পাণ্ডবগণ হায় কেশব! হায় কেশব! ব'লে কাঁদতে লাগলেন। আবার সেইটারই অর্থ যদি পণ্ডিতি বুলেটিনে ঢোকে, তার অর্থ হবে—কে অর্থাৎ জলে শব পতিত দেখে দ্রোণ অর্থাৎ কাক (কাকের এক নাম দ্রোণ) আনন্দিত হ'য়ে—কে অর্থাৎ

জলে ভেসে যাওয়া শবে ব'সে প'ড়লো, আর তীরে দাঁড়ানো পান্ডবা অর্থাৎ শৃগাল-গুলো (শৃগালের এক নাম পান্ডব) কাঁদতে লাগলো। তা হ'লে এখন এই পুষ্পটির নাম যে দ্রোণপুষ্প সেখানে কোনটাকে গ্রহণ করা যায়?

এভিন্ন দ্রোণ শব্দের অন্যত্র ব্যবহার আছে—যেমন দ্রোণী বা দুনি (এখানে দ্রুণ অর্থে ক্ষরিত দ্রব্যকে যে পাত্রে ভ'রে নিয়ে অন্যত্র নিক্ষেপ করা হয়, তাকে বলা হয়

দ্রোণী), যার চ'লতি নাম ডোঙ্গা (জল ছেঁচার যন্ত্র) ধরি, তা হ'লে "অগস্তিপুষ্প" যার প্রচলিত নাম সেই বকফুলও তো (Sesbania grandiflora) ডোঙ্গার মত, সেটাই বা নয় কেন? আবার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ওজনেরও (দ্রব) পারিভাষিক শব্দনাম দ্রোণ। এখন কাকে আদর্শ ক'রে ভেষজ নির্ণয় করা যাবে?

দ্রব্য পরিচয়ে বৈদ্যকের ফোরেনসিক্ পদ্ধতি

এই দ্রোণপুষ্পের লোকপ্রচলিত নাম ঘলঘসে, এটা নিশ্চয়ই আর্যভাষা নয়; এ

নামটির উৎপত্তি হ'য়েছে একশ্রেণীর লোকের কাছ থেকে, যাদের ব্যবহার্য ভাষার বেশীর ভাগই ধ্বন্যাত্মক ও প্রয়োজনে ব্যবহারাত্মক।

এই নামকরণেরও অন্তরালে আছে তার একটি গুণের সমীক্ষা—সেটা হ'লো দ্রোণপুষ্পীর ডাঁটা ও পাতার রস সামান্য গরম ক'রে শিশু বা বৃদ্ধদের কফ-কাসিতে বুকে মালিশ অথবা এটার সঙ্গে স'রষের তেল মিশিয়ে, ফুটিয়ে নিয়ে, সেই তেলটা বুকে-পিঠে ঘষলে শ্লেষ্মা তরল হয়। হালকা ধরনে ঘ'ষতে হয়, ঘল শব্দটি লঘু শব্দেরই অপভ্রংশ, আর ঘ'সে শব্দটি ঘষা অর্থাৎ ঘর্ষণ থেকে, এইটাই এই নামকরণের উৎস।

তবুও প্রশ্ন—এই দ্রোণপুষ্পীটাই কি বৈদিক? না, এ নামে কোন ভেষজ বেদে পাওয়া যায় না? তবে সুশ্রুত টীকাকার ডল্বন এ সম্পর্কে এর একটা দিক্‌দর্শন ক'রেছেন, তিনি দ্রোণপুষ্পকে ব'লেছেন—এটার প্রাচীন নাম "সুপুষ্পা"। এদিকে একাদশ শতকের চক্রপাণি দত্ত মহাশয় চরকসংহিতার টীকা লেখার সময় মন্তব্য ক'রেছেন—দ্রোণপুষ্পীর প্রাচীন নাম 'কুতুম্বক'; কিন্তু চরকসংহিতা রচনার যুগে এই দ্রোণপুষ্পীর নাম সুপুষ্পা ব'লে প্রচলিত ছিল। অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পে 'কুতুম্বক' নামে ভৈষজ্যের উল্লেখ আছে। ভাষ্যকার মহীধরের উক্তিতে সেটা জানা যায় যে, কুতুম্বকের প্রচলিত নাম "সুপুষ্পা"। এখন দেখা যাক বৈদিক সূক্তে কি পাওয়া যায়—

> কাসি কতমাসি, কস্মৈত্বা, কায়ত্বা, কুতুম্বকা শিরোমে, যশো মুখং, ত্বিষি কেশাশ্চ, অমৃতং প্রাণো মে মোদা প্রমোদা সর্ব্বং ব্যগাহতু বিগাহতে।
>
> (অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ১৩২।৭।৯ সূক্ত)

মহীধর এই সূক্তটির ভাষ্য ক'রেছেন—

> ভেষজ লতাং আমন্ত্র্য পৃচ্ছতি ভিষক্, কাত্বং? কিং ভূতাসি। কস্মৈ যোজ্যাসি। লতা স্বাত্মানং বিজ্ঞাপয়তি। অহং "কুতুম্বুকা" মে শিরঃ সুপুষ্পৈঃ জ্ঞাপয়তি মাং। মুখং চ যশসা। ভিষজা যজমানেন বাগাশ্রয়ং খ্যাপয়তি। কেশা বারুণা বর্দ্ধন্তে। ত্বাশ্চ ত্বিষি। প্রাণঃ অমৃতং। মোদাদয়ঃ সর্ব্বং ব্যগাহতু, বিগাহতে যোগ-কর্ম্মসু। কুতুম্বকাতু সুপুষ্পা।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—ভেষজলতাকে আমন্ত্রণ ক'রে ভিষক্ জিজ্ঞাসা ক'রছেন—কে তুমি? কি রূপ তোমার? কার জন্য তুমি নিযুক্ত হও?

লতা নিজেকে পরিচিত করাচ্ছে—তার সর্বাঙ্গের রূপ ও গুণের দ্বারা। আমার শিরোভাগ সুপুষ্পে শোভিত, তাই আমার নাম কুতুম্বকা। আমার মুখ যশে পূর্ণ (এখানকার ইঙ্গিত হ'লো—পুষ্পাধিতে সাদা ফুল), ভিষক্ তার যজমানকে বলেন—আমার মুখকে আশ্রয় ক'রতে হয় বাক্যের জন্য। বরুণই আমার কেশ (এখানে কেশ মানে জলপ্রকাশ) ক=জল, তস্য ঈশ। অর্থাৎ বিসর্গকালে এর জন্ম হয়। বিসর্গ অর্থে বর্ষা (কোন কোন কাঁকর ও পাথুরে মাটিতে বর্ষায় এই দ্রোণ জন্মে)। এ সবই আমার দেহের চর্মে আছে, অমৃত আমার প্রাণ। আমোদ-প্রমোদ সবই আমার দ্বারা সাধিত হয়।

প্রাচীন বৈদ্যগণ বাক্-জড়তায় দ্রোণপুষ্পের কল্কে তেল প্রস্তুত ক'রে মুখে মাখতে

দিতেন। মনে হয় তাঁদের এই ব্যবহার বিজ্ঞানটির মৌল সূত্র বৈদিক এই সূক্তেরই ইঙ্গিত "আমার মুখকে আশ্রয় ক'রতে হয় বাক্যের জন্য"। আপনারা লক্ষ্য ক'রে থাকবেন এই ফুলটি হয় পুষ্পাধির মাথায়।

বৈদ্যকের নথি

এই বৈদিক সূক্তটিতে খুব সুন্দর ক'রে কাব্যরূপকে ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে. চরক ও সুশ্রুত সংহিতায়ও এটি গৃহীত হ'য়েছে। চরকেও গৃহীত হ'য়েছে "কুতুম্বুক"

নামে। এই কু—তুম্বক নামটি অথর্ববেদের ঐ বৈদ্যক কল্পেরই ঐ স্থানের ৯/১০ সূক্তে। ওখানে যাস্ক (বৈদিক শব্দাভিধান প্রণেতা) ব'লেছেন কু=কুৎসিৎ তুম্বং=রুচিং রুণদ্ধি=রোধয়তি ইতি কুতুম্বক। অর্থাৎ যে কুৎসিত রূপকে চায় না তাকে নিরুদ্ধ

করে। এই নামটি চরকের সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে ৭৬ শ্লোকে গৃহীত হয়েছে। তার প্রসিদ্ধ টীকাকার চক্রপাণি ব'লেছেন কুতুম্বকঃ দ্রোণপুষ্পিকা।

এর রস মধুর ও শীতবীর্য এবং ভেদক। তাছাড়া একটু বিলম্বে জীর্ণ হয় এবং পেটে বায়ু করে।

সুশ্রুত সংহিতা কিন্তু সোজাসুজি বেদের ভাষ্যকারের সুপুষ্পা নামটিই গ্রহণ ক'রেছেন সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৩৮ অধ্যায়ে নবম সূত্রে (কোনো সংকলনে সুগন্ধ পাঠ, কোথাও আবার সুপুষ্পা পাঠ)। দুই জায়গাতেই টীকাকার ব'লেছেন সুপুষ্পা, সুগন্ধা বা দ্রোণপুষ্পী। এখন প্রশ্ন—এই দ্রোণপুষ্পে তো কোন গন্ধ নেই, তবে তাকে সুগন্ধা কেন বলা হ'লো? তাহ'লে তাঁদের নামকরণ কি নিরর্থক? না, এই গন্ধ শব্দের অর্থ হিংসা, কারণ হিংসার এক নাম গন্ধ। সে উত্তমরূপে হিংসা করে ব'লেই তার এই নাম। এই দ্রোণপুষ্পের রস বীর্য সম্বন্ধে পরীক্ষা ক'রে ব'লেছেন—এর পাতা, ফুল ও অন্যান্য অংশ, বিশেষ ক'রে পাতার রস কফ দূর করে, ক্রিমি নাশ করে, অরুচিকে জব্দ করে, হাঁপানিকে উপশম করার ক্ষমতাও এর মূলে আছে।

পরিচিতি

বর্ষজীবী ক্ষুদ্র ক্ষুপ, কাণ্ড ১ ফুট থেকে ৩ ফুট পর্যন্ত উঁচু হ'তে দেখা যায়, ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই সমতল পতিত জমি বা চাষের ক্ষেতে, বিশেষতঃ যেখানে যব, গম, ডাল কলাই প্রভৃতি রবিশস্য জন্মে, সেখানেই এটি বেশী হ'তে দেখা যায়। আবহাওয়া ও মাটি হিসেবে কোন কোন জায়গায় বর্ষারম্ভে গাছ বেরোয়, আবার কোন কোন দেশে দেখা যায় বর্ষান্তে গাছ বেরুতে সুরু করে। বৈশিষ্ট্য হ'লো—গরু-ছাগলে খায় না। ২/৩ মাসের মধ্যেই ফুল ও পরে বীজ হ'য়ে চৈত্র-বৈশাখেই গাছ ম'রে যায়; ঐ সময়ে যে বীজ প'ড়ে রইলো—সেই বীজ থেকেই আবার গাছ বের হয়। অবশ্য কোন কোন জায়গায় অসময়েও ২/৪টি গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এই গাছের পাতায় ও গাছের গায়ে সূক্ষ্ম রোম আছে, পাতার ধারটা করাতের মত অল্প কাটা; পৃথিবীর উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে এই গণের প্রায় ৫০টি প্রজাতি বর্তমান, তার মধ্যে ভারতে আছে ৩৮টি প্রজাতি।

নিবন্ধোক্ত গাছের দু'টি প্রজাতির আকৃতি-প্রকৃতিতে প্রচুর সাদৃশ্য আছে। এদের একটি সংস্কৃত নাম 'ফলেপুষ্পা', এটা ফলের মত হ'লেও একে পুষ্পধিও বলা যেতে পারে, অবশ্য সেইটার মধ্যেই বীজ হয়। এর একটির নাম 'বড় হলকষা', এই গাছটিকে ৪ হাজার ফুট উঁচু পর্যন্তও জন্মাতে দেখা যায়; এটির বোটানিকাল্ নাম Leucas cephalotes Spreng. একে হিন্দিভাষী অঞ্চলে বলে 'ধুরূপি শাক'। আর ছোট হলকষার বোটানিকাল্ নাম Leucas lavandulaefolia Rees., পূর্বে এটির নাম ছিল Leucas linifolia spreng. উড়িষ্যার অঞ্চল বিশেষে এটিকে বলে 'গইছু'। হিন্দিভাষী অঞ্চলে একে বলে গোমা বা গুমা।

লোকপ্রচলিত এই হলকষা নামটির তাৎপর্য হ'লো—সাধারণতঃ এটি হলকর্ষিত জমিতে (যে জমিতে লাঙ্গল চষা হয়) জন্মে, তাই তার এই লোকপ্রচলিত নাম।

ঔষধার্থে ব্যবহার হয়—ফুল, পাতা, মূল বা সমগ্র গাছ।

লোকায়তিক ব্যবহার

১। **কামলা রোগেঃ—** যাকে চল্‌তি কথায় আমরা ন্যাবা বলি। কোন অসাধ্য

(যেটি আপনি খেতে অভ্যস্ত নন) বা দূষিত খাদ্য খাওয়ার পরিণতিতে হয় পিত্তবিকার, সেই বিকৃতপিত্ত যখন বায়ু কর্তৃক চালিত হ'য়ে যকৃতে উপস্থিত হয় এবং পরে মূত্র-গ্রন্থিতে সে সঞ্চিত হ'তে থাকে, তারই পরিণতিতে হয় জ্বর, পিপাসা, আহারে অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও দাহ। আরও সঞ্চিত হ'লে গায়ের, হাতের তালু, পায়ের তলার রং হ'লদে হ'তে থাকে, তার সঙ্গে প্রস্রাবের রংও হ'লদে হয়। এ'দের পক্ষে দ্রোণপুষ্প দুই প্রকারে ব্যবহার করা হয়। যেটির বাহ্য ব্যবহার (External application) হ'লো—দ্রোণ গাছের পাতা বেটে, সেটা হাতে মাখিয়ে রগড়াতে হয়, তারপর আস্তে আস্তে জল ঢালতে হয় আর রগড়াতে হয়; যদি প্রকৃতই কামলা বা জণ্ডিস হ'য়ে থাকে, তাহলে হাত থেকে হলুদ আভাযুক্ত জল ঐ পাতা বাটার সঙ্গে মিশে বেরুতে থাকবে; তাই প্রাচীন বৈদ্যগণের মধ্যে প্রথমেই এই দ্রোণ পাতা বাটা হাতে মাখিয়ে এটা কামলা রোগ না অন্য কোন কিছু, সেটা নির্বাচন করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

এখানে আর একটা কথা বলে রাখি—বর্তমানে আর এক প্রকার জণ্ডিস দেখা যায়, সেটাকে বলা হ'চ্ছে ভাইরাস্ জণ্ডিস; তার লক্ষণও একই, তবে সেটা দ্রুতগতিতে শরীরকে দূষিত ক'রে ফেলে। অনেকের আজও ধারণা যে, প্রাচীন যুগে ভাইরাসের কোন অস্তিত্ব তাঁরা জানতেন না, এ ধারণাটা ভুল; অথর্ববেদ এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ক'রেছেন, তবে এই ভাইরাস্ শব্দটা সেখানে নেই, সেখানে বলা হ'য়েছে "যাতুধান"। আর ক্ষেত্র উপযোগী হ'লে তবেই তো এটা রূপ পরিগ্রহ ক'রবে, সুতরাং কোন কারণে সে নিশ্চয় উপযুক্ত পরিবেশ পেয়েছে, তাই। সেইজন্য সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রে পরিষ্কার বলা হ'য়েছে—মৃৎ সম্পর্কের কোন অপক্ক জিনিস ভক্ষণে, এমন-কি এই রোগাক্রান্ত কোন লোকের সংস্পর্শে আসলেও এই রোগাক্রমণ হয়—যদি এইটাই ভাইরাস্ জণ্ডিস বলা হয়, তাহ'লে সংহিতার যুগেও তাঁরা অবগত ছিলেন। আর আভ্যন্তর ঔষধ হিসেবে দ্রোণপত্রের রস ৫ ফোঁটা ৭/৮ চা-চামচ আখের (ইক্ষু) রসে অথবা গ্লুকোজের জলে মিশিয়ে দু'বেলা খেতে দিতে হবে। আর পথ্য হিসেবে প্রাচীনেরা সমস্তদিন বালকদের পক্ষে ১২০ মিলিলিটার থেকে ২০০ মিলিলিটার (আধ পোয়া থেকে এক পোয়া) পর্যন্ত আখের রস খেতে দিতেন, তবে অগ্নিবল কম থাকলে রসের মাত্রা হিসেব করে ব্যবস্থা ক'রতে হয়। বর্তমানে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ আখের রসের পরিবর্তে গ্লুকোজ ব্যবহার ক'রে থাকেন।

২। **ঘুস্‌ঘুসে জ্বরেঃ—** যে জ্বর ৩ সপ্তাহের মধ্যে সুচিকিৎসার অভাবে অথবা ভুল চিকিৎসায় তাঁর শরীর দোষমুক্ত হ'লো না, সেক্ষেত্রে পুনরাক্রমণের ভয়ও তাঁর গেল না; পরিণতিতে সেই দোষাংশ রক্তগত হবে, যার ফলে অল্প অল্প জ্বর মাঝে মাঝে হ'তে থাকবে এবং যকৃৎ (লিভার)-প্লীহাও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। এক্ষেত্রে ফুল সমেত দ্রোণপুষ্প গাছকে কলার পাতায় জড়িয়ে, একটু মাটি লেপে, তাকে পোড়াতে হবে; তারপর মাটি ছাড়িয়ে গাছগুলি একটু থে'তো ক'রে, ছে'কে, সেই রস এক চা-চামচ নিয়ে সকালে ও বৈকালে দু'বার দুধসহ খেতে দিতে হবে; তবে দুধ পাওয়া না গেলে জলের সঙ্গেও খাওয়ানো যায়। একে দেশগাঁয়ে বলা হয় ঘুস্‌ড়ো ক'রে খাওয়ানো।

৩। **নাকভরা সর্দিতেঃ—** ঝেড়ে ফেললেই আবার ভ'রে যায়, বুকে পিঠে যেন জগদ্দল পাথরের মত চাপ ধ'রে আছে; এক্ষেত্রে দ্রোণপুষ্প (ফুল) ৩/৪ গ্রাম পিষে নিয়ে অল্প গরম জলসহ খেলে সর্দিটা বেরিয়ে যাবে এবং বুকে-পিঠের চাপটাও কমে যাবে।

৪। **শিশুদের ক্রিমিতেঃ—** শিশু কাঁদে, কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, পেট যে ফাঁপা তাও নয়, এক্ষেত্রে বুঝতে হবে শিশুর পেটে ক্রিমি আছে; সেখানে দ্রোণের পাতার রস ৩/৪ ফোঁটা একটু জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। এটাতে ক্রিমির উপশম হবে।

৫। **শিশুদের দুধে-শ্বাসেঃ—** এক্ষেত্রে দ্রোণপাতার রস ২/১ ফোঁটা একটু মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিতে হয়, এর দ্বারা ঐ দুধে-শ্বাসটা প্রশমিত হবে।

বাহ্য প্রয়োগ

৬। **দূষিত ঘায়েঃ—** কোন কিছুতেই পুরে উঠতে চায় না—প্রতিদিনই ক্লেদ জন্মে, সেক্ষেত্রে ২/৩ চা-চামচ দ্রোণের পাতার রস এক কাপ গরম জলে মিশিয়ে ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেই জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়।

৭। **দাঁতের পোকা লাগায়ঃ—** অনেক সময় আমরা দেখতে পাই—দাঁতগুলো কালো হ'য়ে সেখানে গর্ত হ'য়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে দ্রোণের পাতার রস (সমগ্র গাছ পাতা নিলেও চ'লবে) ২/৩ চা-চামচ ঈষদুষ্ণ জলে মিশিয়ে সেটা ২/৩ বারে ৫/৭ মিনিট ক'রে মুখে পুরে ব'সে থাকতে হবে, তারপর ওটা ফেলে দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। তবে এর সঙ্গে অল্প একটু লবণ দিলে ভাল হয়।

এই নিবন্ধের শেষে উপসংহার ক'রতে ব'সে সমস্যা এসে গেল—আচ্ছা, আমাদের প্রাচীনদের অভিজ্ঞতালব্ধ উপদেশ হ'লো— (১) পণ্ডিত ব্যক্তিকে সুমিষ্ট ভাষায় তুষ্ট ক'রতে হবে, (২) বিনয় নম্রতার দ্বারা মূর্খকে বশ ক'রতে হবে, (৩) সূর্যের কোপকে ছাতা দিয়ে রক্ষে ক'রতে হবে, (৪) শিঙেল জানোয়ারকে লাঠি মেরে বশে আনতে হবে।

আর যে স্বভাব হিংসুক? যেমন সাপ, তাকে কোন্ রাস্তায় সামলানো যাবে? এ সূত্রটা কিন্তু পুঁথিতে না থাকাতে ম্রিয়মাণ হ'য়ে ভাবছি—দ্রুণ অর্থ হিংসা, তা থেকে হ'য়েছে দ্রোণ, তা যদি হয় তা হ'লে এ ভেষজটি কাকে হিংসা করে? অবশ্য তার সন্ধান বৈদিক সমীক্ষকরা দিয়ে গিয়েছেন, তবে সেটুকু গবাক্ষমাত্র। তা হ'লেও সে ইঙ্গিতটা কিন্তু নূতন তথ্য সন্ধানের উৎস। তাঁরা ব'লেছেন—এটি ওষধিটি যাতুধান নামক রাক্ষসকে বিনাশ করে। তার ক্রিয়া-কলাপের লক্ষণের দ্বারা এইটাই নিশ্চিত হওয়া যায় যে—এই যাতুধান কিন্তু বর্তমান যুগের প্রচলিত নাম ভাইরাস্ বা ব্যাক্-টিরিয়া, আবার সংহিতাযুগে দেখা যাচ্ছে—একে কামলা রোগে (জণ্ডিস্) ব্যবহার করা হ'য়েছে; তাহ'লে এটা কি ভাইরাস্ জণ্ডিসেও কাজ করে? এসব ইঙ্গিতকে যদি আমল না দিই, তা হ'লে আমাদের দাম্পত্য জীবনই চ'লবে কিন্তু পূর্বপুরুষ আর পিণ্ড পাবে না।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Essential oil. (b) Alkaloid. (c) Fatty alcohols. (d) Glucoside.

বায়সী (কাকমাচী)

আর্যধারার ঐতিহ্যমণ্ডিত বৈদিক শব্দভাণ্ডারের মধ্যে কি বিজ্ঞানের, কি স্বাস্থ্যের, কি স্থাপত্যবিদ্যার, কি রণবিদ্যার যেসব তথ্য লুকিয়ে আছে—সেটার সঙ্গে 'মরা হাতি লাখ টাকা'র তুলনা করাটার কালও বর্তমানে নেই, বরং এখনকার কালে তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে 'স্যাকরার ঘরের ঝাঁটানো ধুলোর বস্তা'র সঙ্গে। এ ধুলো থেকে সোনা বের ক'রে নিতে গেলে এর ধোলাই করার সেই রকম ওস্তাদ চাই; এখন সেই ধরনের ওস্তাদের হাতে প'ড়লে তবেই সে সোনা বেরোবে, নইলে ওটা ঐ ধুলোর বস্তাই হ'য়ে থাকবে। সেই ধুলোর বস্তাই এখন আমাদের বেদভাণ্ডার। সে ভাণ্ডার একদিনে পুরে ওঠেনি। ঋক্ এর আদি কাল, তারপর যজুর কালও গেছে, সর্বশেষের যে ধুলো সেটা জোগাড় হ'য়েছে অথর্বার কালে। তাঁরই কালে সংকলন হ'য়েছে অথর্ব-বেদ; সেই ভাণ্ডারের যে 'ভৈষজ্যকল্প' আছে—সেটাতেই বৈদ্যককুলের স্বার্থ বিজড়িত। সংহিতার যুগে (চরক সুশ্রুতাদির কালে) যেসব ভৈষজ্যের গবেষণা হ'য়ে আরও তথ্য সন্নিবেশিত হ'য়েছে, সেটা ঐ তথ্যকেই অবলম্বন ক'রে। সেই গৃহে প্রবেশের সিংহদ্বার হ'লো তার এই নাম বিশ্লেষণটা; যদিও তাঁরা ছিলেন সীমিত-বাক্, তথাপি তাঁদের সে গবেষণার উৎসটা কোন্ স্তরে পৌঁছে দিতে পারে তাই দেখুন।

সিঞ্চতি পরিসিঞ্চতি উৎসিঞ্চতি বায়সী
কুবেরং শোফং অভ্যাদধামি সুরাহৈব বদ্রৈব।
(অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ১৭।৬২।২৫৩)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

বায়সীমুদ্দিশ্য ত্বং তু বায়সীতি বয় এব অস্+ইমন্ বায়সং,

তস্য প্রিয়ত্বাৎ সা লতা বায়সী, রসায়নং—বায়সস্য। কুবেরং কুৎসিত শরীরং শোফং চ সিঞ্চতি পরিসিঞ্চতি উৎসিঞ্চতি। যা তাং অভিদধামি, অপি বভ্রে্র বভ্রুবর্ণায়ৈ পিঙ্গল বর্ণায়ৈ সুরায়ৈ=সুরায়াং স্থিতকিম্বাসরূপায়ৈ মদ্যে।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—বায়সীকে উদ্দেশ ক'রে এই সূক্ত, তুমি বায়সী, বয়স রক্ষা করে এর ফল, তাই বায়সী, এর ফল বায়সের প্রিয় এবং তার রসায়ন। কুবের অর্থাৎ কুৎসিত শরীরে সিঞ্চন করা হয়, শোথে পরিসিঞ্চন করা হয় এর ক্ষুপ লতা, একে ঋত্বিক্ অভ্যর্থনা করেন। এর কিম্বাস পিঙ্গল বর্ণের, যেটি অভ্যন্তরে থাকে।

বৈদ্যকের নথি

বেদের এই সূক্তার্থটির অনুশীলন ক'রে চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় তাকে সন্নিবেশিত করা হ'য়েছে এবং লোকবৈদ্যগণ তাঁদের অনুভূত এর ভৈষজ্য শক্তিটি

লিপিবন্ধ ক'রেছেন। তাই চরক সংহিতার চিকিৎসাস্থানের ৬, ৭, ১৭ ও ২৭ অধ্যায়ের বহুস্থানেই এবং সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রে, কল্পস্থানে এর ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায় এবং বাগ্‌ভটে ও চক্রদত্তে এর ব্যবহার তো আছেই।

এই বায়সী বা কাকমাচী শাকটির ভৈষজ্য শক্তিটি খুব স্পষ্ট ভাষায় চরকে ব্যাখ্যাত হ'য়েছে (চরক সূত্রস্থান ২৭ অধ্যায় ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে), সেখানে বলা হ'য়েছে—

ত্রিদোষশমনী বৃষ্যা কাকমাচী রসায়নী।
নাত্যুষ্ণ শীতবীর্য্যাচ ভেদনী কুষ্ঠনাশিনী॥

এই শ্লোক যেন অবিকল বৈদিক সূক্তকেই সরল ভাষায় বলা হ'য়েছে।

এই কাকমাচী প্রকৃতপক্ষে ত্রিদোষ বিকারকে উপশমিত করে, তাছাড়া এটি বৃষ্য এবং অত্যধিক উষ্ণবীর্যও নয়, তবে এর রস ভেদকের কার্য করে এবং অন্তর্বাহ্যতঃ কুষ্ঠরোগেরও হিতকারী।

আর সুশ্রুত সংহিতায় দেখা যায় কল্পস্থানে কাকমাচীর বাহ্য ও আন্তর ব্যবহারের উল্লেখ; তাছাড়া সূত্রস্থানের ৩৭ ও ৪৩ অধ্যায়েও এর প্রয়োগ, আর বাগ্‌ভটের সূত্রস্থানের ১৫ অধ্যায়ে চরক সংহিতার অনুরূপই ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে।

এস্থলে আর একটু জ্ঞাতব্য এই যে, সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৪০ অধ্যায়ে এই কাকমাচী সম্পর্কে ডল্বন ব'লেছেন—কাকমাচী দুই প্রকারের—একটি অধিকতর তিক্ত-রস সম্পন্ন, অপরটি কিঞ্চিৎ মধুর রস সম্পন্ন। যেটি তিক্তরস সেটি প্রলেপাদি বাহ্য-প্রয়োগে ব্যবহার্য; এটি চক্রদত্তেরও অভিমত।

এভিন্ন ষোড়শ শতাব্দীর ভাবপ্রকাশকার পূর্বখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে এই অভিমত সমর্থন ক'রেছেন। তাছাড়া আরও ব'লেছেন—যেটি মধুর-তিক্ত রস, সেটির পত্র ও গাছ কিঞ্চিৎ শুভ্র (সাদা) হবে। আর যেটি তিক্ত, সেটি কৃষ্ণবর্ণাভ। তবে এই কাকমাচীর বাহ্য ব্যবহার যত বেশী পাওয়া যায়, আন্তর ব্যবহার তত নয়।

পরিচিতি

কাকমাচীর ক্ষুপ এক / দেড় হাত উঁচু হয়, আবার তেমন সার মাটিতে গাছ হ'লে দু'হাত পর্যন্ত উঁচু হ'তে দেখা যায়। এটি ফল পাকান্ত ক্ষুপ অর্থাৎ ফল হ'য়ে পেকে গেলে গাছ ম'রে যায় সত্যি, তবে সেটা গ্রীষ্মকালে; আবার জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়েই গাছ বেরোয়; কিন্তু সব সময়ই কিছু না কিছু গাছ পাওয়া যায়। এই গাছের পাতার অগ্রভাগ ক্রমশ সরু, পাতার কিনারা করাতের মত কাটা। শরৎকাল থেকে আরম্ভ ক'রে গুচ্ছবন্ধ ফুল ও ফল হ'তে সুরু হয়; এই ফুল দেখতে অনেকটা লঙ্কাফুলের মত, আর ফলগুলি আকারে বৃহতী ফলের মত; আর তার বীজ বেগুনের বীজের মত হ'লেও আকারে অনেক ছোট।

এদিকে সুশ্রুত টীকাকার ডল্বন ব'লেছেন, এই কাকমাচী দুই প্রকারের—যে গাছগুলি একটু হরিদ্রাভ এবং পাতাগুলিও তেমন লম্বা হয় না, তাছাড়া এ প্রকারের গাছের ফল পাকলে হরিদ্রাভ লাল হয়, সেইগুলি আভ্যন্তর প্রয়োগের উপযোগী; আর যেসকল গাছ গাঢ় সবুজ, পাতাগুলি একটু লম্বাটে এবং স্বাদেও খুব তিতো, এই গাছগুলিকে বাহ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছেন।

বাস্তবে, আমাদের দুই প্রকার রঙের ফলের গাছ নজরে পড়ে। আমরা কিন্তু

এদিকটাকে লক্ষ্য ক'রে বা বিচার ক'রে প্রয়োগ করি না। আমি লক্ষ্য ক'রেছি, দক্ষিণ কলকাতার বাজারে ঝুড়ি ঝুড়ি কাঁচা সবুজ কাকমাচী ফল বিক্রি হ'তে আসে, এগুলি মদ্রদেশের জনগণ লিভারকে ভাল রাখার জন্য শাকের মত রান্না ক'রে খেয়ে থাকেন। আর ইউনানি সম্প্রদায় এই সবুজ ফলগুলিকে শুকিয়ে ঔষধার্থে পাচন বা ক্বাথ ক'রে অথবা তার অর্ক (আরক) প্রস্তুত ক'রে ব্যবহার ক'রে থাকেন।

কোথায় পাওয়া যায়

এই গণের প্রায় ৭০০ প্রজাতি আছে, এটি জন্মে সমগ্র পৃথিবীর উষ্ণপ্রধান অথবা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে; অবশ্য ৬/৭ হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যেও যে পাওয়া যায় না তা নয়। সুতরাং ভারতের সব প্রদেশেই পাওয়া যায়, তবে কম-বেশী। এটার চাষও ক'রতে হয় না—আপনি জন্মে ও আপনিই ম'রে যায়। এই গাছটির লোকায়তিক নাম গুড়কামাই, হিন্দিভাষী অঞ্চলে একে বলে মকোই, আবার ছাপরা অঞ্চলে এর প্রচলিত নাম "ভ'ট্কু'য়া"; এটির বোটানিকাল্ নাম Solanum nigrum Linn., ফ্যামিলি Solanaceae.

ঔষধার্থে ব্যবহার হয়—সমগ্র ক্ষুপ (গাছ) ও শুক্নো (শুষ্ক) ফল।

লোকায়তিক ব্যবহার

প্রথমেই ব'লে রাখি—আভ্যন্তরিক প্রয়োগের (Internal medication) ক্ষেত্রে স্বাদুপত্র কাকমাচী ব্যবহার ক'রতে হবে, এই গাছের পাতা তিতো (তিক্ত) নয়; তাব'লে মিষ্টি যে তাও নয়। এ বিচারটা ক'রে যদি চিনে নেওয়া সম্ভব না হয়—তাহ'লে ব্যবহার না করাই ভাল।

১। **প্রমেহ রোগেঃ—** আয়ুর্বেদে দু'টি কথা আছে—মেহ ও প্রমেহ এই দুটি রোগের নাম। এই মেহ রোগটা বংশগতও হয় না আর রক্ত বা মূত্রগতও হয় না; প্রমেহ রোগ তা হয়। এই কাকমাচীর পাতা প্রমেহের ক্ষেত্রেই কাজ করে; যদিও এই রোগ যাপ্য তথাপি উপশম হবেই। এটা রসবহ স্রোত দূষিত হ'য়ে যে প্রমেহ রোগ হয়, তাকেই আমরা বলি মূত্রাতিসার অর্থাৎ প্রচুর-পরিমাণ প্রস্রাব হবে এবং আস্তে আস্তে শরীর দুর্বল হ'তে থাকবে, আর থাকে পিপাসা, আলস্য, নিদ্রা এবং পায়ের মাংসপেশীগুলিতে ব্যথা। এক্ষেত্রে স্বাদু কাকমাচী পাতার রস একটু গরম ক'রে, ছে'কে নিয়ে সেই জলটি সকালের দিকে ১ চা-চামচ ও বৈকালের দিকে ১ চা-চামচ খেলে মূত্রাতিসারে উপকার পাবেন। আর অগ্নিবল যদি ভাল থাকে, তাহ'লে ২ চা-চামচ ক'রেও খাওয়া যায়।

২। **পাণ্ডু রোগেঃ—** যাকে ভুলবশতঃ জণ্ডিস্ বলা হয়, এটা সে রোগ নয়; এটা আসলে রক্তাল্পতা, বর্তমানের এনিমিয়া (Anaemia) রোগ। যাঁরা এই রোগগ্রস্ত, তাঁদের শরীরটা হবে ফ্যাকাসে, দাস্ত হবে ছাড়া-ছাড়া (ভস্কা), মলে থাকবে টক গন্ধ; এ'দের ক্ষেত্রে স্বাদু কাকমাচী (এই গাছের ফল পাকলে মিষ্টি লাগে আর রং হয় লাল, এগুলি কাকে খায়) পাতার রস গরম ক'রে, ছে'কে, সকালে ও বৈকালে এক চা-চামচ ক'রে খেতে হবে। এটাতে এনিমিয়াটা চ'লে যাবে, তবে এর সঙ্গে লৌহঘটিত ঔষধ খাওয়া ভাল।

৩। **মুরো ক্রিমিতেঃ—** যাকে আমরা চলতি কথায় কুচো ক্রিমি বলে থাকি (Thread worms), এই ক্ষেত্রে স্বাদু কাকমাচী পাতার রস ১৫ ফোঁটা (বালকের পক্ষে) ৭/৮ চা-চামচ দুধ মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। তবে রসটা গরম ক'রে ছে'কে নিতে হবে।

৪। **মূত্রকৃচ্ছ্রেঃ—** বায়ুবিকারে মূত্রবহ স্রোতের গ্রন্থি যখন শিথিল হ'য়ে যায়, তখন প্রস্রাব ধ'রে রাখার ক্ষমতা আর থাকে না, আর যদি গ্রন্থি স্ফীত হয়—তাহ'লে বারে বারে প্রস্রাব হয় বটে, কিন্তু কষ্টের সঙ্গে এবং পরিমাণেও অল্প হ'তে থাকে। এইটাই মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ। অবশ্য অশ্মরী হ'লে কোন কোন সময় তার সঙ্গে ব্যথাও অনুভূত হ'তে থাকে। এক্ষেত্রে স্বাদু কাকমাচী পাতার রস গরম ক'রে, ছে'কে নিয়ে এক বা দুই চা-চামচ খেতে হবে।

৫। **অরুচিতেঃ—** স্বাদু কাকমাচীর পাতা অল্প সিদ্ধ ক'রে, জল ফেলে দিয়ে সেই শাক ঘি দিয়ে সাঁতলে, শাকের মত প্রথমে ভাতের সঙ্গে খেলে অরুচি সেরে যায়।

৬। **এলার্জিতে (আভ্যন্তরীণ শোথে)ঃ—** এই রোগ সাধারণতঃ পিত্ত-শ্লেষ্মা-প্রধান লোকদের হ'য়ে থাকে। এদের পক্ষে উষ্ণগুণান্বিত দ্রব্যই শোথের কারণ হয়। সেক্ষেত্রে স্বাদু কাকমাচীর রস ১ চা-চামচ গরম ক'রে, ছে'কে দু'বেলাই খেতে হবে। আর যদি গায়ে চাকা চাকা হ'য়ে ফুলে ওঠে, তাহ'লে ঐ গাছ বাটা অল্প গরম ক'রে গায়ে লাগালেও ওটা ক'মে যাবে।

বাহ্য প্রয়োগ

৭। **বিষিয়ে যাওয়ায়ঃ—** কোন জায়গায় বিষাক্ত পোকার কামড়ে বা লোমফোড়া হ'য়ে কিংবা নখ লেগে বিষিয়ে গেলে ফুলে লাল হ'য়ে উঠলো ও যন্ত্রণা হ'তে লাগলো; সেক্ষেত্রে কাকমাচীর গাছ পাতা বেটে, সামান্য গরম ক'রে ঠাণ্ডা হওয়ার পর অল্প ঘি মিশিয়ে সেই জায়গায় লাগালে ওটার বিষুনিটা কেটে যায়। প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাখি—এখানে স্বাদুপত্র কাকমাচী ব্যবহার না ক'রলেও চ'লবে।

৮। **ঘামাচিতেঃ—** কুনো ব্যাঙের গায়ের মত যে চাপ্‌ড়া ঘামাচি হয়—সেখানে এই কাকমাচী পাতা বাটা হলুদের মত গায়ে মাখলে ওটা সেরে যায়।

৯। **চুলকণায়ঃ—** এটা শরৎকালের ও শীতের প্রারম্ভের বেসাতি, এটির বৈশিষ্ট্য হ'লো—প্রথমেই হাতে ধ'রবে, তারপর যোগ্যস্থানে আক্রমণ ক'রবে। এদের পক্ষে কাকমাচী বাটা একটু গরম ক'রে গায়ে মাখলে ২/৩ দিনের মধ্যেই এই রোগটা চ'লে যাবে। তাছাড়া সম্ভব হ'লে স্বাদু কাকমাচীর পাতা জলে অল্প সিদ্ধ ক'রে, জলটা ফেলে দিয়ে, শাকের মত রান্না ক'রে অল্প পরিমাণে খেতে পারলে আরও ভাল হয়।

৯। **কুষ্ঠেঃ—** এই রোগে স্ফোটক যখন বেরোবে—সেক্ষেত্রটা সর্বদাই থাকবে, কোন অঙ্গের অগ্রভাগ, যেমন হাতের, পায়ের, নাকের, কানের ও চোখের জায়গাটিতে। এ রোগে আরও বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে—এই স্ফোটক (ফোড়া) ওঠার সময় তার রংটা থাকবে কালো, ব্যথাও তেমন হবে না ও পুঁজও হবে না, অথচ ক্ষত বেড়ে যেতে থাকবে। এই রকম ক্ষেত্রে যে কাকমাচীটা তিতো (তিক্ত) সেইটার রস একটু গরম ক'রে, ছে'কে,

এক চা-চামচ ক'রে সকালে ও বৈকালে ২ বার খেতে হবে। আর ঐ পাতা বেটে ব্যাধিতস্থানে প্রলেপ দিতে হবে।

১০। **ঝাপ্সা দেখায়ঃ—** তিতো কাকমাচীর পাতা গরম জলে ধুয়ে, থে'তো ক'রে তার রস এক বা দুই ফোঁটা একবার ক'রে চোখে দিতে হবে। এই রকম একদিন অন্তর ৫/৬ দিন ব্যবহার করার পর ঐ ঝাপ্সা দেখা চ'লে যাবে, তবে প্রাচীন বৈদ্যদের অভিমত হ'লো—রসটা গরম ক'রে, ছে'কে, ঠাণ্ডা হ'লে সেই রস চোখে ফোঁটা দেওয়াই ভাল।

১১। **চোখে পিচুটি পড়ায়ঃ—** অনেকের চোখে দেখা যায় যে সমস্ত দিনই চোখের কোণে জমা কফের মত অথবা জমা কফের সুতোর মত পিচুটি প'ড়ছে। এটা এক ধরনের নেত্রনালী রোগ। এই রোগের ওষুধ হ'লো কাকমাচীর ফল অল্প শুকিয়ে নিয়ে, একটি পাত্রে আগুন রেখে তার মধ্যে ঐ ফল দিয়ে, তার ধোঁয়া চোখে লাগাতে হবে; তবে প্রত্যক্ষ ধোঁয়া যেন চোখে না লাগে, তাই কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ঐ ধোঁয়া চোখে লাগাতে হবে।

সর্বশেষে একটা কথা মনে প'ড়ছে—এই কাকমাচী সম্পর্কে ইউনানি শাস্ত্রজ্ঞের কাছে যখন প'ড়েছিলাম, তখন তিনি ব'লেছিলেন—এটি **'আনাবুস্ সালিব্'** অর্থাৎ 'লোম্ড়ী কা আঙ্গুর', লোম্ড়ী অর্থে খে'ক্শিয়াল; আবার বৈদিক চিন্তার ধারাটি যখন প'ড়লাম—এটির নাম "বায়সী"। তার এই নামকরণটি তার গুণগত পরিচয়-ব্যঞ্জক, যেহেতু এটি কাকের পক্ষে রসায়ন তার পাকা ফলগুলি। তাহ'লে আমাদের পক্ষে এটির উপযোগিতা এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার কি করা যায় না? আমাদের অবস্থা এখন হতাশ বৈরাগীর মত অর্থাৎ বৈরাগী হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন—"ঠেলা সামলায় কে বাবা!"

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Alkaloids, viz, Solanine, Saponin. (b) Riboflavin, nicotinic acid, Vitamin-C, β-carotene, Sitosterol. (c) Steroidal glycoalkaloids, viz., solamargine, solasonine and α- and β-solanigrine. (d) Tygogenin.

রাগ-দালিকা (মসুর)

মসুর (ডাল) মানে মসুর—ওর আবার মানে কি হবে? কথায় বলে "মূর্খের একটা জ্বালা আর পণ্ডিতের শতেক জ্বালা"। কেন বলছি?

আমরা সাধারণে ধরে নিই—সব নামই হয় দেবতাদের, না হয় মুনি-ঋষিদের দেওয়া; সুতরাং ওর আবার মানে হয় নাকি? আবার সেই নামটাই যদি পণ্ডিতের খপ্পরে প'ড়ে যায়—তখন কি অবস্থা হ'তে পারে এইবার সেইটাই বলছি—

এই মসুর ভাবতে ভাবতে পণ্ডিতের স্মৃতিচারণা ছুটে গেল অসুরের দিকে, আচ্ছা, ওরা তো সুর-বিরোধী অর্থাৎ দেবতাদের বিরোধী, তবে এ সংস্কারটা কি বৈদিক আর্য্যরা সৃষ্টি ক'রেছিলেন? অবশ্য এটা দেখা যাচ্ছে, রামায়ণ মহাকাব্যের ১/৪৫/৩৮ শ্লোকে বলা হ'য়েছে—যারা দেবতাদের শত্রু তারাই অসুর; তাছাড়া মহাকবি কালিদাসও তাঁর রঘুবংশ কাব্যের তৃতীয় সর্গের ৫৪ শ্লোকে সুরদ্বেষী যে সেই অসুর, এই কথা ব'লেছেন।

এইবার তাঁর স্মৃতিচারণাটা ছুটে যাবে বৈদিক তথ্যের দিকে, সেখানে গিয়ে তিনি দেখবেন অসুর শব্দের দু'টি অর্থ—যাঁরা প্রাণবান, বলবান এবং শত্রুদের তাড়িয়ে দেওয়ার সামর্থ্য ধারণ করেন তারা অ-সুরা অর্থাৎ অস্ (প্রাণ) তার উত্তরে উরণ প্রত্যয় যোগে অসুর, এটা আছে ঋক্‌বেদের ১/৫৪/৩ সূক্তে। আবার দশম মণ্ডলের ১৫৭/৪ সূক্তে বলা হ'য়েছে—যাঁরা বলবান তারাই অসুর; এখানে শব্দবিন্যাস করা হ'য়েছে—তারা শত্রুকে অস্+অস্যতি=ক্ষেপতে উরণ অর্থাৎ ক্ষেপ্তা; যাকে বলা যায়, তুলে ধ'রে ছুঁড়ে আছড়ে দেয় তারাই অসুর। এটাতে এরা যে দেববিরোধী ছিল, সেটা তো বলা হয়নি। বেদভাষ্যকার সায়ণই এইজন্য ব'লেছেন—

অসুর সর্ব্বেষাং প্রাণদঃ (১।৩৫।৭ সূক্ত)।

এর পরের স্তরের বেদ অর্থাৎ যজুর্বেদ থেকে যে যুগ সুরু, তাতে বলা হ'য়েছে, "ন সুরা যত্র" অর্থাৎ ন বারুণী (মদ্য বা তাড়ি) যত্র তত্রৈব অ-সুরা। এর অর্থ হ'লো—যাদের মধ্যে মদ্য বা সুরা অথবা সুধা নেই তারাই অসুর।

সে যুগও কেটে গিয়ে যখন অথর্ববেদের সংস্কারে এসে গেলেন, তখন দেখছেন "বিম্বাংসো হি দেবাঃ ত এব সুরা"—যাঁরা বিম্বান তাঁরাই দেবতা, তাঁরাই সুর আর

যারা অবিদ্বাংসঃ, তারা অসুর অর্থাৎ যারা মূর্খ তারাই অসুর।

এইখান থেকেই সুরু হ'লো অসুর শব্দের বিকৃত ব্যাখ্যা। দম্ভ, দর্প, অজ্ঞানতা যারই আছে সেই অসুর। অঘাসুর, বকাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভাসুর, মহিষাসুর—কত যে অসুরের নাম হ'লো, সেও এক বিরাট পর্ব। এইখানেই অসুরকে খাড়া করা হ'লো দেবতাদের বিরুদ্ধে পুরাণের কাহিনীকে আকর্ষণযোগ্য এবং বলিষ্ঠ করার জন্যে।

এও তো দেখা যাচ্ছে—গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ও ষোড়শ অধ্যায়ে—ঐ অজ্ঞ ব্যক্তিকেই অসুর বলা হ'য়েছে, অর্থাৎ যারা ভোগসুখে মত্ত তারাই অসুর।

এ তো গেল অসুর প্রসঙ্গ, তারপর এই মসুর শব্দটিতেও। ওটিতে যখন আকার যোগ হ'য়ে 'মসুরা' স্ত্রীলিঙ্গ হ'লো, তখন তার অর্থ বারবনিতা (বেশ্যা), ওখানে মস্ ধাতুর অর্থ উজ্জ্বল বেশ, তাকে যারা উর্যতে=স্বীকৃয়তে তারা 'মসুরা'—এ মতটা বৃহৎ সংহিতার ১—২৭ অধ্যায়ে বারবনিতার চরিত্র প্রসঙ্গে। তাছাড়া কয়েকটি পুরাণেও মসুরা বা (মসূরা) শব্দটি এই মতকে সমর্থন করে।

তারপর ষষ্ঠ শতাব্দীর এক প্রখ্যাত সংস্কৃত অভিধান অমরকোষকার "মসুরঃ কলায়-বিশেষঃ" অর্থাৎ মসুর এক শ্রেণীর কলায়। এর টীকাকার ক্ষীরস্বামীও তা ব্যাখ্যা ক'রেছেন।

তাহ'লে মসুর বা মসূর শব্দটি বাররমণী থেকে একেবারে কলায় বিশেষে দাঁড়ালো। পণ্ডিতের স্মৃতিচারণা ছুটে গেল স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানে; সেখানে তো বলা আছে—

মস্করা ন নিষেবেরণ্ মসূরাণ্ মাষকাংস্তথা।

অর্থাৎ যাঁরা মস্কর অর্থে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, তাঁরা মসুর আর মাষকলায় খাবেন না। অমনি তারপর থেকে যতি, ব্রতী, বিধবা, বৈষ্ণব পরিবার—এ'দের মসুর, গাজর, পেঁয়াজ, পুঁই, মাষ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি খাওয়া নিষেধ। এ তো গেল এদিককার কথা, আবার দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের স্মার্তগণ ব্যবস্থা দিলেন—

"মস্করা নান্ন দোষেণ বিদল ক্বাথকেন বা।
দুষ্যন্তি জাহ্নবী তীর্থে ন বা পিণ্ড গয়াক্ষিতৌ"॥

অর্থাৎ যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁরা অন্নদোষে দুষ্ট হন না এবং কোন প্রকার দালের দ্বারাও হন না, যদি তাঁরা জাহ্নবীতীর্থে এবং পিণ্ডদান ক্ষেত্র গয়ায় গমন করেন।

অতএব মসুর কলায় নিয়ে স্মার্তবৃন্দের দু'টি মত এ ভারতে আজও সুপ্রতিষ্ঠিত, কারণ তাঁরা বুঝেছেন এই ডাল তমোগুণে ভরপুর কিন্তু এ দু' দলের মতকে অপেক্ষা বা উপেক্ষা না ক'রে ভৈষজ্যবিদ্‌গণ বিচার ক'রে দেখেছেন—ভেষজ-বিজ্ঞানে দ্রব্যগুণেরই প্রাধান্য, কিন্তু দার্শনিক পরিভাষায় সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের অচিন্ত্যশক্তির বিচার করা সম্ভব নয়। যাঁরা চিহ্নিত হন তমোগুণের খাদ্যভোজী ব'লে, তাঁদের দ্বারাই (প্রাক্-আর্য জাতি) জনকল্যাণ, সমাজকল্যাণ সাধিত হয়। তাঁদেরই বিচারটি ভৈষজ্যবিদ্‌গণ সহৃক্ষেত্রেই গ্রহণ ক'রেছেন। এই মসুর তাঁদেরই দ্রব্যগুণ বিচারিত দ্রব্য।

প্রমাণের নজির

স্বাদ্বীংত্বা স্বাদুনা রুষাং শষ্পবর্হাং রাগদালিকাম্।
অশ্বিভ্যাং পচ্যস্ব, ইন্দ্রায় সুত্রামণে পচ্যস্ব॥
(উপবর্হণ সংহিতা, ৭২।৬২ সুক্ত)

ভাষ্যকার উবট্ এই সূক্তটির ভাষ্য ক'রেছেন—

> অশ্বিভ্যাং ইন্দ্রায় চ দর্শ পৌর্ণমাস—ধর্মেণ ব্রীহিশ্যামাকয়োঃ চরুপাকে তাং বহুজলে পক্তা তত্র রাগদালিকা=রাগেণ রক্তবর্ণ সমাঃ দালিকাঃ ক্ষেপ্যাঃ দালিকেতি=দল্যতে ইতি মসূরাঃ মস্+উরচ পরিমাণ বাচিকা, তাশ্চৈব প্রক্ষিপ্য শৃতালম্ভনানন্তরং পৃথক্ পাত্রয়োঃ আদায় অশ্বিভ্যাং ইন্দ্রায় চ সুত্রামণে যাগে দেয়া, স্বাদ্বী রুষা তীক্ষ্ণা ইতি বলবিশেষণম্।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—মসূর বা মসুর ভেষজটি বল রক্ষণের জন্য, স্বাদু ও তীক্ষ্ণ হ'য়েও দর্শ পৌর্ণমাস যাগ ও সূত্রামণি যাগে অশ্বিনীকুমার যুগল এবং ইন্দ্রের জন্য পক্তব্য। এই দ্রব্যটি শষ্পাবৃত এবং রাগদালিকা ব'লে আখ্যাত। অর্থাৎ রক্তিমাভ এবং শৃত বা সিদ্ধ হ'লে দলিত হয়। মসূর শব্দটি পরিমাণবাচক হ'য়েই পরিভাষিত। ধান্য ও শ্যামাক দ্রব্যের জলসিদ্ধ দশায় রাগ-দালিকাকে প্রক্ষিপ্ত ক'রতে হয়।

বৈদ্যকের নথি

ভাষ্যকারের বক্তব্যে দেখা যাচ্ছে—মসূর শব্দটি পরিমাণবাচক, মস্ অর্থে পরিমাণে তার উত্তরে উর্ বা উর প্রত্যয় যোগে মসুর বা মসূর। প্রতিটি সমপরিমাণে জন্ম নেয় ব'লেই মসুর বা মসূর। এই নামকরণ থেকেই মসূরিকা রোগের নামকরণ।

উপবর্হণ সংহিতোক্ত মসূর কলায়টি আমাদের প্রামাণ্য আয়ুর্বেদ সংহিতাগুলির সূত্র ও চিকিৎসাস্থানে বহুপ্রকারে উল্লেখিত হ'য়েছে, কোথাও বাহ্য ব্যবহারে কোথাও আন্তর প্রয়োগে; সেইজন্যই প্রথম স্থান পেয়েছে চরক সংহিতার সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে, ওখানে বলা হ'য়েছে মসূর কলায় লঘুগুণসম্পন্ন এবং শৈত্যধর্মী, মধুর রসে একটু কষায় রসও আছে, তবে রুক্ষ কিন্তু পিত্ত-শ্লেষ্মাবিকারে খুবই উপকারী। এই দ্রব্যের সূপের দ্বারাও যেমন, তেমনি প্রলেপের দ্বারাও উপকার হয়। তবে এর বিশেষ গুণ—মসূর দ্রব্যটি সংগ্রাহী।

এই জন্যই অন্যান্য দ্রব্যগুণ সংগ্রহগ্রন্থে বলা হ'য়েছে—

'ঋতে মুগ মসূরাভ্যাং অন্যে ত্বাধ্মানকারকাঃ।'

অর্থাৎ মুগ এবং মসূর কখনই বায়ুকারক হয় না, অন্য ডালে তা হয়।

এই মসূরটি চরকের বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়েও উল্লেখিত হ'য়েছে। তাছাড়া বাগ্‌ভটের চিকিৎসাস্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে এবং চক্রদত্তের ব্যবস্থায় আমাশয় (Stomach) ও অগ্ন্যাশয় (Duodenum) -জাত রোগের পরম বন্ধু।

পরিচিতি

মসূর শীতান্তে তোলার ফসল; কার্তিক-অগ্রহায়ণে ক্ষেতে বীজ ছড়ানো হয়. ক্ষুদ্র ক্ষুপ, ১/১½ ফুটের বেশী উঁচু হয় না, গাছগুলি দেখতে অনেকটা ছোলা গাছের মত হ'লেও এর কাণ্ড নরম, ছোট ছোট শাখায় পাখনার মত জোড়া পাতা থাকে,

পাতার আগা (অগ্রভাগ) সরু সুতোর মত, একই বোঁটায় জোড়া ফুল, তাদের রং সাদা; আরও ২ রকম রঙের ফুলও দেখা যায়—একটি বেগুনে এবং একটি গোলাপী; তারপর হয় ছোট ছোট চ্যাপ্টা শুঁটি, তার মধ্যে ধূসর রঙের দু'টি ক'রে চ্যাপ্টা দানা থাকে। এই মসুরি কলাই-এর খোসার গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সরু দাগ।

ছোট ও বড় দু'রকমের মসুর এদেশে হ'তে দেখা যায়; বৈশিষ্ট্য হ'লো—এর কোনটাই কি ওজনে আর কি আকারে ছোট বড় হয় না, অর্থাৎ সবেরই একই ওজন আর একই আকারের হবে। চৈত্র মাসে মসুর ক্ষেত থেকে খামারে নিয়ে এসে তাকে ঝাড়াই করা হয়। চাষ হয় ভারতের সর্বত্রই, তবে বিশেষ ক'রে মাদ্রাজে, বিহারে, উত্তর ও মধ্যপ্রদেশে, তাছাড়া বাংলার প্রায় সব অঞ্চলেই অল্প-বিস্তর চাষ হয়। সব দেশেই এর কচি গাছগুলি শাক হিসেবে রান্না ক'রে খেয়ে থাকেন। এর বোটানিক্যাল্ নাম Lens culinaris Medic., ফ্যামিলি Leguminosae.

এ সম্পর্কে আরও একটা বক্তব্য আছে—পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক De Candolle লিখেছেন যে, এটি প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে পশ্চিম এশিয়ার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে, গ্রীসে, ইটালীতে প্রথমে এর চাষ ছিল; পরে সেখান থেকে মিশরে এটির চাষের প্রচলন হয়; তার বহুদিন পরে ইউরোপ ও ভারতবর্ষে এই মসুর ডালের চাষের প্রচলন হয়। তাঁর মতে প্রাক্-আর্যসভ্যতার যুগে ভারতে এটির প্রচলন ছিল না, অবশ্য বৈদিক তথ্যে এটির উল্লেখ দেখা যাচ্ছে না; তবে অথর্ববেদোত্তর উপবৃংহণ সংহিতায় এটির উল্লেখ আছে। এই সংহিতায় প্রাক্-আর্য গোষ্ঠীর বহু ভেষজ সম্পর্কে আলোচিত হ'য়েছে, সুতরাং এটিও যে সে সভ্যতার, যাকে বলা যায় নগর-সভ্যতার জনকল্যাণ-সভ্যতার যুগে প্রচলন ছিল না, সেটাও মেনে না নেওয়ার যুক্তি থাকতে পারে না কি?

লোকায়তিক ব্যবহার

এই মসুর সাধারণতঃ রসবহ স্রোতে কাজ করে।

১। **মূত্রকৃচ্ছ্রে:**— এ কৃচ্ছ্রতা গ্রন্থিস্ফীতিজনিত ক্ষেত্রের নয়। এটা এসেছে চোরা অম্লরোগ থেকে। কোন কারণে পেটে বায়ু হয়েছে, ঊর্ধ্ব বা অধঃ কোনদিকেই নিঃসরণ হ'চ্ছে না, এক্ষেত্রেও মূত্রকৃচ্ছ্রতা দেখা দেয়, সেখানে খোসা সমেত মসুরের ডাল এক লিটার জলে সিদ্ধ করে ৫০০ মিলিলিটার থাকতে নামিয়ে রেখে দিতে হবে, ওটা থিতিয়ে গেলে, উপর থেকে পাতলা জলটা আস্তে আস্তে ঢেলে নিতে হবে এবং একঘণ্টা অন্তর ৩/৪ বারে খেতে হবে। এর দ্বারা অপানবায়ুর স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে; তার ফলে এই কৃচ্ছ্রতাটা চলে যাবে।

২। **দাহ রোগে:**— যাঁদের শরীরে মেদ কম, যাকে বলে হাড়ে-মাসে জড়ানো, এ'দের দেখা যায় প্রকৃতি মণ্ডলের আবহাওয়ায় একটু অসমতা হ'লেই ক্ষণে দাহ ক্ষণে শীত উপস্থিত হয়। এরা তেল না মাখলে থাকতে পারেন না। এই প্রকৃতির লোক যাঁরা, তাঁরা খোসা সমেত মসুর ২৫ গ্রাম এক লিটার (আন্দাজ এক সের) জলে সিদ্ধ ক'রে ২৫০ মিলিলিটার (আন্দাজ এক পোয়া) থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে উপরের পাতলা জলটা কিছুদিন আহারের সময় অথবা অন্য সময় খাওয়ার অভ্যেস করবেন। এর দ্বারা পিত্তবিকারটা চ'লে গিয়ে দাহটা আর হয় না এবং শরীরে একটু মাংসও লাগে।

৩। **মাথা ধরায়:**— চোখেরও দোষ হয়নি, সমস্তদিন খাটুনি, বৈকালের দিকে

প্রায়ই মাথা ধরে, বৈদ্যকের চিন্তা হ'লো—মস্তিষ্কের শ্লেষ্মধরা কলা বায়ুকুপিত; এখন চাই এমন জিনিস খাওয়া, যেটি এসে স্নিগ্ধ ক'রতে পারে, তাই পূর্বোক্ত নিয়মে গোটা মসুর ডাল সিদ্ধ ক'রে ছে'কে, সেই জলটা কয়েকদিন খাওয়া। এর দ্বারা বৈকালের দিকে মাথার যন্ত্রণা হবে না।

৪। **পেটের ব্যথায়ঃ—** মুখে ভালো লাগছে, তখনও খেয়ে চ'লেছেন, শাকপাতা কিছুই ফেলছেন না, এর পরিণতিতে দেখা গেল পেটে কি যেন গজ্‌গজ্‌ ক'রছে, আর ভিতরে ফুটছে, তার সঙ্গে ব্যথা আরম্ভ হ'য়েছে; এক্ষেত্রে খোসা সমেত মসুরের ডাল পূর্বোক্ত নিয়মে সিদ্ধ ক'রে উপরের সেই স্বচ্ছ জলটাই আধ ঘণ্টা অন্তর ২/৩ বারে খেলে ওটা সেরে যায়।

৫। **বাতকুণ্ডলীঃ—** অম্লপিত্ত হ'লেও এইরকম হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে এ যোগটি উপযোগী নয়। যেক্ষেত্রে পেটটা হঠাৎ শক্ত হ'য়ে বলের মত হয়ে ওঠে, খালি কি ভরা সেটার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে খোসা সমেত মসুর ডাল ২০ গ্রাম ৩ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে এর সঙ্গে এক চা-চামচ খাঁটি ঘি মিশিয়ে তার সঙ্গে পরিমাণমত লবণ দিয়ে সুস্বাদু ক'রে সকালে ও বৈকালে দু'বারে ঐ ডালের জলটা খেতে হবে। এইভাবে তৈরী ক'রে কয়েকদিন খেলে বাতকুণ্ডলী আর পাকাবে না। দেশ-গাঁয়ে একে বায়গোলা বলে।

৬। **পুরাতন গ্রহণী রোগেঃ—** মল কখনও ঢিলে কখনও শক্ত—এটার চিকিৎসায় চিকিৎসকের বিভ্রান্তি ঘটে। এই মল এমন শক্ত হয়—যেন অজাবিষ্ঠা, আবার যেদিন দাস্ত হ'তে আরম্ভ হ'লো তো একদিনেই ৭ দিনের রোগী; এক্ষেত্রে অর্থাৎ বাতকুণ্ডলী রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত পদ্ধতিতে মসুরের যূষকে সমস্তদিনে ৪ বারে খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৭। **গ্রহণী রোগেঃ—** এর লক্ষণ আবার অন্য ধরনের, সেটা হ'লো—৪/৫ বার দাস্ত হয় কিন্তু সেটা দিনের বেলাই হ'য়ে যাবে, রাত্রে উৎপাতে প'ড়তে হয় না। এক্ষেত্রে উপরিউক্ত নিয়মে মসুরের যূষ প্রস্তুত করার সময় ১০ গ্রাম বেলশুঁঠ ওটার সঙ্গেই সিদ্ধ ক'রতে হবে। তারপর ছে'কে কেবলমাত্র ঐ জলটাই নিতে হবে। সকালে ও বৈকালে দু'বারে ঐ যূষটা খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৮। **রক্তপিত্তেঃ—** কোন প্রকার ডাল রক্তপিত্তরোগে খাওয়া অসমীচীন সত্যি, কিন্তু বৈশিষ্ট্য এইটাই যে—এই মসুর ডালটাকে ব্যবহার করা যায়, কারণ রাগদালিকার রক্তিম-রূপে তার সহায়ক হয়, সেটা না ব'লে এটি পিত্ত এবং শ্লেষ্মা—এ দু'টির উপর যেমন কাজ করে, দ্বিতীয়তঃ কষায়ধর্মী হওয়াতে তার সংকোচনশক্তি বৃদ্ধি ক'রে রক্তস্রুতিকে কমিয়ে দেয়, তার উপর বাতানুলোমক ব'লে গলা সুড়্‌সুড়্‌ ও বমনের বেগ কমিয়ে দিয়ে রক্তবেগকে সংহত করে, তাই মসুর ব্যবহার ক'রতেন প্রাচীনগণ। তবে খোসাসমেত মসুরকে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে নিয়ে দু'বেলায় খেতে হবে। তবে ঐ ডাল সিদ্ধ হওয়ার সময় দুই/এক মুঠো (মুষ্টি) সাদা খই ওর সঙ্গে সিদ্ধ ক'রতে হবে। মাত্রা ১০—২৫ গ্রামের মধ্যে।

৯। **জ্বালা মেহেঃ—** ক্ষেত্রটা হ'লো মূত্রনালী দিয়ে যা বেরোয়—সেটাতেই জ্বালা অথবা শুক্রনির্গত হওয়ার সময়ও জ্বালা করে আর প্রস্রাব করার সময় তো ক'রেই, অথচ প্রস্রাবের সঙ্গে যে কিছু নির্গত হ'চ্ছে তা নয়। এক্ষেত্রে ২৫ গ্রাম খোসা সমেত

মসুরের ডাল দেড় লিটার জলে সিদ্ধ ক'রে এক লিটার থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে দিনের মধ্যে দুই/তিন বারে সেই জলটা খেতে হবে, এর দ্বারা ঐ জ্বলুনিটা চ'লে যাবে।

১০। **জীর্ণজ্বরেঃ—** যেটাকে আমরা ঘুস্ঘুসে জ্বর ব'লে থাকি—এক্ষেত্রে ২০/২৫ গ্রাম খোসা সমেত মসুরের ডাল ৫ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ৩ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে ঐ জলটা ২/৩ বারে খেতে হবে।

বাহ্য ব্যবহার

১১। **বর্ণের ঔজ্জ্বল্যেঃ—** লোকে একদিন সুন্দরী ব'লতো, কিন্তু আজ কালোর পর্যায়ে, লিভার যে খারাপ তাই বা বলি কি ক'রে, অথচ গায়ের ও মুখের রঙটা চেপে গিয়েছে—এমতাবস্থায় মসুরীর ডাল (খোসা বাদ) ও এক টুকরো কাঁচা হলুদ (এক গাঁটের মত) একসঙ্গে বেটে ওর সঙ্গে একটু দুধের সর মিশিয়ে মাখতে হয়, এর দ্বারা ঐ ঝাঁই দাগটা উঠে যায়।

১২। **চোখ ওঠায়ঃ—** এর উপসর্গ হ'লো—চোখ ফুলে যাওয়া ও পিচুটি পড়া, এক্ষেত্রে মসুরের ডাল বেটে চোখের পাতার পাশে লাগিয়ে দিলে ফুলো ও পিচুটি পড়া ক'মে যাবে।

১৩। **ফোড়ায়ঃ—** পেকে গিয়েছে বটে, কিন্তু ফাটছে না, আবার এও হয়—পাকছেও না, যাকে বলে দরকচা মেরে আছে, এক্ষেত্রে মসুরের ডাল বেটে, গরম ক'রে ফোড়ার উপর প্রলেপ দিলে—হয় বসবে না হয় ফাটবে।

১৪। **গাত্র-দৌর্গন্ধেঃ—** দেশগাঁয়ে একে বলে "বাক্রেশে গন্ধ"। যার উপায় নেই সেই-ই কাছে আসে, নইলে জানা লোকে দূরে থাকতে চায়; এঁরা যদি মসুরের ডাল বেটে গায়ে, বিশেষতঃ যেসব জায়গায় ঘাম হয়, সেখানে সপ্তাহে ৩ দিন মাখেন, তাহ'লে ওটা সেরে যায়।

১৫। **ঠুন্কো হ'লেঃ—** মায়েরা বড়ই ভারাক্রান্তা হ'য়ে পড়েন, যন্ত্রণাও হয়, এক্ষেত্রে মসুরের ডাল বেটে স্তনে লাগিয়ে দিলে ব্যথা ও ভার হওয়াটা ক'মে যায়, তবে যতক্ষণ খানিকটা স্তন্য না বের করে ফেলা যায় ততক্ষণ স্বস্তি হয় না।

১৬। **রক্তগুল্মেঃ—** যাঁদের মাঝে মাঝে মাসিক স্রাব বন্ধ থাকে, আবার ২/৩ মাস বাদে বেশী স্রাব হ'তে থাকে, তাঁরা মসুরের ডাল ভোজ্য হিসেবে প্রায়ই খাবেন। এর দ্বারা ঐ অনিয়মিত স্রাবটা চ'লে গিয়ে স্বাভাবিক হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ— অনেকগুলি মুষ্টিযোগে খোসাসমেত মসুর ডাল ব্যবহার করতে বলা হ'য়েছে, যদি একান্তই না পাওয়া যায়, তা'হলে খাঁড়ি মসুরী ব্যবহার করলেও কিছুটা হবে।

আজ এই নিবন্ধটি 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ক'রতে ব'সে মনটা হঠাৎ বিগড়ে গেল; তখনই মনে এলো—স্মার্ত মতবাদটি কেমন যেন একটু একপেশে, যাকে বলা যায় সুবিধেবাদী মতবাদ—তাঁদের উপদেশ হ'লো মাটিতে পড়া ফুলে পূজা হবে না, কিন্তু শিউলি ও বকুল ফুলের বেলায় কোন দোষ নেই, কারণ রাত-দুপুরে কে ফুল পাড়বে? দ্বিতীয়তঃ, পদ্মফুল যে কোন জাতি-বর্ণের লোকে এনে দিলে পূজা হবে, কারণ মজা-পুকুরের মধ্যে সাপখোপের হাত থেকে কে তুলে নিয়ে আসে, আর দূর জলযাত্রায়

নৌকায় বহু জাতি উঠেছে—সেখানে উপবাসে থাকা কি সম্ভব, সুতরাং "বৃহৎ কাষ্ঠে দোষো নাস্তি"। ঔষধপথ্যের বেলায় সুরাতেও দোষ নেই। আবার পেটে বায়ু হ'য়ে দাস্ত বন্ধ। বৈদ্যের উপদেশ মসুরের ডালসিদ্ধ জল খেলে ওটা স্বাভাবিক হবে, সেটাও দেহধর্মকে রক্ষে ক'রতে গেলে ওটাতে দোষ নেই। তাই ব'লছিলাম—নিদেনের (হেতু) কাছে বিধেন চলে না; সংস্কারটা সেখানে গৌণ, প্রয়োজনটাই এখানে বড়, তাই প্রয়োজন হ'লে সবই সচল। এই যে দ্বাদশ প্রকার বিবাহ, তাও তো অনুমোদিত হ'য়েছিলো, সে তো নিরুপায় হ'য়েই, তারপর তাকে ফারখত দেওয়া হ'লো।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Vitamins of B group, other vitamins are: Carotene, ascorbic acid, vitamin K, tocopherol. (b) Protein, starch.

গবাক্ষী (শাখোটক)

রাষ্ট্রের জীবনে হয়তো এমন একটা সময় এসেছিলো, যে সময় মূর্খ ও অকালকুষ্মাণ্ডগুলোকে রাষ্ট্র পোষণ ক'রতেন, আর যাঁরা মনীষী তাঁদেরকে অবহেলা করতেন; তাই এক মনীষী দুঃখ ও আক্ষেপের সঙ্গে ব'লেছিলেন যে—

'ছেদশ্চন্দনচূত চম্পক বনে রক্ষাপি শাখোটকে',

অর্থাৎ যে দেশে বেছে বেছে চন্দন, আম আর চাঁপা ফুলের মত মূল্যবান গাছগুলি

কেটে শাখোটক (শেওড়া) গাছকে যত্ন করে, সেই দেশকে নমস্কার—'দেশায় তস্মৈ নমঃ'। আজও ভাবি—সেই মনীষী বোধ হয় হাড়ে-হাড়ে অনুভব ক'রেই এই ছন্দটি রচনা ক'রেছিলেন। আবার এটাও সত্যি, প্রয়োজন তো সবেরই আছে। বৈদিক সমীক্ষায় কিন্তু এই শাখোটক উপেক্ষিত হয়নি সমাজকল্যাণে তার উপযোগিতায়। তারই সমীক্ষা

ক'রেছেন অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ১৩৯।৫৩।২ সূক্তে, সেখানে পাওয়া যায়—

মাহির্ভূমা পৃদাকুঃ গবাক্ষী উরুংহি রাজা শাখোটকং চকার।
সূর্য্যায় পন্থানং অন্বেতং উচক্ষুর্বিতথ্যং করচ্ছদং॥

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> গবাক্ষীরিতি=কিরণঃ গোঃ তেষাং অক্ষিরিব অশ্+অচ্ ই=অক্ষীব অন্তং প্রবেশকরং ইতি। গবাক্ষী অহির্ভূমা, সর্পাণাং প্রীতিকরীভূঃ। ত্বং পৃদাকুরসি, পৃদাকুঃ পর্দগতৌ, সর্পাণাং গতিসম্প্রসারণং বৃশ্চিকানাং চ। তব ভূমি পৃদাকুঃ। উরুং কাষ্ঠসারং অক্ষধ্বং শাখোটকং চ রাজা চকার। সূর্য্যায় পন্থানং অন্বেতং শাখোটত্বাৎ পত্রাচ্ছাদৈঃ ব্যাপ্তত্বাৎ। তব করচ্ছদং চক্ষুষাং বিতথ্যং ব্যাহতিং বিদধাতি। গবাক্ষী তু সূর্য্যকিরণস্য শারীর পিত্তস্য অক্ষিরিব সাধর্ম্যাৎ।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—তুমি গবাক্ষী। সূর্যকিরণকে অন্তরে প্রবেশ করাও, তোমার করে (অগ্রভাগে) প্রচুর পত্রশাখা আছে, তাই তোমার নাম শাখোটক (সূর্য-কিরণের প্রবেশ ঘটলেও তার বাহ্য প্রকাশ হয় না)। তোমার মূলদেশ সর্পের এবং বৃশ্চিকেরও আবাস এবং বিচরণভূমি। তোমার শাখাপল্লবের ছাদকে সূর্য অন্বেষণ ক'রে ভিতরে প্রবেশ করে। তোমার উরুদেশ শকটের অক্ষধর। তোমার রস দেহের পিত্তকে ভক্ষণ করে, সাধর্ম্য আছে তাই। তোমার করচ্ছদ চক্ষুর গতিকে ব্যাহতি সাধন করে।

বৈদ্যকের নথি

বৈদিক সূক্ত থেকে কি ইঙ্গিত পাওয়া গেল—

(১) 'সূর্যকিরণকে অন্তরে প্রবেশ করাও'—এটিতে দেখা যাচ্ছে, যেসব রোগে সূর্যকিরণের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে এই গাছের পাতা বেটে লাগালে ওটায় ফলপ্রসূ হওয়া অসম্ভব নয়, যেমন—শ্বিত্র রোগীর ক্ষেত্রে; আর দ্বিতীয়তঃ এই গাছের তেজো-ধর্মী প্রভাব থাকায় কফধর্মী রোগের ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা থাকবেই।

(২) আবার আর একটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, 'তোমার রস দেহের পিত্তকে ভক্ষণ করে', তবে এটি কি বিকৃত পিত্তের ক্ষেত্রে অথবা সাধর্ম্য থাকাতে সামান্যধর্মী হ'য়ে বৃদ্ধির কারণ হয়, কোনটি? সেটি বিচার্য—সংহিতা যুগের প্রয়োগের অনুশীলন দেখে। তাঁরা দেখেছেন—শাখোটকের সার, পত্র, বৃক্ষত্বক্, ফুল ও ফলের গুণাগুণ। এ বিষয়ে অগ্রণী সুশ্রুত সংহিতার অভিমত আমাদের সর্বাগ্রে প্রণিধানযোগ্য। ঐ সংহিতায় বলা হয়েছে (চিকিৎসাস্থান ১৮ অধ্যায়)।

মেদ ও কফ যখন দূষিত হয় একই স্রোতে, তখন এমন একটি রোগ জন্মগ্রহণ করে যে, সেটি মাসের পর মাস ধ'রে নানাভাবে ব্যক্তিকে আক্রমণ করে, এইভাবে কখনও অপচী (Scrofula), কখনও গণ্ডমালা (Hodgkin's disease), কখনও গলনলীর স্ফীতি প্রভৃতি অর্থাৎ আরও স্পষ্ট হয়; এইভাবে আমাদের দেহে যতগুলি স্রোত আছে, তাদের মধ্যে ১২টি স্রোতের প্রাধান্য সর্বদাই। এই মেদোবহ স্রোত হ'ল সপ্তম।

এটি দূষিত হয় যদি কোন ব্যক্তি শারীর-শ্রমবিমুখ, দিবা-নিদ্রায় আসক্ত এবং ঘৃত, চর্বি, তৈলাক্ত খাদ্যে অত্যধিক আসক্ত এবং ভোক্তাও বটে—এদের হয় ব্যাকুলিত কফের গতি ব্যাহত; এর দ্বারা উপরিউক্ত রোগগুলি তো আসেই, আরও আসে গ্রন্থিবাত, নানা প্রকার কণ্ডু রোগ; এগুলিতে দূষিত ক্ষতেরও সৃষ্টি করে। আবার কখনও কখনও প্রায় সারা বৎসর ধ'রে কখনও গণ্ডে, কখনও বা বাহুতে, কখনও কুক্ষিতে, বঙ্খণে (কুঁচকি)

নানান ধরনের শোথের সঙ্গে বিষফোড়ায় আক্রান্ত হয়। এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে—

'মেদঃ কফাভ্যাং খলু রোগ এষ, সুদুস্তরো বর্ষগণানুবন্ধী',

অর্থাৎ মেদ ও কফের দ্বারা অনুবন্ধী হ'য়ে এই রোগ দীর্ঘকাল অবস্থান করে। একাদশ শতকে চক্রদত্ত মহাশয় এই গাছটিকে ব্যবহার করেছেন বাতরক্তে। এই বাতরক্তের উপসর্গ প্রায় কুষ্ঠের মত। এই রোগটির প্রথমে আক্রমণ হয় হাতে ও পায়ে, অঙ্গুলির পর্বসন্ধিতে, তারপর সেটা সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এভিন্ন বায়ুবিকারের শোথেও শাখোটকের বৃক্ষের ত্বকের রস মহদুপকারী। দীর্ঘকাল পরে সপ্তদশ শতকে এসে (বঙ্গসেনের সময়) আরও অগ্রগতি লাভ ক'রেছে; তিনি ব'লেছেন—এটাকে শ্লীপদেও (Filaria) ব্যবহার করা যাবে।

পরিচিতি

প্রথমেই বলে রাখি—বাংলাদেশে এই গাছটির প্রচলিত নাম শেওড়া, চলতি কথায় আমরা একে শাঁড়া গাছ ব'লে থাকি।

বাংলায় একটা কিংবদন্তী আছে যে, এ গাছে পেত্নী (প্রেতিনী) বাস করে, তাই কোন কুরূপা মেয়ের রূপের সঙ্গে তুলনা ক'রে ব'লে থাকে, "শাঁড়া গাছের পেত্নী"। অবশ্য পরবর্তীকালে এর একটি নাম ভূতাবাসও বলা হ'য়েছে। এ নাম রাখার আর একটি কারণও থাকতে পারে, বৈদিক তথ্যে দেখা যাচ্ছে—এ গাছের মূলদেশে সাপ ও বিছে থাকতে ভালবাসে; হয়তো বা কল্যাণকামী বৈদ্যককুল মানুষের সংস্কারকে (কু?) কাজে লাগিয়ে এই গাছের সান্নিধ্যে লোক যাতে রাত-বেরাতে না যায়, তারই ইঙ্গিত থাকতে পারে; অথবা অন্য কিছু।

এই গাছটিকে হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে শহোরা বা শিহোড় বলে, উড়িষ্যার অঞ্চল বিশেষে একে বলে শাহাড়া, সংস্কৃত নাম যে শাখোটক, এটা পূর্বেই উল্লেখিত হ'য়েছে।

এই গাছ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিবাঙ্কুর, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই বিক্ষিপ্তভাবে জন্মে, তবে খুব উঁচু পাহাড়িয়া অঞ্চলে হ'তে দেখা যায় না।

ঝোপ-ঝাড় চিরসবুজ গাছ, দীর্ঘদিনে তিলে তিলে বাড়ে, তবে ১৫/২০ ফুটের বেশী সাধারণতঃ উঁচু হয় না, আর এই গাছের শাখা-প্রশাখাগুলি সোজা বড় হয় না, প্রায়ই গাঁট, পাতার আকার চওড়া ১/১½ ইঞ্চি, লম্বা ২/২½ ইঞ্চি, কিন্তু খস্‌খসে কাকডুমুরের (Ficus hispida) পাতার মত। এই গাছের পাতাগুলি এত ঘন-সন্নিবিষ্ট যে গাছের নিচে রৌদ্র পেঁছোয় না। এইজন্যই এর নাম দেওয়া হ'য়েছে শাখোটক। শাখা+উটক=শাখোটক, উটক শব্দের অর্থ ছাদ। পাতা ছিঁড়লে বা গাছ কাটলে দুধ (ক্ষীর) বের হয়, মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয়, আকারে মটরের মত হ'ল্‌দে রংয়ের ফল হয়, পাকে জুন মাসে।

এর আর একটি নাম ক্ষীরনাশ, কারণ এর পাতা ছাগীকে খাওয়ালে দুধ চ'লে যায়। গাছটির বোটানিকাল্‌ নাম Streblus asper Lour., ফ্যামিলি Moraceae.

এই গাছটির সম্পর্কে একটা মজার কথা ব'লে রাখি—মেদিনীপুরের অঞ্চলবিশেষে এই গাছেরও বিয়ে হয়; যাঁরা "বউ-খেগো" অর্থাৎ যাঁদের বউ বাঁচে না, তাঁদের পুনর্বার বিয়ের দিনে এই গাছের সঙ্গে আগে মালা বদল ক'রে তারপর বিয়ে ক'রে থাকেন। জানি না এই ভূতাবাস নামীয় গাছটির উপযোগিতায় এর আর এক তান্ত্রিক প্রক্রিয়া কিনা। আর একটি তথ্য জানাই—ছাগল চুরি ক'রে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই গাছের

একটি পাতা ছাগলের জিভের তলায় দিয়ে দেয়, তা'হলে সে জোরে ডাকতে পারে না, কেবল গোঁ গোঁ শব্দ করে।

ব্যবহারিক ক্ষেত্র

১। **ঊর্ধ্বগত রক্তপিত্তেঃ—** শেওড়া ছালের রসে পক্ক ঘৃত (আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত) আধ চা-চামচ মাত্রায় সকালে ও বৈকালে দুইবার খেতে হয়। এর দ্বারা ওটা উপশমিত হবে (এই রোগের লক্ষণ চিরঞ্জীবের প্রথম খণ্ডে ৩২১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে)।

২। **অর্শরোগেঃ—** অন্তর্বলি ও বহির্বলি যাই থাক—শেওড়াছালের রস ৩০ ফোঁটা মাত্রায় আধ কাপ দুধের সঙ্গে সকালে ও বৈকালে দুইবার খাওয়ালে প্রথমে অর্শের রক্তপড়া বেড়ে যাবে, তারপর ঐ রসে পাককরা ঘি এক চা-চামচ ক'রে দুধের সঙ্গে খেলে ওটা সেরে যাবে; তবে প্রথমে একটু না বৃদ্ধি হ'লে অর্শের বলি চুপ্‌সে যাবে না, তাই প্রথমে রস ক'রে খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দ্রব্যশক্তিতে একটু বাড়িয়ে নেওয়া।

৩। **অতিসারেঃ—** এ অতিসার পিত্তবিকারের নয়, শ্লেষ্মাবিকারের এই অতিসারের লক্ষণ হ'লো—থোকো থোকো আম বা চাল ধোওয়া জলের মত অসাড়ে দাস্ত অথবা পচা মাংস ধোয়া জলের মত মল নিঃসরণ হ'তে থাকলে শেওড়া ছালের রস ২০ বা ৩০ ফোঁটা একদিন বা দুইদিন বার্লির সঙ্গে খেলে ওটা সামলে যাবে।

৪। **কোষ্ঠবদ্ধতায়ঃ—** এটা যাঁদের সাময়িক নয়, প্রত্যহই ঐ অসুবিধেটায় ভুগে থাকেন, তাঁরা শেওড়া পাতা অথবা মূলের ছালের রস দিয়ে ঘি পাক ক'রে রাখবেন; ঐ ঘিটি (ঘৃতটি) প্রত্যহ প্রাতে আধ বা এক চা-চামচ ক'রে একটু গরম দুধের সঙ্গে কিছুদিন খেয়ে দেখুন ঐ কোষ্ঠবদ্ধের ধাতটা বদলে যাবে।

৫। **হাঁপানি ও কাসিঃ—** সকালে উঠলেই অচল। এটাতে যদিও সারবে না, তবু উপশম তো হবে—আধ চা-চামচ ঘিয়ের সঙ্গে ২/৪ ফোঁটা শেওড়া ছালের রস মিশিয়ে খেয়ে ফেলুন; এটাতে কিছুক্ষণ ভাল থাকবেন; তবে আর একটু বেশী সময় ভাল থাকবেন—যদি চিরতার গুঁড়ো (Swertia chirata) সিকি বা আধ গ্রাম এর সঙ্গে মিশিয়ে চেটে খান।

৬। **শ্লীপদে বা গোদে** (Filaria) :— লজ্জাকর রোগ, সর্বদা ভয়—কেউ না দেখে ফেলে, কিন্তু ঢাকা কি যায়? এ রোগে মুক্তি পাওয়ার জন্য গোমূত্র খেলে যদি এ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় সেটা কি ভাল না? তাই বলছি শেওড়া ছালের রস আধ বা ১ চা-চামচ ২/৩ চা-চামচ গোমূত্রের সঙ্গে মিশিয়ে প্রত্যহ সকালে একবার ক'রে খান; তবে স্বাস্থ্য ভাল থাকলে সকালে বৈকালে ২ বার খাবেন। তবে সবৎসা হওয়ার পূর্বের যে গরু তার মূত্র হ'লেই ভাল হয়।

বাহ্য প্রয়োগ

৭। **দাঁতের পাথুরীতেঃ—** দাঁতের গোড়ায় পাথুরী জমে যাঁদের, তাঁরা শেওড়া গাছের ছাল চূর্ণ অন্য কোন মাজনের সঙ্গে সিকি ভাগ মিশিয়ে সেই মাজন দিয়ে দাঁত মাজুন—এর দ্বারা দাঁতের গোড়ার পাথরগুলি ক্ষয়ে উঠে যাবে।

৮। **শ্বিত্রে (শ্বেতীতে):—** শেওড়াবীজের তেল শ্বেতীর দাগে লাগালে এক মাসের মধ্যে ওগুলি মিলিয়ে যেতে সুরু ক'রবে, তবে যেখানে লোম ওঠে না সেখানে কোন কাজ হয় না, অন্য জায়গায় স্বাভাবিক হয়।

কি ক'রে তেল ক'রতে হবে? বীজের সময় সুপক্ক হ'লদে বীজগুলো সংগ্রহ ক'রে শুকিয়ে ঘানিতে পেষাই করিয়ে তৈলা ক'রে নিতে হবে।

৯। **বাত শোথে:—** মেদ ও কফ বিকৃত হ'লে বাত শোথ রোগ হয়। এর প্রধান লক্ষণ গাঁটে, মাংসপেশীতে ও উরুতে ব্যথা, কোন কোন সময় প্রস্রাবও পরিষ্কার হয় না। এক্ষেত্রে শেওড়ার পাতা খুব মিহি ক'রে বেটে অল্প গরম ক'রে প্রলেপ দিলে অথবা তেল-হলুদ মাখার মত আস্তে আস্তে লাগালে ব্যথা বা যন্ত্রণা সেরে যাবে, তবে বেশী ঘ'ষবেন না, সেখানে জ্বালা ক'রবে।

১০। **হাত-পা ফাটায়:—** শেওড়া গাছের আঠা (ক্ষীর) হ'লে ভাল হয়, নইলে ছালের রস লাগাতে হয়।

হাতির দাঁতের কোন বস্তুকে পালিশ ক'রতে এই শেওড়ার পাতা পূর্বে ব্যবহার করা হ'তো। দেশগাঁয়ে একটা কথা আছে—তিন দড়ি কাটলে তবেই সে মুক্ত হয়, আর বৈদ্যের বেলায় তিন দড়ি গলায় দিলে তবেই সে বৈদ্য হবে। প্রথম দড়ি তার বেদোপ-নয়ন সংস্কার, দ্বিতীয় দড়ি তার বেদাভ্যাস সংস্কার, তারপর তৃতীয় দড়ি হ'লো বৈদ্যকের সংস্কার। এ সংস্কারের পরিপূর্ণতা তখনই আসে, যখন তার কাছে জগতে পরিত্যজ্য ব'লে কোন জিনিসের হদিশ মেলে না। আপাতঃদৃষ্টিতে এই শ্যাওড়া গাছটি অখ্যাত কিন্তু বৈদ্যকের দৃষ্টিতে এটা যে কত প্রয়োজনীয়, সেটার অনুশীলন দেখলেই বোঝা যায়। আজ আমাদের তিন দড়ি কেটে গিয়েছে, তবে সে অন্য পথে (লজ্জা, ঘৃণা, ভয়), তাই কালজ পরিহাসের তরঙ্গে গা ভাসিয়ে মনে মনে ভাবি—'আর কি গোদে ভয়, গোদের কাপড় তুলে এখন সবার মাঝে রয়।' আমরাও সেই দলে নই কি?

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Milky juice. (b) A bitter substance.

মদন (বকুল)

একটা কথা প্রায়ই মনে আসে—আমরা যাঁদের দেবতা বা সুর বলি এ'রা কারা? এ'রা কি অশরীরী ছিলেন?

না আমাদের মতই, অথবা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোন দেহধারী, যেমন ছিলেন ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও বরুণ? তাঁরা কি গ্রহান্তরের লোক? না সবই কল্পনা? আচ্ছা তাই যদি হয়, তাহ'লে বৈদিকযুগে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা তো শরীরী ও বাস্তব। ধ'রেই নিলাম সেই দেবতারা ছিলেন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন; কিন্তু তাঁদের যে অন্যান্য নামকরণ করা হ'য়েছে—সেগুলি ক'রলে কারা? বাস্তবে দেখা যাচ্ছে—তাঁরা সুরাপায়ী, সুরাপ, সুরাধিপ প্রভৃতি।

এই যে সুরাপায়ী ব'লে তাদের বিশেষিত করা হ'য়েছে, তাহ'লে সুরা সে যুগেও কি অঢেল ছিল?

এখন দেখা যাক এটাই বা কি? আমরা ঋক্‌বেদের ৮।২।১২ সূক্তে দেখতে পাচ্ছি—সুরা মানে অভিষুত দ্রব্য অর্থাৎ এক দ্রব্যের সংগে অপর একটি দ্রব্যের মিশ্রণের পর কালে (পরিণামে) তা থেকে অভিষুত অর্থাৎ পচনক্রিয়াজাত রসই সুরা। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে—সুর অর্থাৎ দেবতারা সুরা প্রস্তুত জানতেন, ক'রতেন এবং খেতেনও। এটা তাঁদের গবেষণালব্ধ দ্রব্য ব'লেই কি সুরা?

আবার এদিকে সুরের অর্থ করা হ'য়েছে—যিনি সমাজকে সেবা করেন তিনিই সুর; আরও বলা হ'য়েছে সুষ্ঠু রাতি ইতি সুর অর্থাৎ সু-শৃঙ্খলা দিতে পারে যে, সেই সুর।

মর্তের সমাজকে ব্রাহ্মণই সু-শৃঙ্খলে বদ্ধ ক'রেছিলেন ব'লেই তাকে বলা হয় ভূ-সুর; কিন্তু সুরা? যার প্রচলিত নাম মদ্য বা মদ, সে কি কখনও শৃঙ্খলা আনে?

সে তো বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করে। তাহ'লে কি আমাদের এই সুরা আর সেই সুরা-পায়ীর সুরা কি পৃথক ছিল?

যাক্ সে কথা, যাঁরা চিকিৎসক তাঁরা শারীর বিজ্ঞানের কথাই ভেবেছেন; প্রাণশক্তি থাকলে তবেই তো সুরার শক্তিকে কাজে লাগানো যাবে; তাই তাঁরা শারীর বিজ্ঞানের

সঙ্গে দ্রব্যবিজ্ঞানটাকে একীভূত ক'রে তার প্রাণশক্তিকে কি ক'রে উদ্দীপিত করা যায় এবং কে তার সহায়ক—সেইটাই বিচার ক'রেছেন। এখন শারীর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখতে হবে, কে তাড়িৎগতিতে জীবদেহে প্রবাহিত হ'তে পারে, সেখানে দেখা যায়,

সুরাই ছিল একমাত্র দ্রব্য—যার চালন-শক্তি আছে। আরও পরবর্তী যুগে আমরা বহু জিনিস পেলেও 'হয়তো সেটার প্রভাব-শক্তি তাড়িৎগতিতে কাজ করে সত্যি কিন্তু বস্তুর অস্তিত্ব সেখানে থাকে না।'

পরবর্তীকালে আমাদের বৈদ্যকের চিন্তায় পারদই সে কাজ ক'রতে পারে এইটাই প্রমাণিত, কিন্তু বৈদিক যুগে ছিল সুরা, তাই ঋষি বৈদ্যগণ অনুসন্ধান ক'রেছেন কত দ্রব্যের মধ্যে মদ্য-যোনি আছে, আবার সেইসব মদ্যের ক্রিয়াকারিত্ব শক্তিও পৃথক, তাই এত বিচার আর তার এত গবেষণা হ'য়েছিল। তবে এটা দেখা যাচ্ছে—যেসব দ্রব্যের মধ্যে মধুর রসের অস্তিত্ব বর্তমান, তা থেকে সুরা তৈরী হ'তে পারে; এটা মোটামুটি স্থিরীকৃত হ'য়েছিল। আমার এই নিবন্ধটি এমন একটি দ্রব্যকে নিয়ে, যা থেকে বোঝা যাবে বৈদিক যুগে মদ্য তৈরী হ'তো।

মদনং কাম মাকুতিং বাচং সত্যং আশীয়।
মৈত্রঃ শরসি পয়সো রেতঃ আভৃতং যশঃ শ্রীশ্রয়তাম্॥
(অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ৫১২।৩।৪১ সূক্ত)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

সুরাকুম্ভং উপস্থাপ্য ঋত্বিক্ পঠতি—ত্বং মনসঃ কামং অভিলাষং বাচঃ সত্যং চ ময়ি মদনঃ মদ্যতে=সূক্ষ্মগত্যা শরীরং প্রবিশতি ইতি মদনঃ=বকুলঃ, বক্=রুল্ তৎজাতঃ ত্বং শরসি সন্তান রহিতে মৈত্রঃ রেতঃ পয়সঃ আভৃতং যশঃ শ্রীঃ=শোভা শ্রয়তাং তিষ্ঠতু।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—সুরাকুম্ভ স্থাপন ক'রে ঋত্বিক্ পাঠ করেন—তুমি মদনজাত অর্থাৎ বকুলজাত; তুমি মনের অভিলাষ, সত্য বাক্য এবং বল আমাকে দাও। তোমার শূন্য মদ্য দুগ্ধের সার, অন্নের সার, যশ, শোভা, কীর্তি ও মৈত্র আমাতে থাকুক।

বেদোক্ত বকুলফলজাত মদ্য যে খুবই মান্যতা লাভ ক'রতো, সেটি চরকের সূত্র-স্থানের ২৫ অধ্যায়ে আসব-যোনির মধ্যে অর্থাৎ ফলজাত যতপ্রকার মদ্য শ্রেষ্ঠতার স্থান দখল করে, তাদের মধ্যে বকুল ফলজাত মদ্যও অন্যতম। কিন্তু সে ফলটির এবং তার অপূর্ব সুগন্ধ ফুলগুলিও স্মরণাতীতকাল থেকে এই ভারতে সংস্কৃত কাব্য-মালায় এক বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে।

বৈদ্যকের নথি

আমরা দেখি—প্রথমে খাদ্য ও পানীয় বস্তুরই মুখ্যত্ব আছে, কারণ দেহবল সৃষ্টির প্রথমেই খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন। তাও আবার ঐ দু'টির মধ্যে পানীয় দ্রব্যেরই মুখ্যত্ব। কারণ রস-ধাতুর সহযোগিতা না পেলে ক্ষিতি ধাতুজ আহার্য অর্থাৎ স্থূল দ্রব্যই অচল, আর রস-ধাতুই সকলকে পরিপাক করে, তার দ্বারাই শরীরের পোষণ-ক্রিয়া চলে, অতএব আহার্য অপেক্ষা পানীয়েরই মুখ্যত্ব।

সেই পানীয়ও দুই প্রকারের—একটি নলবাহী মাত্র, দ্বিতীয়টি রসগ্রন্থিবাহী। সেই দ্বিতীয়টিরই মুখ্যত্ব; কারণ রসগ্রন্থির পুষ্টিসাধন না থাকলে নলবাহিতাও থাকে না। অতএব রসগ্রন্থির পুষ্টিকারিত্ব একমাত্র এক সুরাতেই আছে ব'লেই তার শ্রেষ্ঠত্ব

ও মুখ্যত্ব। এইজন্য সুরাতুল্য পানীয় দ্রব্যের দ্বিতীয় কোন প্রতিকল্প নেই।

তাই বেদে ও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে সুরার এত প্রশংসা। চরক সংহিতার চিকিৎসাস্থানের ১২ অধ্যায়ে সুরার স্তুতি প্রসঙ্গে প্রায় ৪০টি শ্লোকে বর্ণনা করা হ'য়েছে। সেখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে—এই সুরা দেবতাদের অমৃত, পিতৃপুরুষদের সুধা, ব্রাহ্মণদের সোম, অশ্বিনীকুমারদের তেজ, সরস্বতীর বীর্য, ইন্দ্রের বল ও তাঁর যজ্ঞের সোম, মানবের রতি।

এই সুরা বিধিপূর্বক পান ক'রতে হয় এবং এই সুরা পান ক'রতে হ'লে দেবতা-দিকে উৎসর্গ ক'রে তারপর ভূচর, জলচর, খেচর জন্তুর মাংস ভেজে বা পুড়িয়ে লবণরসযুক্ত ক'রে এবং উপস্কার বা মসলা দিয়ে সুগন্ধি ক'রে তার সঙ্গে অবদংশ নিয়ে (চাট্ বা চাট্নি সহযোগে) কিঞ্চিৎ জলের সঙ্গে মদ্য বা সুরা মিশ্রিত পান ক'রবে। তবে যাঁরা ধনী, তাঁদেরই জন্য এই সুরা মাত্রামত পানের ব্যবস্থা। আর যাঁরা তা নন, তাঁদের জন্য অর্থাৎ যাঁরা বায়ু-প্রকৃতির লোক, তাঁদের পাতলা গৌড়িক ও পৈষ্টিক মদ ভাল। আর যাঁরা কফ-প্রকৃতির এবং পিত্ত-প্রকৃতির, তাঁদের পক্ষে ফলের রসে প্রস্তুত মধুর রস-প্রধান ও শর্করা-প্রধান মদ্যই শ্রেষ্ঠ। যাঁরা রুক্ষ প্রকৃতির, তাঁদের মদের আসক্তির উগ্রতা ভাল নয়। যাঁরা খুব পরিশ্রম করেন, তাঁরা মাত্রামত পান ক'রবেন।

মদ্যের শ্রেষ্ঠ গুণের মধ্যে দশটি গুণ অগ্রণী। আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংহিতাগ্রন্থ মনুসংহিতা, তার টীকাকারও (১১।৯৬) মদ্যের প্রকারভেদে যে পৃথক পৃথক গুণ-কারিতা—তার উল্লেখ ক'রেছেন।

দ্বাদশ প্রকারে মদ্যের জন্ম হয়—

মাধ্বীকং পানসং দ্রাক্ষং খার্জ্জুরং তাল মৈক্ষবম্।
মৈরেয়ং মাক্ষিকং মাধুং বকুলং নারিকেলজম্॥

অর্থাৎ দ্বাদশ প্রকার মদ্য পানীয় (পানযোগ্য)—মধু অথবা মহুয়াফুল-প্রধান, কাঁঠালের রস-প্রধান, আঙুর-প্রধান, এগুলির সঙ্গে মধু অথবা গুড় মিশিয়ে মদ্য প্রস্তুত করা হয়। তাছাড়া খেজুরের রস, তাল রস, অন্ন (ভাত থেকে), মধু সঞ্জাত (উৎকৃষ্ট ফলের রসের সহিত মধু মিশ্রিত ক'রে), বকুল ফলের শাঁস থেকে (গুড় বা মধু মিশ্রিত ক'রে) এবং নারিকেল ও মধুসঞ্জাত। সুতরাং বকুল ফলেও যে মদ তৈরী হ'তো—এইটাই এখানকার বক্তব্য। এ সম্বন্ধে বৈদিক তথ্য পূর্বেই বলা হ'য়েছে।

পরিচিতি

চিরহরিত বৃক্ষ, ৪০/৫০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। ছায়া-তরু হিসেবে রাস্তার ধারেও যেমন লাগানো হয়, আবার মন্দির প্রাঙ্গণেও তাকে স্থান দেওয়া হয়, ছায়া ও ফুলে সুগন্ধ আছে ব'লে।

পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এই গণের ৩০টি প্রজাতি আছে, তার মধ্যে ভারতে ৪টি প্রজাতি বর্তমান। এই গাছ পশ্চিমঘাট পার্বতীয় অঞ্চলে অযত্ন-সম্ভূত, কিন্তু অন্যান্য স্থানে তাকে লাগানো হয় (রোপণ করা হয়)। সমাজকল্যাণকামী সনাতন-ধর্মীগণ এই গাছের শাখাকে পুজোপচারের অঙ্গ ব'লে এটাকে তাঁদের বিধানে নির্দেশ দিয়েছেন। মনে হয়, জনপদে এর বিলুপ্তি না ঘটে তাই এই ব্যবস্থা।

এই গাছটিকে ক্ষীরীবৃক্ষের (যে বৃক্ষের ডাল পাতা ভাঙ্গলে আঠা বেরোয়) পর্যায়ে

ধরা না হ'লেও ডাল ভাঙ্গলে বা কাটলে আঠা বেরোয়।

এই গাছটি সাধারণের কাছে খুবই পরিচিত। এর ফুলের গন্ধেই সে সকলের কাছে পরিচিত হয়। গ্রীষ্মকাল থেকে সুরু ক'রে শরৎকাল পর্যন্ত এই ফুল রোজই ফুটতে থাকবে; তাছাড়া এমন গাছও আছে যে বারোমাসই কম-বেশী ফুল হয়, তাই এই গাছটির আরও দু'টি নামকরণ করা হ'য়েছে 'সদাপুষ্প' ও 'স্থির কুসুম'; এই ফুল শুকিয়ে রাখা যায়, পচে যায় না।

এই গাছ থেকে একজাতীয় আঠা বেরোয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন—এর মধ্যে কোন রাসায়নিক উপাদান নেই।

হিন্দীভাষী অঞ্চলে বকুলকে মৌলসারী বলে, উড়িষ্যার অঞ্চল বিশেষে একে বৌলী বলে। এটির বোটানিকাল নাম Mimusops elengi Linn., ফ্যামিলি Sapotaceae.

ঔষধার্থে ব্যবহার হয় গাছের বা মূলের ছাল. কাঁচা ও পাকা ফল, ফুল ও বীজ।

লোকায়তিক ব্যবহার

প্রথমেই বলে রাখি—বৈদিক তথ্যে যেসব ইঙ্গিত দেওয়া আছে, সেগুলিকে উপজীব্য ক'রে তাদের গবেষিত ফল চরক বা সুশ্রুত সংহিতায় সামগ্রিক লিপিবদ্ধ করা হয়নি, তবে বৈদিক ও তান্ত্রিক পথানুসারী চক্রদত্ত এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত ক'রেছেন; তাছাড়া বহু প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত কতকগুলি যোগ আজও প্রচলিত। তার কয়েকটি এখানে সন্নিবদ্ধ করা হ'লো।

১। **মূত্রকৃচ্ছ্রতায় বা শিথিলতায়ঃ—** বাতশ্লেষ্মা বা পিত্তশ্লেষ্মার ধাত যাঁদের, ঋতুবিশেষে তাঁদের মূত্রবেগ কখনও ঢিলে কখনও কষা হ'তে দেখা যায়; তাঁদের ধারণা হয়—বোধ হয় প্রোষ্টেট্ গ্লান্ড্ বড় হ'য়েছে অথবা তাকে ধ'রে রাখার ক্ষমতা চ'লে গিয়েছে; এক্ষেত্রে বকুলছাল ১০ গ্রাম একটু কুটে (থে'তো ক'রে) ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সেইটাকে সকাল, বৈকাল ও রাত্রে ৩ বারে খেতে হবে; এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে। যদি দেখা যায় কোষ্ঠবদ্ধতা আসছে, তবে ৫ গ্রাম ওজনে নিয়ে একটু থে'তো ক'রে, ৩ কাপ জলে সিদ্ধ করার পর এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে ৩ বারে খেতে হবে।

২। **শুক্রতারল্যেঃ—** দীর্ঘদিন অজীর্ণে ভুগলে শুক্রতারল্য হয়, আবার শরীরের পুষ্টির অভাবেও শুক্রতারল্য হয়, যদি জমার থেকে খরচ বেশী করার প্রবণতা থাকে; তাছাড়া বেশী বয়সেও শুক্রতারল্য এসে জোটে।

এখন যেখানে অপুষ্টিজনিত শুক্রতারল্য হয়েছে, সেখানে পাকা বকুল ফলের সিরাপ প্রত্যহ আহারের পর (এক বেলা) ১ চা-চামচ ক'রে ঠাণ্ডা জলে মিশিয়ে ১৫/২০ দিন খেলে অপুষ্টিজনিত তারল্য সেরে যাবে।

সিরাপের প্রস্তুত পদ্ধতিঃ— পাকা বকুল ফল ৫০০ গ্রাম, ছোট ফল হ'লে ৭৫০ গ্রাম নিয়ে চট্‌কে বীজ ও খোসা বাদ দিয়ে ২৫০ গ্রাম মধু মিশিয়ে ৩ দিন ঢেকে রাখতে হবে। তারপর একটা পাতলা ন্যাকড়ার (গামছা হলেও চ'লবে) পুঁটলী ক'রে টানিয়ে রাখতে হবে; তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে ঝ'রে প'ড়ে যাবে। সেইটাই হ'লো বকুল ফলের সিরাপ।

বাহ্য ব্যবহার

৩। **শ্বেতী রোগেঃ—** সব শ্বেতীর রং এক রকম হয় না। যার রং দুধের মত সাদা হ'য়ে গিয়েছে, সেগুলি দুঃসাধ্য বলা যেতে পারে। আর এই রকম সাদা দাগ একটু মেদস্বী লোকেরই বেশী হয় অর্থাৎ রোগা লোকের এই রকম সাদা দাগ বেশী হবে না। আর যে দাগগুলি একটু লালচে বা তামাটে রংয়ের, সেগুলি সকলেরই হ'তে পারে।

এক্ষেত্রে বকুল ছালের ঘন ক্বাথে বকুল বীজ ঘষে (চন্দন ঘষার পাথরে ঘষলেও চ'লবে) ঐ দাগে আস্তে আস্তে ঘষে লাগাতে হবে, এর দ্বারা ঐ দাগগুলি ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে।

ঘন ক্বাথ কি ক'রে ক'রতে হয়— ১০০ গ্রাম ছালকে কুটে এক লিটার জলে সিদ্ধ ক'রে, আধ লিটার থাকতে নামিয়ে, ছে'কে তাকে পুনরায় ঘন করে আধ ছটাক আন্দাজ রাখতে হবে, সেইটাই হ'লো ঘন ক্বাথ। এটি তান্ত্রিকদের ঔষধ। তাঁদের নির্দেশ— এই ঔষধ ব্যবহারকালে নিরামিষ খাওয়া ভাল, যদি না মানা সম্ভব হয়, তাহ'লে অন্ততঃ রবিবারে আমিষ ভোজন অবশ্য বর্জনীয়।

৪। **দাঁতের পোকায়ঃ—** দাঁতের মাঝখানে গর্ত হ'য়ে যায় অথচ ধার ঠিক থাকে, সেক্ষেত্রে বকুল ছাল ১০ গ্রাম নিয়ে থে'তো ক'রে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রতে হবে, এক কাপ অবশিষ্ট থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সকালে ও বৈকালে অথবা রাত্রে প্রত্যহ ২ বার কবল ধারণ ক'রতে হবে অর্থাৎ ক্বাথটা মুখে পুরে, ১০/১৫ মিনিট রেখে ফেলে দিতে হবে। প্রতিবার ৭/৮ চা-চামচ ক'রে নিলেও চ'লবে। এই রকম ১৫/২০ দিন নিয়মিত ব্যবহার ক'রলে বা করালে পোকায় আর দাঁত নষ্ট ক'রবে না।

৫। **অকালে দাঁত নড়ায়ঃ—** সে যে কোন কারণেই হোক, ২০/২৫ গ্রাম বকুল ছাল ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে নিতে হবে। আর ২/৩ টিপ্ (নস্যির মত) পরিমাণ পিপুল চূর্ণ ১০/১৫ ফোঁটা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে প্রথমে দাঁতের গোড়ায় লাগিয়ে দিতে হবে। এইটা লাগাবার ৫/৭ মিনিট বাদে, যে ক্বাথ তৈরী করা আছে সেই ক্বাথকে নিয়ে ৭/৮ মিনিট ক'রে মুখে রাখতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় ১০/১২ দিন বকুল ছালের ক্বাথ ব্যবহার ক'রলে নড়া দাঁত ব'সে যাবে। তবে এর দ্বারা বুড়োকালের নড়া দাঁত কি আর ব'সবে? এটা চক্রদত্তের অভিমত।

৬। **মাথার যন্ত্রণায়ঃ—** (যেখানে কফের সংযোগ থাকবে সেখানেই কেবল কাজ হবে।) বকুল ফুলের গুঁড়োর (চূর্ণের) আটভাগের এক ভাগ (⅛) ফটকিরির গুঁড়ো মিশিয়ে রেখে দিতে হবে, যাদের মাঝে মাঝে সর্দি ব'সে মাথায় যন্ত্রণা হয়, তাঁরা এই নস্যিটা ব্যবহার ক'রবেন। মাথার যন্ত্রণা সেরে যাবে।

৭। **দাঁত পড়ায়ঃ—** অল্প বয়সে যাঁদের দাঁত ন'ড়ে যাচ্ছে বা প'ড়ে যাচ্ছে, তাঁরা কাঁচা বকুল ফল কিছুদিন চিবিয়ে দেখুন—দাঁতের গোড়া শক্ত হ'য়ে যাবেই, তা না হ'লে কাঁচা ফলকে পেড়ে শুকিয়ে সেই শুকনো ফলের শাঁসের গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজলে অকালে দাঁত ন'ড়বেও না, আর প'ড়বেও না।

৮। **নাসাজ্বরেঃ—** এ জ্বরে সাধারণতঃ মাথায় ও ঘাড়ে যন্ত্রণা তো হয়ই, অধিকন্তু সমস্ত শরীরেই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি; এক্ষেত্রে বকুলফুলের চূর্ণের নস্য নিলে

ঐ অস্ুবিধেগুলি চলো যায়।

৯। **শিশুদের কোষ্ঠবন্ধতায়ঃ—** বকুলবীজের অভ্যন্তরস্থ শাঁসটাকে বাদ দিয়ে শক্ত অংশটাকে মিহি চূর্ণ ক'রে, পুরাতন ঘিয়ের সংগে মিশিয়ে বর্তি বা বাতি তৈরী ক'রে অথবা পানের বোঁটায় লাগিয়ে শিশুর মলম্বারে দিলে ১০/১৫ মিনিটের মধ্যেই দাস্ত হয়ে যায়। তারপর কোন স্নেহজাতীয় দ্রব্য, যেমন নারকেল তেল বা ঘি লাগিয়ে দিতে হয়। বীজের চূর্ণটা অল্প পরিমাণে মিশাতে হয়।

১০। **পুরাতন আমাশা রোগেঃ—** প্রত্যহ কয়েকটি ক'রে পাকা বকুল ফলের শাঁস খেলে এ রোগের উপশম হয়।

এতক্ষণ বকুলের গুণপনা নিবেদন ক'রলাম, এখন ভাবছি এই যে—গিন্নীর কাছে 'বকুল ফুল' সই (সখী) পাতানোর জন্যে আর কবির চোখে বকুল ফুল উপমা সৃষ্টির; তিনি দেখিয়েছেন—রমণীর যৌবনসম্পদকে লুটে নিয়ে যায় সদ্য ঝরা বকুল, শিউলি ফুলের মত। আর চিকিৎসক তার রূপকে গৌণ ক'রে ঝরা (ঝ'রে পড়া) পাকা ফলকে নিলেন, তৈরী ক'রলেন 'মৃতসঞ্জীবনী', সে যুগের সেরি-স্যাম্পেন্‌ তো এই-ই ছিল। এখনকার সেরি-স্যাম্পেনে হয় 'লিভার অ্যাব্‌সেস্‌' আর ওটায় হয় দীর্ঘজীবন; তফাত এইখানেই। তবে হ্যাঁ—এটায় হাতি কেনার মেজাজ নিয়ে আসে না, আবার সকালে চ'লেও যায় না। এটাও একটা তফাত।

আবার এও ভাবছি—এর বৈদিক নাম তো মদন, যাকে বলা যায় কাম; তার ফুলের মরশুম সেই মদনোৎসবের কালে। কামনার বহ্নিতে আহুতি দেয় ব'লেই কি তার নাম "মদন" রাখা হ'লো?

তাহ'লে, কাজ দেখেই কি তার এই নামকরণ?

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Saponin. (b) Fatty oil. (c) Sterols.
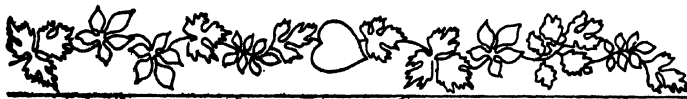
কর্ণিকার (সোন্দাল)

নজরে পড়ার মত হলুদ রং-এর পুষ্পগুচ্ছ, সে গুচ্ছের আকৃতি দেখতে অনেকটা ঝাড়লণ্ঠনের মত, আর ফুলগুলির আকৃতিও অঙ্গুলির অগ্রভাগের মত—সেইহেতু এর নাম কর্ণিকার; তাই না মহাকবি কালিদাসের চোখ এড়ায়নি! সেজন্য প্রাক্-আর্যসভ্যতার যুগের মানুষদের, যক্ষ-রমণীদের কানের গহনায় পরিয়েছেন এই পুষ্পগুচ্ছ তাঁর মহাকাব্যের শ্লোকগুচ্ছে (মেঘদূত কাব্যের উত্তরমেঘের ১৭ শ্লোক)। এইসব কাব্যের টীকাকার মল্লিনাথ এই ফুলের ব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে কবিপ্রসিদ্ধি লিখেছেন—"এই বৃক্ষের সমীপে যদি সুন্দরী যুবতী আহ্লাদে নৃত্য করে, তবে এই বৃক্ষের গর্ভ হয়" অর্থাৎ প্রাক্-বর্ষায় সে নতুন পাতায় সজ্জিত হ'য়ে যেন ভরাযৌবনা হ'য়ে যায়, তারপরই ঝাড়লণ্ঠনের মত হলুদ রং-এর পুষ্পগুচ্ছে গাছ ভ'রে যায়, এইটাই মনে হয় টীকাকারের মানস-কল্পনা।

এদিকে মহাকবি ব্যাস তাঁর ভাগবত রচনাকালে ভক্তদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের রূপকে যখন আঁকিয়ে দিয়েছেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণকে স্বর্ণনির্মিত কর্ণকুণ্ডল না পরিয়ে কর্ণিকার পুষ্পগুচ্ছ পরিয়েছেন।

তাই লিখেছেন—

বর্হা পীড়াভিরামং... আর কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং।

যখন থেকে ভারতের জনগণ তন্ত্র-সংস্কৃতিকে সামনে রেখে পৌত্তলিকতাকে মেনে নিয়ে আরাধ্য ক'রেছেন, তখন থেকেই এই বনজ পুষ্পরাজির অর্ঘ্য দেব-দেবীকুলের পদতলে দেওয়ার রেওয়াজ হ'লেও এই একটি মাত্র ফুল—যেটা কেবল কানেই পরানো হ'য়েছে। সে যুগে তার এত কদর বাড়লেও মহাকবি কালিদাসের কলমের খোঁচা তাকে

খেতেই হ'য়েছে; তাই তিনি লিখেছেন—

"বর্ণ প্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং..., নির্গন্ধতয়াস্ম দুনোতি চেতঃ"
(কুমারসম্ভব)

অর্থাৎ বর্ণোজ্জ্বল কর্ণিকার কুসুমের ওই গন্ধহীনতাই মনে বেদনা আনে (পলাশের Butea monosperma মত)।

তবে দেখা যাচ্ছে—আর্যগণ এই প্রাক্-আর্যসভ্যতার আমলের কোন জিনিসকেই

সমীক্ষা ক'রতে বাকী রাখেন নি। তাঁরা প্রচার ক'রেছেন তার ভৈষজ্য শক্তিটিকে। সেই সময়ই প্রাচীন বোটানি জন্ম নিয়েছে নামকরণের মধ্য দিয়ে, যেমন তার নাম শম্পাক, আরগ্বধ, কৃতমাল প্রভৃতি। প্রতি নামেরই সার্থক প্রয়োগ ক'রেছেন বিভিন্ন ব্যাধির ক্ষেত্রে; যেমন শম্পাক অর্থাৎ যার ফলই মঙ্গল বিধান করে। আরগ্বধ অর্থাৎ রোগ-শঙ্কাকেই যে বধ করে। এছাড়া রূপ-পরিচয়ও তাঁরা দিয়েছেন—'কৃতমাল' অর্থাৎ যার পুষ্পগুচ্ছ মালার মত হয়। এই রকম আরও বহু নাম আছে, প্রতিটি নামই অর্থবহ।

বৈদ্যকের নথি

তাঁদের এইসব নামের প্রেরণা এসেছে বৈদিক সূক্ত থেকেই এবং তাকে অনুসরণ ক'রেই যে সংহিতাকারগণের অনুশীলন, তা নিঃসন্দেহ। শংপাক যে কত শক্তিধর, তা চরক সংহিতাকার কল্পস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে যে কয়টি মূল্যবান ভেষজের উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে আরগ্বধকে নিয়ে একটি বিশেষ অধ্যায়ই রচনা ক'রেছেন এবং তার পর্যায়বাচী শব্দ নির্বাচন ক'রে জ্বর, হৃদ্‌রোগ, বাতরক্ত, উদাবর্তের মত জটিল রোগগুলিতে সুকৌশলে তাকে ব্যবহার ক'রতে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁদের মতে আরগ্বধ, রাজবৃক্ষ, শংপাক, চতুরঙ্গুল, প্রগ্রহ, কৃতমাল ও কর্ণিকার এবং অবঘাতক এই কয়টি নামের দ্বারাই যথা যথা স্থানে এর উপযোগিতার ক্ষেত্র উল্লেখিত হয়।

এই এতগুলি নামের মধ্যে সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, চক্রদত্ত অন্ততঃ তিনটি নামের উল্লেখ এবং ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছেন।

আরগ্বধের মত এমন নিরাপদ রেচন, শমন, উদ্দীপনকারী ভেষজ আয়ুর্বেদীয় সংহিতায় প্রতিযোগী ভেষজ সংখ্যায় অল্পই গণনা করা যায়। একমাত্র নিদানস্থান ছাড়া সমগ্র গ্রন্থেই আরগ্বধের ব্যবহার দেখা যায়।

পরিচিতি

কর্ণিকারের আরও কয়েকটি পর্যায় নাম আছে, তার মধ্যে আরগ্বধ নামটিই বেশী প্রচলিত। এর লোকায়তিক নাম সোন্দাল বা সোনালু; ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই, এমন-কি এই দেশের সন্নিহিত দেশ বর্মা অঞ্চলেও পাওয়া যায়। তবে পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিজ্ঞানীগণের বক্তব্য হ'লো—এই গাছের আদিম বাসস্থান নাকি দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে যে, প্রাক্‌-আর্যসভ্যতার কালে অর্থাৎ দ্রাবিড় সভ্যতার কালেও এই ফুলের ব্যবহার করা হ'তো।

অযত্নসম্ভূত এই গাছ মধ্যমাকার, ২৫/৩০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হ'তে দেখা যায়। এর লম্বা পত্রবৃন্তে ৩ থেকে ৬ জোড়া পর্যন্ত পাতা হ'তে দেখা যায়, পাতার আকার অনেকটা কাকজামের (Eugenia fruticosa) পাতার মত। ফাল্গুন-চৈত্রে গাছের পাতা ঝরে যায় এবং বৈশাখে নতুন কচিকলাপাতা রঙের পাতা গজায়, তারপরই গাছ পুষ্পিত হ'তে সুরু করে। এর বৈশিষ্ট্য হ'লো গাছের শাখা থেকে লম্বা ছড় নামে, সেটাতেই মালার আকারে হ'লদে রঙের ফুল হয়। সাধারণের কাছে এই গাছটি "বানরলাঠির" গাছ ব'লে পরিচিত—এই হেতু যে, এর ফলগুলি লম্বায় কম-বেশী এক হাতের মত হয় এবং আকারে গোল, ব্যাস প্রায় এক ইঞ্চি, কাঁচা ফল সবুজ থাকে, পাকলে এই ফলের গায়ের রঙ হয় মেহগনি কাঠের রঙের মত। ফলের মধ্যে বহু বীজ থাকে—সেগুলি আকারে মটরের মত হ'লেও চেপ্টা, মসৃণ, উজ্জ্বল পীতের আভাযুক্ত ধূসর রঙের। বৈশিষ্ট্য হ'লো, এই বীজগুলি একসঙ্গে থাকে না, এর ফলের মধ্যে সমদূরত্বে গোল পয়সা বা আধুলি আকারে দেওয়াল সৃষ্টি ক'রেছে প্রকৃতি। আর সেই দেওয়ালের গায়ে তেঁতুলের মাড়ি বা মজার মত চিটচিটে আঠাবৎ একটি জিনিস জন্মে। ফল কাঁচা অবস্থায় পাড়লে এটা পাওয়া যায় না, গাছপাকা ফলেই এটা পাওয়া যায়। সেই আঠাবৎ পদার্থটাই ঔষধার্থে ব্যবহার্য "সোন্দালের আঠা" বা ফলমজ্জা। ইউনানি সম্প্রদায় একে বলেন "মগ্‌জ্‌ ফুলুস্‌", এই ফুলুস্‌ অর্থে আগেকার আমলের "বড় পয়সা", যেহেতু এই ফলের প্রকোষ্ঠগুলি পয়সার আকারের হয়। ফাল্গুন-চৈত্রে গাছ

পত্রশূন্য হ'লেও গাছে পাকা ফলগুলি ঝুলতে থাকে। এই গাছটির বোটানিকাল্ নাম Cassia fistula Linn., ফ্যামিলি Leguminosae. হিন্দিভাষী অঞ্চলের লোকায়তিক নাম আমল্‌তাস্, উড়িষ্যার অঞ্চলবিশেষে একে বলে সোন্দালি।

ঔষধার্থে ব্যবহার হয়—ফুল, পাতা (বিশেষতঃ কচি পাতা), গাছের বা মূলের ছাল এবং ফলমজ্জা।

লোকায়তিক ব্যবহার

লোকায়তিক ব্যবহার লেখার পূর্বে এটির বিশিষ্ট গুণ সম্পর্কে একটু সংকেত দিয়ে রাখি—

এই একটি মাত্র ভেষজ—যেটির দ্বারা প্রাকৃতিক, বৈকৃতিক, নৈমিত্তিক ও রোগ-সাংকর্যে এটিকে প্রয়োগ করা যায়। উপমা-স্বরূপ বলা যেতে পারে, এই যেমন—প্রাকৃতিক রোগ—ভাদ্রমাসে পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর হয়, বসন্ত ঋতুতে বসন্ত রোগ দেখা দেয়—এইগুলিই প্রাকৃত রোগ। আর বৈকৃতিক রোগ হ'লো—যেটা খাওয়া উচিত নয়; যেমন, ডায়েবেটিস হ'য়েছে, জানি যে চিনি খেলে বাড়ে (বৃদ্ধি হয়), তবুও খাই। এইটাই হ'লো—শরীরে বিকার সৃষ্টি করা হ'চ্ছে। তারপর নৈমিত্তিক রোগ—যেমন হার্টের দোষ, কোনই অসুবিধে ছিল না, হঠাৎ একটু পাহাড়ে ওঠার সখ হ'লো, এলো আরও বিপর্যয়। আর একটা উদাহরণ দিই—হে'পো রোগী, অধৈর্য হয়ে ক'রলো শুক্রক্ষয়, এলো আরও অসুবিধে। তারপর রোগসাংকর্য—যেমন, আছে জ্বর, মাথার যন্ত্রণা, তার উপর অর্শের দোষ বর্তমান, কারণ, এ রোগটা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। এইসবের সঙ্গে যদি পেটের দোষ এসে জোটে, তাহ'লে রোগীরও প্রাণ ওষ্ঠাগত, চিকিৎসকও বিভ্রান্ত; তাই এইসব ক্ষেত্রের মুকাবিলা করার জন্য চরকীয় চিন্তাধারা হ'লো—আরগ্বধই (সোন্দাল) একমাত্র ভেষজ, যেটা এইসব বাধাকে অতিক্রম ক'রে শরীরকে সুস্থ ক'রতে পারে। এখন এসব ক্ষেত্রের জন্য প্রাচীনপন্থী চিকিৎসক সম্প্রদায় একটি পদ্ধতি অনুসরণ ক'রতেন—সোন্দাল ফলের মধ্যেকার মজ্জা (আঠা) অংশ আন্দাজ ৩/৪ গ্রাম নিয়ে একটু গরম দুধে বা গরম জলে গুলে, ছে'কে দুই-একদিন সকালের দিকে রোগীকে খাওয়ালে শরীরের দোষ অংশ নিঃসরণের সহায়ক হবে। তারপর চিকিৎসক সহজেই চিকিৎসা ক'রতে পারবেন।

এই ভেষজটি সম্পর্কে প্রথমেই একটি তথ্য জানা দরকার যে, এটি প্রধানভাবে কাজ করে রসবহ ও রক্তবহ স্রোতের উপর।

১। **উর্ধ্বগত রক্তপিত্তে:—** ব্লাড্‌প্রেসার হ'লেও নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, আবার উর্ধ্বগত রক্তপিত্তেও নাক-মুখ দিয়ে রক্ত আসে; তাহ'লে এটা কি রোগ—এ বিচারের সহজ পদ্ধতি হ'লো—রক্তপিত্তে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকবেই আর ব্লাড্‌প্রেসারে না থাকাটাই সম্ভব। এক্ষেত্রে সোন্দালের ফলমজ্জা (আঠা) ৪/৫ গ্রাম আধ কাপ জলে বা দুধে গুলে নিয়ে, ছে'কে ওর সঙ্গে একটু চিনি বা মধু মিশিয়ে ২/৩ দিন খেলে ঐ অসুবিধেটার উপশম হয়।

২। **উদরীরোগে:—** যদি পিত্তপ্রধান হয়, তাহ'লে আর রক্ষে নেই; যদি সেটা হয় তবে তাঁদের থাকবে পিপাসা; এদিকে পেটে জল, দাহ, তার উপর প্রস্রাব হ'তে চাইছে না; মনে হবে কিড্‌নিতে বুঝি পাথুরী হ'য়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক কর্তব্য হ'লো—দুধ এক কাপ, সোন্দালের আঠা (ফলমজ্জা) ৮/৯ গ্রাম আর জল ৪ কাপ একসঙ্গে

সিদ্ধ ক'রে এক কাপ (দুগ্ধাবশেষ) থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে সেই দুধটা সকালের দিকে অর্ধেক ও বৈকালের দিকে বাকী অর্ধেকটা খেতে দিতে হবে। যদি সম্ভব হয় ৪ চা-চামচ আখের (ইক্ষুর) রস এর সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিতে পারলে ভাল হয়। আরও চমকপ্রদ ফল পাওয়া যায়—যদি এই সঙ্গে এক চা-চামচ আমলকীর রস মিশিয়ে দেওয়া যায়।

৩। **ক্ষার মেহেঃ—** এই রোগ সব বয়সেই হ'তে পারে। এই রোগী প্রস্রাব ক'রলে সেখানে সাদা খড়ির মত দাগও যেমন হয় আবার তার সঙ্গে থাকে নাক ঝাঁজানো দুর্গন্ধ। এক্ষেত্রে সোন্দাল পাতার রস অথবা সোন্দালের মূলের ছালের রস এক চা-চামচ, তার সঙ্গে ৭/৮ চা-চামচ গরম জল মিশিয়ে, ঠাণ্ডা হ'লে, প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে দুই বারে খেতে হয়। এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যায়।

৪। **অগ্নিমান্দ্যে** (শ্লেষ্মাপ্রধান)ঃ— এ'দের লক্ষণ দেখা যায়—পেটটা থুম্ মেরে আছে, খেলে যে অম্বল হয় বা চোঁয়া ঢেকুর ওঠে তাও নয়, মুখে কিছুই ভাল লাগে না, সে টক, মিষ্টি, ঝাল যাই হোক—আবার খেলে যে অসুখ করে তাও নয় অথচ রুচি নেই; এক্ষেত্রে সোন্দাল ফলের আঠা ৫/৬ গ্রাম, আধ কাপ গরম জলে গুলে অল্প যোয়ান বাটা বা গুঁড়ো (আধ গ্রাম আন্দাজ) মিশিয়ে প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে দুবারে খেতে হবে। ৩/৪ দিন খাওয়ার পর যদি তেমন উপকার না হয়, তাহ'লে ঐ মাত্রায় দু'বার খেতে হবে অর্থাৎ সকালের দিকে একবার ৫/৬ গ্রাম ও বৈকালের দিকে একবার ৫/৬ গ্রাম মাত্রায় খেতে হবে।

৫। **যক্ষ্মারোগীর কোষ্ঠবদ্ধতায়ঃ—** চিকিৎসক সঙ্কটে পড়েন এখানে, কারণ এ রোগে কোন তীব্র মলভেদক ভেষজের দ্বারা বিরেচন করানো বিপজ্জনক, অথচ দাস্ত পরিষ্কার না থাকলেও চলে না। এক্ষেত্রে এই একটিমাত্র ভেষজ, যেটির দ্বারা তার মলভাণ্ডকে উত্যক্ত করে না, তাই সোন্দাল ফলের আঠা (মজ্জা) ৫/৬ গ্রাম আধ কাপ জলে গুলে, পাতলা কোন গামছা বা ন্যাকড়ায় ছেঁকে, একটু চিনি বা আধ চা-চামচ মধু মিশিয়ে সকালের দিকে খেতে দিলে দাস্ত পরিষ্কার হ'য়ে যাবে, অথচ দাস্ত হওয়া জনিত দুর্বলতা আসবে না।

৬। **গণ্ডমালায়** (Scrofula):— এই রোগে সোন্দাল গাছের মূলের ছালের রস ক'রে তার নস্যি নেওয়া এবং ছাল বেটে গণ্ডমালায় লাগানো, এর দ্বারা গণ্ডমালা সেরে যাবে, এটা একাদশ খৃষ্টাব্দের চিকিৎসক চক্রপাণি দত্তের (যাঁর গ্রন্থ চক্রদত্ত) সিদ্ধ যোগ।

৭। **আমবাতেঃ—**গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা, তার সঙ্গে ফুলো, কন্‌কনানি, এই যে ক্ষেত্র, এখানে ৬/৭ গ্রাম সোন্দালপাতা বাটা ২/১ চা-চামচ ঘিয়ে একটু ভেজে, সকালের দিকে জলসহ খেতে দিলে, ওটা ৩।৪ দিনেই সেরে যাবে। তবে এই মাত্রায় খেয়ে যদি দাস্ত পরিষ্কার না হয়, তা হ'লে একটু মাত্রা বৃদ্ধিও করা যেতে পারে।

৮। **শূল রোগেঃ—** এই নামটিতেই তার রোগের লক্ষণের কথা বোঝানো হ'য়েছে, লোকে কথায় বলে শূলের খোঁচা অর্থাৎ যে ব্যথার অনুভূতি হবে যেন খোঁচা মারছে—সেইটাই শূলের লক্ষণ, অবশ্য সেটা আমের দোষের জন্যেই হোক, আর বায়ুর জন্যেই হোক অথবা কফের জন্যেই হোক, কষ্ট হ'চ্ছে; এক্ষেত্রে সোন্দালের আঠা ৫/৬ গ্রাম আধ কাপ গরম জলে গুলে, গামছার মত পাতলা ন্যাকড়ায় বা পাতলা কাপড়ে ছেঁকে খেলে ওটা প্রশমিত হবে। তবে এটাও ঠিক—এর দ্বারা আসল রোগের প্রতিকার হয়তো নাও

হ'তে পারে, তার জন্য পৃথক চিকিৎসার প্রয়োজন।

৮ক। **বৃদ্ধকালের কোষ্ঠবদ্ধতায়ঃ—** সোন্দাল ফলের আঠা (ফলমজ্জা) ৫/৭ গ্রাম গরম দুধে চটকে নিয়ে গামছার মত জেলজেলে পাতলা কাপড়ে ছে'কে সেইটা প্রত্যহ সকালে খেতে হবে। এর দ্বারা দাস্ত স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যাবে।

বাহ্য ব্যবহার

৯। **বিষুনিতেঃ—** কোন জায়গায় কেটে বা ছ'ড়ে গেলে বিষিয়ে ওঠে, জ্বালা যন্ত্রণা হ'তে থাকে; এক্ষেত্রে সোন্দালপাতা বেটে, তার সংগে অল্প ঘি মিশিয়ে ওখানে লাগালে বিষুনিটা কেটে যাবে।

১০। **কুষ্ঠের ক্ষতেঃ—** সোন্দালপাতা বেটে লাগিয়ে দিলে ওটা থেকে দূষিত রস নির্গত হ'য়ে রসস্রাব বন্ধ হ'য়ে যায়। এটা চরকীয় যোগ।

১১। **উপদংশের ক্ষতেঃ—** সে নারী বা পুরুষ যারই হোক, এই সোন্দালপাতা ২০/২৫ গ্রাম, ৩/৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে ঐ জলে ক্ষত ধুতে হবে। এর দ্বারা ক্ষতটার উপশম হবে।

১২। **ভগন্দরে** (Fistula) :— এক্ষেত্রে পাতা ও গাছের ছাল একসংগে বেটে ব্যাধিতস্থানে লাগাতে হবে, এর দ্বারা ওখানকার ব্যথা ও যন্ত্রণা দু-এক দিনের মধ্যেই চ'লে যাবে, তারপর রসস্রাব হওয়ার পর ক্ষতপূরক কোন ঘৃতৌষধ (medicated ghrita) লাগাতে হবে।

আরগ্বধকে বধ ক'রে বসে ভাবছি—সমাপ্তি ঘোষণা কোন্ রসের সঞ্চারে করবো!

আচ্ছা, অমৃতকুম্ভ নিয়েই তো সুর-অসুরে লড়াই! কার দখলে কতটা এলো আর কে কতটায় বঞ্চিত হ'লো—সে তথ্যটার ইঙ্গিত যেন আরগ্বধের ক্ষেত্রে প্রতিভাত।

একথা কেন বলছি—এর উজ্জ্বল সোনালী রংয়ের কুসুমকে অনার্য বা প্রাক্-আর্য সম্প্রদায় বরণ ক'রে আপন ক'রেছেন; এর মধ্যে তাঁরা আর বেশী কিছু পাননি, কিন্তু আর্য বৈদিকগণ যেন এর অভ্যন্তরে অমৃতের সন্ধান পেয়ে অকাতরে আমাদের দান করেছেন; এখন এই অমৃতকুম্ভের স্মৃতি-উৎসবের যোগে ব'সে ভাবছি—আমাদের দীর্ঘদিনের বেদ-বিস্মৃতি কি সেই প্রাক্-আর্য গোষ্ঠীর সংস্কারকে নিতে প্রলুব্ধ করছে?

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Anthraquinone derivatives, very little tannin, phlobaphenes, small amount of volatile oil, three waxy substances and resinous substances.

অক্ষঃ (বহেড়া)

"তাস, দাবা, পাশা—তিন কর্মনাশা" ব'লে একটি প্রবাদ প্রচলিত। এই পাশা খেলাকে বলা হয় অক্ষক্রীড়া। এই অক্ষক্রীড়ার পরিণামে ভ্রাতৃকুলকে নিয়ে ১২ বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে হ'য়েছিল যুধিষ্ঠিরকে। তবে তেমন পণ রাখা খেলায় অক্ষ নামক ফলটি ব্যবহৃত হয়নি, কিন্তু সেই অক্ষক্রীড়ায় অন্য যে কিছু ছিল, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৪।১১।২।৫ সূক্তে। এতে বলা হ'য়েছে—

> গর্ভো ব্যতনুৎ লোমানি বানস্পতি স্ত্বমক্ষঃ প্রসদ্য রসেন যবিষ্ঠঃ নিবর্ত্তস্ব আয়ুষা নিবর্ত্তস্ববসসো।

এটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> ত্বং এব অক্ষোসি, ইন্দ্রিয়ে ক্কাথে, দ্যুত সাধনে ব্যক্তোহসি, (ঋচ ১০।৩৪।১) বিভীতকঃ ত্বং বনস্পতিঃ। তবাঙ্গ রসেন প্রসদ্য কেশ প্রসাদনং কৃত্বা লোমানি ব্যতনুৎ। রঞ্জয়তে। গর্ভশ্চ তে যবিষ্ঠঃ আয়ুষা পাশক্রীড়য়া আয়ুষং ক্ষপয়সি। বসসো নিবর্ত্তস্ব ধনদঃ ভব। ধনদশ্চ কলেবররক্ষণে"।

ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—ওহে তুমিই সেই অক্ষ, তোমারই গর্ভ দ্যুতক্রীড়ায় দক্ষ। (অক্ষ শব্দটি ইন্দ্রিয়ার্থে ক্কাথে ও দ্যূতে প্রযুক্ত হয়।) তুমি তো বানস্পতি। তোমাকে ঋক্‌বেদিগণ জানেন (১০।৩৪।১)। তাঁরা তোমাকে ভয়ও পান। তোমার রসে কেশ,

লোম প্রসাদন ক'রে রঞ্জিত করা হয়। তোমার গর্ভ ধন ও আয়ুর ক্ষয়কারক। তুমি আমার দেহ ও ধনের রক্ষা কর।

বৈদ্যকের নথি

(সংহিতাকারগণের অনুশীলন)

অথর্ববেদের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতকে সংহিতাকারগণ অনেক প্রকারে যে অনুশীলন ক'রেছিলেন, তা নিঃসন্দেহ, কারণ চরক সংহিতা এর ভৈষজ্য শক্তির পরীক্ষার প্রথমে
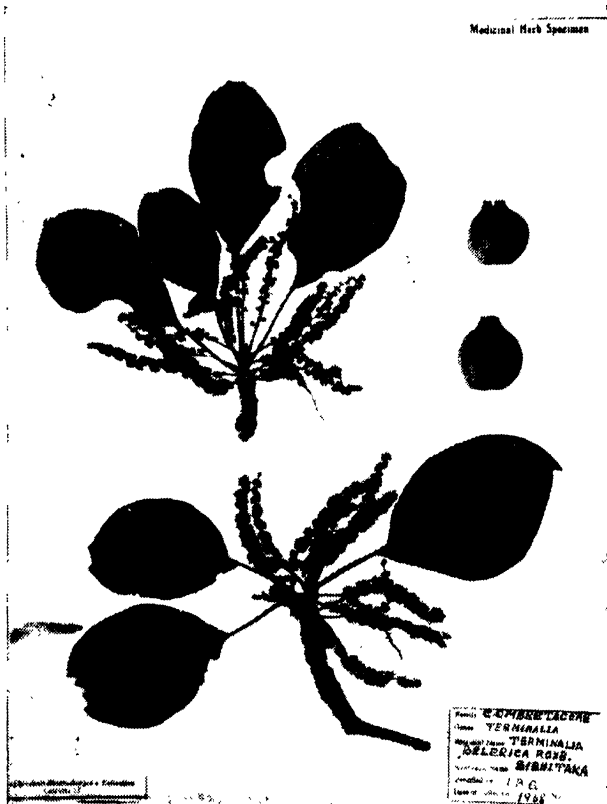
এর মধ্যে যে একজাতীয় অতুল্য গুণশক্তিসম্পন্ন তেল আছে, তা পরীক্ষা করেছেন। তাই চরক সংহিতাটির সূত্রস্থানের ১৩।৩ সূত্রে অগ্নিবেশের প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে—স্থাবর ও জাঙ্গম ভেদে স্নেহের (তেলের) ২ প্রকার যোনি আছে—যেমন তিল, পিয়াল তেমনি বিভীতক। এই বিভীতকের তেল স্থাবর যোনির।

এটা নিঃসন্দেহে বেদোক্ত সূক্তেরই অনুশীলন। বেদ বলেছেন—এর রসে কেশরঞ্জন হয়, লোম রঞ্জিত করা হয়।

এর অপর ভৈষজ্য শক্তি কতখানি, তার পরিচয় পাওয়া যায় চরক সূত্রস্থান ২৫ অধ্যায়ের ৫৪ সূত্রে। এই শ্লোকে বৈদিক ইঙ্গিতের আর একটি অর্থকে প্রকাশ ক'রেছে—অথর্ববেদ ব'লেছেন, তোমাকে ঋক্‌বেদিগণ জানেন, তুমি বানস্পতি (অর্থাৎ যার ফুল হয় আগে, ফল পরে হয় সেই বানস্পতি।) এর বিপরীত বনস্পতি। ফলই আগে হয়, ফুল দেখা যায় না। ফলের গর্ভেই ফুল হয়।

অতএব প্রশ্ন কি জানেন? ঋক্‌বেদে দেখা যায় বিভীতক ফল থেকে তাঁরা মদ্য প্রস্তুত ক'রতেন। সেই মদ্যের কি কুফল তাও হয়তো জানতেন। চরক সংহিতা সেখানে ঋকের একটি নামকে গ্রহণ ক'রে মদ্য যোনির পর্যায়ে বিভীতককে ব'লেছেন মৃগ-লণ্ডিকা। টীকাকার চক্রপাণি মৃগলণ্ডিকার অর্থ ক'রেছেন বিভীতকং।

যাস্ক ব'লেছেন—

মৃগাণাং তাড়ন কর্ম্মণি লণ্ডং উৎক্ষেপণ কারকং—

অর্থাৎ হরিণদের তাড়াবার জন্য বিভীতক ফলের ব্যবহার করা হ'তো। তাছাড়া এই ফলের মদ্যও প্রস্তুত করা হ'তো। চরক সংহিতায়ও তাই করা হ'য়েছে। এই ফলের মদ্য বিভীতক অর্থাৎ ভয় সৃষ্টি করে; তাই এর নাম বিভীতক।

তাই ভাষ্যকার অর্থ ক'রেছেন—এর মদ্য ধনক্ষয়ও যেমন করে, তার সঙ্গে আয়ু-ক্ষয়ও করে, তবে এটি সেবনে অক্ষক্রীড়ায় দক্ষতা নিয়ে আসে।

চরক সংহিতায় এর ভৈষজ্যগুণ সম্পর্কে বলা হ'য়েছে—এটি রুক্ষবীর্য, স্বাদু, কষায়, অম্লরস সম্পন্ন; এর বিশেষ শক্তি—কফ-পিত্ত দূর করে, এটির বিশেষ গুণ রসবহ, মাংসবহ ও মেদোবহ স্রোতকে দোষমুক্ত করে (চরক, সূত্রস্থান ২৭।১১২)।

এখানে খুব লক্ষ্য করার বিষয়—বিভীতকের বৃক্ষত্বক্ এবং পত্রের কোন ভৈষজ্য শক্তির পরিচয় দেওয়া নেই; হরীতকী ও আমলকীর ক্ষেত্রেও তাই।

সুশ্রুতও তাঁর সংহিতার সূত্রস্থানের ৩৮ অধ্যায়ে এই বিভীতককে লিপিবদ্ধ ক'রে এর বিশেষ গুণপনার আলোচনা করেছেন। এর বিশেষ গুণ সম্বন্ধে প্রথমে মুস্তকাদি-গণের মধ্যে বলেছেন—শ্লেষ্মা দূর করে এবং রমণীর জননস্থানের দোষ দূর করে এবং স্তন্য শোধন করে। বিশেষভাবে এটির গুণ পাচন-শক্তির বর্ধক।

দ্বিতীয়বার একে মিলিত ফলের সহযোগে অর্থাৎ হরীতকী-আমলকী সহযোগে এর ব্যবহার পদ্ধতির প্রসঙ্গে বলেছেন—এরা মিলিত হয়ে দূষিত কফ ও পিত্ত দূর করে এবং মেহ, কুষ্ঠ দূর করতে এরা অগ্রণী। ঠিক, এইসব রোগের চিকিৎসাক্ষেত্রেও ত্রিফলার প্রয়োগ নানান্ পদ্ধতিতে দেখিয়েছেন।

অর্ধপক্ক ফল বিরেচক, আর যে ফল পেকে নীচে প'ড়ে যায়, সে ফল সঙ্কোচক হয়ে থাকে। কাসিতে এটি উপকারী এবং গলরোগ, স্বরভঙ্গ, জ্বর, উদররোগ, প্লীহা-বৃদ্ধি, অর্শ অতিসার, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগেও ব্যবহার্য। এটি মস্তিষ্কের বলকারক। নেত্ররোগে এটির অঞ্জন কার্যকর। ফলমজ্জা বেদনাস্থাপক, শোথঘ্ন এবং সামান্য মদকারী।

পরিচিতি

বহেড়ার বৃক্ষ ৬০ থেকে ১০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হ'তে দেখা যায়, গাছের গুঁড়িও বেশ লম্বা, অবশ্য ছাল খুব বেশী পুরু হয় না, পাতা ৩ থেকে ৭/৮ ইঞ্চি লম্বা হয়;

দেখতে অনেকটা ছোট আকারের বট পাতার মত, শীতকালে গাছের পাতা প'ড়ে যায়. বসন্তকালে আবার নতুন পাতা গজায়। পাতার বোঁটা (পত্রবৃন্ত) ১—১½ ইঞ্চি লম্বা। গ্রীষ্মকালে ফুল হয়—যেটিতে ফুল ধরে সেই দণ্ডটি অর্থাৎ পুষ্পদণ্ডটি ২ থেকে ৬ ইঞ্চি লম্বা, ফুল ছোট, দেখতে অনেকটা নাকছাবির মত, সেগুলি দণ্ডের চারদিকে যেন সাজানো; তারপর হয় ফল—সেই ফল পুষ্ট হয় শীতের প্রাক্‌কালে, তারপর আপনা-আপনি প'ড়ে যেতে সুরু হয়; ফলে একটি বীজ, তার মধ্যে বাদামের মত একটা মজ্জা আছে, যদিও সেটা আকারে ছোট—তা হ'লেও খেতে অনেকটা কাগ্‌জী বাদামের মত। এটি প্রধানভাবে জন্মে ছোটনাগপুরে, বিহার, হিমাচলপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে; তবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অংশ বিশেষে বিক্ষিপ্তভাবেও হ'য়ে থাকতে দেখা যায়। এই পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্ধমানের শালবনেও প্রচুর জন্মে। তবে পূর্বোক্ত প্রদেশে এ গাছ লাগানোর অর্থাৎ রোপণ করার দরকার হয় না; পতিত জমি ও মাঠের ধারে বীজ প'ড়ে আপনা-আপনিই গাছ হয়।

এই বহেড়া ফল দু'টি আকারের হ'তে দেখা যায়—একটি গোল আর একটি ডিম্বাকৃতি, কিন্তু এরা প্রজাতিতে পৃথক নয়।

এটির বোটানিকাল্ নাম Terminalia belerica Retz., ফ্যামিলি Combretaceae.

ঔষধার্থে ব্যবহার হয় ফল ও ফলমজ্জা।

লোকায়তিক ব্যবহার

১। **শ্লেষ্মায়ঃ—** বিশেষ কার্যকারণ সম্পর্কে শ্লেষ্মা এলে, সেক্ষেত্রে নয়। কিন্তু ঋতুর সাহচর্য পেয়ে যে শ্লেষ্মা হয়—যেমন বসন্তকালে স্বভাবতঃই শরীর রসস্থ হয়, সেই রকম ক্ষেত্র উপস্থিত হ'লে বহেড়া চূর্ণ মধু মিশিয়ে চাটলে উপশম হয়, তবে একটা কথা জানা দরকার—বহেড়ার স্বভাব রুক্ষ, তাই কড়াতে ২/৪ চা-চামচ ঘি চড়িয়ে বহেড়া চূর্ণ দিয়ে নেড়েচেড়ে একটু গরম ক'রে নিতে হয়, এর দ্বারা বহেড়ার স্বভাব-রুক্ষতা নষ্ট হয়। বহেড়া চূর্ণের মাত্রা ২/৩ গ্রাম।

২। **বাতিক কাসিতেঃ—** কাসি হ'চ্ছে অথচ বুকে সর্দি নেই এবং কিছু বেরোয় না; চল্‌তি কথায় যাকে পেট গরমের কাসি বলে। এক্ষেত্রে ঘি-এ ভেজে নেওয়া বহেড়া চূর্ণ ও মুথোর (cyperus rotundus) চূর্ণ সম পরিমাণে নিয়ে ৪ গুণ চিনির গাঢ় রসের সঙ্গে পাক ক'রে (মোটা রস ক'রে পাত্রটা নামিয়ে পরে যেভাবে মুড়কি পাক করে সেইভাবে পাক ক'রতে হয়) ছোট ছোট গুলি অথবা লজেন্সের মত কেক্ ক'রে রাখতে হয়, এগুলির ওজন আন্দাজ ২ গ্রাম ক'রে হবে। এই কেক্ বা গুলি সকালে ও বৈকালে একটি ক'রে চুষে খেতে হবে। এটাতে ঐ বায়ুজনিত কাসি সেরে যাবে।

৩। **স্বরভঙ্গেঃ—** যক্ষ্মারোগজনিত স্বরভঙ্গে নয়, ক্যান্‌সারের স্বরভঙ্গেও নয়; কোন উচ্চভাষণের জন্য যে স্বরভঙ্গ এসেছে অথবা হঠাৎ গরম-ঠাণ্ডা খেয়ে বা লেগে এটা হ'য়েছে, সেখানে বহেড়াচূর্ণ একটু মধু মিশিয়ে চেটে খেতে হবে। মাত্রা ২/৩ গ্রাম।

৪। **হাঁপানিতেঃ—** বহেড়া বীজের শাঁস (বাদামের মত) দুই-একটি ক'রে ২ ঘণ্টা

অন্তর চিবিয়ে খেতে হয়। এটাতে কার্ডিয়াক্ (হৃদ্‌যন্ত্রগত) হাঁপানিতে কোন কাজ হয় না।

৫। **আমাশায়ঃ—** সাদা আমাশাই হোক কিংবা রক্ত আমাশাই হোক—বহেড়াচূর্ণ সকালে ও বৈকালে ১—৩ গ্রাম মাত্রায় (অবস্থা ভেদে) জলসহ খেতে হয়।

৬। **অতিসারেঃ—** পাতলা দাস্ত—তার সঙ্গে আম থাকে, সশব্দে মল নির্গত হয়, বায়ু-নিঃসরণে আতঙ্ক—এই বুঝি একটু গ'লে যাবে, এক্ষেত্রে বহেড়াচূর্ণ আধ গ্রাম (৩/৪ রতি) ও মুথো (cyperus rotundus) ২৫০ মিলিগ্রাম একসঙ্গে সকালে ও বৈকালে দুইবার জলসহ খেতে হয়, এর দ্বারা দু'দিনের মধ্যেই এই অতিসার প্রশমিত হয়।

৭। **ইন্দ্রিয়-দৌর্বল্যেঃ—** অনেকের ধারণা আছে—পুরুষের বিশেষ অঙ্গটাই বুঝি ব্যাধিগ্রস্ত। না, সেটা ঠিক নয়, সমগ্র শরীরের যে শুক্রধাতু সেই তো আজ দুর্বল, তাই সেও তো দুর্বল; অতএব শুক্রধাতুকে বলবান ক'রলেই সেও বলবান হবে। সেক্ষেত্রে প্রত্যহ দু'টি ক'রে বহেড়া বীজের শাঁস (বাদামের মত) খেতে হবে, এর দ্বারা শুক্রের বলাধান হবে, তারও স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে।

বাহ্য প্রয়োগ

৮। **টাকেঃ—** যে টাক পরিণত বয়সে এসেছে, তাঁরা সেক্ষেত্রে চেষ্টা ক'রলে বিশেষ কিছু লাভ হবে বলে মনে হয় না। যাঁদের অকালে টাক প'ড়ে যাচ্ছে—তাঁরা বহেড়া বীজের শাঁস অল্প জল দিয়ে মিহি ক'রে বেটে, টাকে চন্দনের মত লাগাতে পারেন, এটা একদিন অন্তর লাগালেও চলে। এর দ্বারা নতুন চুল বেরোবে, রোগা চুলগুলিও মোটা হবে।

৯। **অকালপক্কতায়ঃ—** যাঁদের ছেলেবেলায় বা কম বয়সে পাক ধ'রেছে, তাঁরা বহেড়া ১০ গ্রাম (বীজ বাদ) জল দিয়ে বেটে, এক কাপ জলে গুলে, ছেঁকে, সেই জল দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলবেন। এটা দুপুরের দিকে করাই ভাল, নইলে মাথায় জল ব'সে সর্দি হ'তে পারে।

১০। **দাঁতের মাড়ির ক্ষতেঃ—** বীজ বাদ বহেড়ার শাঁস (উপরের মাংসল অংশ) আন্দাজ ৫ গ্রাম জল দিয়ে বেটে, ঘন ক'রে জলে গুলে সেইটা কবল ধারণ ক'রতে হবে। তবে দিনে ২/৩ বার হ'লে ভাল হয় এবং মুখে নিয়ে ১৫/২০ মিনিট ব'সে থাকতে হবে।

১১। **ফুলোয়ঃ—** যেখানে তার সঙ্গে ব্যথা থাকবে, সেখানে বহেড়া বেটে একটু গরম ক'রে প্রলেপ দিলে ব্যথা ও ফুলো দুই-ই ক'মে যাবে।

১২। **রক্তরোধেঃ—** কেটে গেছে—তাড়াতাড়ি রক্ত বন্ধ ক'রতে গেলে বহেড়ার মিহি গুঁড়ো ঐ কাটা জায়গায় টিপে দিলে তখনই রক্ত বন্ধ হ'য়ে যাবে, ব্যথাও হবে না। সংসারী লোকের ঘরে এটা একটু তৈরী ক'রে রাখা ভাল, এটা styptic -এর কাজ করে।

১৩। **শ্বিত্রে (শ্বেতি রোগে)ঃ—** বহেড়া বীজের শাঁস থেকে তেল বের ক'রে ঐ

সাদা জায়গায় লাগালে কিছুদিনের মধ্যে ওটার বর্ণ স্বাভাবিক হ'য়ে যাবে।

১৪। **চোখ ওঠায়ঃ—** যে চোখ ওঠায় চোখ কর্‌কর্‌ ক'রছে, জল ঝ'রছে, সেক্ষেত্রে বহেড়া ঘষে চোখে কাজলের মত লাগিয়ে দিলে চোখ ওঠা ও চোখের জলপড়া বন্ধ হয়।

এই বিভীতকের প্রসঙ্গটা শেষ করার প্রাক্‌কালে একটা কথা মনে আসছে—"নাম" যদি দুমুখো হয়, সেটার সমস্যা বড় কম হয় না—এই যেমন একটা সাধারণ শব্দ অমূল্য, সেই রকমই বিভীতক, অর্থাৎ যে বিশেষ ভীতি উৎপাদন করে, আবার এটাও তো হয়, যে ভীতিকে বিগত করে।

এই ফলটির হাড়ে ও মাসে দুটিতেই ভেল্‌কি আছে—হাড়ে আছে মনের ভেল্‌কি, আর শাঁসে আছে দেহের ভেল্‌কি।

এক এক সময় ভাবি—এইসব নামকরণ যেসব মগজ থেকে বেরিয়েছে, তাঁরা কি আমাদের মত তামসিক আহার ক'রতেন, না সাত্ত্বিক আহার ক'রতেন? তাই আজ সমীক্ষার বিষয়।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Tannin. (b) Fixed oil. (c) Saponin. (d) resinous compounds. (e) Amorphous glycosidal compounds.

কণ্টকারিকা

ভাষা-পরিচ্ছেদে বিশারদ (দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায়, বিশেষ ও অভাব—এই সাতটির জ্ঞানই ভাষা-পরিচ্ছেদের বক্তব্য) এক পণ্ডিত মহাশয়কে কোন গোলা কবিরাজ যদি বিধেন লিখে দেন, 'আপনি কণ্টকারি ভিজিয়ে খাবেন', তখনই পণ্ডিত মহাশয় শব্দ ভেদ ক'রে 'কণ্টকের অরি (শত্রু)' এইটা বুঝে গেলে, সেই বদ্যির মুণ্ডপাত করার চিন্তা যে তাঁর হবে না—একথা কে ব'লতে পারে! কারণ, বিশারদের বক্তব্যে দেখা যাচ্ছে—কণ্টকারি তো জুতোকেও বোঝায়, তা'হলে বোঝা যাচ্ছে—নাম-শব্দ এতই জটিল যে—বাস্তব জ্ঞানকে হাতড়ে না নিয়ে যিনি যেটাই করুন, তাঁর জ্ঞান অসম্পূর্ণই থেকে যায়; তাই কণ্টকারিকার পরিচিতি, গুণ, কর্ম যে কি, আজ ভাষা-পরিচ্ছেদ বিশারদদের কাছে তা নিবেদন ক'রতে চাই।

বৈদ্যকের নথি

"মুড়ি ও ভুঁড়ি সব রোগের গুঁড়ি" একটা লোককথা প্রচলিত। এই দুটি জায়গার একটি হ'লো জাহাজের কম্পাসের ঘর, আর একটি হ'লো ইঞ্জিন ঘর। আসলে ইঞ্জিন ঘর অচল হ'লে কম্পাসও অচলেরই সামিল। এদিকে দেখা যাচ্ছে—আমাদের প্রধান আশয় (ক্ষেত্র) দুটি। একটি হ'লো আমাশয় (Stomach) আর একটি অগ্ন্যাশয় (Duodenum)— এই দুটিকে নিয়ে আমাদের ইঞ্জিন ঘর; একটি আমাদের অন্নবহ স্রোতের সরণি; অবিপাক (অজীর্ণ অবস্থায় থাকা), বমন প্রভৃতি যত প্রকারের উদ্বেগ, সবই এই কেন্দ্র থেকে উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ প্রাণহর (Fatal) রোগগুলি এই আশয় দু'টি থেকেই জন্মগ্রহণ করে এবং পরিণামে তীব্র বেদনা (Colic), হিক্কা (Hiccough),

শ্বাস, বাত (বায়ু), কফাত্মক (কফ-সংশ্লিষ্ট) রোগ প্রভৃতি সৃষ্ট হয়। এক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের মতবাদ হ'লো—আমাশয় স্থানটি অন্নপরিপাকের (খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের) প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের স্বাভাবিক ক্রিয়াকারিত্ব শক্তি যে কোন কারণে বিঘ্নিত বা তার অস্বাভাবিকতাই অন্য রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়, এমন-কি অনেক ক্ষেত্রে হৃদয়ের বলও কমিয়ে দেয়, তখন তুচ্ছ কারণে, যেমন ধূলো, দূষিত বায়ু নাকে যাওয়া, ঠাণ্ডা জল খাওয়া, ঠাণ্ডা ঘরে বায়স্কোপ্ দেখা, অথবা হিমশীতল ঘরে ব'সে কাজ
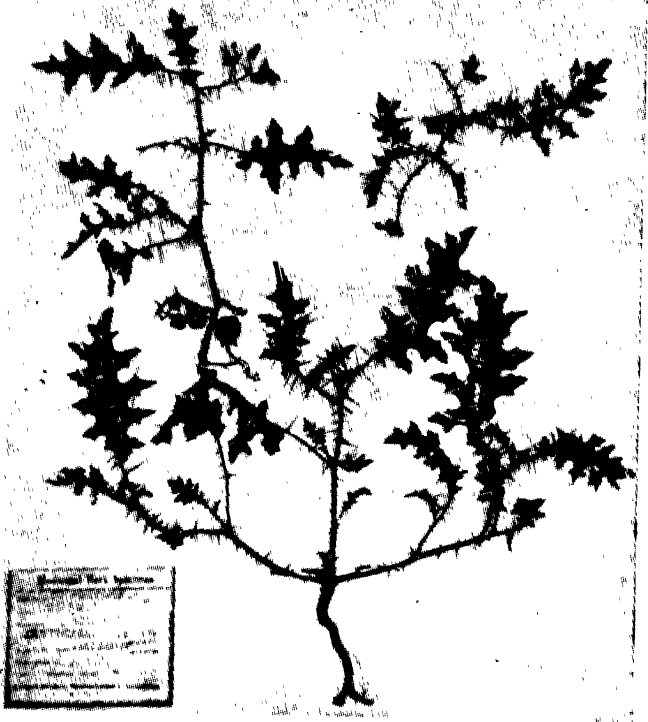
করা—এগুলিও তখন রোগের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়, পরে এইভাবে পরস্পর কার্যকারণ সম্বন্ধের ফলে প্রতিশ্যায়াদি (Nasal allergy) প্রভৃতি বিশটি রোগ ঘটবার কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।

মোটকথা, প্রথমে দূষিত হয় অন্নবহ স্রোত, তারপর সেইখানের যে ক্লেদক কফের জন্য দোষ সৃষ্টি হয়(Toxin form করে), সেই দোষ এবং দূষ্যগুলি (দূষিত পদার্থ-গুলি) একে অন্যের সহায়ক হ'য়ে শরীরকে ব্যতিব্যস্ত করে। একে সরল ক'রে বুঝতে গেলে আয়ুর্বেদের দু'টি কথা অনুধাবন করা দরকার—একটি হ'লো 'কোপ' আর দ্বিতীয়টি 'প্রকোপ'।

এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক যে, কেন এটি হয়? সেখানে চরক সংহিতায় বলা হ'য়েছে—

'ক্বাথ্য মানস্য সর্পির্যো অগ্নিসংযোগেন সঞ্চলনমেব প্রকোপনম্',

অর্থাৎ যদি কোন স্নেহ পদার্থকে কল্ক (জলের দ্বারা পেষা বস্তুপিন্ডকে বলে) সংযোগে অগ্নিতে উত্তপ্ত করা যায়, তাহ'লে সেটি যেমন ফুটে ফুটে উথলে ওঠে এবং চঞ্চল তরঙ্গে কম্পিত হয়, তেমনি বাহ্যবস্তুর প্রবল আকর্ষণ বা বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা সেই পদার্থগুলি ঊর্ধ্বদিকে উৎক্ষিপ্ত হ'তে থাকে, ওকেই বলা হয় 'প্রকোপ'। সেই রকম আমাদের আমাশয় অর্থাৎ পাকস্থলীতে দু'টি কারণে এই উৎক্ষেপের সৃষ্টি হয়; একটি হয় ঋতু দোষে, আর একটি হয় অসাত্ম্য বা অতিযোগের খাদ্য থেকে—এই অসাত্ম্য হ'লো আপনার পাকস্থলী যখন এই ধরনের খাদ্য আর গ্রহণ ক'রতে চাইছে না, সেইটাই হ'লো অতিযোগ।

আবার দেখা যায় ঋতুগুলিরও নৈসর্গিক স্বভাব আছে—যেমন বর্ষায় বায়ুর কোপ, শরৎকালে পিত্তের কোপ এবং বসন্তকালে কফের কোপ হয়, তবে সে কোপের অভি-ব্যক্তিটা আমরা উপলব্ধি করি আমাদের দেহের মাধ্যমে, কারণ আধার পেলে তবেই তো তার ক্রিয়া উপলব্ধি হয়; এই দেখুন একটি তারে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবহমান, কিন্তু যদি এমন কোন দ্রব্যের সাহায্যে তাকে স্পর্শ করা যায় যেটাতে আমার দেহে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার কোন সম্ভাব্যতা থাকবে না, আবার এমন ধরনের কোন দ্রব্যের (Non-conductor) কোন সাহায্য না নিয়ে তাকে স্পর্শ ক'রলে তার প্রকোপ আমাতে বর্তাবে।

এখন দেখা যাক তার কোন প্রাচীন ঐতিহ্য আছে কিনা—

সহস্ব মে অরাতীঃ সহস্ব পৃতনায়াতঃ
সহস্ব সর্বং প্রচোদনী সহমানৌষধীঃ।
(অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ৩।১২।৪)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

ত্বং প্রচোদনী প্রচোদ্যতে=অপসার্য্যতে রোগোঽনয়া চুদ্ নিচ্ ল্যুট ডীপ্ কণ্টকারিকা। নতু কণ্টকারী, সাতু বৃহতীতি যাস্কঃ। প্রকৃষ্ট রূপেণ শ্লেষ্মাদিকং রোগাণীকং অপসারয়তে অনয়া। ত্বং অরাতীঃ সহস্ব, প্রতিশ্যায়ং হন্যমানা। ত্বং পৃতনায়াতঃ পৃতনামিব সংগ্রামং সহস্ব, সহমানা ওষধীঃ ইতি।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—তুমি প্রচোদনী, শ্লেষ্মাদিপ্রভব রোগসমূহকে বিদূরিত কর। মহীধরের ব্যাখ্যায় এটি কণ্টকারিকা। কণ্টকারী নয়। কণ্টকারীর অপর নাম বৃহতী, এটি যাস্ক-কৃত নিরুক্তি (বৈদিক শব্দের একটি অভিধানের নাম)। তুমি প্রতিশ্যায়াদিকে শত্রুরূপেই হত্যা কর। অন্যদিকে পৃতনার (সেনানী সহযোগে) সহ্য কর, তুমি ওষধী।

বেদোক্ত প্রচোদনী বা কণ্টকারিকার ভৈষজ্য শক্তির অনুশীলনের ফল বিঘোষিত হ'য়েছে চরক সংহিতায়। এই সংহিতার সূত্রস্থানের ৪র্থ অধ্যায়ে যে পঞ্চাশৎ প্রকার মহাকষায়ের বিশেষগুণ বর্ণিত আছে, তাদের মধ্যে আবার দশ প্রকার মহাকষায়ের ৫টি

স্থানে নিবেশ করা হ'য়েছে—(১) হিক্কা দমনে, (২) অংগ মর্দনে (গা-হাত-পা কামড়ানিতে), (৩) শোথ হরণে, (৪) কাস হরণে এবং (৫) শীত হরণে।

দেখা যাচ্ছে—ক্লেদক শ্লেষ্মার প্রকোপে যতগুলি দুঃখকর এবং উদ্বেগজনক রোগের উৎপত্তি হয়, সব ক্ষেত্রেই কণ্টকারিকার বীর্যশক্তি সেই সকল রোগকে প্রতিহত করে। বর্তমান নিবন্ধে ব্যবহৃত যোগগুলি সেই মূল চিন্তাধারাকে অবলম্বন ক'রেই রোগ প্রতিকারে প্রয়োগ করা হয়েছে।

পরিচিতি

ঘন কণ্টকময় গুল্ম কিন্তু ভূলুণ্ঠিতা, অর্থাৎ মাটিতে গড়িয়ে গাঁড়য়ে ছত্রাকার হ'য়ে বেড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই গুল্মটির ডাঁটা নরম হ'লেও ভাংগে না; উপরের পাতলা ছাল তো আছেই আর ভিতরেও আছে আঁশ। শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট ডাঁটা ও পাতা দুই-ই সবুজ; পাতার শিরাতেও কাঁটা হয়। হেমন্তকালে গাছ বের হয়, শীতে ফল ও ফুল হয়, তবে ফুলের আকৃতি বেগুনের (Solanum melongena) ফুলের মত, তবে রং রক্তাভ নীল; ফল কাঁচায় সবুজ, গায়ে সরু কয়েকটা সাদা দাগ, ফল পাকলে হ'লদে হ'য়ে যায়, এর বীজও বেগুনের বীজের মত। গাছটি ভারতের প্রায় সর্বত্রই হয়, তবে দাক্ষিণাত্য, পাঞ্জাব ও বাংলায় প্রচুর পরিমাণে জন্মে। মজা নদ-নদীর চরে এবং ক্ষেতে-খামারে যে হয় না তা নয়, দো-আঁশ মাটিতে এদের বাড়-বৃদ্ধি বেশী, বর্ষা প'ড়লেই এরা ম'রে যায়। ডাঙগা জায়গায় অসময়েও গাছ হ'তে দেখা গেলেও সেটা খুবই কম। সাদা ফুলের কণ্টকারিকার গাছ দেখা যায় উত্তর ভারতের পাহাড়ী নদীর ধারে, গাছ দেখতে একই রকম, তাকেই বলা হয় 'শ্বেত কণ্টকারিকা'। চলতি কথায় আমরা ব'লে থাকি কণ্টিকারী, হিন্দিভাষী অঞ্চলে একে বলে রেঙ্গনি অথবা কাটেলিও বলে; আর এর সংস্কৃত পর্যায় নাম অনেকগুলি, যেমন ব্যাঘ্রী, নির্দিগ্ধিকা, বহুকণ্টা প্রভৃতি। এটির বোটানিকাল্ নাম Solanum Xanthocarpum Schard and Wendl.

ঔষধার্থে ব্যবহার হয় মূল, সমগ্র গাছ, ফুল ও ফল।

কণ্টকারিকা—প্রয়োগ ক্ষেত্র

এই কণ্টকারির প্রয়োগ সেখানে—আমাদের পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য যাওয়ার পর সেখানে যে ক্লেদক শ্লেষ্মা আছে, (এই ক্লেদক শ্লেষ্মার কার্য খাদ্যদ্রব্যকে তাল পাকিয়ে দেওয়া) কোন অহিতকর (তাঁর পক্ষে) দ্রব্য সেবনে ঐ ক্লেদক কফ দূষিত হয়, তখন ওখানকার বায়ু আবৃত হ'তে থাকে, যার ফলে সে বিকৃত রসকে উৎক্লিষ্ট করে, এই কণ্টকারিকা সেই দোষকে নিরসন করে।

প্রথমে আয়ুর্বেদ সংহিতোক্ত কয়েকটি ব্যবহার-বিধি লিখছি—

১। **অর্শের ধাতেঃ—** যাঁদের অর্শ আছে—এই ক্লেদক কফ বিকৃত হ'লে তাঁদের কোষ্ঠবদ্ধতা আসে। এখানে ব'লে রাখি, এ'রা কিন্তু এলার্জিতে ভোগেন; এক্ষেত্রে কণ্টকারিকা ২০ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে দু'বারে খেতে হবে। এটা চরকের চিকিৎসাস্থানের নবম অধ্যায়ে আছে।

২। **মদাত্যয় রোগেঃ—** মদকে (সুরা) যতই ডিষ্টিল্ড্ করা হোক না কেন, তার

কিট্টদোষ মুক্ত করা যায় না, এটি তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বর্তমান; যাঁরা মদে বেশী আসক্ত হ'য়ে পড়েন, পরিণামে আসে পিপাসা (এটা অগ্নিবল কমে যাওয়ার লক্ষণ), তখন মদের পিপাসাই বাড়তে থাকে; সেই সময় মানুষ কাণ্ডজ্ঞানহীন হ'য়ে পড়ে। এটা যতই খেতে থাকে, ক্ষিধে আর হয় না, মুখটা ফুলো ফুলো হ'তে আরম্ভ হয়, আর পেটটাও বড় হ'তে থাকে। এক্ষেত্রে কণ্টকারিকা ২৫ গ্রাম এক লিটার জলে সিদ্ধ ক'রে আধ লিটার থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে, যখনই পিপাসা হবে তখনই ঐ জল আধ কাপ আন্দাজ নিয়ে তা'তে একটু জল মিশিয়ে সমস্ত দিনে খেতে হবে। এর দ্বারা রোগ-জন্য যে পিপাসা সেটা তো যাবেই, অধিকন্তু মদ খাওয়ার প্রবৃত্তিটাও ক'মে যাবে। এটা আছে চরকের চিকিৎসাস্থানের ১২ অধ্যায়ে।

৩। **কাসিতে:—** অনেক সময় সংসারে পাইকারি হারে কাসি হ'তে দেখা যায়, তা যদি নাও হয় হয়তো একজনেরই হ'লো—একটা কাজ করলে ওষুধ খেতে হয় না, পথ্যি খেলেই সেরে যায়। সেটা হলো—১০ গ্রাম কণ্টিকারি ৮ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে, ৪ কাপ থাকতে নামিয়ে ঐ ক্বাথটা ছেঁকে নিয়ে, সেই ক্বাথের জলে মুগের ডাল রান্না ক'রে খেলে কাসি আর থাকবে না। এটা বলা আছে চরকের চিকিৎসাস্থান ২২ অধ্যায়ে।

৪। **পাথুরী রোগে:—** যে পাথুরী হ'লে স্ফিকে ব্যথা (কোমরের পিছনটায়), প্রস্রাব হওয়ার সময় জ্বালা যন্ত্রণা থাকবে না অথচ প্রস্রাব হ'তে হ'তে মাঝে মাঝে বন্ধ হতে থাকবে, এখানে বৈদ্যকের নির্বাচন—এটা শ্লেষ্মাজনিত (বায়ু তার অনুষঙ্গী) পাথুরী। এক্ষেত্রে কণ্টকারিকা ১০ গ্রাম, আর বৃহতীমূলের (Solanum indicum) ছাল ৫ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ৫০ গ্রাম আন্দাজ সাদা দই-এর সঙ্গে মিশিয়ে প্রত্যহ সকাল ৯ বা ১০টা নাগাদ খেতে হবে, এর দ্বারা ঐ পাথুরী আস্তে আস্তে ক্ষ'য়ে বেরিয়ে যাবে। এটা চরকের চিকিৎসাস্থানের ২৬ অধ্যায়ে আছে।

এবার সুশ্রুত সংহিতোক্ত দুই-একটি মুষ্টিযোগ লিখছি।

৫। **শ্বাস রোগে:—** এ-রোগ এলে আর যেতে চায় না, কোন কোন সময় কম থাকে সত্যি, যা হোক খুবই কষ্ট হ'চ্ছে—সেক্ষেত্রে ১০ গ্রাম কণ্টকারির মূল তার সঙ্গে ভাজা হিং-এর গুঁড়ো এক টিপ মিশিয়ে খেতে হবে, তবে শুকনো মূল ৫/৬ গ্রাম নিলেই চ'লবে। এটা আছে সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রের ৫১ অধ্যায়ে।

৬। **প্রবল কাসিতে:—** অনেক সময় এর পরিণতিতে গলক্ষতও হয়, সুতরাং উপেক্ষা না ক'রে কণ্টকারিকা কাঁচা পেলে ২৫০ গ্রাম নিয়ে, সেটা থেঁতো ক'রে ২/৩ লিটার জলে সিদ্ধ ক'রে, আন্দাজ এক লিটার থাকতে নামিয়ে, সেই ক্বাথ দিয়ে অন্ততঃ ৫০০ গ্রাম ঘি পাক ক'রে নিতে হবে। সেই ঘি প্রত্যহ ২ চা-চামচ ক'রে খেতে হবে। অবশ্য এটা সাধারণের পক্ষে করা সম্ভব হবে না, এটায় কোন বৈদ্যের সাহায্য চাই। এই ভৈষজ্য যোগটি আছে সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রে।

৭। **মূত্রকৃচ্ছ্রতায়:—** যেখানে দেখা যায় অল্প অল্প প্রস্রাব হ'চ্ছে, সেটাও মলদ্বারের সঙ্কোচন ক'রলে তবে এবং বস্তিটা (মূত্রথলিটা) ভারী বোধ এবং প্রস্রাব হ'য়ে গেলে তবে হালকা বোধ হয়, এক্ষেত্রে ১০ গ্রাম কণ্টকারিকা থেঁতো ক'রে সেটা ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে খেতে হয়, তবে কাঁচা বেটে সরবতের মত ক'রে খেতে পারলে খুবই ভাল হয়।

৮। **হুপিং কাসিতে:—** *এটা সাধারণতঃ বাচ্চাদেরই হয়, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মতে এটি ভাইরাস্-জনিত রোগ। এই রোগে কণ্টকারিকা ফুল শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে আধ গ্রাম মাত্রায়, শিশু হ'লো সিকি গ্রাম মাত্রায় নিয়ে মধু মিশিয়ে চাটিয়ে দিলে ঐ কাসিটা কয়েকদিনের মধ্যেই নিরাময়ের পথে যাবে, আর ২/৩ দিনের মধ্যেই* তার তীব্রতা ক'মে যাবে।

৯। **পুরানো শুক্নো কাসিতে:—** এর সঙ্গে অনেকের পেটের দোষও থাকে, সেখানে কণ্টকারিকার ফলের বীজগুলো, ফল থেকে বের ক'রে, সেই ফলের মধ্যে সৈন্ধব লবণের গুঁড়ো পুরে, পৃথক পৃথক মাটির ঠুলি ক'রে ঐ ফলগুলোকে পুরে, রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে, তারপর ঘুঁটের আগুনে পুড়িয়ে, পোড়া মাটি ছাড়িয়ে ফেলে দিয়ে লবণ সমেত ওটাকে গুঁড়ো ক'রে রাখতে হবে, ঐ গুঁড়ো এক বা দেড় গ্রাম মাত্রায় সকালে ও বৈকালে দু'বার জলসহ খেতে হবে। ২/৩ দিনের মধ্যে কাসিরও উপশম হবে, পেটের দোষও ক'মে যাবে।

১০। **হাঁপানিতে:—** হাঁপের টান আছে ও শুকনো কাসি, দম আটকে আসতে থাকে কাসতে কাসতে, সব শরীর ঘেমে যাচ্ছে, অথচ কিছু বেরুচ্ছে না; এক্ষেত্রে কণ্টকারিকার ফল-মূল গাছ সমেত ২৫০ গ্রাম নিয়ে একটু থে'তো ক'রে ২ লিটার জলে সিদ্ধ ক'রে, আন্দাজ আধ লিটার থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, সেটাকে পুনরায় ঘন ক'রে চিটেগুড়ের মত ক'রতে হবে এবং ঠাণ্ডা হ'লে তার সঙ্গে সমান পরিমাণ মধু মিশিয়ে রাখতে হবে, সকাল থেকে ৪/৫ বার এটাকে একটু একটু ক'রে চেটে খেতে হবে; এটা অন্ততঃ ৫/৬ দিন চ'লবে—এর দ্বারা ঐ কাসিটাও প্রশমিত হবে, তার জন্য টানেরও উপশম হবে।

বাহ্য ব্যবহার

১১। **পাঁকুই হ'লে:—** হাজা আর পাঁকুই কিন্তু এক নয়, পাঁকুই হাতে হয় না; হাজায় গর্ত হয় না, সাদা হ'য়ে চারদিকে ছড়িয়ে যায়, আর পাঁকুই পায়ের দুই আঙুলের মাঝে গর্ত হ'য়ে নিচে ঢুকেও যায়। এই জায়গায় কণ্টকারিকার তেল লাগালে সেরে যাবে।

এই তেল তৈরী করার পদ্ধতি:— যদি কাঁচা পাওয়া যায়, সেটাকে ভাল ক'রে থে'তো ক'রে জল দিয়ে ক্বাথ ক'রে নিতে হবে। কড়ায় সরষে বা তিল তেল চড়িয়ে নিষ্ফেন হ'লে তেলটা নামিয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'লে ঐ তেলে ক্বাথটা মিশিয়ে পাক ক'রতে হবে। এই কণ্টকারিকার গাছ শুকনো হ'লেও চ'লবে, সেটাকে ক্বাথ ক'রে নিতে হবে।

১২। **চোখ ওঠায়:—** কণ্টকারির মূল ২/৩ গ্রাম একটু থে'তো ক'রে, এক ছটাক আন্দাজ (৫০ মিলিলিটার) ছাগদুগ্ধ ও জল এক ছটাক নিয়ে একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে এক ছটাক থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সেই দুধে চোখ ধুতে হবে, এটাতে দু'দিনের মধ্যেই ওটা সেরে যাবে।

১৩। **গে'টে বাতে:—** গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা আর ফুলো—সেখানে স'জনের ছাল ও কণ্টকারিকা সমান পরিমাণে বেটে, একটু গরম ক'রে ঐ গাঁটের ফুলোয় প্রলেপ দিলে সেইদিনই উপকার পাওয়া যাবে।

১৪। **দাঁতের পোকায়:—** একটা লোহার ছুঁচে কণ্টকারির ফল গে'থে সেইটাকে

াগুনে একটু পুড়িয়ে ঐ ধোঁয়াটা দাঁতে লাগালে পোকার যন্ত্রণা সেরে যায়, তবে কান পাত্রে আগুন ক'রে একটা ফল ঐ আগুনে ফেলে, যখন ধোঁয়া উঠছে—তখন তামাক খাওয়ার ক'লকের মধ্যে ঐ ফলটাকে রেখে ঢেকে দিলে, ক'লকের পিছনদিক থেকে যে ধোঁয়া বেরুবে সেটা হাঁ ক'রে মুখের মধ্যে লাগালেও হয়। এটা বিহার অঞ্চলে খুবই প্রচলিত।

আজ কণ্টকারিকার উপসংহার ক'রতে ব'সে একটা কথা মনে হ'চ্ছে—বহু প্রাণী আছে—যাদের শিকারের পদ্ধতিটা স্বতন্ত্র, যেমন—মাছরাঙা পাখি ছোঁ মেরে মাছ ধ'রে খায়, ব্যাঙ জিভ উল্টে তার জিভের আঠা দিয়ে পোকাটাকে ধ'রে পেটে ভরে, সিংহ সামনে আক্রমণ করে, আর বাঘ (ব্যাঘ্র) কিন্তু সামনে থেকেও সে ঘাড়ে কামড়ে ধ'রে মানুষকে শিকার করে। এই যে—পিছনদিকে ধ'রে তাকে হত্যা করা, সেই দৃষ্টান্তটা এই কণ্টকারির ক্ষেত্রে তার "ব্যাঘ্রী" নামকরণ করারও অন্তরালে র'য়েছে—সে রোগকে পিছন থেকে আক্রমণ ক'রে রোগকে হত্যা করে। তাই এই গাছটির নাম "ব্যাঘ্রী" দেওয়া হ'য়েছে। প্রাচীনদের এই যে অনুশীলন—এটা বর্তমানের গবেষণা থেকে কি কিছু কম? তাই ভাবছিলাম—ছেঁড়া জামায় কি কেউ বেশী ভিক্ষে দেয়?

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Carpesteral. (b) Glycosidal alkaloids viz., solanocarpine, solanidine-s. (c) Solasonine, diosgenin, semi-drying oil, fatty acids.

প্রসহা (বৃহতী)

"ধ'রে বেঁধে পীরিত আর মেজে-ঘ'ষে রূপ"—এ দুটোর কোনোটা কি হয়? সেইটারই রূপান্তরিত পণ্ডিতিভাষ্য হ'লো—

কবিতা বনিতা চৈব সুখদা স্বয়মাগতা।
প্রসহ্যা-কৃষ্যমাণা চেৎ সরসা বিরসায়তে॥

অর্থাৎ কবিতা আর রমণী—এরা যদি আপনাআপনি বেরিয়ে আসে, তবেই হয় মধুর; নইলে সেই রসকলিকা দু'টি বিরসের বস্তু হ'য়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ কবি-প্রতিভার মাধুর্য তখনই হয়, যদি কবিতাশক্তির বিকাশ আপনাআপনি হয়। আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে 'ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়, ন বিপ্রায়' এ তো হবেই, অধিকন্তু বিড়ম্বনার শেষ।

এই হ'লো মনুষ্য সমাজের পরিবেশ, কিন্তু পশুপক্ষীর ক্ষেত্রে বহু স্থলেই বিপরীত, তারা পরস্পরের খাদ্য কেড়ে খেয়েই তৃপ্তি পায়, এটা হয়তো গৌরবের হয় তাদের। কোন জিনিস জোর ক'রে টেনে নেওয়া ও করাকে বলা হয় প্রসহ। এই প্রসহটাই চিকিৎসকের ধর্ম—এটা যাঁর নেই, তিনি চিকিৎসকই নন—সে কি ফিজিসিয়ান্ আর কি সার্জেন। রোগ হ'লে জোর ক'রে তিতো ওষুধ খাওয়ানো আর ফোড়া হ'লে অপারেশন—এই দু'টি তো দু'টি সম্প্রদায়ের চিকিৎসকের ধর্ম ও মানবিকতা, সুতরাং সব ক্ষেত্রেই এই ফরমুলা চলে না।

এই রকম একটি অবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ২।১৭৩।৮৭ সূক্তে একটি ভেষজকে "প্রসহা" নাম দিয়ে প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। সেটি হ'লো—

অহরহঃ প্রযাবং ভরন্তো অশ্বয়েব তিষ্ঠতে প্রসহা।
রায়স্পোষেণ সমিষা মদন্তো মা তে প্রতিবেশ রিষম্॥
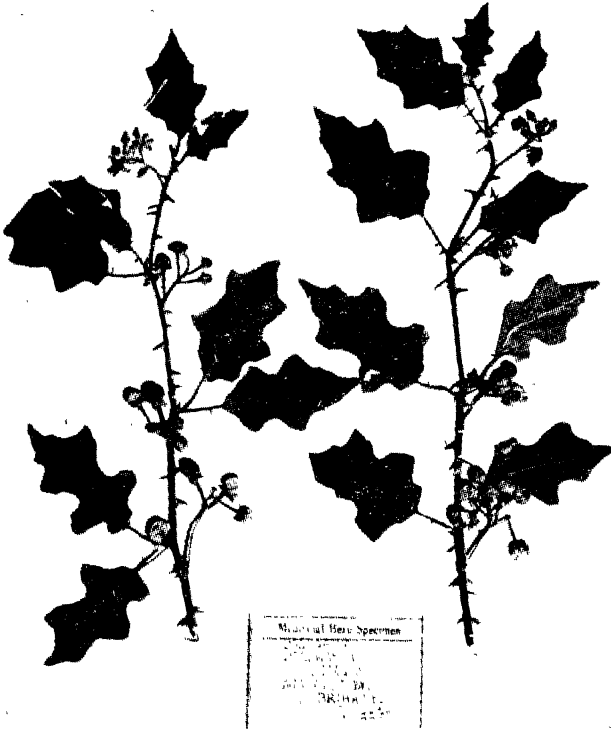
Solanum indicum

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

প্রসহা ত্বং বৃহতীতি। অহরহঃ প্রত্যহং সন্ততং অপ্রযাবং অপ্রমত্তং যথা তথা অশ্বায়েব বাজীব তিষ্ঠতে। রায়ঃ বেগঃ শুক্রমিতি, বয়ং ভরন্তঃ=লভন্তঃ স্পোষেণ=পুষ্টা ইতি পোষেণ, ত্বং সামিষা =গ্রাহিণী, মিষং আমিষং অপক্কং অপি রোচয়সি=অরোচক নাশিনীতি প্রসহা-বলাৎ বৃহতীতি রিষং হিংসনং বয়ং মা প্রাপ্নুয়ুঃ।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—অপ্রমত্ত হ'য়ে যে সর্বদা অশ্বের মত বিদ্যমান, যে প্রাণীর শুক্রকে বলপূর্বক পুষ্টিসাধন করে, অপক্ক গ্রহণ ক'রলেও যে রুচিপ্রদ—আমরা তোমাকে হিংসা করি না—এ কাজ বলপূর্বক কর, তাই তুমি প্রসহা।

উল্লিখিত বৈদিক সূক্তের একটি বিশেষ ইঙ্গিত গবেষণার উৎস বহন করে; ভাষ্যকার ব'লেছেন— (১) তুমি অপ্রমত্ত হ'য়ে সর্বদা অশ্বের মত বিদ্যমান, এটার দ্বারা সে বলপূর্বক অশ্বের মত বীর্যবত্তা শরীরে দান করে—এটার দ্বারা এইটাই কি প্রমাণ হয় না যে, এর মধ্যে হরমোন্ জাতীয় কোন দ্রব্য বর্তমান অথবা এনাবোলিক্ (Anabolic) কোন দ্রব্য এর মধ্যে আছে? কারণ দেখা যাচ্ছে—সংহিতার যুগে এর বীজকে বলা হ'য়েছে ক্ষবিকা, পীততণ্ডুলা, গর্ভপ্রদা। 'ক্ষব' শব্দের অর্থ অবশ্য হাঁচি হওয়া; এটার একটা উত্তেজক ক্ষরণশীলতার শক্তি আছে, যার জন্য হাঁচি হয়। দ্বিতীয়ত গর্ভপ্রদা, তাহ'লে যেখানে শুক্রের মধ্যে কীটের অভাব থাকে সেইটাকে কি সে পূরণ করে অথবা নারীর ক্ষেত্রে তার ওভারি (Ovary) অর্থাৎ ডিম্বকোষকে সে বলাধান করে? সেটাও সমীক্ষার বিষয়। আরও বলা হয়েছে, এটি রুচিপ্রদ অর্থাৎ অরুচি (Anorexia) দূর করে। এখন দেখা যাক, সংহিতার যুগে তাকে আরও কোন্ চোখে দেখেছেন।

বৈদ্যকের নথি

বেদ সূক্তিতে প্রসহা এবং ভাষ্যকার লোকপরিচয়ে তাকে বৃহতী নাম দিয়ে চিনিয়ে দিয়েছেন। তাই সংহিতাগুলির অগ্রগণ্য চরক সংহিতায় বৃহতীকে সূত্রস্থানে ভেষজ পরিচয়ে এবং চিকিৎসাস্থানের শোথে এর উল্লেখ দেখা যায়; আর একটি পরিচয় অঙ্গমর্দনে এর বীর্যশক্তি প্রচুর।

বৈদিক সূক্তের অনুভাষ্য হিসেবেই দেখা যায়—যেখানেই শ্লেষ্মপ্রধান বিকারের উল্লেখ, সেইখানেই বৃহতীর ব্যবহার। মুখে অরুচি জন্মে পিত্ত-শ্লেষ্মবিকারে, তাছাড়া শরীরে শৈত্যবোধ, তন্দ্রা, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে বৃহতী খুবই উপযোগী।

এখানে প্রশ্ন এই ওঠে যে, ভেষজটির স্বাভাবিক দ্রব্যশক্তি এমন কি আছে—যাতে বেদোক্ত সূক্তের প্রয়োগ ফল সংহিতাগ্রন্থগুলিতে এত ব্যাপক?

তার উত্তরে, আয়ুর্বেদোক্ত চিকিৎসা বিধানে অগ্নিগুণ ও আকাশীয় গুণের প্রাধান্যের জন্যই বৃহতীর আময়িক প্রয়োগবিধি; অগ্নির ঊর্ধ্বগামিত্ব থাকার জন্যই শরীরের মধ্যে শ্লেষ্মবিকারের ক্ষেত্রে হিক্কা, কাস, অরুচি, প্রতিশ্যায়, স্বরভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে এবং ভুক্ত বস্তুর শোষণের ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা। এ সম্পর্কে দেখা যায়—চরকে অশ্মরীতে, কাসে; সুশ্রুত সংহিতায় শকুনিগ্রহে, যোনিরোগে; বাগ্‌ভটে ইন্দ্রলুপ্তে; চক্রদত্ত সংগ্রহে শিশুর বমনে; হারীত সংহিতায় সন্নিপাত জ্বরে ও সংগ্রহগ্রহণীতে প্রয়োগ ক'রা হ'য়েছে।

পরিচিতি

অযত্নসম্ভূত গুল্মজাতীয় গাছ, যত্র-তত্র হয়, তবে সাধারণতঃ প'ড়ো জায়গায় (জংলা জায়গায়) হ'তে দেখা যায়, ৩/৪ ফুট পর্যন্তও উঁচু হয়। দেখতে কাঁটা বেগুনের গাছ যেমন—অনেকটা সেই রকমই, তবে এই গাছের গায়ে ও পাতায় ঘন ঘন কাঁটা হয় এবং তার মুখ অল্প বাঁকা; আর কাঁটা বেগুনের (যার লোকপ্রচলিত নাম মাক্‌ড়া বেগুন) পাতা থেকে এর পাতা অনেক ছোট এবং পাতলা। ফুল দেখতে বেগুনে রংয়ের

বেগুনেরই ফুলের মত কিন্তু আকারে একটু ছোট। এর ফল কাঁচায় সবুজ, আকারে কাবুলী মটরের মত, পাকলে সেটার রং হয় অনেকটা ফিকে কমলালেবুর রংয়ের মত; আবার কোন কোন গাছে এই ফলের রং বেশ লালচে। বারোমাসই প্রায় ফুল-ফল হ'তে দেখা যায়, তবে গ্রীষ্মের তাপে মাঠঘাট শুকিয়ে জলের অভাবে গাছে প্রায় পাতা থাকে না, কিন্তু গাছ মরে না, বৃষ্টি হ'লে আবার গাছ সতেজ হয়। বাংলায় এই গাছকে চলতি কথায় "ব্যাকুড়" বলে, হিন্দীভাষী অঞ্চলে বলে "বীরহাত্তা"। এই গাছটির

Solanum khasianum

বোটানিকাল্ নাম Solanum indicum Linn., ফ্যামিলি Solanaceae. সমগ্র পৃথিবীতে এই গণের সাত শত প্রজাতি (species) আছে, তবে প্রধানতঃ উষ্ণপ্রধান অঞ্চলেই এই গণের গাছগুলিকে হ'তে দেখা যায়।

এখানে একটা কথা সবিনয়ে নিবেদন ক'রে রাখি—আমাদের বিপদ কোথায় জানেন? সেটা হ'লো—এই গাছের পরিচিতি নিয়ে। নিবন্ধোক্ত প্রকৃত গাছ কোন্‌টি—যদি ঠিক

চিনতে না পারা যায়, তাহ'লে এইসব মুষ্টিযোগেও রোগোপশম হবে না, তখনই এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উপর অশ্রদ্ধা আসাটাই স্বাভাবিক। কেন এ কথা ব'লছি—সাধারণতঃ আমরা (অবশ্য যাঁদের ঠিক চেনা নেই) বর্তমানে যে গাছ বৃহতী ব'লে পাচ্ছি, সেগুলি ঐ গণের গাছ বটে, তবে সেটা Solanum indicum নয়, সেটির বোটানিকাল্ নাম Solanum torvum., বাংলায় এই গাছটির প্রচলিত নাম "গোষ্ঠ বেগুন" বা গোঠ বেগুন।

এ প্রশ্ন মনে আসতে পারে যে, যে গাছ অযত্নসম্ভূত, যত্র-তত্র হয় অথচ একে কেন সংগ্রহ করা হয় না? তার কারণ হ'লো—এই গাছে এত ঘন কাঁটা যে, সে গাছের ধারে-কাছে সংগ্রহকারীরা ঘেঁষতে চায় না, তাই এটা বিক্রয়ার্থ বাজারেও আসে না। এ তো গেল এক রকম; এমনকি কাঁটা বেগুনের গাছগুলিকে কুচিয়ে বৃহতী ব'লেও বিক্রি হয়। আবার বনবেগুনের যে গাছ হয় সেও দেখতে একই রকম, তবে তার ফল বৃহতী থেকে বেশ বড়। কিন্তু ফুল সেই বেগুনে রংয়ের।

আরও একটা তথ্য জানা দরকার—আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে 'বৃহতীদ্বয়ম্' লেখা আছে— (১) বৃহৎ ফলা, (২) ক্ষুদ্র ফলা; এই বৃহৎ ফলাটি Solanum khasianum নয়তো? এই গাছ কিন্তু এসব অঞ্চলে মাঝে মাঝে দেখা গেলেও উত্তরবঙ্গ ও আসামে প্রচুর পরিমাণে এবং যেখানে-সেখানে হ'য়ে আছে, তবে গাছগুলির ফুল সাদা, ফলও বেশ বড় হয়, কাঁচায় সবুজ, গায়ে সাদা সাদা ডোরা দাগ এবং পাকলে একটু হ'লদে হয়। ভেষজবিজ্ঞানীগণ দেখেছেন এই ফলটিতে এক জাতীয় হর্‌মোন পাওয়া যাচ্ছে। তবে নবীন উদ্ভিদবিজ্ঞানীগণের মতে এই গাছটি নাকি বহিরাগত।

যাক, আর একটা প্রসঙ্গ তুলে এখানকার প্রসঙ্গটি শেষ ক'রবো।

পঞ্জিকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি—খাদ্য গ্রহণের নিষিদ্ধ তিথি বিচারে দ্বিতীয়া তিথিতে বৃহতী ভক্ষণ নিষেধ, আবার ত্রয়োদশী তিথিতে বার্তাকু (বেগুন) ভক্ষণ নিষেধ, অতএব দেখা যাচ্ছে যে, সমাজে এই বৃহতীফল খাওয়ার প্রচলন ছিল; তাহ'লে খাদ্য হিসেবেও এর উপযোগিতা খুব প্রাচীন।

লোকায়তিক ব্যবহার

১। **শ্লেষ্মাধিক্য-জ্বরে:—** যেখানে দেখা যাচ্ছে শরীরে মোচড়ানি ব্যথা ও যন্ত্রণা, বিশেষতঃ গাঁটে গাঁটে, তার সঙ্গে জ্বর—সেখানে বুঝতে হবে রসবহ স্রোতে কফের ঘনত্ব এসেছে, সর্বশরীরগত সঞ্চরণশালী বায়ু, তাকে ঠেলে চ'লতে পারছে না, তাই এই ব্যথা ও যন্ত্রণা; এক্ষেত্রে বৃহতীর কাঁচা ফল ৫/৬টি থে'তো ক'রে, এক কাপ গরম জলে ঘণ্টাখানেক ভিজিয়ে রেখে, সেটা ছে'কে ২ ঘণ্টা অন্তর ২/৩ বারে খেতে হবে। এর দ্বারা কফগুলোকে খুবলে নিয়ে বায়ুর গতিকে সাবলীল ক'রে দেবে।

২। **সর্দিতে:—** বুকে পিঠে ব'সে গিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক অবস্থা নেই, কষ্ট হ'চ্ছে, মনে হ'চ্ছে যেন পাষাণ চেপে আছে, এক্ষেত্রে বৃহতীফল শুষ্ক হ'লে ২ গ্রাম আর কাঁচা হ'লে ৫ গ্রাম একটু থে'তো ক'রে ২ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে ২ ঘণ্টা অন্তর ৩/৪ বারে খেলে বুকের চাপটাও ক'মে যাবে, শরীরও ঝরঝরে হবে।

৩। **কফের ধাতে:—** বারোমাসই সর্দি লেগে থাকে, বেশী চলাফেরা ক'রলে হাঁসফাঁস ক'রতে থাকে, এই ধাতের লোক যাঁরা, তাঁদের উচিত ৭/৮টি বৃহতীফল

থে'তো ক'রে, অল্প জলে চট্‌কে, নিংড়ে রস বের ক'রে, এক চা-চামচ আন্দাজ প্রত্যহ কয়েকদিন খেলে শেলষ্মার প্রবণতাও চ'লে যাবে। মোটকথা—Cold Susceptibility-তে—যেখানে সর্দি বাসা বে'ধে থাকে. সেখানে কাজ হয়।

৪। **পেট রোগায়ঃ—** যাঁরা বারোমাস অজীর্ণরোগে ভোগেন, তাঁরা বৃহতীফল চূর্ণ আধ গ্রাম মাত্রায় সকালে ও বৈকালে ২ বার জলসহ খাবেন।

৫। **অরুচি রোগেঃ—** অনেক সময় সাময়িক কারণেও অরুচি আসে, যেমন—পিত্ত-শ্লেষ্মা জ্বরে ভুগলে, অথবা গর্ভাবস্থায় বা পাণ্ডুরোগে (anaemia) ভুগতে থাকলে, কিংবা ক্রিমির উপদ্রব বাড়লে অরুচি হয়; এভিন্ন কোন তীব্র গন্ধ দীর্ঘদিন ব্যবহার ক'রতে থাকলে অথবা নাকে যেতে থাকলেও অরুচি আসে। এক্ষেত্রে বৃহতীর কচি পাতা সিদ্ধ ক'রে জলটা ফেলে দিয়ে, ঘিয়ে সাঁতলে শাকের মত কিছুদিন খেতে হবে। এর দ্বারা এই অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৬। **পুরনো হাঁপানি রোগেঃ—** রোগটা সেরে যাবে—এ কথা বলছি না, তবে উপশম হবে। যাঁরা এই রোগে আক্রান্ত তাঁরা বৃহতীফল শুকিয়ে নিয়ে প্রথম ৬/৭ দিন ৫ গ্রাম ফলকে থে'তো ক'রে, তাকে ২ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে, আধ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, সকালে অর্ধেক ও বৈকালে অর্ধেক খেতে হবে। তবে এটা ৭ গ্রাম পর্যন্তও নেওয়া যায়।

৭। **পিত্ত বৃদ্ধিতেঃ—** সাধারণতঃ দেখা যায়—শরৎকালে এটা বেশী হয়, মুখেও তিতো লাগতে থাকে, এই সময় বৃহতী ফলের তরকারি অল্প পরিমাণে একদিন অন্তর খেলে পিত্তবিকারটা চ'লে যাবে।

৮। **অগত্যা বৈরাগীঃ—** বয়েসও যায়নি, অসুবিধেও নেই, তবুও ভোগে অরুচি, কি মানসিক আর কি দৈহিক। এই রকম যে অবস্থা, সেক্ষেত্রে বৃহতী ফলের রস ক'রে এবং সেটা একটু গরম ক'রে নিয়ে, সকালের দিকে ১ চা-চামচ ও বৈকালের দিকে ১ চা-চামচ ৫/৭ দিন খেলে, আবার নতুন বয়সের আমেজ ফিরে আসবে। তবে প্রথমে কয়েকদিন একবার ক'রে খেয়ে দেখতে হবে, তারপর অবস্থা বুঝে দুইবার খেতে হবে।

৯। **দম্‌কা দাস্তেঃ—** অনেকের ২/৪ দিন অন্তর দম্‌কা দাস্ত হয়। তাঁরা মাঝে মাঝে বৃহতী ফলের তরকারি ক'রে খাবেন, এটাতে ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

১০। **গে'টে বাতেঃ—** গাঁটে ব্যথা, তার সঙ্গে ফুলো, এইসব লোকের নিত্য খাদ্যের মধ্যে বৃহতী ফলের তরকারিকে ফেলতে হবে; তাহ'লে কিছুদিন বাদে ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে। তবে কোন মিষ্ট দ্রব্য বা মিষ্ট ফল অথবা টক বর্জন ক'রে চলাই ভাল। এ'দের পক্ষে কোন একটু তিতো জিনিস খাওয়া ভাল।

১১। **মূত্রকৃচ্ছ্রেঃ—** এটা দু'টি কারণে দেখা যায়—একটি ক্ষেত্র প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড বড় হ'লে; আর যদি মূত্রবস্তিতে পাথুরী জন্মে থাকে, সেটা ঠিক করা যাচ্ছে না; এক্ষেত্রে বৃহতী মূলের ছাল চূর্ণ ১ গ্রাম মাত্রায় প্রত্যহ সাদা দই-এর ঘোল ক'রে, সেই দিয়ে খেতে হবে। এইভাবে ৭ দিন খেলে প্রস্রাব সরল হ'য়ে যাবে। যদি এটাতে বিশেষ উপকার না হয়, তখন অশ্মরীভেদক অন্য বনৌষধি প্রয়োগ ক'রতে হবে।

১২। **দ্রংষ্ট্র বিষ সন্দেহে:—** কি কামড়ালো দেখাও গেল না এবং বোঝাও গেল না, অথচ নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকাও যাচ্ছে না, এমতাবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে বৃহতী পাতা থে'তো ক'রে ৩/৪ চা-চামচ রস খাইয়ে দেওয়া, এর দ্বারা প্রতি-ষেধক হিসেবে এটি কাজ করে।

১৩। **যোনি কণ্ডূয়নে:—** অনেক সময় এই বাহ্য অসুবিধে মায়েদের বিব্রত করে; নরম জায়গা চুলকোনোও যায় না, আবার না চুলকেও থাকা যায় না; এই অবস্থায় বৃহতী ফলের রস ক'রে ছে'কে, একটা তুলি ক'রে দিনে দু'বার ব্যাধিতস্থানে লাগিয়ে দিতে হবে। এটা ২/৩ দিন লাগালেই এই চুলকণা ক'মে যাবে।

১৪। **শিশুর দুধ তোলায়:—** বুড়ি ঠান্‌দি ব'লে গেল 'ছেলে যত ওগ্‌রায়, তত মোগ্‌রায়' অর্থাৎ ছেলে যত দুধ তোলে, ততই মুগুরের মত চেহারা হয়, আসলে এই দুধ তোলাটা এসেছে মায়ের বুকের দুধ খেয়ে, আসলে মায়ের অম্লরোগ আছে। অথবা যদি কোন ফুড্‌ খেয়ে এই রকম দুধ তুলতে থাকে তা'হলেও বুঝতে হবে—তার ভিতরে ভিতরে চাপা অম্বল (acid) হ'চ্ছে, সেই জন্যেই। এক্ষেত্রে বৃহতী ফলের রস এক ফোঁটা ২/৫ ফোঁটা মধু মিশিয়ে চাটিয়ে দিলে ঐ বমি বন্ধ হ'য়ে যাবে। তবে মায়ের অম্লরোগটা যেন ক'মে যায়, তার ব্যবস্থাও ক'রতে হবে। আর একটা কথা ব'লে রাখি—কাঁচা ফল প্রত্যহ যোগাড় করা সম্ভব না হ'লে কতকগুলি ফলকে শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে সেই গুঁড়ো আধটিপ নস্যির মত নিয়ে, একটু মধু মিশিয়ে চাটিয়ে দিতে হবে।

১৫। **সায়েটিকা বাতে:—** একে আয়ুর্বেদে বলা হয় গৃধ্রসী। শকুনকে গৃধ্র বলা হয়, এই সায়েটিকা বাতটি কোমর থেকে আরম্ভ ক'রে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নেমেছে; যখন এই সায়েটিক্‌ নার্ভের যন্ত্রণা হয়, তখন শকুন যেমন খুবলে খুবলে মাংসগুলিকে খায়, সেই রকম খুবলে নেওয়ার মত যন্ত্রণা হ'তে থাকে। এক্ষেত্রে এই বৃহতীফল সিদ্ধ ক'রে নিয়ে পরিশ্রুত (রিফাইন্‌) এরণ্ড তেলে (ক্যাস্টর অয়েল) ভেজে এক বা দুই তোলা (১০ থেকে ২০ গ্রাম) ক'রে প্রত্যহ সকালে অথবা বৈকালে ভাজা কাবুলী মটরের মত খাবেন; এর দ্বারা কয়েকদিনের মধ্যেই ঐ দুর্বিষহ যন্ত্রণার উপশম হবে।

১৬। **সংগ্রহগ্রহণী:—** এই রোগে রোজই পাতলা দাস্ত হয়, তবে দিনেই হয়, রাত্রে কিছুই থাকে না অর্থাৎ দাস্ত হয় না—একেই বলা হয় সংগ্রহগ্রহণী। এক্ষেত্রে বৃহতীমূলের ছাল চূর্ণ ক'রে এক গ্রাম মাত্রায় সকালে ও বৈকালে দু'বার জলসহ খেতে হয়—এর দ্বারা কয়েকদিনের মধ্যে এই গ্রহণী রোগের উপশম হবে। তবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সাবধান না হ'লে রোগ কি সারবে?

১৭। **টাক রোগে:—** একে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে Alopecia areata বলে, আমরা একে বলি বিক্ষিপ্ত টাক। এটি একটি Fungus infection, তবে একটি বিশেষ ইঙ্গিত দেওয়া আছে—যাঁর এই টাক হয়েছে এবং তার যদি প্রমেহ রোগও (urinary disease) থাকে, সেক্ষেত্রে এই টাক সেরে যাওয়ার অন্তরায় হয় এই প্রমেহ রোগটি। তথাপি জানিয়ে রাখি—বৃহতীফলের রস ক'রে তার সঙ্গে সমান পরিমাণ মধু মিশিয়ে টাক যেখানে পড়েছে, সেখানে ঘষতে হবে। এটা মাথায় অন্ততঃ ৫/৭ ঘণ্টা রাখতে হবে এবং একদিন অন্তর মাথায় লাগাতে হবে। এর দ্বারা ঐ টাকে নতুন

চুল গজাবে।

ভারতীয় চিন্তাধারায় নাম দেখে যদি তার বাস্তব রূপ কল্পনা করি, তাহলে সুতোর মুখ হারিয়ে যাবে—কেন তা বলছি—'গজ' ব'লে একরকম পোকা আছে, সে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে ঢুকে কয়েৎবেলকে অন্তঃসারশূন্য ক'রে খেয়ে নেয়; থাকে শুধু উপরের খোলটি। বর্তমান আয়ুর্বেদের অবস্থা যদি কেউ উপহাস ক'রে বলে ফেলেন—এটা এখন "গজভুক্ত কপিত্থবৎ", তাহলে অবনতমস্তকে আমাদের মানতে হবে। আচ্ছা, আমি যদি বলি—এতটুকু ছোট্ট ফল, তার নাম বৃহতী কেন দেওয়া হ'ল? তাঁদের দেওয়া নামটার অন্তর্নিহিত অর্থকে বিচার করলে দেখা যাবে—শ্লেষ্মা বিকারগ্রস্ত হ'য়ে যেসব রোগকে যাপ্য ক'রে রাখে, তাদের সে নিরাময় করে। আর বৈদিকরা দেখেছেন—এ শ্লেষ্মাকে খুবলে খুবলে সরিয়ে দেয়, তাই তার নাম দিয়েছেন প্রসহা, তাই বলি—তার ক্রিয়াকারিত্বকে প্রাধান্য দিয়ে তার এই বৃহতী নামকরণ, বাস্তব আকারের জন্য তার এই নামকরণ নয়, হয়েছে তার গুণকে বিচার ক'রে।

CHEMICAL COMPOSITION

(for Solanum indicum)

(a) Enzyme, semidrying oil, Fatty acids. (b) Alkaloids viz., solanine, solanidine. (c) Sitosterol, carpesterol.

(for Solanum khasianum)

(a) Solasodine, Solakhasianin, diosgenin.

ইন্দ্রযব (কুড়চি)

অনেক ক্ষেত্রে খ্যাতিসম্পন্ন মা-বাবার নামেই সন্তান পরিচিত হন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে জনক-জননীরাই পরিচিত হন সন্তানের নামে।

দেখা যাচ্ছে, বৈদিক সংস্কৃতিতেও একটি ভেষজ তার উপাদান-যোনির দ্বারা পরিচিত না হ'য়ে, পুত্ররূপী ইন্দ্রই যেন নামের দ্বারা পরিচিত হ'য়েছে; আসলে খ্যাত হওয়া উচিত ছিল কুটজ নামে, কিন্তু হ'য়েছে ইন্দ্রযবে পরিচয়। হ'লে কি হবে, এরা ধাড়ী-বাচ্চা সকলেরই স্বভাব তিক্ত।

উদ্ভিদ জগতের সমাজ-সংস্কারক ব'ললে, এ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের রাজগোষ্ঠীর একজন তাকে এমন গোষ্ঠীভুক্ত ক'রেছেন, যে গোষ্ঠীর প্রায় সকলেরই স্বভাব তিক্ত, কিন্তু এই গোষ্ঠীর সকলেই বুকে দুধ নিয়ে বাস করে। তার সমাজের শিষ্যগোষ্ঠীর সকলেরই এটা জানা।

এখন দেখা যাক, বৈদিক আমলের আর্য সমাজের চোখে ইন্দ্রযব কি?

অথর্ববেদের ৩৭৭।২২।৫২ সূক্তে বলা হয়েছে—

> 'ইন্দ্রঘোষস্ত্বা অভ্যাবর্ত্তস্ব ধত্তে যজ্ঞেন পয়সা সহ। সং তে পয়াংসি সমূযন্তু বাজাঃ সং বৃষ্ণান্যভিমাতিষা অমৃতায় সোম বৎসো যমং পরমার্চিৎ সধস্তাৎ।'

এটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> 'ত্বা ইন্দ্রঘোষ অভ্যাবর্ত্তস্ব। ইন্দ্রযব ইতি। ইন্দ্র ইতি জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে যবাকৃতি বীজানি জায়ন্তে। তেন ইন্দ্রঘোষঃ। ত্বা অভ্যাবর্ত্তস্ব

যজ্ঞেন পয়সা সহ। তে তব পয়াংসি ক্ষীরাণি রেতাংসি সমুযন্তু বাজাঃ বৃষ্ণানি চ। তব বৎসঃ বীজং যমৎ সং যমৎ পরমার্চিঃ উৎকৃষ্টং সহ স্নানাৎ সধস্তাৎ।'

ভাষ্যটির অনুবাদ এইরকম—তোমাকে ইন্দ্রঘোষ ব'লে অভ্যর্থনা করি। তুমি জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে যবাকৃতি বীজ দান কর। তাই তোমার নাম ইন্দ্রযব। যজ্ঞে তোমার ক্ষীর-রূপ

Holarrhena antidysenterica

দুগ্ধের সহিত আগমন ক'রে আমাদের রেতকে বর্ধিত কর। যে স্থান শিথিল হয়, তুমি তাই উৎকৃষ্টরূপে আবার স্থাপন কর।

মহীধর ভাষ্যের সমীক্ষা

এখানে 'ইন্দ্রঘোষ' বলার সার্থকতায় দু'টি ইঙ্গিত বহন করে। প্রথমতঃ বর্ষাকালকে ইন্দ্রকাল বলা হয়, এই বীজের জন্মলগ্ন ইন্দ্রকালে, তাই সে ইন্দ্রযব; দ্বিতীয়তঃ তীরের অগ্রভাগের নাম ইন্দ্র, এর শিম্বীরূপী ফলের অগ্রভাগ তীরের অগ্রভাগের মত সরু, তাই মধ্যের বীজগুলির আকৃতি যবের অগ্রভাগের মত হয়, সেইজন্য তাকে ইন্দ্রযব বলা হয়; আর জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বীজ দান করে। এই জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের নামকে অবলম্বন ক'রে জ্যৈষ্ঠ মাসের নামধারণ। যেমন বিশাখা থেকে বৈশাখ এসেছে, যেমন পূর্বাষাঢ়া থেকে আষাঢ় এসেছে, শ্রবণা থেকে শ্রাবণ এসেছে—সেই রকমই।

বেদভাষ্যের ইঙ্গিতে দেখা যাচ্ছে—আমাদের রেতকে বর্ধিত কর—এই উক্তি করা আছে। আমাদের মধ্যে 'রসায়ন নির্মাণের' ক্ষেত্রে ইন্দ্রযবের ব্যবহারের উল্লেখ থাকলেও একমাত্র পুঁথিগত স্মৃতি ছাড়া ইন্দ্রযবে যে রেত বর্ধিত হয়—এটা প্রাত্যক্ষিক নয়, কিন্তু ইউনানি সম্প্রদায় ইন্দ্রযব ব্যবহার করেন রসায়নকার্যে, তবে তাঁরা যেটা ব্যবহার করেন সেটা এই যব নয়, মিঠা ইন্দ্রযব, এইটাই আমাদের 'অসিত কুটজ বীজ', স্বল্প তিক্ত; ওটাকে ওঁরা উর্দুতে বলেন 'জবান্ কুনজুস্ক্' অর্থাৎ আকৃতিতে সেটা ছোট পাখীর জিভের মত, আর আরবীতে বলা হয় লিসান্-উল্-আসাফির্—লিসান্ শব্দের অর্থ জিভ আর আসাফির্ ছোট পাখী। ঐ সম্প্রদায় রসায়নকার্যে এই মিঠা ইন্দ্রযবই ব্যবহার করেন। 'ইন্দ্র জো সিরিন্'—এটাও উর্দু শব্দ, এই সিরিন্ অর্থে মিষ্টি বা মিঠা। তাহ'লে বৈদিক ইন্দ্রযবের ব্যবহার অসিত কুটজ বীজের না হ'লে "তোমার দুগ্ধের সঙ্গে" ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিক্ততা বর্জনই বক্তব্য সেখানে। এটা মহীধরের ভাষ্য -ব্যাখ্যার দ্বারাও সামঞ্জস্য হয়।

সংহিতাকালের গবেষণা

বৈদিক সূক্তটি সংহিতোক্ত ইন্দ্রযবের তুল্যতা জানার পক্ষে খুবই জটিল; কারণ বৈদিক সূক্তে ইন্দ্রযব শব্দটির দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায়—তাতে চরকের বক্তব্যে ইন্দ্র-যবের মধ্যে আছে ফল-প্রাধান্য। বৃক্ষের অন্য কোন অংশ গ্রাহ্য হয় না, সেইজন্য চরক সংহিতার সূত্রস্থানের প্রথম অধ্যায়ে ইন্দ্রযব বা কুটজ বৃক্ষের ফলই গ্রহণ করা হ'য়েছে এবং বমন ও আস্থাপনে প্রয়োগ করা হ'য়েছে; তারপর দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় সূত্র থেকে যেসব ভেষজের নাম উল্লেখিত, তাদের মধ্যে ইন্দ্রযবকেও ধরা হ'য়েছে এবং তাতে বলা হ'য়েছে "উপস্থিতে শ্লেষ্মপিত্তে ব্যাধৌ" প্রয়োগ ক'রতে হবে। আর তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় সূত্রে ইন্দ্রযবের একটি নাম 'বৎসক' ব'লে তার ছাল ব্যবহার করার উপদেশ, সেটা কিন্তু প্রলেপের জন্য; (এই বৎসক কিন্তু একটি অঞ্চলের নাম, এটির অবস্থান এলাহাবাদের পশ্চিমাঞ্চল, এখানে প্রচুর কুটজ বৃক্ষ জন্মে)। প্রলেপটি হবে গোপিত্তের ভাবনা দিয়ে সরষের তেল মিশিয়ে। এই প্রলেপটি দাদ, ভগন্দর, অর্শ, অপচী, কিলাস, কিটিম, পামা প্রভৃতি রোগে, এমন-কি টাকে ও কুষ্ঠে ব্যবহার্য। আবার ইন্দ্রযব শব্দের উল্লেখ—যেমন, "উভে হরিদ্রে কুটজস্য বীজং" (চরক সূত্রস্থান ৩/৭), সেখানে স্পষ্টই বীজের উল্লেখ। এর ঠিক পরে "দর্বী প্রলেপ" ব'লতে গিয়ে পরিষ্কার-ভাবে বলা হ'য়েছে "মনঃশিলা ত্বক্ কুটজাৎ" অর্থাৎ কুটজের ছালের ব্যবহারের কথা; আবার ৪র্থ অধ্যায়ে অর্শরোগে কুটজ অর্থে বীজের ব্যবহার; স্তন্য শোধনের বেলাতেও বৎসক ফল অর্থাৎ ইন্দ্রযব।

এই চরক সংহিতারই চিকিৎসাস্থানের নবম অধ্যায়ে অর্শরোগের প্রধান ঔষধগুলির অন্যতম ঔষধ ইন্দ্রযব; কিন্তু এখানে ফলের ব্যবহার নেই। সর্বত্র গাছের ছালের ব্যবহার। কুটজ রসক্রিয়া ও আসব-অরিষ্ট প্রস্তুতের জন্য কুটজত্বক্ এবং ইন্দ্রযব অর্থাৎ বীজের ব্যবহার করা হয়েছে।

Wrightia tinctoria

এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ইন্দ্রযব শব্দের প্রয়োগ থাকলে হবে বীজ, অন্য যে কোন প্রতিশব্দ থাকলে সেক্ষেত্রে বৃক্ষের ত্বক্ (ছাল) বুঝতে হবে, অবশ্য ইন্দ্রযব ছাড়া অন্য শব্দের সঙ্গে বীজ শব্দের ব্যবহার থাকলে, যেমন 'কুটজস্য বীজং', সেখানে বীজ গ্রহণ ক'রতে হবে।

মিশ্রক ঔষধে ইন্দ্রযব মানে বীজ, যেমন যক্ষ্মায় (চরক চিঃ ৮/১৬) 'কুটজস্য ফলানি'। চরকে মিশ্রক ঔষধে ইন্দ্রযবকে বিষরোগে (চিঃ ২৫/১৬৩) এবং কুষ্ঠরোগেও (চিঃ ৭/১০২) ব্যবহার করা হয়েছে। এ তো গেল চরকের কথা, এদিকে সুশ্রুত সংহিতায়

কুটজের প্রয়োগ খুব বেশী দেখা যায় না, তবে কুটজের ফুলের ভৈষজ্য শক্তির উল্লেখ আছে, সেখানে বলা হ'য়েছে "কফ পিত্ত হরং পুষ্পং কুষ্ঠঘ্নং কুটজস্য চ" অর্থাৎ এর ফুল কফ-পিত্ত নাশক ও কুষ্ঠরোগ উপশামক। সুশ্রুত সংহিতায় কুষ্ঠ রোগেই ইন্দ্রযবের ব্যবহার-বিধি। এর বৃক্ষত্বক্ সম্বন্ধে স্পষ্টোক্তি নেই।

তারপর দেখা যাচ্ছে—একাদশ শতকের চক্রদত্তে অতিসারে কুটজাষ্টক ঔষধে প্রধানভাবে ইন্দ্রযব ব্যবহারের উপদেশ আর কুটজাবলেহ ঔষধে এর বৃক্ষত্বকের (ছালের) ব্যবহার। চক্রদত্তের ব্যবহার পদ্ধতিতে জানা যায়—অতিসার রোগে ইন্দ্রযব ও কুড়চি গাছের ছাল (বৃক্ষত্বক্) অমোঘ ঔষধ ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। ওদিকে সুশ্রুত সংহিতায় কুষ্ঠরোগের ক্ষেত্রে এর শক্তি অসাধারণ, একথা বলা হ'য়েছে।

পরিচিতি

কুটজ বৃক্ষের বীজকে ইন্দ্রযব বলা হয়। এই গাছটি আমাদের কাছে কুড়চি গাছ ব'লে পরিচিত। এর বর্ণনা দিতে গেলেই প্রাচীন ও নবীন দু'টি মতের অবতারণা ক'রতে হবে।

এই কুড়চি গাছের সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে যে, ইন্দ্রদেব যখন হনুমানকে অমৃত দিয়ে জীবিত করেন, তখন হনুমানের গা (গাত্র) থেকে এক ফোঁটা অমৃত মাটিতে প'ড়ে যায়, সেই অমৃতবিন্দু থেকে এই কুড়চি গাছের জন্ম হয়।

আসলে কথাটা হ'লো—এটি পাকাশয়জাত রোগের ক্ষেত্রে অমৃততুল্য, তাই উপাখ্যানের মাধ্যমে একে বিজ্ঞাপিত করা হ'য়েছে।

এটা মাঝারি ধরনের গাছ, ২০/২৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু হ'তে দেখা যায়, পাতা ৬/৭ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা এবং ১½ ইঞ্চি থেকে ২½ ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া হয়। বোঁটা ছোট, ডিমের আকারে ক্রমশ সরু। বসন্তকালে গাছের পাতা ঝ'রে যায়, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে আবার নতুন পাতা গজায়, আষাঢ়ে গাছভরা সাদা ফুল হয়, অল্প গন্ধও আছে, তাই কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে এই কুড়চি ফুলের এত ব্যাখ্যানা।

এখন গাছভরা ফুল হ'লেও সব গাছে ফল হবে তা নয়, এইজন্যই প্রতিসংস্কৃত চরক সংহিতার কল্পস্থানে (এটি ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে দৃঢ়বলাচার্যের নূতন সংযোজন) স্ত্রী ও পুং পুষ্পভেদে দুই রকমের গাছ হ'য়ে থাকে একথা ব'লেছেন।

এই কথাটা যে সত্যি—সেটা বর্তমান পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন না।

তবে যেসব গাছে ফল হয়, সেগুলিতে দেখা যায়, ডালের (শাখার) ডগায় সরু বরবটির মত দু'টি শুঁটি, এগুলি সাধারণতঃ ৮/১০ ইঞ্চি লম্বা। এই শুঁটি ফলের ভিতরে যেন লম্বা আঁশের তুলোর মধ্যে লম্বাভাবে সারি সারি বীজগুলি সাজানো থাকে। এই গাছের ছালের রং ধূসর বর্ণ। এটির বোটানিকাল্ নাম Holarrhena antidysenterica Wall., ফ্যামিলি Apocynaceae.

এই Holarrhena গণের ৭/৮টি প্রজাতি এশিয়া ও আফ্রিকার উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে পাওয়া যায়, তার মধ্যে ২/৩টি প্রজাতি ভারত ও সিংহলে বর্তমান। তবে সাধারণতঃ তিন/সাড়ে তিন হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যে এই গাছগুলি হয়।

তবে এটা দেখা যায়—কাঁকর বা পাথর মেশানো মাটি যে অঞ্চলে বেশী, সেখানেই কুড়চির বন। আর এসব অঞ্চলের আবহাওয়াও শুষ্ক।

ঔষধার্থে ব্যবহার হয় গাছের ও মূলের ছাল, বীজ ও ফুল।

দ্বিতীয়তঃ—প্রাচীন গ্রন্থে আমরা দেখতে পাচ্ছি—সিত কুটজ ও অসিত কুটজ দুই

প্রকার কুটজের উল্লেখ। সিত কুটজের আলোচনা প্রথমেই করা হ'লো; এইবার অসি
কুটজ সম্পর্কে আলোচনা ক'রছি—

এই দু'টি গাছের পার্থক্য তার ফুলে ও গাছের ছালের ও পাতার রঙে এবং ত
অঙ্গসৌষ্ঠবে। প্রথমতঃ গাছের ছালের রং কৃষ্ণাভ এবং পাতারও, দ্বিতীয়তঃ সি
কুটজের পাতা শুকিয়ে গেলে কালো হয় না, অসিত কুটজের পাতা কালো হ'

Wrightia tomentosa

যায়। প্রধান পার্থক্য তার বীজের শুঁটিতে, কারণ এই গাছে যে শুঁটি হয়—সেগুলি সজনের ডাঁটার মত মোটা অথচ বীজ হয় ঐ ইন্দ্রযব থেকে অপেক্ষাকৃত সরু, আর স্বাদে সিত কুটজ বীজের মত এতটা তিতো (তিক্ত) নয়। একে ইউনানি সম্প্রদায় বলেন 'ইন্দ্রজো সিরিণ', সিরিণ অর্থে মিঠে (মিষ্টি)। এটিকে তাঁরা আভ্যন্তরিক ব্যবহার করেন বৃষ্য এবং শুক্রের অল্পতার ক্ষেত্রে টনিক হিসেবে; অথচ আমরা বাংলার বৈদ্যক সম্প্রদায় যে ইন্দ্রযবের ব্যবহারই করি না, বরং সেটা রাজস্থানের বৈদ্য সম্প্রদায় ব্যবহার ক'রে থাকেন। এটির বোটানিকাল্ নাম Wrightia tinctoria R.Br. অবশ্য পূর্বে সিত কুটজেরও বোটানিকাল্ নাম ছিল Wrightia antidysenterica.

এই গাছ জন্মে মধ্য ভারত, দাক্ষিণাত্য, ব্রহ্মদেশ, বোম্বাই প্রদেশ, করমণ্ডল ও গোদাবরী প্রভৃতি স্থানে।

ঔষধার্থে ব্যবহার করা হয় গাছের ছাল ও বীজ।

আরও একটি সমস্যা আছে—এই Wrightia গণের আর একটি প্রজাতি আছে, তার নাম Wrightia tomentosa Roem and Schult. এই গাছটির চ'লতি নাম 'দুধ করবী', যেহেতু গাছে সাদা দুধের মত আঠা (ক্ষীর) আছে। ফুল হওয়ার পরই আস্তে আস্তে বেগুনে রঙে পরিবর্তিত হয়।

এই গাছ প্রধানভাবে পাওয়া যায় সিকিম, সাহারাণপুর জঙ্গলে, রাজপুতনার আবু পাহাড়ের নিকট এবং বিহার, গোদাবরী নদীর তীর, বর্মা ও আসামেও। অবশ্য এইসব প্রজাতির সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'লে শিবপুর বোটানিকাল্ গার্ডেনেই গেলে এদের দেখতে পাওয়া যাবে।

বৈদ্যকে ব্যবহার

১। **অতিসারেঃ—** সব অতিসারে ব্যবহার ক'রলে উপকার পাওয়া যাবে না, যেখানে পেটে যন্ত্রণা এবং অসাড়ে দাস্ত, এইভাবে ২/৩ দিন চ'লছে, তার সঙ্গে রক্তের ছিট দেখা যাচ্ছে, এটা বুঝতে হবে বায়ু এবং পিত্তজাত অতিসার। এখানে কুড়চির ছাল (শুষ্ক) ৫ গ্রাম একটু কুটে নিয়ে দুই কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আধ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে ঐ জলটা দুইবারে খেতে হবে। এটাতে একদিনের মধ্যেই উপশম হবে।

২। **রক্তামাশয়েঃ—** এটা-সেটা খেতে থাকেন, মনে করেন রক্ত বন্ধ হ'য়ে যাবে; এ'দের বিশেষ লক্ষণ রাত্রে বড় দাস্ত হয় না, দিনের বেলায় এর প্রকোপ বেশী, কুন্থনও থাকে; বুঝতে হবে একটা ক্ষত সৃষ্টি হ'য়েছে, এ'দের পক্ষে কুড়চির ছাল ১০ গ্রাম একটু কুটে নিয়ে তিন/চার কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সকালে ও বৈকালে দু'বারে এটাকে খেতে হবে; দুই-এক দিনের মধ্যেই রক্তপড়া বন্ধ হ'য়ে যাবে, তবে পুরনো হ'লে দুই-একদিন বেশী লাগতে পারে।

৩। **রক্তার্শেঃ—** প্রথমেই ব'লে রাখি—মলদ্বারের তিনটি আবর্তেই বলি হ'য়ে থাকে—বহির্বলি, মধ্যবলি ও ঊর্ধ্ববলি; বহির্বলিতে রক্ত প'ড়লেও যন্ত্রণা বেশী হয় না, তবে টাটানি বা টন্‌টনানি থাকে; মধ্যবলি ও ঊর্ধ্ববলির অর্শে যেমন যন্ত্রণা তেমনি রক্তপড়া; এক্ষেত্রে কুড়চির ছাল উপরিউক্ত মাত্রায় ও পদ্ধতিতে প্রস্তুত ক'রে খেতে হবে, এটাতে রক্তপড়া ও যন্ত্রণা দুই-ই ক'মে যাবে কিন্তু বলি খ'সে যাবে না।

সাবধানতা— যাঁদের অর্শ আছে আবার হারিশও বেরিয়ে আসে, তাঁরা যেন এ ক্বাথ ব্যবহার ক'রবেন না, বিপদ আসতে পারে, মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসা সরলান্ত্রটি সঙ্কুচিত হ'য়ে মাঝপথে আটকে যেতে পারে।

৪। **বিষম জ্বরেঃ—** নতুন জ্বরকে চাপা দিয়ে ছাড়ানো হ'লো, কিন্তু অগ্নিবল (কায়াগ্নি) রক্তে ফিরে গেল না, টিস্‌টিসে শরীর, মুখেও কিছু ভাল লাগে না, তার সঙ্গে যা-তা খেয়েই চ'লেছে, আবার দেখা যাচ্ছে বৈকালের দিকে শরীরটায় একটু উত্তাপ—কোনদিন একটু ভাল কোনদিন একটু মন্দ, এই ভাল-মন্দটা কিন্তু অগ্নি-মান্দ্যের জন্য হয়। এই ক'রে রক্তের অগ্নিবল নষ্ট হ'য়ে যায় (যাকে বলা যায় রক্তের মেটাবলিজিম্ হ্রাস পেয়ে যাওয়া), এক্ষেত্রে কুড়চি ছাল চূর্ণ ১ গ্রাম ও তার বীজ

ইন্দ্রযব চূর্ণ ১ গ্রাম, এই দু'টি একসঙ্গে সকালে ও বৈকালে দু'বার জল দিয়ে খেতে দিতে হয়। আরও আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়—যদি শিউলি পাতার (Nyctanthes arbortristis.) রস ৪ চা-চামচ একটু গরম ক'রে ওর সঙ্গে একবেলা বা দু'বেলা মিশিয়ে খাওয়া যায়; যদি নিতান্ত দু'বেলা না হয়, একবেলা খেলেও চলে। অনেক সময় এইসব ক্ষেত্রে মুখে অরুচিও হয়, সেক্ষেত্রে মুখ-ছাড় হিসেবে একটি ফুলুরির কথা বলি—শিউলির পাতা ও কাঁচা মুগের ডাল একসঙ্গে বেটে বড়া ক'রে খেলে মুখের রুচিটা ফিরে আসবে।

৫। **রক্তপিত্তেঃ—** সর্দি নেই কাসি নেই অথচ মুখ থেকে রক্ত পড়ে, এ সময় গলা সুড়সুড় ক'রে কাসির বেগে রক্তটা বেরিয়ে আসে, আবার কারও অর্শের যন্ত্রণা নেই অথচ দাস্তের সময় কাঁচা রক্ত প'ড়ছে, আবার এও দেখা যায়—প্রস্রাবের কোন জ্বালা-যন্ত্রণা নেই অথচ প্রস্রাবের সময় রক্ত প'ড়ছে; এসব ক্ষেত্রে এটা যে রক্তপিত্ত সেটা নিঃসন্দেহ হ'তে পারা যায়। আরও পরিষ্কার ক'রে বলি—পিত্তবিকার হ'লে বমন হয়, রক্ত বিকারগ্রস্ত হ'লে বমন হয় না, কিন্তু রক্ত ও পিত্তের সমধর্মিতা থাকায় এই রক্তিম পিত্তই বমন হয়। এ'দের পক্ষে ভাল—কুড়চির ছাল চূর্ণ দেড় গ্রাম মাত্রায় (দুই আনা) দু'বেলা জলসহ খাওয়া, তবে একটু ছাগদুগ্ধ দিয়ে খেলে আরও ভাল হয়।

৬। **বাতরক্তেঃ—** এটি বংশপরম্পরায় যেমন আসে, আবার বিরুদ্ধ ও অহিত ভোজনেও আসে। এ রোগের প্রধান লক্ষণ যেখানে-সেখানে ফুলে ওঠা ও ব্যথা, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে স্রাবী ক্ষতও হয়। এই রোগটা কুষ্ঠেরই একটা সংস্করণ। এক্ষেত্রে কুড়চি ছাল ৫ থেকে ১০ গ্রাম মাত্রায় নিয়ে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে, সকালে ও বৈকালে দু'বার খেতে হবে। এটা বেশ কিছুদিন ব্যবহার ক'রতে হবে; তবে এক নাগাড়ে ব্যবহার না ক'রে ৬/৭ দিন খাওয়ার পর আবার ৬/৭ দিন বন্ধ রেখে পুনরায় ৬/৭ দিন খেতে হবে। এইভাবে এক/দেড় মাস খেলে ঐ দোষটা চ'লে যাবে।

৭। **মূত্রকৃচ্ছ্রেঃ—** কৃচ্ছ্র শব্দের অর্থ হ'লো কষ্টে হওয়া। এটা অনেক কারণেই আসতে পারে—প্রোস্টেট্ গ্লান্ড বড় হ'লে কৃচ্ছ্রতা ততটা থাকে না কিন্তু প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, সেটাকে মূত্রাঘাত বলা হয়; তবে যেখানে প্রস্রাবের কৃচ্ছ্রতা থাকে, সেখানে কুড়চির ছাল চূর্ণ ৮/১০ গ্রাম পূর্বদিন রাত্রে ১ গ্লাস গরম জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে, তার পরদিন সকালে ছেঁকে নিয়ে ১/১½ ঘণ্টা অন্তর ৪/৫ বারে সেটা খেতে হবে। এটাতে ঐ কৃচ্ছ্রতাটা চ'লে যাবে।

৮। **কেঁচো-ক্রিমিতেঃ—** প্রায় সময় মুখ দিয়ে জল ওঠে, থুথু ফেলার অভ্যেস, পেট গুলোয়, এক্ষেত্রে কুড়চি বীজ অর্থাৎ ইন্দ্রযব (তিক্ত) যাকে বলা যায় কুটজ বীজ চূর্ণ আধ থেকে ১ গ্রাম মাত্রায় মধু মিশিয়ে চেটে খেতে দিতে হয় কিন্তু বালকদের এই চূর্ণ খাওয়ানো খুবই মুশকিল।

৯। **ফোড়ায়ঃ—** যে ফোড়া পাকেও না, বসেও না, যাকে চলতি কথায় বলে দড়কচা মেরে যাওয়া; এই ফোড়ায় কুড়চির ছাল বেটে একটু গরম ক'রে ফোড়ার উপর প্রলেপ দিলে পেকে ফেটে যায়।

১০। **মুখ ক্ষতেঃ—** কুড়চির ছাল আন্দাজ ১০ গ্রাম নিয়ে ৩ কাপ জলে সিদ্ধ

ক'রে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে নিয়ে সেই ক্বাথ মুখে পুরে ৫/৭ মিনিট ব'সে থাকতে হবে, এইভাবে ৩/৪ বারে ঐ ক্বাথ দিয়ে কবল ধারণ ক'রতে হবে। এটাতে ঐ ক্ষতটা সেরে যাবে।

এ ভিন্ন যেসব ক্ষত কিছুতেই সারছে না, সেসব ক্ষেত্রে এই কুড়চি ছালের ক্বাথ দিয়ে ধুলে ক্ষত সেরে যাবে।

এই নিবন্ধের শেষে একটা কথা মনে আসছে—আমরা হরবোলা হ'য়েছি কতদিন আগে থেকে!

আমার মনে হয়—যখন থেকে আমাদের মন বিভিন্ন নামে ভ'জতে আরম্ভ ক'রেছে; সেই প্রভাবে প'ড়ে আমার ভারত হ'য়ে গেছে হরবোলা। নইলে এক একটা গাছের প্রদেশভেদে এত নাম হয়? আমাদের মানসিকতাকে শতধায় বিভক্ত ক'রেছে, তাই বলি—যদি ভেষজের বৈদিক নামগুলি সর্বভারতীয় গ্রন্থের সিনোনিম্ (Synonym) হ'য়ে যায় তবেই তো আয়ুর্বেদকে এক সূত্রে গাঁথা যাবে, নইলে এ খিচুড়ির আর উদ্ধার হবে না।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Alkaloids viz., holadysamine, holadysine, holarrhidine, irchdiamine-kurchaline, kurchassine, alphakurchessine, kurchiline, kurchimine, kurchiphyllamine, kurchiphylline, 3-N-methylholarrhimine, 20-N-methylholarrhimine, N, N, N^1, N^1-tetramethylholarrhimine, holarrhimine, 3-alphaaminoconan-5-one, conkuressine, dihydroisoconessimine, dihydroconkuressine, 7-alpha dihydroxyconessine, holanamine, kurcholessine, holantosine A, holantosine B, holarosine A, holarosine B, conessine, kurchine, kurchicine, nor-conessine, conesimine, iso-conesimine, conimine, conamine, conarrhimine, conessidine, conkurchine, lettocine. (b) Sterols viz., β-sitosterol, γ-sitosterol.

গুগ্গুলু

সমগ্র ভারতীয় সম্প্রদায় আজ এক হাটে এসে মিলেছি, পোষাক-পরিচ্ছদের অনুকরণ তো চ'লছে বহুদিন থেকে, এমন-কি ভাষার অনুপ্রবেশও ঘটেছে এবং অনুকরণও ক'রে থাকি; হয়তো এমন অনেক শব্দ আছে—যার প্রকৃত অর্থও জানি না; বহু শিক্ষিত লোককেও দেখা যায়, লঘু-গুরু জ্ঞান না ক'রেই সকলের সামনেই ব'লে ফেললেন অন্য প্রাদেশিক লোকায়তিক ভাষা, যেমন একটি কথা বুড়বক্ (ওয়াক্)। কথাটা এত নগ্ন যে, এর প্রকৃত শব্দার্থটা জানলে তিনিই লজ্জায় জিভ কাটবেন। এই রকম সংস্কৃতেও এমন শব্দ আছে—যেটির অর্থ অশ্লীল নয়, তবুও লোকায়তিক ভাষায় 'শ্রুতিকটু'; যাহোক, এমন একটি শব্দ এই 'গুগ্গুলু'।

এটি তো বৃক্ষবিশেষের নির্যাসেরই নাম; কিন্তু এটির শব্দার্থ বিন্যাস প্রাচীন হ'য়েও আমাদের কাছে কেন যেন হাস্য ও জুগুপ্সার ব্যঞ্জনা আনে; অথচ বৈদিক পরিভাষার ব্যাখ্যায় খুব স্পষ্টতই এর নামকরণ করা হ'য়েছে রোগনিয়ামক সংজ্ঞাকেই নির্দেশ ক'রে।

বৈদিক অভিধানে গুগ্গুলুর শব্দবিন্যাস করা হ'য়েছে গুদে অথবা গুদাৎ গুলঃ অর্থাৎ মলদ্বারের জাত ব্যাধি থেকে গুলঃ=রক্ষকঃ। আবার গুদ মানেও ব্যাধি, তাকেও গুলতি=রক্ষতি=গুলু। গুদঃ চ গুগ্ চ একার্থঃ, ব্যাধি ক্রমাৎ ইতি। এ ব্যাখ্যা উবট্, মহীধর, দুর্গাচার্য প্রভৃতি বেদভাষ্যকারগণ সকলেই ক'রেছেন; এখন দেখা যাচ্ছে যে, এককালে যেদেশে যেটি শ্লীল, অপরকালে ভিন্ন প্রদেশে অশ্লীলের পর্যায়ে প'ড়ে গেল।

বেদজ্ঞগণের মনে কাহিনী সৃষ্টির প্রবণতা

ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলে এবং যজুর্বেদের দ্বাদশ মণ্ডলে বর্ণিত হ'য়েছে যে, প্রতিটি শ্রেষ্ঠ ভেষজের যথার্থ গুণপনা প্রকাশ করার সময়ে যে রূপক কাব্য-কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হ'য়েছে সেটা হ'চ্ছে—গুরুরূপী সোম ভেষজ-জগৎকে আহ্বান ক'রে জিজ্ঞাসা

করেছেন—তোমাদের মধ্যে কার কি শক্তি আছে, যার দ্বারা মর্তের (মানবের) রোগার্ত ব্যক্তিদের দুঃখ দূর ক'রতে পার?

এরই উত্তরে এইসব অন্তশ্চেতনাসম্পন্ন বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদি যেন চেতনাবান হ'য়ে তাঁদের নিজ নিজ শক্তিকে গুরু সোমের কাছে জ্ঞাপন ক'রেছেন। ওখানেই বলা হয়েছে—

দশবৃক্ষ মুঞ্চমাং রক্ষসো গ্রাহ্যাঃ।
শং নো দেবী পৃশ্নি পর্ণাশম্।
পাঠমিন্দ্র জলায় ভেষজ ইদংহিরণ্যং গুগ্গুলুঃ॥

অর্থাৎ অদৃশ্য অথচ ক্রিয়াশালী যেসব রাক্ষস (যাতুধান=জড়াজড় প্রাণী—এইটাই বর্ত-মানের ভাইরাস্ ও ফাংগাস্ Fungus) ইতস্ততঃ বিচরণ করে এবং সর্বপ্রকার প্রাণীদের অহিতসাধন করে (বৃক্ষলতাদিরও), আমাদের মধ্যে দেবী পৃশ্নিপর্ণী (Uraia lagopoides or Uraia picta or Uraia hamosa ?), ইন্দ্রবীজ (Seeds of Holarrhena antidysenterica), পাঠা (stephania hernandifolia or wrightia tinctoria)—এরা সর্বদা হিতসাধন করে আর এই যে গুগ্গুলু বৃক্ষ, এও হিরণ্যের মত শক্তিধারণ করে, এ জলের মধ্যেই আত্মগোপন ক'রে থাকে।

উপরিউক্ত সূক্তটির মধ্যে প্রতিটি ভেষজের অচিন্ত্যশক্তি-বীর্যের কথাই বলা আছে, বিশেষ ক'রে এই গুগ্গুলুর।

এই বৃক্ষের নির্যাসেই এর শক্তি, তাকেই স্বর্ণের সংগে তুলনা ক'রে বলা হ'য়েছে—তুমি হিরণ্যের মত শক্তি ধারণ কর, এখানে এই ইংগিত বহন করে যে, জগতের শ্রেষ্ঠ ভেষজধাতু যে স্বর্ণ—সেটির কান্তি দেহে এনে দিয়ে থাকে, আর জলের মধ্যে এ আত্ম-গোপন করে।

পরবর্তী সংহিতার যুগে এর যেসব রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ, সেসব ক্ষেত্রেই শরীরের আদি অর্থাৎ প্রথম ধাতু যে রস, যা থেকে রূপান্তরিত হ'য়ে রক্ত-মাংসাদি আরও ৬টি ধাতুতে রূপান্তরিত হ'য়ে শরীরকে পোষণ করে, সেই রসধাতু অর্থাৎ জলের মধ্যে সে অন্তঃপ্রবিষ্ট হ'য়ে থেকে রোগকে বিতাড়িত করে ও কান্তিকে দান করে। মোটকথা, তার স্বভাববীর্যের প্রভাব রসধাতুর উপর; তাই ভাষ্যকারগণ ওইখানেই গুগ্গুলু শব্দটির বর্ণ-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব'লেছেন—

গুদে কীল গুদ্‌কীলঃ বর্ণান্তর যোগাৎ গুগ্গুলু। অথবা গুগ্
ইতি রুক্=ব্যাধি ততঃ গুলতি=রক্ষতি, নির্যাস ইতি জল রূপম্,

অর্থাৎ ব্যাধিকে যে আসতে দেয় না বা রক্ষা করে।

বৈদ্যকের নথি

চরকীয় চিন্তাধারায় এটি প্রথমস্থান পেয়েছে সংজ্ঞাস্থাপনীয় ভেষজপঞ্জীর মধ্যে। আর সুশ্রুতে এর স্থান এলাদি বর্গে—এর ভৈষজ্য প্রয়োগ চরকের চিকিৎসাস্থানে ১৮ অধ্যায়ে উদর রোগে, সুশ্রুতের চিকিৎসাস্থানের ৫ অধ্যায়ে উরুস্তম্ভ রোগে, চিকিৎসা-স্থানের ২৩ অধ্যায়ে শোথ রোগে এবং উত্তরতন্ত্রে ২১ অধ্যায়ে কর্ণে দৌর্গন্ধ্য রোগের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পূতিকর্ণে; তারপর ষষ্ঠ শতকে এসে বাগ্‌ভটের কালে শ্বাস রোগে (চিঃ ৪ অঃ), এরপর একাদশ খৃষ্টাব্দে চক্রদত্তের কালে এটির ব্যবহার হয়েছে গৃধ্রসী (সায়েটিকা) বাত রোগে ও ক্রোষ্টুকশীর্ষ বাতব্যাধিতে (বাতব্যাধি চিঃ) এবং বিদ্রধি রোগে (বিদ্রধি চিঃ), তারপর ষোড়শ শতকে ভাবপ্রকাশের যুগে এসেও গুগ্গুলু নিয়ে রোগ প্রতিকারের জন্য নূতন নূতন চিন্তা ক'রেছেন।

পরিচিতি

গুগ্গুলুর গাছ প্রধানতঃ জন্মে সিন্ধুপ্রদেশ, রাজপুতনা, খান্দেশ, বেরার (মধ্য-প্রদেশ—প্রাচীন বিদর্ভ), মহীশুর, কাথিয়াবাড় প্রভৃতি প্রদেশে, এইসব অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হ'য়ে সমগ্র দেশে রপ্তানি হয়।

এই গাছ বেশী উঁচু হয় না, সাধারণতঃ ৪ থেকে ৬ ফুট; বেশ ঝাড়ী গাছ, গাছের ডালের রং হরিদ্রাভ এবং খুব মসৃণ। শাখাগ্রে কাঁটা, অবশ্য ছোট ছোট ডালগুলিই পরে কাঁটায় পরিণত হয়; এটি এই গাছের প্রকৃতিগত ধর্ম, যেমন এদেশে দেখা যায় অঙ্কোটের (Alangium salviifolium) গাছে। এই গুগ্গুলু গাছের ডাল থেকে পাতলা কাগজের মত পরদা তোলা যায়, কাঠের রং সাদা, পাতা দেখতে অনেকটা বিলিতি আমড়ার (Spondias dulcis) পাতার মত হ'লেও এতটা মসৃণ ও কোমল নয়। এই পাতা সাধারণতঃ শাখায় বিশেষ থাকে না, প্রশাখায় থাকে; এই গাছে ফুল ও ফল দুই-ই হয়।

গুগ্গুলু কোথায় হয়

ঐ গাছের ডালে একটু কোপ মেরে রেখে আসতে হয় এবং ঐ কাটা জায়গা থেকে তৈলাক্ত গ'দ (Oleo gumresin) বেরিয়ে গ'দের আঠার মত জ'মতে থাকে। এইভাবে প্রতি গাছ থেকে সংগৃহীত হয়, সেইটাই গুগ্গুলু ব'লে পরিচিত। বর্তমানে এইটাই আমরা বাজার থেকে পেয়ে থাকি; এটির নাম সব প্রদেশেই প্রায় একই, যেখানে আমরা বলি গুগগুলু, অন্য প্রদেশে বলে গুগল্; এটির বোটানিকাল্ নাম Balsamodendron mukul Hook. ex Stock., ফ্যামিলি Burseracae.

একটা কথা জানিয়ে রাখি—এসব অঞ্চলে এ গাছ দেখা যায় না, তবে শিবপুর বোটানিকাল্ গার্ডেনে এই গাছ আছে।

রোগ প্রতিকারে

প্রথমতঃ, গুগ্গুলু পুরনো (পুরাতন) হ'লে ব্যবহার করা উচিত নয়, দ্বিতীয়তঃ, শোধন না ক'রে ব্যবহার করাও সমীচীন হবে না; তৃতীয়তঃ, রসবহ স্রোত বিকারগ্রস্ত হ'য়ে কিছুদিন পরে যখন সে রক্তবহ স্রোতকে বিকৃত ক'রেছে, সেখানেই এই গুগ্গুলুর ব্যবহার।

এইবার এর প্রয়োগ সম্পর্কে বলি—

১। **অকালবার্ধক্যেঃ—** বয়সে নবীন ও নবীনা, কিন্তু দেখতে বুড়ো বা বুড়ীর পর্যায়ে চ'লে যাচ্ছে, চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে, সর্বদিকের পুষ্টি আস্তে আস্তে ক্ষীণ হ'য়ে যাচ্ছে, এর সঙ্গে মনোবল ও উদ্দীপনাও চ'লে গেল—যাকে বলে যৌবনে ভাটা প'ড়েছে; এক্ষেত্রে শোধিত গুগ্গুলু এক থেকে দেড় গ্রাম মাত্রায় নিয়ে প্রায় ২০০ মিলিলিটার, কমপক্ষে ১০০ মিলিলিটার (এক পোয়া বা আধ পোয়া) ধারোষ্ণ দুধের সঙ্গে প্রত্যহ সকালে খেতে হবে। এই রকম ১০/১২ দিন খেলেই আস্তে আস্তে ঐ সব অসুবিধে চ'লে যাবে।

২। **কফের ধাতেঃ—** বারো মাসই যাঁরা সর্দিতে ভুগতে থাকেন, তাঁদের ক্ষেত্রে

প্রায় এক গ্রাম ক'রে শোধিত গুগ্‌গুলু সকালে ও বৈকালে আধ কাপ দুধসহ খেতে হয়, তবে এই গুগ্‌গুলুটো দশমূলের ক্বাথে শোধন ক'রতে হবে, আর শোধনটা কোন বৈদ্য ভিন্ন ক'রতে পারবেন ব'লে মনে হয় না।

৩। **ক্রিমির জন্য পেটে বায়ুঃ—** দেখা যায় নানারকম ওষুধ খেয়েও পেটের বায়ু ক'মছে না, ক্রিমির লক্ষণও তার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা যে যায় না তা নয়—যেমন মুখ দিয়ে জল ওঠা, অনিয়মিত মাথাধরা, বমনেচ্ছা প্রভৃতি। এক্ষেত্রে মনে আসা স্বাভাবিক যে, এটা ক্রিমির জন্য হ'লেও সেটার সৃষ্টি ক'রেছে রসবহ স্রোত, অর্থাৎ এই স্রোত বিকারগ্রস্ত, তাই এখানে খেতে হবে শোধিত গুগ্‌গুলু প্রায় এক গ্রাম ক'রে সকালে ও বৈকালে দু'বেলা ২/৩ চা-চামচ শিউলিপাতার (Nyctanthes arbortristis) রস মিশিয়ে, এটা কয়েকদিন খেলেই তাঁর এই অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৪। **প্লী**হার ব্যথায়ঃ— এখানে ফোড়াও হয়নি, পাকেওনি, অথচ একটু ন'ড়তে চ'ড়তে গেলেই ব্যথা লাগে, প্লীহাটা একটু স্ফীত হ'য়েছে মনে হ'তে থাকে, এক্ষেত্রে এর নিদেন (হেতু) হ'লো—রস ও রক্তবহ স্রোতের স্বাভাবিকতা নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে, এক্ষেত্রে ১২ গ্রেণ (৮০০ মিলিগ্রাম) মাত্রায় শোধিত গুগ্‌গুলু প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে ২ বার খেতে হবে। তবে প্রাচীন বৈদ্যগণ গরুর ছোট বাছুরের প্রস্রাব (গোমূত্র) এক বা দুই চা-চামচ একটু জলে মিশিয়ে সেই জলসহ সকালের দিকটায় আর বৈকালের দিকে শুধু জলসহ খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন।

৫। **শোথেঃ—** মেদস্বী দেহ, খাওয়ার ইচ্ছে প্রচুর, কিন্তু হজম হয় না; মাঝে মাঝে আমাশাও হয়; পা দুটো একটু রসস্থ, কোন কোন সময়ে একটু ফুলেছেও দেখা যায়—এটা আবার সব সময়ে যে থাকবে তাও নয়। এখানে বুঝতে হবে যে, এই রোগীর রসবহ স্রোত বিকারগ্রস্ত। এক্ষেত্রে এই রসবহ স্রোতের বিকারকে স্বাভাবিক ক'রতে গেলে সকালে ৮০০ মিলিগ্রাম (১২ গ্রেণ) ও বৈকালে ঐ মাত্রায় গুলঞ্চের রস এক চা-চামচ জলে মিশিয়ে ঐ জল দিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ স্রোতপথের গতি সাবলীল হবে।

৬। **অনিয়মিত মাসিক ঋতুস্রাবেঃ—** অনেক মায়ের দেখা যায়—ঋতুস্রাব ৩/৪ দিন একটু একটু রইলো, তারপর বন্ধ হ'য়ে গেল, আবার ৩/৪ দিন বাদে দেখা গেল, সেও কয়েকদিন রইলো—এ'দের কোন সময় কোষ্ঠবদ্ধতা, কখনও বা পাতলা দাস্ত, কখনও অরুচি কখনও রুচি—এই যে ক্ষেত্র, এখানে মাসিক হওয়ার ২/৩ দিন পূর্ব থেকে এবং মাসিক হ'য়ে যাওয়ার পরেও ২/৩ দিন ৮০০ মিলিগ্রাম (১২ গ্রেণ) মাত্রায় অন্ততঃ এক কাপ গরম দুধ সহ দু'বেলা খেতে হবে।

৭। **মেহ রোগেঃ—** জ্বালা থাকা এ মেহের অনুষঙ্গী, এ'দের চেহারা একটু থপথপে, তাব'লে রোগা লোকের যে হয় না তা নয়, তাঁদের ধাত হবে বায়ু ও কফের। এ'দের ঘাম বেশীও হয় আবার তাতে থাকে দুর্গন্ধ। এটা সাধারণতঃ ৩৫/৪০ বৎসর বয়সের লোকেরই বেশী দেখা যায়। এ'দের ক্ষেত্রে শোধিত গুগ্‌গুলু ৮০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় দু'বেলা আধ বা এক কাপ দুধ সহ খাবেন। তবে গুগ্‌গুলুটা যদি গুলঞ্চের রসে শোধন ক'রে নেওয়া যায়, খুবই ভাল হয়। এর দ্বারা ঐ জ্বালামেহ সেরে যাবে।

৮। **বাত রোগেঃ—** এর সঙ্গে মলবদ্ধতা (কোষ্ঠবদ্ধতা) যেন এর সঙ্গের সাথী। এই দেহে বায়ুর স্বাভাবিক সঞ্চরণশালিতা ব্যাহত, তাই তার গতি তির্যক, কখনও

কোমরে, কখনও পায়ে, কখনও হাতে; কখন কোথায় পে'ছিবে তার ঠিক নেই, এক্ষেত্রে শোধিত গ্বগ্গ্বল্ব এক গ্রাম থেকে দেড় গ্রাম মাত্রায় দ্ব'বেলাই গরম জলসহ খেতে হবে। এই গ্বগ্গ্বল্বটা ব্যবহারের কালে কোন কফ বা বায়ুবৃদ্ধিকর জিনিস না খাওয়াই সমীচীন। এ'দের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ২৩৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে।

৯। **মাংসপেশীগত বাতেঃ—** এটার কারণ—গর্ভসঞ্চারের সময় পিতা বা মাতার কারও যদি রক্তবহ এবং মাংসবহ স্রোত বিকারগ্রস্ত থাকে, প্রাচীনদের মতে সেই দোষে সন্তানের মাংসপেশী এই রোগাক্রান্ত হয়; ফলে তাদের পেশীর সংযমনশালিতা (Volantary movement) নষ্ট হ'য়ে যায়, যার জন্য তারা হাঁটতে পারে না, আর ব'সলে উঠতে পারে না এবং চলতে চলতে হাঁটু ভেঙ্গে প'ড়ে যায়। এই রোগটিকে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন (Muscular dystrophy), এক্ষেত্রে বয়সানুপাতে গুলঞ্চের রস দিয়ে গ্বগ্গ্বল্ব খেতে দিতে হবে; আর এদের নিষেধ মিষ্টি খাওয়া, মালিশ করা আর সেক দেওয়া, তেল-ঘিয়ের জিনিস বেশী না খেতে দেওয়া। তবে সাধারণ মাত্রা ৮০০ মিলিগ্রাম দ্ব'বেলায় খাওয়ানো আধ চা-চামচ গুলঞ্চের রসের সঙ্গে।

১০। **গ্রীষ্মের ফোড়ায়** (Summer boil):— তেলে-ঝোলে খাওয়ার অভ্যেস, খাটুনি (Sedantary habit) কম, যাকে বলে আত্মসুখী লোক, এ'দের গরমকালে অল্পতেই লোমকূপগুলি উত্তেজিত (Irritation of the hair follicles) হয়, যার জন্য গায়ে অসম্ভব ঘামাচি বেরোয়, তার জন্য নোড়া নোড়া ফোড়াও হয়, আচ্ছা—আপনারা দেখেছেন কি? যারা খেটে খায়, রৌদ্রে ঘোরে, বিশেষ তেল-ঘি একরকম খেতেই পায় না, তাদের কি এই ফোড়া হয়? যদিও দেখা যায়, সেটা খুবই বিরল। যাক্—এই আত্মসুখী লোকদের গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সপ্তাহে ২/৩ দিন শোধিত গ্বগ্গ্বল্ব ৮০০ মিলিগ্রাম ক'রে সকালে ও বৈকালে দ্ব'বেলা গরম জলসহ খেতে হয়, অবশ্য এটা ১½ গ্রাম (দেড় গ্রাম) পর্যন্তও খাওয়া যায়; এটাতে ফোড়া হওয়ার হাত থেকে রেহাই পাবেন।

১১। **সায়েটিকায়ঃ—** আয়ুর্বেদে এই রোগটির নাম গৃধ্রসী রোগ। এক্ষেত্রের নিদান হ'লো—রসবহ ও রক্তবহ স্রোত দুটিই বিকারগ্রস্ত। এই শিরাটি কোমর থেকে নেমে গোড়ালি পর্যন্ত গিয়েছে, সকালে ব্যথাও থাকে, আবার বেলা হ'লেও উদ্ধার নেই, গরমও সহ্য হয় না, আবার ঠাণ্ডা দিয়েও লাভ হয় না—এক্ষেত্রে শোধিত গ্বগ্গ্বল্ব এক থেকে দেড় গ্রাম মাত্রায় ত্রিফলার কাথ দিয়ে খেতে হবে, ত্রিফলা হ'লো—হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী ৫ গ্রাম ক'রে গরম জলে অল্প সিদ্ধ ক'রে, ছে'কে নিয়ে সেই জলটা দিয়ে খেতে হবে। তবে হরীতকী ও বহেড়ার এবং আমলকীর বীজ বাদ দিয়ে ৫ গ্রাম নিতে হবে।

কোন নিবন্ধ লেখার শেষে আমার মস্তক কণ্ডূয়ন আরম্ভ হয়, তখন যে কোন একটা মলম লাগানোর মত দু/চার লাইন লিখে ফেলি। তাই ব'লছি—এই গ্বগ্গ্বল্বর প্রাচুর্য যেখানে ছিল সেটা 'গান্ধার দেশ' (আফগানিস্তানের কান্দাহার অঞ্চল)। যখন আমরা এক ছিলাম তখন আমাদের ঝঞ্ঝাট ছিল না, তারপর যে সময় থেকে মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মকে পাওয়ার পর এগিয়ে পিছিয়ে চ'লেছি, তখনই আমাদের দেশশুদ্ধ পার্থক্যটা দূরেই নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু এই ভেষজ এমন একটি জিনিস, যেটির

গায়ে জাতের ছাপ দেওয়া যায়নি। রোগ হ'লে দরগাতলায় জলপড়া আনতেও যাই, আবার বসন্ত ডাকলে শীতলাতলায়ও পুজো মানত করি, তাহ'লে একটা জায়গায় দেখা যাচ্ছে—'ঠেলার নাম বাবাজী'।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Essential oil. (b) Gummy substance. (c) Resin. (d) Terpenoid constituents.

নারিকেল (নারকোল)

অনেক সময় ভাবি—কেবল মানুষই বুঝি গ্যাঁড়াকল জানে, এখন দেখছি প্রকৃতিও কম গ্যাঁড়াকল ক'রে রাখেনি, সেটা ক'রেছে জল, মাটি ও আবহাওয়াকে নিয়ে। এই যেমন শত চেষ্টা ক'রলেও রাজস্থানে নারকেল গাছ করা যাবে না, আবার লবণাক্ত এলাকায় আপেল গাছ পুঁতলে আপেল তো হবেই না, এমন-কি গাছ পর্যন্তও হবে না। তাই বিশেষ ক'রে দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের অধিবাসীরা কত কাব্য, কত ব্যঙ্গ কত উপদেশ নীতিবাক্যে নারকেলকে সংবর্ধনা ক'রেছেন। এই যেমন নীতিমান কবি ব'লেছেন—

"আগচ্ছতি যদা লক্ষ্মীঃ নারিকেল ফলাম্বুবৎ"

অর্থাৎ লক্ষ্মী যখন আসেন, তখন কেমন ক'রে কোন্ পথে আসেন তা কেহ জানে না,

ঠিক যেন নারিকেল ফলের সুমিষ্ট জল। আবার কেউ ব'লেছেন—এ জগতে প্রকৃত কৃতজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ওই নারিকেল ফল। কারণ তার শৈশবে যখন মূলে জল সিঞ্চনের দ্বারা তাকে জীবিত ক'রে রাখা হ'য়েছিল, তখন থেকেই সে তা স্মরণ ক'রছিলো। যেদিন তার জীবন সতেজ হ'লো—সেদিন সে মাথায় ক'রে জল ধরে রাখলো, সেই

কৃতজ্ঞতাকে চিহ্ন ক'রে নিজে রোদের তাপে জ্বলে পুড়ে গেলেও উদার চরিত্রের দ্বারা পথিকের খাদ্য পানীয়ের অভাব সে মোচন করে।

আবার আর একজন কবি ব'লেছেন—লোভাতুর মূর্খ পরপ্রত্যয়শালীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতেই নারিকেল ফলের জন্ম। কেন? তাই ব'লছেন—

"উচ্চৈঃ এষ তরুঃ ফলং চ বিপুলং দৃষ্টৈব হৃষ্টঃ শুকঃ।
পক্বং শালিবনং বিহায় জড়ধীঃ তন্নারিকেলং গতঃ॥
তত্রারুহ্য বুভুক্ষিতেন মনসা যত্নঃ কৃতো ভেদনে।
আশা তস্য ন কেবলং বিদলিতা চঞ্চুর্গতা চূর্ণতাম্॥

অর্থাৎ ঐ দেখ মূর্খ শুকপাখীর কান্ড, অমন পাকা পাকা শালীধান ছেড়ে ঐ যে অত বড় গাছ, অত বড় ফল নারকেল—ওই দেখেই ও গিয়ে ওই নারকেলের উপর ব'সলো, কি খুসী! তারপর সুরু ক'রলো নারকেলের গায়ে ঠোকর দিতে। দিতে গিয়ে একেবারে কাৎ। ঠোঁট দুটিও গেল, আশাও ভাঙলো। এখন ভাঙা ঠোঁটে আর শালীধানও ঠুকরে খাওয়া যাবে না।

তাই তো শুকের কান্ড দেখে অন্য পাখিরা হাসছে আর ব'ছে—হায় মূর্খ, পাকা ধান ছেড়ে ডাগর ফলের আশায় ওপরে উঠলো—এবার আশাও গেল, ঠোঁট দু'টিও চুরমার।

তাই তো লোকে বলে—

ডাগর দেখে লোভ ক'রো না
কোঁৎকা খেয়ে সব হারাবে।

এই নারকেলকে নিয়ে কত যে লোককথা প্রাচীন ও নবীন সমাজে ছড়িয়ে আছে, এরই মাঝে খুঁজতে যাই বৈদিক ভারতের গ্রন্থমালা। নাঃ, পাই না তার হদিশ। পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়—আয়ুর্বেদের অথবা তারও পরের সংহিতার প্রবক্তা যাঁরা, তাঁরাও আসেননি ভারতের দক্ষিণ কূলে অথবা এই গাঙ্গেয় ভূমিতে। আবার সন্ধান করি মহাভারত ও পুরাণগুলির পৃষ্ঠায়; খুঁজে পাই ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের বহু স্থানেই নারিকেলের উল্লেখ। অবশ্য এটা থাকা অসম্ভব নয়, কারণ পন্ডিতগণ বলেন—ভাগবতের জন্ম দক্ষিণ ভারতে আর ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের জন্ম এই গাঙ্গেয় ভূমিতে, কিন্তু কারুর কোন বক্তব্য নেই নারকেলের গুণপনা জানাতে। এখন দেখা যাক—

বৈদ্যকের নথি

ভারতের শ্রেষ্ঠতম আয়ুর্বেদ সংহিতাগুলির প্রামাণ্যগ্রন্থ চরক ও সুশ্রুত সংহিতা। এই গ্রন্থ দুটির পৃষ্ঠা খুঁজতে গিয়ে দেখি—চরকের মৌল সংগ্রহ অংশ দশেমানি বর্গ, তার মধ্যে নারকেলের অস্তিত্ব নেই। তবে তার অংশবিশেষের যেগুলি যোজিত অর্থাৎ পরবর্তীকালে সংগৃহীত, তারই মধ্যে নারকেলের সূত্র বিধৃত হ'য়েছে। এটি কিন্তু প্রয়োগবিধির মৌল সূত্রে নেই। তাই সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে ফলবর্গের মধ্যে এবং বিরুদ্ধ ভোজনের সংযোগ সংস্কারের রস বিদুষ্টির মধ্যে নারিকেলের উল্লেখ। ওখানে নারিকেলের শাঁস বৃংহণ, স্নিগ্ধ, শীতল এবং বলকর ও মধুর রসসম্পন্ন। কিন্তু এই নারকেলের রস যদি অম্ল রস এবং দুধের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তবে তা দুর্জর। আর সুশ্রুতের তৈলযোনি ফলবর্গের মধ্যে দেখা যায়—কচি নারকেলের জল বিরেচনের উপযোগী এবং বৃষ্যকর, এবং পিত্তদাহ জন্য পিপাসায় হিতকর। সুশ্রুতের এই বিচারটিও অতি পুরাতন সুশ্রুতেও পাওয়া যায় না। তাহ'লেও এই অংশটি অন্ততঃ খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে যোজিত হ'য়েছে ব'লে মনে করা হয় না, কারণ

সুশ্রুতের চিকিৎসাস্থানের ৩১ অধ্যায়ে পিত্তসংসৃষ্ট বায়ুবিকারে নারিকেলের স্নেহ ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া আছে।

সুশ্রুতের এই বক্তব্য অনুসরণ ক'রেই ষষ্ঠ শতাব্দীর আর একখানি উৎকৃষ্ট ও প্রামাণ্য সংগ্রহগ্রন্থ বাগ্‌ভটের সূত্রস্থানে নারকেলের গুণগত পরিচয় দিতে যে তথ্য আমাদের শুনিয়েছেন, তাতে মনে করা চলে চরক সুশ্রুতের চেয়ে বাগ্‌ভট নিশ্চয় নারকেলের শাঁস এবং জল নিয়ে বিশেষ ভাবেই অনুশীলন ক'রেছেন। নইলে একথা কেন ব'লবেন—এই ফলের শাঁস কিন্তু পাকান্তে (জীর্ণ করার পর) স্বাদু হ'লেও বিষ্টম্ভি অর্থাৎ পেটে বায়ুকর হয় আর শ্লেষ্মারও একটু বৃদ্ধি করে; তবে এর পরিণাম শক্তি শুক্রকারক। এটা আছে সূত্রস্থানের সপ্তম অধ্যায়ে। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর চক্রদত্তের টীকায় (চরকের) এর অনুল্লেখ, অর্থাৎ নারিকেলের শাঁস এবং জলের ভৈষজ্য পরিচয় নিয়ে চরক-সুশ্রুত-বাগ্‌ভটে এবং চক্রদত্তের মত প্রামাণ্য ও প্রবীণ বৈদ্যের গ্রন্থে যেভাবে উল্লেখ, সেগুলিকে যদি পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত রচনা ব'লে গণ্য করা না হয়, তাহ'লে সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ পণ্ডিত শিবদাস সেন মহাশয় কেন চক্রদত্তের অম্লপিত্ত ও শূলরোগের চিকিৎসায় নারকেলের কোন কথা লেখেননি! কিন্তু চক্রদত্তের দ্রব্যগুণের মধ্যে ঐ নারকেলের দ্রব্যগুণের উল্লেখ ক'রতে চক্রদত্ত বিস্মৃত হননি। এই জন্যই পণ্ডিতগণ মনে করেন—একই শিবদাস সেন একই গ্রন্থকারের প্রামাণ্য টীকাকার অথচ নারিকেল খণ্ডের ব্যাখ্যাটি তাঁর টীকায় অনুপস্থিত রাখার মধ্যে কিছু একটা রহস্যই যেন লুকিয়ে আছে।

আরও বক্তব্য—আয়ুর্বেদের তৈল পাকের ক্ষেত্রে উপপন্ন দ্রব্যগুলির মধ্যে নারিকেল তৈলের দ্বারা প্রস্তুত কোন ভেষজেরও কোন ব্যবহার নেই। আমরা প্রত্যক্ষ ক'রেছি—নারিকেল তেলের মূর্ছাপাক করা যায় না, গুণান্তর উপস্থিত হয় কিনা সে বিষয়ে প্রচুর সন্দেহ আছে; তাছাড়া নারকেল বা তার তেল কেশ্য—এটারও উল্লেখ কোন গ্রন্থে নেই।

এইজন্য একমাত্র নজির ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রাচীন বৈদ্যদের সংগৃহীত যোগাবলীর মধ্যে আমরা বাংলার প্রাচীন বৈদ্যদের সিদ্ধযোগের ক্ষেত্রগুলি এখানে লিপিবদ্ধ ক'রছি।

মনে করা যায়—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নারকেলের ভৈষজ্য যোগের সন্ধান সংগ্রহ ক'রলে আরও অনেক ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা বুঝতে পারবো।

পরিচিতি

যদিও বাংলার মানুষের কাছে—এ গাছ দেখতে কেমন, তেমন প্রশ্নের অবসরই আসে না, তবুও গ্রন্থের ধারাকে রক্ষা করার জন্যে কিছুটা বলা দরকার আছে বৈকি; তাই ব'লছি—এই গাছের প্রাচুর্য দেখা যায় সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানে এবং বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে, তবে সমুদ্রের ধারেকাছে হ'লেই এ গাছ যে ভাল হয় এটা সর্বাংশে কি ঠিক? আর গাছ তো হ'লো—সে যে খুব ফলবান হবে তারও তো নজির নেই; তাহ'লে সুন্দরবন এলাকায় শুধু নারকেলেরই চাষ হ'তো; তবে যেসব অঞ্চলে লোনা হাওয়া পোঁছোয় অথচ মাটির তলার জল লোনা (লবণাস্বাদ) নয়, সেই অঞ্চলের গাছে প্রচুর পরিমাণ নারকেল হয়, তাই এর প্রাচুর্য করমণ্ডল, মালাবার উপকূল এলাকায়, মাদ্রাজে, উড়িষ্যায়, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অথবা তৎসংলগ্ন দ্বীপগুলিতে এবং শ্রীলঙ্কায় পাওয়া যায়, আর হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর এবং বর্তমান

বাংলা দেশের বহু জেলার প্রায় সর্বত্রই অল্প-বিস্তর হ'য়ে থাকে।

আকৃতির বর্ণনায় বলা যায়—অনাবৃত স্তম্ভাকৃতি দেহ খাড়া লম্বা হ'য়ে ৭০/৮০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হ'তে দেখা যায়, তবে আস্তে আস্তে উপরের দিকটা সরু হ'তে থাকে। গাছের ব্যাস সাধারণতঃ এক ফুট থেকে দেড় ফুট পর্যন্ত হ'য়ে থাকে, পাতার মূল ডাঁটা যেটি গাছের সঙ্গে যুক্ত থাকে, সেটি লম্বা হয় ১২ থেকে ১৮ ফুট পর্যন্ত আর তৎসংলগ্ন যে পাতা হয়, তার মাঝের শিরা চেঁছে ঝাঁটার কাঠি তৈরী হয়। সেগুলিও লম্বা হয় দুই থেকে তিন ফুট পর্যন্ত আর মূল ডাঁটা (নারকেল বেগ্‌ড়ো) শুকিয়ে প'ড়ে গেলে গাছের গায়ে একটা খাঁচ হ'য়ে যায়—তাই গাছের গায়ে এবড়ো-খেবড়ো গোলাকার দাগ হ'য়ে যায়। এর ফলের (নারকেলের) আকারের ভিন্নতায় ভিতরের জলাধার খোলাটিও ছোট-বড় হয়, আবার গায়ে-গতরে বড় হ'লেই যে ভিতরকার জলাধার খোলটি বড় হবে তার কোন স্থিরতা নেই। আন্দামানে এক জাতীয় নারকেল হয়—সেগুলি আকারে বৃহৎ অর্থাৎ তার জলাধার খোলটাই বড় এবং এই নারকেলের শাঁসও বেশ পুরু, আবার কেরালার অঞ্চলবিশেষে এক জাতীয় নারকেল চাষ করা হয়—সেগুলি গতরে বেশ বড় কিন্তু তার ভিতরকার জলাধার অতি ক্ষুদ্র, সেগুলি ছোবড়ার জন্যই গাছ করা হয়। এই ছোবড়ার আঁশ থেকে কাতার দড়ি, যাকে আমরা বলি নারকেল দড়ি, পাপোশ এবং ঐ খোল থেকে বিভিন্ন ধরনের খেলনাও তৈরী হয়; পাকা অর্থাৎ ঝুনো নারকেলের শাঁস শুকিয়ে, ঘানিতে পেষাই ক'রে তেল তৈরী করা হয় আর এর সিটা বা খইলগুলি বিদেশে রপ্তানিও হয়, এর সঙ্গে অন্য জিনিস মিশ্রিত ক'রে বিস্কুট ও চকোলেট ধরনের খাদ্যও প্রস্তুত হ'চ্ছে। সারা বৎসরই এই গাছে ফুল-ফল হয়, তবে ঋতু হিসেবে কম-বেশী।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই গাছটির ফুল, কচি ফল (কচি ডাব), খোসা (ছোবড়া), শিকড়, পাকা ফলের অর্থাৎ ঝুনো নারকেলের শাঁস, এমন-কি নারকেল মালাও (ঝুনো নারকেলের শক্ত খোলা) ঔষধার্থে কাজে লাগে।

এটির বোটানিকাল্ নাম Cocos nucifera Linn., ফ্যামিলি Palmae.

গাছের বর্ণনা প'ড়লেন সত্যি কিন্তু এ প্রশ্ন কি আপনার মনে জাগলো না যে নামটা এলো কি ক'রে? তবে এ সম্পর্কে ভাষাতত্ত্ববিদদের কাছে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, সেখানে বলা হয়েছে—কের শব্দটি এসেছে কেরল শব্দ থেকে, আর নাড়ু মানে পল্লী; এখন মাদ্রাজ প্রদেশের নামই তো তামিলনাড়ু (যদিও কেরল পল্লী থেকে আজ তা বিচ্ছিন্ন)। সেই কেরল পল্লীর নাড়ুকেরই নারিকেল; অর্থাৎ নাড়ুকের পরে অপভ্রংশ হ'তে হ'তে আমাদের কাছে নারিকেল বা নারকেল অথবা নারকোল হ'য়ে গিয়েছে।

লোকায়তিক ব্যবহার

প্রথমেই জানিয়ে রাখি—আয়ুর্বেদিক কোন প্রাচীন গ্রন্থে দৈহিক ও মানসিক রোগের ক্ষেত্রে নারকেল তেলের আভ্যন্তর (Internal application) প্রয়োগের নজির দেখা যায় না; এর কারণ হ'চ্ছে—এর দ্বারা অগ্ন্যাশয় ও পাকাশয়ে ক্ষত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকাতেই একে আভ্যন্তর প্রয়োগের জন্য গ্রহণ করা হয়নি; কিন্তু লোকায়তিক মুষ্টিযোগগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে, এই গাছের বিভিন্নাংশকে নানাপ্রকার রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হ'য়েছে; তবে এটা ঠিক যে, নারকেল ফলের শাঁসের বা জলের যোগগুলি রক্তবহ স্রোতে কোন প্রতিক্রিয়া করে না।

১। **ক্রিমিতে:—** এসব ক্রিমি মলদ্বারে উৎপাত করে না আর নাকের ডগাও চুলকোয় না এবং মুখ দিয়েও জল ওঠে না। এটা সৃষ্টি হয় আমাশয়ে। যদি কয়েক-দিন সম্যক পরিপাক না হয়—তাহ'লে রসবহ স্রোতের উৎস আমাশয়ে এক প্রকার ক্রিমি (ব্যাক্‌টেরিয়া) সৃষ্টি হয়, তার কাজ পেটে বায়ু সৃষ্টি করা এবং উদরকে স্তম্ভিত ক'রে রাখা, এই যে ক্ষেত্র—এখানে কচি ডাবের জল অর্থাৎ যে জলের স্বাদ কষায় ও লবণাক্ত, সেই রকম কচি ডাবের জল আহারের পর খেতে হয়, এর দ্বারা ঐ ব্যাক্‌টেরিয়া-গুলির ধ্বংস হয়। তবে জল মিষ্টি হ'য়ে গেলে সেই জল খেলে আরও ক্ষতিই ক'রবে।

২। **গ্রন্থি মলে:—** মল নিঃসরণ হ'চ্ছে বটে, তবে তার নিরবচ্ছিন্নতা থাকছে না, অর্থাৎ একটা বুলেট্ বেরিয়ে গেল, আবার আর একটা এলো, তার উপর এর গায়ে পাকা পাকা আম জড়ানো—এই রকম যে ক্ষেত্র—সেখানে প্রত্যহ ঝুনো নারকেল মিহি ক'রে কুরে অথবা ঐ কোরা নারকেল অল্প জলে গুলে ন্যাকড়ায় ছে'কে ঐ দুধটা খেতে হবে, আধখানা অর্থাৎ একমালা নারকেল হ'লেই চ'লবে, তবে ৪/৫ দিন প্রত্যহ খেতে হবে, এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৩। **মূত্রকৃচ্ছ্রতায়:—** অজীর্ণজনিত কারণে, অত্যধিক রৌদ্রে ঘোরায়, অত্যধিক পরিশ্রমে অথবা একনাগাড়ে এক আসনে চেপে ব'সে থাকায় যে প্রস্রাবের কৃচ্ছ্রতা আসে, সেক্ষেত্রে একটা বা দুটো কচি ডাবের জল খেলে সাময়িক ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৪। **কোষ্ঠবদ্ধতায়:—** পিত্ত-শ্লেষ্মার ধাত, বায়ু জন্য দাস্ত পরিষ্কার হয় না; এক্ষেত্রে ঝুনো নারকোলের জল প্রত্যহ খালি পেটে এক বা দুই কাপ ক'রে খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৫। **উরঃক্ষতে:—** সর্দি-কাসিতে প্রতি বৎসর বিশেষ কষ্ট দেয়, বিশেষতঃ শীত-কালটায়। এ'দের পিতৃ বা মাতৃকুলে কারও না কারও সর্দিকাসির দোষ থাকা অসম্ভবও নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকেও। অল্প ঠান্ডা লাগলেই বুকটা ভার বোধ এবং দুই দিককার পাঁজরায় ব্যথা। এ'দের যে রক্ত উঠছে তাও নয়, এই যে ক্ষেত্র—এখানে একটা ঝুনো নারকেল কুরে নিয়ে, জলে গুলে, ছে'কে, সেই জলটা আগুনে চড়িয়ে পাক ক'রে তেলটা বের ক'রে নিতে হবে, এই তেল সকালের দিকে এক চা-চামচ ও বৈকালের দিকে এক চা-চামচ খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৬। **প্রোস্টেট্ গ্রন্থির স্ফীতিতে:—** লাগলে ধ'রে রাখার ক্ষমতাও অনেকের থাকে না, আবার কারও কারও লাগলেও একসঙ্গে বেরোয় না—ফোঁটা ফোঁটা ঝরতে থাকে, এক্ষেত্রে নারকেল গাছের কচি শিকড় ছে'চে রস ক'রে সকালের দিকে এক চা-চামচ ও বৈকালের দিকে এক চা-চামচ একটু দুধ মিশিয়ে খেলে ৭/৮ দিনের মধ্যেই উল্লেখ-যোগ্য উপকার পাওয়া যায়।

৭। **অম্ল ও অজীর্ণে:—** এই প্রক্রিয়ার মুষ্টিযোগটা একটু গোলমেলে, তবে এটা কোন বৈদ্যের দ্বারা যদি তৈরী করিয়ে নিতে পারেন তো ভাল হয়; একটা ঝুনো নারকেলের (বড় সাইজের) মুখের দিকে ছ্যাঁদা ক'রে, জল ফেলে দিয়ে তার মধ্যে শুষ্ক আকন্দপাতা ২৫ গ্রাম কুচি কুচি ক'রে পুরে দিতে হবে, তারপর বাখারি চূর্ণ (শামুক বা ঝিনুক পুড়িয়ে যে চূর্ণ হয়) ১০ গ্রাম আর যোয়ান ২৫ গ্রাম ঐ নারকেলের খোলের মধ্যে পুরে গায়ে মাটি-ন্যাকড়া জড়িয়ে, লেপে শুকিয়ে ঘুঁটের আগুনে পোড়াতে

হবে; এমনভাবে পোড়াতে হবে—যেন নারকেলের খোলটা পুড়ে গিয়ে ভিতরকার শাঁস ও অন্যান্য জিনিসগুলি পুড়ে যায়। তারপর নারকেলের উপরকার পোড়া খোলা অর্থাৎ মালাটাকে বাদ দিয়ে সেই পোড়া শাঁস সমেত অন্যান্য জিনিসগুলিকে একসঙ্গে গুঁড়ো ক'রে, ছেঁকে রাখতে হবে; এই চূর্ণ এক বা দেড় গ্রাম মাত্রায় মধ্যাহ্নে ও রাত্রে দুইবেলা আহারের পর জলসহ খেতে হবে। এর দ্বারা অম্ল-অজীর্ণের দোষ নিশ্চয়ই ক'মবে, এমন-কি যাঁদের শূল ব্যথা ধরে—তাঁরাও এটা খেলে রেহাই পাবেন, তবে পথ্যাশী হওয়া দরকার অর্থাৎ খাওয়াদাওয়ার নিয়ম মেনে চ'লতে হবে।

৮। **ফিতে ক্রিমিতেঃ—** এটা অবশ্য পশুর পেটেই বেশী হয় সত্যি, কিন্তু মানুষের পেটেও হয়। এক্ষেত্রে শুষ্ক নারকেল (এগুলি মেওয়ার দোকানে পাওয়া যায়) যতটা, তার সিকিভাগ সৈন্ধবলবণ মিশিয়ে থে'তো ক'রে রাখতে হবে, সেই চূর্ণ সকালের দিকে খালি পেটে ২ গ্রাম মাত্রায় ও বৈকালের দিকে ২ গ্রাম মাত্রায় জলসহ কিছুদিন খেতে হবে। কিছুদিন খেলে ঐ ক্রিমি টুকরো টুকরো হ'য়ে মলত্যাগের সময় মলের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে।

৯। **অজীর্ণ রোগেঃ—** অবশ্য যদি এটা সাময়িক হ'য়ে থাকে তবে। ঝুনো নারকেল বেটে জলে গুলে, ছেঁকে নিয়ে, সেই জল পাক ক'রে টাটকা তেল ক'রে নিতে হবে, সেই তেল ১ চা-চামচ ভাত খাওয়ার সময় প্রথমেই ভাতে মেখে খেতে হবে, ২/৪ দিন খেলেই এই সাময়িক অজীর্ণটা সেরে যাবে।

১০। **অম্লপিত্ত রোগেঃ—** যদিও এ রোগে চিকিৎসক ঘি ও চিনি খেতে দিতে চান না, তবুও লিখি—ঝুনো নারকেল কুরে সেটাকে ঘিয়ে ভেজে নিয়ে আন্দাজ ১০ গ্রাম ক'রে দু'বেলা খেতে হবে।

এটা তৈরী ক'রতে গেলে ২ চা-চামচ ভাল ঘি কড়ায় চড়িয়ে নিফেন হ'লে ১ চা-চামচ চিনি ঐ ঘিয়ে ভেজে নিতে হবে, তারপর ২০ গ্রাম আন্দাজ নারকেল কোরা ঐ সঙ্গে ভেজে সকালের দিকে অর্ধেকটা ও বৈকালের দিকে অর্ধেকটা খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ রোগের উপশম হবে।

১১। **শুক্র তারল্যেঃ—** ঝুনো নারকেলের মুখটা ছ্যাঁদা ক'রে জলটা ফেলে দিয়ে, অল্প লবণ তার মধ্যে পুরে এক বা দুই দিন মুখটা বন্ধ ক'রে রাখতে হবে, এটার দ্বারা ভিতরকার শাঁসটা নরম হ'য়ে যাবে, তারপর ওটাকে অল্প জল দিয়ে ধুয়ে নারকেলের শাঁসটাকে চামচ বা ছুরি দিয়ে তুলে নিয়ে, বেটে, সেটাকে ছেঁকে নিয়ে যে দুধ পাওয়া যাবে—তা থেকে ২ চা-চামচ আধ কাপ গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে প্রত্যহ এটা কয়েকদিন খেতে হবে। এর দ্বারা শুক্র গাঢ় হবে।

১২। **মূত্র শর্করায়ঃ—** প্রস্রাবের সঙ্গে শর্করাবৎ (দেখতে চিনির দানার মত) একটা জিনিস বেরিয়ে যাচ্ছে, যাকে Crystalluria ও বলা যায়। এক্ষেত্রে নারকেলের ফোঁপল অন্ততঃ ১০ গ্রাম দই দিয়ে বেটে প্রত্যহ সকালে একবার ক'রে খেতে হবে। এত দ্বারা মূত্রের সহিত শর্করা নির্গমন বন্ধ হবে। তবে গুরুমুখে যেটা শোনা আছে, তাতে মনে হয় এটা আর না দেখা দেওয়ারই কথা।

১৩। **পরিণাম শূলেঃ—** এই রোগে সাধারণতঃ যাঁরা অল্প পরিমাণ খান, তাঁরাই ভাল থাকেন। জলীয় কোন খাদ্যের থেকে শুষ্ক খাদ্যের উপর বেশী ঝোঁক; এ'দের বমন হ'য়ে গেলে খানিকটা স্বস্তি। এই শূল পিত্তপ্রধান—এক্ষেত্রে ঝুনো নারকেলের

শাঁস বেটে, নিংড়ে, সেই দুধ ২/৩ চা-চামচ আধ কাপ গরম জলে মিশিয়ে তার সঙ্গে ২/৩ টিপ পিপুলের গুঁড়ো মিশিয়ে সকালের দিকে একবার খেতে হবে। কয়েকদিনের মধ্যে এটা উপশম হবে।

১৪। **মাসিক ঋতুর দোষেঃ—** যাঁদের অনিয়মিত মাসিক হয় এবং স্রাবও ভাল হয় না, তাছাড়া রক্তের রঙও ভাল নয়, এক্ষেত্রে নারকেলের শিকড় ১০ গ্রাম, বাঁশের শিকড় ৭/৮ গ্রাম, বাঁশপাতা ৪/৫টি এবং বেগুন গাছের শিকড় ৫ গ্রাম একসঙ্গে থে'তো করে, ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, সকালের দিকে অর্ধেকটা ও বৈকালের দিকে অর্ধেকটা খেতে হবে। তবে এটা খাওয়া উচিত সাধারণতঃ যে সময় (তারিখে) মাসিক হ'য়ে থাকে তার ৭/৮ দিন পূর্ব থেকে। মাসিক হ'য়ে গেলে অর্থাৎ চলা কালে এটা খাওয়া বন্ধ থাকবে। আবার পরের মাসেও সেই ৭/৮ দিন পূর্ব থেকেই খেতে হবে। এই রকম পর পর ২/৩ মাস খেলে ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

১৫। **আধ-কপালে মাথা ব্যথায়ঃ—** যাকে আয়ুর্বেদে অর্ধাভেদক বলে, এই রোগটির ডাক্তারি নাম Hemicrania. এই রোগে নারকেলের জলে ১০/১২ দানা চিনি মিশিয়ে অল্প অল্প ক'রে নাক দিয়ে টেনে অথবা ড্রপারে ক'রে নাকে ফেলে গলাধঃকরণ ক'রতে হবে, অবশ্য অনভ্যস্ত যাঁরা তাঁদের অসুবিধে হবে বৈকি?

বাহ্য ব্যবহার

১৬। **দাঁতের মাড়ী ফুলোয়ঃ—** যন্ত্রণা হ'চ্ছে, এক্ষেত্রে নারকেলের শিকড় পুড়িয়ে কয়লা ক'রে সেটাকে মিহি গুঁড়ো ক'রে, ছে'কে নিয়ে সেইটা দিয়ে আস্তে আস্তে দাঁত মাজতে হবে। তবে এর সঙ্গে একটু ফিটকিরি ও কর্পূর মিশিয়ে নিলে আরও ভাল উপকার হয়।

১৭। **দাদে (দদ্রু রোগে)ঃ—** যেগুলি শক্ত হ'য়ে যায় আর গোল হ'য়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ঝুনো নারকেলের মালায় আগুন লাগিয়ে একটা পাথর বাটির মধ্যে পুরে একটা চায়ের কাপের ডিস্ দিয়ে চাপা দিয়ে ঐ ঘামটা ধ'রে নিতে হবে, তারপর ঐটা তুলি ক'রে কেবলমাত্র ঐ দাদের জায়গায় লাগাতে হবে। এটা লাগালে বেশ জ্বালাও ক'রবে এবং ঐ জায়গাটা পুড়িয়ে দেবে; তারপর আবার ২/৩ দিন লাগানোর দরকার নেই, শুধু নারকেল তেল লাগাতে হবে; এই রকম হয়তো আর একবার লাগানোর দরকার হ'তেও পারে, নইলে একবার লাগালেও অনেকের সেরে যায়। তবে এটা এক্‌জিমায় লাগানো উচিত নয়।

এই নিবন্ধের শেষে একটা বক্তব্য রাখছি—

আমরা পৌরাণিক উপাখ্যানে জানতে পারি—বিশ্বামিত্র নাকি তপোবলে ব্রাহ্মণ হ'য়েছিলেন; প্রবাদ আছে তাঁরই মস্তক এই নারিকেল—এর দ্বারা একটা হালকা রসের অবতারণার স্মৃতি আনে, কারণ হাস্য, করুণ, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও শৃঙ্গার এই ৬টি রসের মধ্যে একমাত্র বীর রসেরই যেন প্রতীক ছিলেন বিশ্বামিত্র, সেই বীর রসের অভ্যন্তরে থাকে অকপট স্নেহ আর অন্য রসের অন্তরে থাকে সঞ্চারী রস; এই নারকেলটি বীর বিশ্বামিত্রের মস্তক তা পরিষ্কার, কারণ এটি যেমনি শক্ত, তেমনি কর্কশ, তারই অভ্যন্তরে আছে সুমধুর স্নেহ। নারকেল তারই প্রতীক নয় কি? আমরা অন্যত্র যে স্নেহের সন্ধান পাই, তাতে থাকে যোগবহ সঞ্চার মাত্র, কিন্তু এই নারকেলের স্নেহ-

কোমল শস্যকে নিংড়ে যে রস পাওয়া যায়—সেটা দান করে প্রাণ, আর প্রাণবন্ত যাঁরা—তাঁদের নিংড়ালে সেটাতে পাওয়া যায় অংগার সত্ত্ব (Sacchrin).

আজ আমরা বৈদ্যক সম্প্রদায় মধুমেহ রোগাক্রান্ত, তাই আমাদের বর্তমান ব্যবস্থা অংগার সত্ত্ব। এই বিশ্বামিত্র নারকেল ফলটি আমাদিকে এই শিক্ষাই দেয়—এ জগতের যাবতীয় দ্রব্যকে প্রাথমিক অনুকূল দ্রব্য হিসেবেই গ্রহণ না করে তার আভ্যন্তর রস সমীক্ষার প্রয়োজন—এই আয়ুর্বেদের চিন্তাধারাই সেই খাতে প্রবাহিত।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Fatty acids: Caproic acid, caprylic acid, capric, lauric and myristic (high precentage), palmitic, stearic, arachidic acid, oleic, linoleic acid. (b) Undecanoic and tridecanoic acids. (c) Mixed glycerides. (d) Histidine, arginine, lysine, tyrosine, tryptophan, proline, leucine, alanine, phytosterols and squalene. (e) Vitamins of the B group.
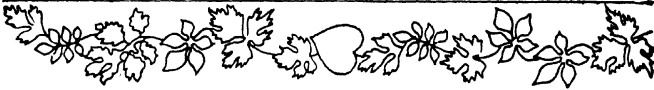
তিল

আজ এমন একটা জিনিস নিয়ে লিখতে ব'সেছি—যেটার প্রসংগ রূপোর কাঠিটা খুড়োর কাছে ছিল; আজ আর খুড়ো বাস্তবে নেই, কিন্তু তার অবাস্তবের ঝুলিটা আমার কাছে ফেলে গিয়েছে—আমার সেই গ্রামীণ জীবনের সীমানায়, তারই একটা

ছুর্‌রা আজ আপনাদের পরিবেশন ক'রবো এই নাম শব্দটাকে কেন্দ্র ক'রে। অবশ্য এরকম খুড়ো প্রায় গ্রাম বা শহরে এখনো যে নেই তা নয়, বরং এ ধরনের লোক আরও বেড়েছে।

কথাটা হ'লো "তিলকে তাল" করা, এখানে তিল কিন্তু বস্তু নয়, "অব্যয়" শব্দ, যেমন কোন বালক না দেখে পাখীর পাখনার ওপর মলত্যাগ ক'রেছে, ওঠার সময় সেটা তার নজরে প'ড়েছে এবং ভয়ে সে কথা মায়ের কাছে ব'লেছে; পুকুরঘাটে তার মা সঠিক না বুঝেই সে কথাটা পড়শীর কাছে ব'লেছে, আর সেইটাই দ্বিতীয় কানে যখন

উপস্থিত হ'লো, তখন সেটা হ'য়ে গেল মলের সঙ্গে পাখনা প'ড়ছে, তার পরের স্তরে প্রচার হ'লো, পাখী প'ড়ছে, তারপর খুড়োর ঝুলিতে যখন এলো তখন শোনা গেল— ওদের বাড়ির ছেলেটার মলদ্বার থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী বেরিয়ে উড়ে যাচ্ছে। এই রকম তিলকে তাল করার ঘটনা তো আপনারাও হালফিল শুনেছেন এবং অনেকে প্রত্যক্ষও যে করেননি তা নয়। এই সেই 'ফুঁয়ো বাবা' নারকেলডাঙ্গার এক মাঠে দাঁড়িয়ে মাইকে বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে কি প'ড়ে ফুঁ দিচ্ছে—এদিকে শত শত লোক স'রষের

তেলের বোতল বা শিশি খুলে দাঁড়িয়ে আছে (এই বৈজ্ঞানিক যুগেও), খানিকক্ষণ বাদে তেল পড়া হ'য়ে গেল আর সেই তেল বাতে পঙগু রোগীকে মালিশ করা হ'লো—তার পরের দিন সেই পঙগু লোকটা উঠে দে ছুট্; এ প্রচার হয়তো বা আপনিও শুনেছেন। এও সেই "তিলকে তাল করা" অব্যয় নাম শব্দের উপমা নয় কি?

এইবার মহাভারতের একটা কবিকাহিনী শুনুন—সেই তিলোত্তমার কথা।

সুন্দ ও উপসুন্দ এই দুই অসুর ব্রহ্মার বরে এত বলীয়ান হ'য়ে উঠেছিল যে, তারা সারা দেশ জয় ক'রে শেষটায় দেবতাদেরও স্বর্গচ্যুত করে। তখন দেবতারা উদ্বাস্তু হ'য়ে, যাকে বলে রিফিউজি হ'য়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন। ব্রহ্মা দেখলে—তাঁর কাছে তো দু'টি বড় অস্ত্র আছে—কামিনী আর কাঞ্চন; এর একটিতেই কিন্তু কুপোকাৎ; তাই তিনি—

"তিলং তিলং সমানীয় রত্নানাং যৎ-বিনির্ম্মিতা।
তিলোত্তমেতি তৎ তস্যা নামচক্রে পিতামহঃ॥"

—অন্য বহু রত্নের তিল তিল সংগ্রহ ক'রে কোন মূর্তি গড়ার মতই বিশ্বের সেরা রূপের অংশ নিয়ে নিয়ে এক সুন্দরী গ'ড়লেন। ব্রহ্মা সেই সুন্দরী রূপসীকে পাঠিয়ে দিলেন সুন্দ-উপসুন্দের কাছে।

ব্যস্, এ বলে সুন্দরী আমার অঙ্কশায়িনী হবে, ও বলে ওটা আমার—এই হ'লো ভ্রাতৃযুগলের কলহ-দ্বন্দ্বের কারণ; তারই পরিণতিতে দু'জনেরই জীবনান্ত (মহাভারত ১।২১১।১৮)।

এখানে তিল 'নাম শব্দটাই' শুধু পরিমাপক রূপে ব্যবহৃত হ'য়েছে।

এইবার সামুদ্রিক বিদ্যাধরের কাছে তিল রূপপ্রকাশিকা সংজ্ঞা নিয়ে উপস্থিত হ'লো দেহকে আশ্রয় ক'রে।

সামুদ্রিক শাস্ত্রের একটি বড় অধ্যায়ের নামই "তিল সঙ্কেত", অর্থাৎ দেহের কোন্ কোন্ স্থানে তিল থাকলে শুভ বা অশুভের সঙ্কেত করে।

এইবার ঐতিহাসিকদের বাঁকা চোখে তিলটা বস্তু হয়ে, সেটাকে আর্যদের থলে থেকে বের ক'রে প্রাক্-আর্যদের তুলসীর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছেন পুরোহিততন্ত্র। যে-কোন সংস্কারকার্যে (বিবাহাদি এবং শ্রাদ্ধাদিও) সঙ্কল্প বাক্য পাঠের সময় এই তিল-তুলসী অপরিহার্য উপচারে পরিণত হ'লো। মোদ্দাকথা, যাকে বলা যায়—আর্য ও প্রাক্-আর্য এই দুই সভ্যতাকে একীকরণ করা হ'লো। যাকে বলে—দুই প্রান্তের দুই সভ্যতার মার্জ্। যেমন ক'রে হরগৌরী মিলনের উপাখ্যান সৃষ্টি ক'রে সংস্কারের আফিংখোর করা হ'লো।

এইবার অথর্ববেদিদের একটি তথ্য তিলকে সামনে রেখে ব'লছি—এই অথর্ববেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণদের রীতিনীতি (১৪।৯।১৬ সূক্ত) পর্যালোচনা ক'রলে দেখা যায়—উৎকৃষ্ট অন্ন প্রস্তুত ক'রে তিল বাটা ও তিল সিদ্ধ দিয়ে খাদ্য খেতে ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করা হ'তো। উত্তরকালে এসে, সেই রীতিটা রূপান্তরিত হ'য়ে গিয়েছে, এই যেমন—অন্নে কিছু তিল মিশিয়ে পিণ্ড ক'রে শ্রাদ্ধে দেওয়া হয় (মনুর ৩।২১৩ বিধান)।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে—ছিল এক, কিন্তু কালে সেই তিল তাল হ'য়ে শতপথী ব্রাহ্মণদের সংস্কারের সপিণ্ডীকরণ করা হ'লো।

আসলে বেদে পিণ্ডের অর্থ দেওয়া হ'য়েছে অন্নের গ্রাস; এখন সে চিন্তাধারাটা যখন নেই, তখন এই সূত্র করা হ'লো—

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্।"

এর নির্গলিতার্থ হ'লো—বৃদ্ধকালে অসমর্থ পিতামাতার মুখে অন্ন দেওয়ার জন্যই পুত্রের প্রয়োজন। বৈদিক পিণ্ডার্থে যে অন্ন, সেটা এখন ঊর্ধ্বদৈহিক হ'লে তবেই চাল, কলা, তিল আমার পেটে যাবে, বেদের সে বাণীর অন্ন আজ কালে খেয়ে ফেলেছে।

আচ্ছা, এই তিলের মূল সূত্রটা কোথা থেকে পাওয়া গেল, সেটা জানতে কার না ঔৎসুক্য জাগে! তাই ব'লছি—দেখুন উপবর্হণ সংহিতায় তার কি মান্যতা। এটা কিন্তু অথর্ববেদোত্তর কালেই এই সংহিতাটি সংকলিত ব'লে পুরাতাত্ত্বিকদের অভিমত।

ঐ সংহিতার ১১।১৭৫ সূক্তে বলা হ'য়েছে—

> ত্বামিদ্ধি হবামহে তিলং বাজস্য কারবঃ।
> পূতং স্নেহং পবিত্রেণ বাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু॥

এই সূক্তটির উবট্ ভাষ্য ক'রেছেন—

> ঋগৈন্দ্রঃ প্রগাথঃ স্নেহস্য যোনিঃ তিলঃ, তিলয়তি স্নেহগতৌ। ত্বাং হবামহে=আহ্বায়ামঃ, বাজস্য অন্নস্য কর্ত্তার ইতি কারবঃ ইৎ এবার্থে, হি নিশ্চয়ে। ত্বং স্বিন্নঃ সন্ পবিত্রং পবিত্রেণ স্নেহেন, স্নাতঃ আজ্যমিব ঘৃতমিব পূতং আপো জলানি এবসঃ পাপাৎ শুধ্যন্তু।

এই সূক্তটি ঋকের ঐন্দ্রগাথায় গান করা হয়—তিল আমাদের স্নেহযোনি, সে স্নেহের সহিত গতিমান, তাই তাকে আহ্বান করি—তুমি অন্নের পবিত্রতা দাও। স্বিন্ন হ'য়ে ঘৃতের পবিত্রতা ধারণ কর, জল যেমন সমস্ত মালিন্য দূর করে, তুমিও তেমনি দেহের মালিন্য দূর কর।

তারপরে—

এই সূক্তের সার অর্থ পাওয়া যায়—ঘৃতের পরেই তিল তৈলের স্থান, আর দেখা যাচ্ছে—তিল বেটে সিদ্ধ ক'রে অন্নের সঙ্গে খেতেন তাঁরা, কারণ তিলের স্নেহের দ্বারা দেহের স্রোতঃগ্রন্থিতে নির্দোষ স্নেহ সঞ্চার ক'রে পিচ্ছিলতা আনে। হয়তো সমগ্র দেহ-যন্ত্রটাকেই তৈল-পিচ্ছিল ক'রে কর্মশক্তি দান করে।

বৈদ্যকের নথি

বৈদিক এই সূক্তার্থ অনুসরণ ক'রেই সংহিতাকারগণের এটার বাস্তব অনুশীলন, এইজন্য তিলের ভৈষজ্য প্রয়োগও বিপুল। তাই প্রথমেই দেখি চরকসংহিতার সূত্র-স্থানের ৪র্থ অধ্যায়ের দশেমানি বর্গে তিলের স্থান। চরক সংহিতার এই অংশ খুবই প্রামাণ্য। ওখানে তিলকে স্বেদোপগ বলা হ'য়েছে। অতএব স্বভাবতই প্রশ্ন—এই তিল দ্রব্যটির ভৈষজ্যগুণ কি? তাই যে প্রশ্নের উত্তরে ২৭ অধ্যায়ে বলা হ'য়েছে—তিল স্নিগ্ধগুণ, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণধর্মী; রসে কষায়, মধুর, কটু; আর ভেষজের ক্ষেত্রে ত্বকের

বৃদ্ধ, কেশের রঞ্জক, বলকর, বায়ুর উপশম করে। কিন্তু যাঁরা পিত্তপ্রধান ও শ্লেষ্ম-প্রধান প্রকৃতির—তাঁদের হিতকর নয়, তাও কৃষ্ণ তিলের ক্ষেত্রে। শ্বেত তিলে যদিও অল্প কিছু হিতকারিত্ব আছে, রূক্ষ পিঙ্গল বর্ণের তিলে তা কিছুই নেই, বরং ক্ষতিকর। এবার দেখা যাক তিলের প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলির লক্ষণ কোথায় কোথায় কিভাবে প্রকাশ পেলো।

পরিচিতি

সমগ্র পৃথিবীতে এই গণের ১০/১২টি প্রজাতি বর্তমান কিন্তু তার অধিকাংশই আফ্রিকায় দেখা যায়। এই ভারতে দু'টি প্রজাতি বর্তমান কিন্তু একটিকে আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই বা চাষ হয়।

আদি জন্মকথা

ঐতিহাসিকদের মতে এটি মধ্য এশিয়ার অযত্নসম্ভূত গাছ ছিল. পরে আর্যরা যখন এদেশে এসেছে—তারাই ভারতে নিয়ে এসেছে, অবশ্য আমরা ঋক্‌বেদেও তিলের ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি।

আর একটি তথ্য পাওয়া যায় যে—তিল জাভা, সুমাত্রার পাহাড়িয়া অঞ্চলে এবং জঙ্গলেও আপনাআপনি হ'য়ে থাকে।

স্থান ও কাল

সাধারণতঃ চাষ হয় পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে, বৎসরে ২ বার একে বপন করা হয়ে থাকে।

সব প্রদেশে একই সময়ে বর্ষা, শীত বা গ্রীষ্মের আবির্ভাব হয় না, তাই চাষেরও (বীজ বপন বা ফসল কাটার) তারতম্য ঘটে। তবে মোটামুটি বর্ষার প্রারম্ভে একবার যেটা বপন করা হয় সে ফসলটা কাটা হয় শরৎকালে, আবার যেটা হেমন্তে বীজ বপন করা হয়—সেটা কাটা হয় গ্রীষ্মের প্রারম্ভে। এইবার আরও বিশদভাবে বলি—তিন রঙের তো বটেই, ৪ রঙের তিলও এদেশে দেখতে পাওয়া যায়—কালো, সাদা, রক্তাভ ও মেটে রঙের—এক এক প্রদেশে এক এক রকম তিলের চাষ বেশী হয়। লাল তিলকে রামতিল বলে। কালো তিল মাঘ-ফাল্গুনে বোনা (বপন করা) হয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে সেগুলি কেটে ঝেড়ে নেওয়া হয়। ঔষধার্থে কালো তিলই বেশী ব্যবহার হয়।

আর সাদা তিলটা জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে বোনা হয়, ভাদ্র-আশ্বিনে সেগুলি কাটা হয়। এই তিলের তেলে গন্ধও কম, খেতেও সুস্বাদু, আহার্যে ও প্রসাধন হিসেবে এই সাদা তিলের তেল ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। এভিন্ন আরও দুই প্রকারের যে তিল আছে, সেগুলির চাষ ব্যাপকভাবে হয় না।

গাছ ১ থেকে ৩ ফুট পর্যন্ত উঁচু হ'তে দেখা যায়, প্রদেশভেদে পাতার আকারের তারতম্যও দেখা যায়। গাছে বা পাতায় সূক্ষ্ম লোম আছে, পাতা ৩ থেকে ৫ ইঞ্চি লম্বা, ছোট বড় পাতা হয়—উপরের দিককার পাতা সরু ও লম্বা, গাছের মাঝখানের পাতা অপেক্ষাকৃত চওড়া; এই গাছের ফুল বিচিত্র আকারের—তবে রামতিল বা লাল তিলের ফুল চিত্র-বিচিত্র। গাছের পাতা কালো তিলের পাতার থেকে বড়। তিল একবারের পেষাইয়ে পুরো তেল বেরোয় না, অন্ততঃ দু'বার তাকে পেষাই ক'রতে হয়। এটির

বোটানিকাল্ নাম Sesamam indicum DC., ফ্যামিলি Pedaliaceae.

বহু প্রদেশেই এটি তিল অথবা তিল্লি বলে পরিচিত, এই বীজের তেলকে জিঞ্জিলি অয়েল (Gingelly oil) বলে। একে মিঠা তেলও বলে, ইউনানি চিকিৎসক সম্প্রদায়ের কাছে এটি 'কুন্‌জুদ্' নামে পরিচিত।

ঔষধার্থে ব্যবহার হয়—বীজ, তেল, খইল, ফুল ও শুষ্ক গাছ (তিলনাল)।

লোকায়তিক ব্যবহার

প্রথমেই ব'লে রাখি—তিলের মৌল শক্তি হ'চ্ছে—তার স্নেহযোনিটার জন্য, সেই জন্যেই আমরা তিলকেই দেখতে পাই আমাদের প্রাচীন সংহিতাগ্রন্থ চরকে। এই সংহিতায় বর্ণিত দেহক্ষেত্রটি ১৩/১৪টি স্রোতধারায় গঠিত; এই ধারাগুলি পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষায় উপচিত ও অপচিত হয়; কিন্তু রসবহ স্রোতকে কেহ অতিক্রম ক'রতে পারে না, অর্থাৎ প্রতিটি স্রোতধারা রসবহ স্রোতেরই মুখাপেক্ষী; সেইজন্য আমাদের আহার্য দ্রব্যগুলির রস প্রথমেই রসবহ স্রোতের আওতায় আসে। সাক্ষাৎভাবে কোন আহার্য রসই এই রসবহ স্রোতকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে না কিন্তু বিস্মিত হ'তে হয়—তাঁদের এই তিলের তৈলযোনির সমীক্ষা দেখে; তাঁরা উপলব্ধি ক'রেছেন যে, তিল এক কালেই বিভিন্ন স্রোতপথে সঞ্চরণশীল হয়। তাছাড়া তিল নিজে যোগবাহী হ'য়েও কাজ করে।

১। **রক্তার্শেঃ—** এই রোগটির পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩১৮ পৃষ্ঠায়, তবুও সংক্ষেপে বলি—এই রোগটি রক্তবহ স্রোত দূষিত না হ'লে তো হয় না, আর দ্বিতীয়তঃ এটা যে কেবল মলদ্বারে ভিতরের দিকে অথবা মুখের কাছে হয় তা নয়, অর্শ শরীরের বিভিন্ন স্থানেই হ'তে পারে, যেমন নাকে হয়—একে বলা হয় পলিপাস্ এবং জননেন্দ্রিয়েও হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কালো তিল ১০ গ্রাম ১২ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রেখে একটু ঘষে দিলেই খোসাটা উঠে যাবে, তারপর জলে ধুয়ে খোসাটাকে ফেলে দিয়ে সেটাকে বেটে নিতে হবে; সেই তিল বাটার সঙ্গে গাওয়া মাখন মিশিয়ে অথবা আধ কাপ গরুর দুধের সঙ্গে (সে কাঁচা বা জ্বাল দেওয়া যাই হোক্) মিশিয়ে সকালের দিকে খেতে হবে, এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে। এটা আছে চরকের চিকিৎসাস্থান নবম অধ্যায়ে।

২। **আমাশায়ঃ—** এই আমাশার বিশেষ লক্ষণ হ'লো—কোমরের ব্যথা যাবে না, লেগেই থাকবে। জীর্ণশীর্ণ চেহারা, রোজ যে আম প'ড়ছে তাও নয়—মাঝে মাঝে পড়ে, কোন কোন সময় একটু রক্তের ছিটও দেখা যায়; আর একটা বিশেষ লক্ষণ থাকবে মূত্রকৃচ্ছ্রতা। এই রোগকে রক্তজ আমগ্রহণীও বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে একটু কচি বেল পোড়ার শাঁস ২ চা-চামচ আন্দাজ, অথবা অগত্যাপক্ষে বেলশুঁঠের গুঁড়ো ১ চা-চামচ দিয়ে তিল বাটার সঙ্গে দই-এর মাথাটা (অগ্রভাগটা) ২/৩ চা-চামচ—এই তিনটে একসঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে। এক্ষেত্রে ৮/১০ গ্রাম কালো তিলকে ভিজিয়ে খোসা ধুয়ে ফেলে, বেটে নিতে হবে। তবে চরকের ব্যবস্থা হ'লো—এর সঙ্গে অন্ততঃ দুই/এক চা-চামচ তিল তেলও মিশিয়ে নেওয়া; অবশ্য টাটকা তেল সংগ্রহ না হ'লে না খাওয়াই ভালো। এটাও চরকীয় ব্যবস্থা, আছে চিকিৎসাস্থানের দশম অধ্যায়ে।

৩। **দন্তহর্ষে বা চলিত দন্তেঃ—** যাঁদের কোন কিছু দাঁতে লাগলে দাঁত শিরশির

করে. ঠান্ডা কিছু খাওয়া যায় না, অকালে মাড়ী আলগা হ'য়ে দাঁত ন'ড়ছে বা ঝুলে এসেছে, এ'দের উচিত রোজ সকালে ৮/১০ গ্রাম কালো তিল (খোসা পরিষ্কার করা) বাটা জলসহ খাওয়া, এর দ্বারা দেহের পুষ্টিও হবে, দাঁতের ও মাড়ীর রোগও সেরে যাবে। এটা ষষ্ঠ শতকের বাগ্‌ভটের ব্যবস্থা—উত্তরতন্ত্রের ৩৯ অধ্যায়ে।

৪। **মূত্ররোধেঃ—** পাথুরী হ'য়ে মূত্ররোধ হ'য়েছে—একথা নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না; অনেক সময় অজীর্ণ জন্যও মূত্ররোধ হয়। যেখানে আপনিও নির্ধারণ ক'রতে পারছেন না, সেখানে তিল ডাঁটার ক্ষার এক গ্রাম, দই ২৫ গ্রাম ও ১ চা-চামচ মধু একসঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা অবরোধটা চ'লে যাবে এবং প্রস্রাবটাও পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।

এই ক্ষার প্রস্তুত করার পদ্ধতি হ'লো—গাছগুলিকে শুকিয়ে নিয়ে অথবা তিল ঝাড়া হ'য়ে গেলে ওগুলিকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে নিয়ে, ছাই-এর আট গুণ জল মিশিয়ে, থিতিয়ে গেলে তাকে ছে'কে নিয়ে ঐ পরিশ্রুত জলকে পাক ক'রলে ঘন হ'য়ে চিনি বা লবণের মত একটা জিনিস কড়ার তলায় প'ড়ে থাকবে; এইটাই "তিলনাল ক্ষার"। সুশ্রুতের মতে ক্ষার তৈরী ক'রতে গেলে ঐ জলটা ২১ বার ছে'কে নিতে হবে। ক্ষার প্রস্তুত পদ্ধতি লেখার পূর্বে যে মুষ্টিযোগটা লেখা হ'লো—সেটা আছে হারীতের চিকিৎসাস্থানের ৩০ অধ্যায়ে।

৫। **অশ্মরী রোগেঃ—** আয়ুর্বেদিক চিন্তাধারায় অশ্মরী রোগ যেখানে বায়ুর প্রাধান্যে হয়—সেখানে প্রস্রাবের ধারাটা চিরিত হ'য়ে বেরোবে, শূলবৎ বেদনা হবে, আর একটু শিহরণে অথবা মাথায় জল ঢাললে একটু প্রস্রাব বেরিয়ে আসে; আর প্রস্রাব করার পূর্ব মুহূর্তে একটা যন্ত্রণা বোধ হবে; এই ক্ষেত্রে তিল ডাঁটার ক্ষার ১ গ্রাম মাত্রায় ১ কাপ কাঁচা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা প্রস্রাবও পরিষ্কার হবে এবং পাথুরীটাও পড়ে যাবে, তবে কয়েকদিন খেতে হবে। তবে যদি নজরে পড়ে সেটার রং কিন্তু সাদা হবে। এটা কিন্তু চক্রদত্তের ব্যবস্থা।

৬। **অজীর্ণেঃ—** যে অজীর্ণ মাংস খেয়ে হ'য়েছে, সেক্ষেত্রে ঐ তিল ডাঁটার ক্ষার আধ গ্রাম মাত্রায় মধ্যাহ্নে ও রাত্রে আহারের পর জলসহ দুইবার খেতে হবে, এর দ্বারা ঐ অজীর্ণের উপশম হবে। এটা আছে ভাবপ্রকাশে।

৭। **রক্তামাশায়ঃ—** কোন গরম জিনিস বা গুরুপাক জিনিস বেশী খাওয়া অথবা অজীর্ণ অবস্থায় গুরুভোজন ক'রে রক্তামাশা হ'য়ে গিয়েছে অথবা অত্যন্ত গরম জিনিস খেয়ে আমরক্ত হ'য়েছে, সেক্ষেত্রে ৭/৮ গ্রাম কালো তিল, তার সঙ্গে ৩/৪ গ্রাম দেশী কুলের (টোপা কুলের) শিকড়ের ছাল একসঙ্গে জল দিয়ে বেটে ওটা ন্যাকড়ায় ছে'কে নিয়ে, সেই জলটা সিকি কাপ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে (তবে এটা ছাগদুগ্ধ হ'লেই ভাল হয়), এর দ্বারা ঐ রক্তামাশা ২ দিনের মধ্যেই ভাল হ'য়ে যাবে। তবে বালকদের ক্ষেত্রে মাত্রা কম।

তবে একটা কথা—এইসব যোগগুলি বৈদ্যককুলের মধ্যে প্রচলিত আছে; অনেকে মনে করেন এগুলি বুঝি তাঁদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের বেসাতি; না, তা নয়, এগুলি সংহিতোক্ত ও প্রাচীন গ্রন্থোক্ত পদ্ধতি।

বাহ্য ব্যবহার

৮। **অর্শের বলির ব্যথায়ঃ—** কালো তিল বাটা আর গাওয়া ঘি একসঙ্গে মিশিয়ে

আধ-বাটা ক'রে তারপর সেটাকে গরম ক'রে ন্যাকড়ায় পুঁটুলী বেঁধে মলদ্বারে সেক দিলে ২/১ দিনের মধ্যে অর্শের বলিটা চুপ্সে যাবে। এটা আছে চরকের চিকিৎসা-স্থানের ১৩ অধ্যায়ে।

৯। **ফোড়ায়ঃ—** সে যে কোন জায়গায়ই হোক না—কালো তিল বেটে, তার সঙ্গে যবের ছাতু ও মাত্রামত টক দই মিশিয়ে, অল্প গরম ক'রে ঐ ফোড়ার উপর পুল্টিসের মত লাগিয়ে দিতে হবে। তবে এমনভাবে দই মেশাবেন—যেন বেশী পাতলা না হ'য়ে যায়। এটা সকালে ও বৈকালে দিনে দু'বার লাগালে ফোড়াটা পাকিয়ে, ফাটিয়ে দেবে। এই যোগটি আছে চরকের চিকিৎসাস্থান ১৩ অধ্যায়ে।

১০। **ফোড়ায়** (দ্বিতীয় ক্ষেত্র)**ঃ—** এ ফোড়া পাকেও না এবং ফাটেও না, না পাকা না কাঁচা—চল্তি কথায় বলে দরকচা মেরে গিয়েছে; এক্ষেত্রে কালো তিল বেটে অল্প মধু মিশিয়ে ফোড়ার উপর প্রলেপ দিলে (এটা গরম করার দরকার নেই) পাকবে, ফেটে পুঁজ বেরিয়ে যাবে। এটা চরক সংহিতার ব্যবস্থা।

১১। **বাতরক্তেঃ—** এই রোগটির সম্পর্কে তার লাক্ষণিক রূপ 'চিরঞ্জীব বনৌ-ষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা আছে; এক্ষেত্রে কাঠখোলায় ভাজা তিলকে (অর্থাৎ বালি না দিয়ে এমনি কড়ায় বা কোন মাটির পাত্রে নেড়ে ভাজা) কাঁচা দুধে বেটে বাতরক্তের ক্ষতে প্রলেপ দিলে ওটা সেরে যায়। এটা আছে বাগ্ভটের চিকিৎসা-স্থানের ২২ অধ্যায়ে।

১২। **তৃষ্ণা রোগেঃ—** এই রোগটি ক্ষুদ্র নয় বা উপেক্ষার নয়—এটি হ'লে বুঝতে হবে যে, মূত্রগ্রন্থি ও তালুগ্রন্থিতে যে রসবহ স্রোত আছে—সেটা বিকারগ্রস্ত হ'য়েছে। এই রোগ দীর্ঘদিন অবহেলিত হলে বা এটা চ'লতে থাকলে মূর্ছা অথবা অপস্মার হ'তে পারে—এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩২৭ পৃষ্ঠায় আছে।

যাই হোক, এই রোগটি দেখা দিলে তিলের খইল জলে বেটে গায়ে মাখুন, খানিকক্ষণ বাদে স্নান ক'রে ফেলুন—এই রকম কয়েকদিন মাখলে এই তৃষ্ণা রোগের উপশম হবে। আপনি হয়তো ভাবছেন—"তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে চাহিলাম জল, তাড়াতাড়ি এনে দিলে আধখানা বেল"; তাই বলছিলাম মনীষীদের সমীক্ষা এই রকমই ছিল, এক্ষেত্রে ঠাণ্ডা জল অথবা ঘোলের সরবত খাওয়ার ব্যবস্থা দেননি।

১৩। **শূল রোগেঃ—** যদি এটা বায়ুজন্য হয় (এটার লক্ষণ লেখা আছে 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩৩২ পৃষ্ঠায়), তাহ'লে তিলকে এমন শক্ত ধরনের বাটতে হবে—যেন পেটের উপর রেখে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স'লতের মত পাকানো যায়, যেমন ক'রে আমরা ময়দাকে মেখে লেচি করার ব্যবস্থা করি; এই পদ্ধতিতে পেটে তিল বাটা দিয়ে স'লতে পাকালে ঐ বায়ুজন্য শূলটা প্রশমিত হবে। এটা চক্রদত্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা।

১৪। **আমবাতেঃ—** এই রোগ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩৩১ পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'য়েছে।

এক্ষেত্রে কালো তিল আর শুঁঠ সমান পরিমাণে নিয়ে, জল দিয়ে বেটে গায়ে তেল-হলুদের মত মাখলে জ্বালা, চুলকানো আর ফুলো—এই তিনটি ক'মে যাবে।

১৫। **পচা ঘায়েঃ—** এই ঘা অনেক সময় বিষাক্ত হ'য়েই জন্মে, অর্থাৎ অনেকের বংশানুক্রমিকতায় অথবা অনেক সময় পূর্বপুরুষদের মেহ-প্রমেহ রোগ থাকে, সেই দোষে অথবা উপদংশ (সিফিলিস্) রোগে, অশোধিত পারদঘটিত কোন ঔষধ সেবনজনিত রক্তদোষেও এই রোগ হ'তে পারে; এই রকম যে ক্ষেত্র, সেখানে কালো তিল বেটে প্রলেপ দিলে পূঁজ হওয়া ক'মে তো যাবেই, অধিকন্তু ঘা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে।

১৬। **শিরোরোগেঃ—** এই রোগটির বিস্তৃত বিবরণ চিরঞ্জীবের প্রথম খণ্ডের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'য়েছে, তবুও সংক্ষেপে বলি—যদি রক্তবহ স্রোতের অভ্যন্তরে রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধির জন্য বায়ুর স্বাভাবিক সঞ্চরণশীলতা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখনই পীড়াদায়ক হয়; এক্ষেত্রে কালো তিল দুধে বেটে ওটাকে অল্প গরম ক'রে পুঁটুলি বেঁধে মাথায় ও ঘাড়ে স্বেদ দিতে হবে, যেমন ক'রে আমরা নুনের পুঁটুলির সেক দিই। তারও একটা প্রক্রিয়াও ভাল কাজ দেয়, সেটা হ'লো—৫০ গ্রাম আন্দাজ তিলকে দুধে বেটে আধ সের আন্দাজ দুধ ও এক পোয়া জল একসঙ্গে ঐ তিল বাটার সঙ্গে মিশিয়ে সিদ্ধ করতে হবে, যখন ফুটে ভাপ (বাষ্প) উঠবে, উনুনের কাছে ব'সে সেইটা মাথায় ও ঘাড়ে লাগাতে হবে। এর দ্বারা মাথার যন্ত্রণা ও ভার বোধ চ'লে যাবে। এই রকম ২/৩ দিন ক'রতে হবে।

১৭। **টাকেঃ—** স্বাভাবিক টাকে এটাতে কাজ হয় না, তবে বিক্ষিপ্ত টাকে বা টাক রোগে, যাকে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এলোপেসিয়া এরিয়েটা ব'লে থাকেন, তিলের ফুল ও গোক্ষুর বীজ সমান পরিমাণ নিয়ে, বেটে অল্প ঘি ও মধু মিশিয়ে ব্যাধিত-স্থানে অর্থাৎ যেখানটায় টাক প'ড়েছে সেখানটায় প্রলেপ দিতে হবে, এটাতে ঐস্থানে নূতন চুল গজাবে।

এই নিবন্ধ লেখার শেষে ব'সে ভাবছি—একে কোন্ ভাষায় ইতি করি—আচ্ছা এর রূপটা তো আপনি দেখেছেন কিন্তু এর মধ্যে যে এত স্নেহ আছে, তা কি তার বাহ্যরূপ দেখে বোঝা যায়?

ভৈষজ্য জগতে এ যেন চাণক্য-নীতির সেই উপদেশ—"স্নেহসংযোগতঃ শিক্ষা", অর্থাৎ মানবের মস্তিষ্কে কখনও কঠোর কর্কশ উপায়ে শিক্ষা দেওয়া ভাল নয়; স্নেহ-কোমল ব্যবহারেই সমগ্র মস্তিষ্কে শিক্ষার সুকুমার বৃত্তির সঞ্চার হয়। তিল আমাদিকে ভৈষজ্য-বিদ্যায় সেই শিক্ষাই দিয়েছে। রোগী একেই তো ব্যাধির পীড়নে পীড়িত, সেক্ষেত্রে স্নেহদানই সর্বাগ্রে করণীয় পদ্ধতি। তাই দেখতে পাই—তিলের যোগগুলি দেহের কঠিনতম ক্ষেত্রেও প্রবেশ ক'রে দুষ্ট ব্যাধির প্রশমন ক'রছে, ভাবতে ভাবতে মনে হয়—এ যেন প্রমীলার স্নেহ-শৃঙ্খলিত রাজ্য সুশাসন।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Vitamins, carbohydrates, proteins. (b) Sesamin, seamolin, sesamol. (c) Guaicol, phenol, furfuryl alcohol, 2-acetyl-3-methyl furan, acetyl-pyrazine, 2-acetyl pyrrole and α-formyl pyrrole.

কটিল্লক ও কারবেল্লক

(উচ্ছে ও করলা)

লোকে কথায় বলে—"ভাজে উচ্ছে বলে পটোল", এটা কিন্তু স্বভাব-খল প্রকৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক উপমা। উদ্ভিদকুলের মধ্যেও এমনি কতকগুলি উদ্ভিদের এক একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—তাদের অপরিণত বয়সে যে রস আশ্রিত হ'য়ে থাকে, পরিণত বয়সে সেই আবার ভোল বদলায়; এই যেমন আখ (ইক্ষু), আম, দ্রাক্ষা (আঙ্গুর), তাল, কলা প্রভৃতি।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে—মধুর রসের সঞ্চারটা অন্তঃসঞ্চারী ফল্গুর মতই আসে, এটি তার স্বভাব রস নয়; এদের চরিত্রের ভূমিকা যেন বারবনিতার। কিন্তু এই যে তিক্তরস—এর অদল-বদল নেই, পরিণত বয়সেও সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটা বদলায় না।

তাই ব'লে সকলের প্রকৃতি কি এক ধাতুতে গড়া? না—তা তো নয়। কারণ এরা এসেছে বিভিন্ন সংসার (ফ্যামিলি) থেকে; সুতরাং কিছু পার্থক্য তাদের থাকবেই: এই ধরুন না—নিমও তেতো (তিক্ত), নিসিন্দেও তেতো আবার উচ্ছেও তেতো; এই রকম গুলঞ্চ, শিউলি, ছাতিম (সপ্তপর্ণ), সোমরাজী, কালকাসুন্দে (কাসমর্দ)—এরা সবাই জাতে তেতো। তবুও নিরীক্ষায় ধরা পড়ে—নিম এসেছে Meliaceae ফ্যামিলি থেকে, আবার নিসিন্দে এসেছে Verbenaceae, উচ্ছে Cucurbitaceae, গুলঞ্চ Menispermaceae, শিউলি oleace, ছাতিম Apocynaceae, সোমরাজী Compositae, কালকাসুন্দে Leguminosae ফ্যামিলি থেকে; সুতরাং প্রকৃতির ভিন্নতা উপলব্ধি হবেই। তাই এক এক ঋতুতে ভোগ ক'রতে ভাল লাগে এক এক জিনিস—যেমন বসন্তে নিম ভাল লাগে, আবার ভাদ্রে (শরৎ ঋতুতে) শিউলি। তাছাড়া, সব কালেই সব জিনিস ভোগ করাও তো উচিত নয়; তবে এই একটি রস যেটি উদ্ভিদের সব অংশে সমান সঞ্চারী, তাই তো আমরা কোন কুঁদুলে বংশকে উচ্ছে গাছের সঙ্গে

তুলনা ক'রে ব'লে থাক—এ যেন "উচ্ছের ঝাড়—এর মূল তিতো, পাতা তিতো, ফলও তিতো"।

কিন্তু প্রত্যেকের প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য পৃথক; তাই তার ক্রিয়াকারিত্বও পৃথক, বৈদ্যক-গোষ্ঠী তাই তার তিক্ত রসের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটাকে কিভাবে বিশ্লেষণ ক'রেছেন সেইটাই দেখা যাক, কিন্তু দেখা যাচ্ছে অথর্ববেদেও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না,

তবে পরবর্তীকালে উপবর্হন সংহিতার ৫২/৩ সূক্তে উল্লেখিত হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে—

উত্থায় তিষ্ঠ মিত্রৈতাং স্বঙ্গুরিঃ ত্বং কটিল্লকঃ।
চর্ষণী ধৃতদ্যুম্ন পৃথিব্যাঃ রসং ভাজয়তেহ নঃ॥

উবট্ এই সূক্তটির ভাষ্য ক'রেছেন—

> মিত্রস্থানীয়াং এতাং তব তনুং লতাং উত্থায় পুনঃ স্থিতাভব, ত্বং কটিল্লকঃ কটিং কঠিনং চ্ছদং ইল্লতি প্রকাশয়তি। স্বঙ্গুরিশ্চ শোভনা করপল্লবা যস্য সঃ, অপিচ পৃথিব্যাঃ চর্ষণী ধৃতদ্যুম্নঃ চর্ষণা মনুষ্যাঃ তৈঃধৃতদ্যুম্নঃ দীপ্যমানঃ রসঃ তং ভাজয়তেহ।

এই সূক্তটির অনুবাদ হ'লো—তুমি কটিল্লক অর্থাৎ কঠিনচ্ছদ, তুমি মিত্রস্থানীয়, তোমার তনু অর্থাৎ লতাকে উত্থিত কর এবং পুনরায় স্থাপন কর, তোমার সুন্দর কলপল্লব এবং তোমার দীপ্যমাণ রস পৃথিবীর মনুষ্যগণ গ্রহণ করে এবং আমরাও।

বৈদ্যকের নথি

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার সিদ্ধান্ত হ'লো—পিত্তবিকারে মধুর, তিক্ত, কষায় ও শীতল দ্রব্য দিয়ে চিকিৎসা ক'রতে হবে ঠিকই, কিন্তু যে তিক্তে বিরেচন ক্রিয়া সৃষ্টি করে, তেমনি তিক্তরসই দিতে হবে; কারণ সব তিক্তরসই আমাশয়ে বা গ্রহণীতে প্রবেশ ক'রে পিত্তের মূলকে ছেদন করে না, কারণ পিত্তের স্বাভাবিক প্রকৃতিতে উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা, লঘুতা, কটুতা, অম্লতা প্রভৃতি ধর্ম আছে, যদি তার বিপরীত পরিণাম শক্তির আবির্ভাব না হয়, তবে পিত্তের উপশম দূরে থাক, আরও বিকৃত হ'য়ে যাবে। এমনকি তীক্ষ্ণধর্মী, উষ্ণধর্মী তিক্তরস পেলে সেই বিকৃত পিত্তের পরিণামে আরও কঠিন রোগের উৎপত্তি ঘটায়।

এইজন্য চিকিৎসকের এমন ধরনের দ্রব্যের নির্বাচন প্রয়োজন যে, যে তিক্ত রসে স্নেহধর্মিতা ও বিরেচন প্রক্রিয়া নিহিত থাকে—তেমনি তিক্ত রসের ভেষজই শ্রেষ্ঠ এবং আহার্যও শ্রেষ্ঠ।

আমার বক্তব্য—এক্ষেত্রে যতগুলি তিক্তরসের আহার্য দ্রব্য আছে—তাদের মধ্যে কটিল্লক বা উচ্ছে আর কারবেল্লক বা বড় করলা অন্যতম। উভয় ফলই প্রায় সমধর্মী, তবে বংশধারায় একটি ক্ষুদ্রাকৃতি এবং আর একটি বৃহৎ আকৃতির।

দুটি ফলই সুপ্রাচীন ভারতে পরিচিত ব'লেই চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভটে এর গুণপনা ও ভৈষজ্য গুণের কথা লিপিবদ্ধ হ'য়ে আছে।

নাম রহস্য

কটিল্লক শব্দটির আভিধানিক শব্দভেদ হ'লো—কট্=কঠিন আবর, তাকেই যে ইল্লতি প্রকাশয়তি সেই কটিল্লক, এর পরিচিত নাম উচ্ছে। এই শব্দটিও উচ্চ ছদ অর্থাৎ বেশ পুরু চামড়া যার। এইভাবে উচ্ছের বিবর্তিত নাম। সংস্কৃত ভাষার দুটি নামই একই বক্তব্য প্রকাশ করে। ঠিক ঐভাবে আর একটি নাম কারবেল্ল অর্থাৎ করলা। কর শব্দের অন্য অর্থ থাকলেও কার শব্দ নিশ্চয়াত্মক অর্থ প্রকাশ করে, আর বেল্ল শব্দ লতাকে বোঝায়; অর্থাৎ যেটি নিশ্চিত রূপেই লতিয়ে লতিয়ে যায়। বৃক্ষত্বও পায় না, মহীরুহত্ব ঘটে না কারবেল্লের। আর এটি যে ওষধি লতা তাও ঠিক; যে লতার "ফল-পাক" ঘটে গেলেই তার দেহান্ত হয়—তাকেই বলা হয় ওষধি। করলা বা উচ্ছেলতার ফল পেকে গেলেই সে লতায় আর হরিৎবর্ণতা থাকে না, দাহ জন্য পিত্ত রং হরিদ্রা বর্ণই

হয়। এই কাটল্লক এবং কারবেল্ল দুটি ভেষজেই চরকের বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে শ্লেষ্ম শমন বিষয়ে তিক্তরস-প্রধান ভেষজ নির্ধারণে নির্ধারিত হ'য়েছে।

এভিন্ন সুশ্রুত, চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে কটিল্লক বা উচ্ছে এবং কারবেল্ল বা করলার ভৈষজ্য শক্তি সম্পর্কে প্রয়োগ এবং তার ক্ষেত্রগুলিকে নির্বাচন করা হ'য়েছে দেখা যায়।

যে কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যবহার—প্রায় সব ক্ষেত্রেই এর লতা ও পাতার ব্যবহারই দেখা যায়। তবে লোকায়তিক ব্যবহারে এর ফলেরও ব্যবহার হয়। এর মৌল উৎসটি পর্যায় মুক্তাবলী গ্রন্থে উল্লেখিত হ'য়েছে।

পরিচিতি

এই ফ্যামিলির সব লতা গাছেরই আকর্ষ (tendril) থাকে। পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম দুই গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এই Momordica গণের অন্ততঃ ২৫টি প্রজাতি (Species) বর্তমান; তার মধ্যে ভারতবর্ষে অন্ততঃ ৫/৬টি পাওয়া যায়।

বর্ষজীবী লতা, কিন্তু এই লতাগাছের মূলটি মাংসল, কোন গাছে অথবা বেড়া বা মাচাকে আশ্রয় ক'রে বেড়ে গেলেও ঐ আঁকুশি বা আঁকড়ি কোন কিছুকে জড়িয়ে ধ'রে এগিয়ে যায়; পাতা হাতের পাঞ্জার মত হ'লেও অসমান খাঁচকাটা, তবে কোনটায় ৪ বা ৩টি খাঁচও থাকে; পাতার বোঁটা এক থেকে দেড় ইঞ্চি লম্বা, ফুল হ'লদে, এই ফুলের বোঁটাও দেড়/দুই ইঞ্চিও লম্বা হ'তে দেখা যায়।

সমগ্র ভারতবর্ষেই করলা ও কটিল্লকের অল্পবিস্তর চাষ হয়, এ দু'টির সাধারণ নাম উচ্ছে।

আমরা তিন প্রকার উচ্ছে দেখতে পেলেও যেটা বনে হয় অর্থাৎ আপনাআপনি গাছ জন্মে, সে গাছে যে ফল হয়—সেগুলি আকারে ছোট ও বীজবহুল এবং স্বাদে অপেক্ষাকৃত কম তিতো (তিক্ত); উপরকার বহিরাবরণের শাঁসটাও পাতলা, সেই উচ্ছেকে কোন কোন অঞ্চলে "কাশীর উচ্ছে" বলে। আর এক প্রকার যেটা দেখতে পাই—সেগুলি মাচাতেও হয় আবার বসন্ত বা গ্রীষ্মকালে মাটিতে অর্থাৎ ক্ষেতেও হয়, তবে

বর্ষাকালে মাচায় অথবা বেড়ায় গাছ উঠিয়ে না দিলে বাঁচে না আর একটু উ'চু ক্ষেত ভিন্ন (অর্থাৎ যেখানে বর্ষার জল দাঁড়ায় না) গাছ বাঁচানো যায় না। চৈত্র বা বৈশাখে বীজ পুঁতে যে গাছ হয় সেইটাই বর্ষায় হ'য়ে থাকে। অবশ্য সব প্রদেশে একই মাসে সব ঋতুর আসা-যাওয়া হয় না, সুতরাং চাষ করারও মাসের পার্থক্য হ'য়েই থাকে। এই ছোট জাতের উচ্ছেটা কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে অথবা শীতের শেষে বীজ পুঁতে চারা করা হয়, এই সময়ই মাটিতেই উচ্ছে গাছ হয় এবং ফলও হয়।

আর এক প্রকার উচ্ছে সমগ্র ভারতে চাষ তো হয়ই, বিশেষতঃ এই বাংলায়। যার সংস্কৃত নাম কারবেল্লক, প্রচলিত নাম করলা উচ্ছে, চৈত্র-বৈশাখে এটির বীজ পুঁতে দেওয়া হয়, সেটাকে মাচায় তুলে না দিলে বর্ষায় ম'রে যায়। এই গাছের লতাগুলিও একটু মোটা এবং এর পাতা আকারেও বড় কিন্তু তার গঠনের তারতম্য নেই। ফুলের রঙও সেই হ'লদে, তবে ফলও হয় বেশ বড়। লম্বায় প্রায় ৭/৮ ইঞ্চি, গঠনটা ভুট্টার (মকাই) মত—দুই দিক সরু আর মাঝখানটায় মোটা, রঙে সবুজ, বুঁটিদার, অসমান গা (গাত্র)। এই ফল পাকলে লালী হ'লদে (রক্তাভ হরিদ্রা) রঙের হয়, পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুরের গড়বেতা, ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে এর ব্যাপক চাষ হয়; সেইগুলির বেশীর ভাগই নিকটবর্তী শহরাঞ্চলে চালান যায়।

এটির বোটানিকাল্ নাম Momordica charantia Linn., আর ছোটগুলির নাম তাঁদের মতে এর Variety বা Var., তথাপি তার নাম দেওয়া হয়েছে Momordica muricata, ফ্যামিলী Cucurbitaceae.

ঔষধার্থে ব্যবহার হয়—সমগ্র লতা-পাতা, মূল, ফল ও বীজ।

লোকায়তিক যোগ

প্রথমেই ব'লে রাখি—এই কারবেল্লক (করলা উচ্ছে) বা কটিল্লক (ছোট উচ্ছে) তিক্তরস-প্রধান, কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য হ'লো—এটা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রসবহ স্রোতকে টপকে গিয়ে সে রক্তবহ স্রোতে পেঁৗছে যায়, এইটাই তার বিশিষ্ট বীর্যশক্তি। সেইজন্য সুশ্রুত একে বাতরক্তে ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছেন।

১। **বাতরক্তেঃ—** এই রোগটির লক্ষণ 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩৩০ পৃষ্ঠায় আছে। এই ক্ষেত্র উপস্থিত হ'লে উচ্ছের পাতার রস ৪ চা-চামচ একটু গরম ক'রে তার সঙ্গে ১/১২ চা-চামচ গাওয়া ঘি মিশিয়ে প্রধান খাদ্যের সঙ্গে প্রথমে খেতে হবে, অথবা যাঁরা রুটি খাবেন, তাঁরাও প্রথমে খেতে পারেন। তবে যদি প্রত্যহ এটা করার অসুবিধে হয়, তাহ'লে অন্ততঃ ২৫০ গ্রাম ঘি নিয়ে তাকে কড়ায় চড়িয়ে নিস্ফেন হ'লে ঘিয়ের ৪ গুণ উচ্ছে পাতার রস দিয়ে পাক ক'রতে হবে এবং ঐ রস ম'রে গেলে কেবলমাত্র ঘৃত অবশিষ্ট যখন থাকবে, তখন নামিয়ে ছে'কে নিতে হবে, তবে পাকশেষে রসের সিটেটা পুড়ে গেলে কিন্তু দ্রব্যটির গুণ থাকবে না। সেই ঘি প্রত্যহ ২ চা-চামচ ক'রে খেলে বাতরক্তের দোষ চ'লে যাবে। এটা সুশ্রুত সংহিতার ব্যবস্থা।

২। **পিত্ত-শ্লেষ্ম জ্বরেঃ—** অনেক সময় ম্যালেরিয়া জ্বরেও পিত্ত-শ্লেষ্মার বিকার হয়, এর প্রধান উপসর্গ শরীরে কামড়ানি, পিপাসা, বমি; এই রকম ক্ষেত্রে ২/৩ ঘণ্টা অন্তর উচ্ছে পাতার রস ১ চা-চামচ একটু গরম ক'রে অথবা গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে সমস্তদিনে দুই-তিন বার ক'রে খেলে জ্বরের উপসর্গগুলি চ'লে যাবে এবং জ্বরও

ক'মে যাবে। এই যোগটি চক্রদত্তের ব্যবস্থা। এটি পশ্চিম বাংলার কবিরাজবৃন্দ ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার ক'রতেন।

৩। **বসন্তরোগে ঃ—** এই রোগটি সাধারণতঃ বসন্তকালেই আসে বটে, তবে রসবহ স্রোতকে দূষিত ক'রে যেগুলি হয়—তাকে আমরা ব'লে থাকি পানিবসন্ত বা জলবসন্ত, আর রক্তবহ ও মেদোবহ স্রোতকে দূষিত ক'রে যে বসন্ত হয় সেগুলি একটু গভীরেই বাসা বাঁধে এবং উঠতেও যেমন দেরী হয়, তেমনি তার যন্ত্রণাও খুব বেশী, আর মজ্জা ও শুক্রবহ স্রোতকে দূষিত ক'রে যে বসন্ত হয় না তাও নয়। এইগুলিকে বলা হয় Small Pox বা আসল জাত বসন্ত।

এক্ষেত্রে চিকিৎসকের প্রাথমিক কর্তব্য হ'লো—কোন্ স্রোতকে দূষিত ক'রে এই বসন্ত হ'য়েছে সেটা নির্ধারণ করা, তারপরে তার চিকিৎসার ধারা নির্বাচন করা, তাহ'লেও এই নিম্নোক্ত যোগটি প্রথমেই ব্যবহার ক'রবেন—হলুদের গুঁড়ো আধ গ্রাম থেকে এক গ্রাম মাত্রায় (বয়সানুপাতে) উচ্ছে পাতার রস এক চা-চামচ একটু গরম ক'রে, সেই রস মিশিয়ে খেতে দিতে হবে দিনে দুই/তিন বার। এর দ্বারা যেগুলি ফুটে বেরোয়নি সেগুলি বেরুবে, পাকবে, শুকিয়ে যাবে। তবে একটি জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যে, বসন্ত হ'য়ে শুকিয়ে যাওয়ার পর আবার ফোড়া বেরোয়, বিশেষ ক'রে অস্থির সন্ধিতে সন্ধিতে অর্থাৎ গাঁটে গাঁটে। এই মুষ্টিযোগটি প্রয়োগ ক'রলে এইসব উপদ্রবের হাত থেকে বেঁচে যাবেন। আর একটা কথা—এই রোগে হাতে পায়ে খুব জ্বালা হয়, সেই উপসর্গ থাকলে উচ্ছে পাতার রস হাতে পায়ে লাগাতে হবে, তবে হাতের তালুতে ও পায়ের তলায় লাগানো দরকার।

৪। **গুঁড়ো ক্রিমিতে ঃ—** একে অনেকে ঝুরো ক্রিমিও ব'লে থাকেন। এই ক্রিমি কি-বা বুড়ো আর কি-বা বাচ্চা—এঁদের লজ্জা-সরম রাখার আর অবসর দেয় না, কুট্‌কুট্ ক'রে কামড়ায় আর সুড়্ সুড়্ করে; তার জন্য কেবল পিছনে হাত বার বার দিতে হয়। এক্ষেত্রে উচ্ছে পাতার রস বয়স্ক হ'লে এক বা দুই চা-চামচ, আর বাচ্চা হ'লে আধ চা-চামচ সকালে ও বৈকালে অল্প জল মিশিয়ে খেতে হবে; এর দ্বারা ঐ উপদ্রবটা চ'লে যাবে।

আসল কথা হ'লো—যাঁদের সম্যক পরিপাক না হয় আর দাস্ত অপরিষ্কার, তাঁদের এ অসুবিধেটা থাকবেই; তবে যখন খাওয়া যাবে, তখন কয়েকদিন কম থাকবে।

৫। **প্লীহা রোগের উপক্রমে ঃ—** এর লক্ষণ হবে—বৈকালে চোখমুখ জ্বালা, নাক-মুখ দিয়ে গরম নিশ্বাস পড়া, মুখ-বিস্বাদ, লবণাস্বাদের জিনিসে অথবা ভাজা জিনিসে তার রুচি বেশী; এক্ষেত্রে বুঝতে হবে—রক্তবহ স্রোত দূষিত হ'য়েছে এবং তার যে আধার প্লীহা সেটা বিকারগ্রস্ত; তাই উচ্ছে পাতার রস ২ চা-চামচ একটু গরম ক'রে সিকি কাপ জলে মিশিয়ে দিনে দুই-তিন বার খেতে হবে। এইভাবে ৫/৬ দিন খেলে এই অসুবিধেগুলি আস্তে আস্তে চ'লে যাবে।

৬। **বাতে ঃ—** (যে বাত পিত্ত-শ্লেষ্মাজনিত) এই বাতের লক্ষণ হ'লো—অমাবস্যা বা পূর্ণিমা বা একাদশী এলে এঁদের হাতে, পায়ে, কোমরে বা সর্বশরীরে যন্ত্রণা, বেদনা-নিবারক কোন ট্যাব্‌লেট খেয়ে এঁদের চলাফেরা ক'রতে হ'চ্ছে, এঁদের শীতকাল এলে তো আর কথাই নেই, তবে খুব গরম প'ড়লে ব্যথা-বেদনা ও যন্ত্রণা একটু কম। এই যে ক্ষেত্র—সেখানে উচ্ছে পাতার রস ৩ চা-চামচ একটু গরম ক'রে অল্প জল মিশিয়ে দু'বেলা খেতে হবে; এর দ্বারা রসবহ ও রক্তবহ দুই স্রোতই শুদ্ধ হ'য়ে সব

অসুবিধেগুলির উপশম হবে।

৭। **ভিটামিনের অভাব হ'লে:—** পাকা উচ্ছের বীজকে অর্থাৎ পুষ্ট বীজকে শুকিয়ে রাখুন। প্রত্যহ তিন/চার গ্রাম ক'রে উচ্ছে বীজ মাখনের মত ক'রে বেটে তাইতে ৭/৮ চা-চামচ জল মিশিয়ে চা-ছে'কা ছাঁকনিতে ছে'কে নিয়ে সেই জলটা প্রত্যহ একবার ক'রে কিছুদিন খেয়ে দেখুন। এটা সে যুগের ভিটামিন্ বি কম্প্লেক্স।

৮। **অরুচি রোগে:—** বৈদ্যকের যুক্তিতে বলে যে পিত্ত-শ্লেষ্মার বিকার না হ'লে অরুচি হয় না। এক্ষেত্রে এক চা-চামচ ক'রে রস সকালে ও বৈকালে প্রত্যহ দু'বার খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ দোষটারও সংশোধন হবে এবং অরুচিও চ'লে যাবে।

৯। **রক্তপিত্তে:—** এই রোগের লক্ষণ সম্পর্কে 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩২১ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে, তবে একটু ব'লে রাখি—যাঁদের জ্বালা-যন্ত্রণা হয় না, দাঁতের সংগে টাট্‌কা রক্ত পড়ে অথচ অর্শও নেই, সেক্ষেত্রে রক্তপিত্তও যে আছে এটা নিশ্চিত ক'রে বলা যেতে পারে; এক্ষেত্রে উচ্ছের ফুল ৮/১০টি ক'রে প্রত্যহ তিনবার ক'রে চিবিয়ে খেতে হবে।

তবে প্রাচীন বৈদ্য যাঁরা, তাঁরা ব'লে গেছেন, উচ্ছে ফুলের রস আধ চা-চামচ ক'রে খেতে।

১০। **অগ্নিমান্দ্যে:—** হয়তো সাধারণে মনে ক'রবেন—একে তার অগ্নিমান্দ্য—তাইতে আবার উচ্ছে! এক্ষেত্রে কিন্তু পাতার রস ব্যবহার্য নয়; উচ্ছের বীজ বাদ দিয়ে উপরের পুরু শাঁসটাকে ছে'চে রস করার পর, একটু গরম ক'রে প্রত্যহ সকালে ও বৈকালের দিকে খেতে হবে; এর দ্বারা ঐ অগ্নিমান্দ্য চলে যাবে।

১১। **এলার্জিতে:—** এই শব্দটি কিন্তু বিদেশী, এটা এখন সার্বজনিক কথ্য ভাষা; তবে বৈদ্যকের নথিতে এটা কিন্তু পিত্ত-শ্লেষ্মাজনিত ব্যাধি। আপনার প্রকৃতিই কিন্তু এই দোষে ভরপুর, তার উপর যখন এমন কোন দ্রব্য খেয়েছেন—যেটা পিত্ত-শ্লেষ্মার অনুকূল অর্থাৎ সমানধর্মী হ'য়ে গেল, তখন সে বেড়ে গিয়ে অভ্যন্তরে ও বাইরে শোথ সৃষ্টি ক'রলো—তখনই হ'লো এলার্জি। মনে করুন আপনার ডিমে এলার্জি, কেন হ'লো? এখানেও সেই পিত্তকারক (প্রোটিন) দ্রব্যটি সমধর্মী পিত্তের সামিল হ'য়ে সেও বেড়ে গিয়ে শোথ সৃষ্টি ক'রলো—এই যে ক্ষেত্র এখানে।

আবার ধরুন কড়াই-এর ডালে আপনার এলার্জি, সেখানেও সেই কফধর্মী এই ডালটি খেলে কফের বৃদ্ধির কারণ হ'য়েও অসমতা সৃষ্টি হ'য়ে শোথ হ'য়ে গেল।

এরও একটা অন্তর্নিহিত রহস্য আছে। যখন থেকে শুক্রবহ স্রোত শরীরে সক্রিয় হ'তে থাকবে, তখন থেকেই এই রোগ ব্যক্ত হ'তে থাকবে। সুতরাং খুব ছোট বয়সে এই রোগ বড় একটা হ'তে দেখা যায় না, এক্ষেত্রের ওষুধ হ'লো—উচ্ছের রস ২ চা-চামচ ক'রে দু'বেলা খেতে হবে। তবে যদি মনে করেন যে উচ্ছের রস যখন খাচ্ছি, তখন যথেচ্ছাচার ক'রে যাবো—এ মানসিকতাটাও ঠিক নয়, কারণ মানুষের প্রকৃতিগত দোষ কি একেবারে সরিয়ে দেওয়া যায়? তবে হঠাৎ হঠাৎ হ'য়ে যেভাবে আপনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে প'ড়তেন, সেটা হবে না।

১২। **অন্তঃপ্রবিষ্ট জরায়ু পথে:—** যে সব নারীর সন্তান বহির্গমনের পথটি অন্তঃপ্রবিষ্ট, তাঁদের আভ্যন্তরিক ক্ষরণ সামান্যই আসে, এই হেতু তাঁদের বিবর থাকে শুষ্ক; সেই হেতু সম্ভোগের ক্ষেত্রে উভয়েই অসুখী। এক্ষেত্রে উচ্ছের লতা ও মূল বেটে

তিল তেলের সংগে পাক ক'রে সেই তেলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে পিচু ধারণ ক'রতে হবে; যাকে Plugging বলে। এই তেল তৈরী ক'রতে হ'লে তেলের ৪ গুণ উচ্ছের লতা-পাতা ও মূল নিতে হবে এবং সেটাকে বেটে রস ক'রে ছে'কে ঐ তেলের সংগে পাক ক'রতে হবে। তবে এটা ঠিক যে, কোন অভিজ্ঞ বৈদ্যের তত্ত্বাবধানে এই তেলটা তৈরী হ'লে ভাল হয়।

আর একটা কথাও এখানে জানিয়ে রাখি—রমণীকুলের বয়স বেশী হওয়ার সংগে সংগে এ অসুবিধেটা আসতে থাকে, এই জন্যে অভ্যন্তরে খুবই চুলকোতে থাকে; সেক্ষেত্রেও এই তেলটা অভ্যন্তরে লাগানোর ব্যবস্থা ক'রলে ঐ অসুবিধেটাও চ'লে যাবে।

১৩। **দূষিত ক্ষতেঃ—** যে ঘায়ে রস গড়ায়, কিছুতেই শুকোতে চাইছে না, সেক্ষেত্রে উচ্ছের গাছ (মূল সমেত লতাপাতা) শুকিয়ে নিয়ে চূর্ণ ক'রে ঘায়ের উপর ছিটিয়ে দিলে এবং গাছসিদ্ধ জল দিয়ে ধুয়ে দিলে কয়েকদিনের মধ্যে ওটা শুকিয়ে যাবে। তবে পর পর কয়েকদিন এটা ক'রতে হবে।

১৪। **আধকপালে মাথাব্যথায়ঃ—** রোগীকে ম্যাজিক দেখাতেন প্রাচীন বৈদ্যরা। রোগী দেখতে গিয়ে একটু উচ্ছের পাতা জোগাড় ক'রে আনতে ব'লতেন, তারপর সেই পাতাটা র'গড়ে একটা ন্যাকড়ায় পুরে যেদিকে যন্ত্রণা হ'চ্ছে সেই নাকে রসটার ফোঁটা ফেলে টানতে ব'লতেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঐ ব্যথা জল হ'য়ে যাবে; এটা দেখিয়ে দিতেন।

এখন ব'সে ভাবছি—আলোচনা তো ক'রলাম কিন্তু "মধুরেণ সমাপয়েৎ" কথাটা লিখতে একটু কেমন বেধে যাচ্ছে।

সেই যে গোড়া থেকে উচ্ছে নিয়ে ব'সেছি—সেই উচ্ছের বীচি পুতেই উঠতে হ'চ্ছে; তবে একটা কথা ব'লে যাই—দেশী মগজটাকে এত খেলো চোখে না দেখে ধৈর্যের সংগে অনুসন্ধান ক'রে দেখতে দোষই বা কি যে, এইসব মগজে কিছু ছিল কিনা?

আমাদের বেদের খনিতে যেন হীরে-চুনী-পান্নার জড়টা প'ড়ে আছে, তাকে সান্-পালিশে ধ'রে কেটে বের ক'রে নিলে সেইটাই যে পৃথিবীর বাজারে স্থান পাবে না এটাই বা ভাবি কি ক'রে? তবে সে পাথর কাটার ওস্তাদের বংশ ক্রমশঃ লোপ পেতে ব'সেছে। ভবিষ্যতে হয়তো বা এটা মহামানবের পদচিহ্নের মত হ'য়ে থাকবে এই পৃথিবীতে।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Protein, carbohydrate, carotene (as vitamin-A), theamine, nicotinic acid, riboflavin and ascorbic acid. (b) Free amino acids, viz., aspartic acid, serine, glutamic acid, threonine, alanine, γ-aminobutyric acid and pipecolic acid. (c) The green fruit contains luteodin. (d) Alkaloid viz., momoridicine. (e) Aromatic volatile oil.

যব

যব লিখতে ব'সে ভাবছি—এই শব্দটাই তো আমাদের সুপ্রাচীন শ্রুতির (বেদের) আমলের। তাকে উপলক্ষ্য ক'রেই কি যবদ্বীপ নাম রাখা, আর সেটির আয়তন কি যবের মত? তাই তার এই নাম?

আচ্ছা তা'হলে যবন শব্দটাও কি এই যবকে সামনে রেখে? তা যদি হবে তাহ'লে আমরা যা ভেবে ব'সে আছি সেটা ভুল, কারণ বহিরাগত যাঁরা তাঁদেরই তো যবন বলা হ'তো; এর প্রমাণ তো ইতিহাস। এই হিসেবে ব'লছি—গ্রীকদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ খৃষ্টপূর্ব থেকে, সেই দেশের লোককেই তো আমরা যবন আখ্যা দিয়েছি, সুতরাং এইটাই ধ'রে নেওয়া হ'য়েছে যে, যাঁরা বহিরাগত তাঁরাই যবন।

পণ্ডিতগণ বলেন—এ'দের আহার্য দ্রব্য যব-প্রধান ছিল বলেই এ'দের যবন আখ্যা দেওয়া, সুতরাং আরবীয় যাঁরা তাঁরাই যে যবন এটা হ'তে পারে না। এর দ্বারা তাঁরা যে ম্লেচ্ছ—এ আখ্যাও প্রমাণ করা যায় না।

এটা পরবর্তীকালে সনাতনী মতাবলম্বীগণ এই আখ্যা দিয়েছেন মনে হয় নাকি?

এই যব থেকে আর একটি শব্দ জন্ম নিয়েছে "যবনিকা", এই বহির্ভারতীয়দের রঙ্গালয়ের কোন পরিচ্ছেদের অভিনয়ের শেষ অঙ্কের সমাপ্তি ঘোষণা করার বাস্তব ইঙ্গিতের পদ্ধতিকে বলা হ'য়ে থাকে "যবনিকা পতন"। অবশ্য এই পদ্ধতির যে প্রাচীন নাম ছিল না তা নয়, তার নাম ছিল "তিরস্করিণী"। তারপর বর্তমানেও কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেটার ছেদ পড়ে গেলেই, আমরা মন্তব্য ক'রে থাকি—যাক, এই ঘটনার "যবনিকা পতন" হ'লো।

তাছাড়া এই যবাকার রেখাকে নিয়ে সামুদ্রিক জ্যোতিষীও কম মাথা ঘামাননি; অবশ্য এ চিহ্নটা থাকে হাতের বুড়ো আঙ্গুলের মাঝখানে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে

থাকে করতলেও; এটা নাকি ধন ও পুত্র প্রাপ্তি কেমন হবে তার ইঙ্গিত বহন করে। এ তথ্যটা বৃহৎ সংহিতার ৫৮ অধ্যায়ের।

এইবার শস্য যবকে উপলক্ষ্য ক'রে লোকপ্রবাদ বলি— "ছাগল দিয়ে আবার যব মাড়ানো যায়?" আসলে কথাটা হ'লো ধান, মুগ, মাষকড়াইয়ের বোঁটা, খোসা এত হালকা যে সামান্য চাপে তা ছেড়ে যায়; কিন্তু যবের বেলায় বিপরীত, অল্প চাপে তো বোঁটা খোসা ছাড়েই না বরং সেগুলি আরও জড়িয়ে যায়, তাই এই লোকপ্রবাদ।
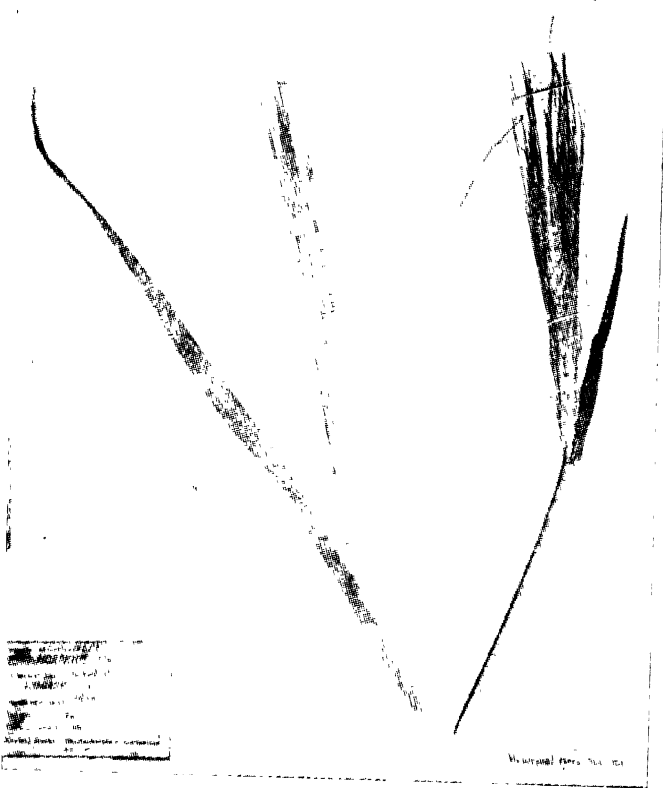
এই যব সম্পর্কে আর একটি তথ্য জানাই—সামাজিক জীবনেও সনাতনপন্থীগণের অনুশাসনরূপ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন কি ক'রে তাই বলি—

আমরা দেখছি—চৈত্র সংক্রান্তির দিনে ব্রাহ্মণকে একটি মাটির কলসী, একখানি তালপাতার পাখা, একখানি কুশাসন বা কম্বলাসন, কিছু ফল, যবের ছাতু ও আখের গুড় বা চিনি দান করাটা যে কোনও সৎ গৃহীর অবশ্যকর্তব্য। আচ্ছা, এক সরা চালও

দেওয়া যেতো, তা না দিয়ে যবের ছাতুকে কেন দেওয়া হ'লো? তাহ'লে এটা কি বৈদিক সংস্কৃতির স্মরণের প্রাধান্য দিয়ে? না আর কিছু? এটা এখন ব্রত পার্বণে দাঁড়িয়েছে মাত্র।

এইবার ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আচার-অনুষ্ঠানের কথা বলি—এই যব ভিন্ন বিবাহাদি কোন সংস্কার কার্য এবং শ্রাদ্ধাদি কোন ঔর্ধ্বদৈহিক কার্যই হয় না, যদিও এখানে তিলের প্রাধান্য বেশী, তথাপি যবেরও উপযোগিতা আছে। এ ভিন্ন কালান্তরে দেব-দেবীর অর্চনাতেও একটা রীতি এসে গিয়েছে, সেখানে যব একটি অপরিহার্য উপচার রূপে গণ্য হ'য়েছে।

এইসব অনুশীলন দেখে আমাদের ঔৎসুক্য জাগে—এর মূল উৎস কত দূরে এবং আদি বক্তব্যটা তার কি ছিল, তাই এগিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে—যবকে বাদ দিয়ে যেমন কোন বেদেই বৈদিক আর্যদের খাদ্যই নেই, তেমনি লোকদেবতার ক্ষেত্রেও। গম, ধান্য তো পরবর্তীকালের।

ঋক্‌বেদের সব শাখাতেই দেখা যাচ্ছে— "পচ্যতে যবঃ" ১।১৩৫।৮ ও ৮।২।৩ সূক্তের বক্তব্যই যজু, অথর্ববেদের স্থানে স্থানে এমন-কি অমন যে গীত সংগ্রহের বেদ সামবেদ, তারও অনেক গানে পাওয়া যায় 'যবোৎসব' 'যব প্রশস্তি' যবহোলিকা নিয়ে। আর যজুর্বেদের যে কোন শাখাতেই যবের কথা, যব তাঁদের এত প্রিয় যে, দেবতাদের চোখের উপর যে ভ্রূগুলির লোম—সেগুলি যে যবের শূকের মত তাও বলা আছে— "যবা ন বর্হির্ভুবি কেশরাণি" (যজুর্বেদ ১৯।৯১); আবার যব এবং গোধূম ও ধান যে তাঁদের প্রিয়তম খাদ্য এবং যবের ছাতুও (সক্তুও) যে সর্বাপেক্ষা বলকর খাদ্য— তার উল্লেখ যজুর্বেদে ১৯/২০-২১ সূক্তে দেখা যায়। সেখানে বলা হ'য়েছে—

> ধানানাং রূপং কুবলং পরীবাপস্য গোধূমাঃ।
> সক্তূনাং রূপং বদরং উপবাকাঃ করম্ভস্য॥

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> কোমলং বদরীফলং ইব রূপং গোধূমা উপবাকাঃ যবাঃ তেষাং সক্তূনাং রূপম্।

আরও একটি সূক্ত ঐখানেই—

> ধানাঃ করম্ভঃ সক্তবঃ যবাঃ পয়ো দধি।
> সোমস্য রূপং হবিষ আমিক্ষা বাজিনং মধু॥

উভয় সূক্তের বক্তব্যের অনুবাদ হ'লো—

> আঃ—আজ কি চমৎকার আয়োজন—উষ্ণে দুগ্ধে দধি ক্ষিপ্তে ঘনভাগ আমিক্ষা। ভ্রষ্টধান্যং ধানাঃ উদমন্থঃ সক্তবঃ। পয়োদধ্নী সোমস্য।

অর্থাৎ সুরা এবং গরম দুধে দই ফেলে তার আমিক্ষা অর্থাৎ ছানা, গরম দুধে ঘৃত

সহ অত উৎকৃষ্ট ধানের খৈ, দই সহ যবের ছাতু, সৌত্রামণী যজ্ঞের বিপুল আয়োজনে পুরোডাশ প্রস্তুত করা হোক। উপরিউক্ত সূক্তগুলিতে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি—যবের চূর্ণ, যবের ছাতু, যবের লপ্‌সি (পরিচেরই মত) আমাদের আর্য ভারতের সুপথ্য, সুখাদ্য, সুপেয় এবং যবের সঙ্গে উৎকৃষ্ট দ্রব্য সংযোগে যবজাত সুরাও ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য আহার্য ও পানীয়। তবে একথা ঠিক যে, যবের ভৈষজ্যশক্তি কতখানি আছে অর্থাৎ রোগবারণীশক্তি তাতে কতখানি নিহিত আছে, সে তথ্য আয়ুর্বেদ সংহিতা না দেখলে বোঝা যায় না; এই নিবন্ধে সেই তথ্যকে মুখ্য উপজীব্য ক'রে কতখানি অগ্রসর হওয়া যায় সে বিষয়ে একান্তভাবেই তা অনুশীলনযোগ্য।

বৈদ্যকের নথি

প্রথমেই সুশ্রুত সংহিতায় যব বিষয়ে যেসব অভিনিবেশের উল্লেখ আছে, তার অনুসরণ ক'রলে দেখা যায়—এই সংহিতাটির সূত্রস্থানের ২১ অধ্যায় থেকেই যব সম্পর্কে নানান্ গবেষণা—যেমন ২১ অধ্যায়ে বলা হ'য়েছে যব নিদ্রাকারক; ৩৬ অধ্যায়ে মদ্যযোনি এবং বাতরোগে প্রলেপ, ও ৩৮ অধ্যায়ে যবকে বাত সংশমন ভেষজ, তাছাড়া ৪৩ অধ্যায়ে বমনপীড়িত ব্যক্তির সুপেয় এবং যব যে বলাধান করে তাও বলা হ'য়েছে; তারপর ৪৫ অধ্যায়ে যবকে উৎকৃষ্ট মদ্যযোনি—তার বিস্তৃত তথ্যও দেওয়া হ'য়েছে।

এ ভিন্ন অন্নপানীয়বর্গে যব শস্যটি মানবদেহের পক্ষে ঐকান্তিক আহার্য এবং পথ্য, তারও বিস্তৃত বর্ণনা যে যুক্তিভিত্তিক—সেটাও সন্নিবেশিত হ'য়েছে। এছাড়া চিকিৎসাস্থানের পঞ্চম অধ্যায়ে মহা বাতব্যাধিতেও যবের ভৈষজ্যবিধান এবং পথ্যের যোগ।

তবে সুশ্রুত সংহিতার যব আর চরক সংহিতার যব নিয়ে একটু গোলমাল বাধে। যেমন সুশ্রুতে বলা হ'য়েছে, যব লঘু গুণ আর চরক সংহিতার উক্তি হ'লো, যবের গুণ গুরু। এখানে আয়ুর্বেদিক পদার্থতত্ত্ববিদ্‌দের অভিমত সুশ্রুতের পাঠটিতে লঘু শব্দটির বক্তব্যের বিরোধ মেটাতে একটি পথ, সেটি হ'লো—চরকের (২৭ অঃ/২৫ শেলাক) যে উক্তি—রুক্ষঃ শীতোহগুরুঃ স্বাদু বহু বাত শকৃদ্‌যবঃ। সেটিতে অ-গুরু অর্থাৎ লঘু এই যুক্তি স্থাপন করলে যব লঘুই হয়। কারণ পদার্থতত্ত্ব বিবেচনায় সুশ্রুতের বক্তব্যও প্রথম ও প্রাচীন।

চরক সংহিতায় যবকে (সূত্রস্থান ৩য় অধ্যায়) এত বেশী বার উল্লেখিত করা হয়েছে যে, বলা চলে সেই বেদবিদ্যায় যব যেমন আহার্য, পানীয় পথ্য তেমনি চরকেও; কারণ তৃতীয় অধ্যায় সূত্রস্থান থেকে কল্পস্থান পর্যন্ত যব যে অতি প্রয়োজনীয়—তা প্রায়ই উল্লেখিত।

পরিচিতি

বর্ষজীবী তৃণজাতীয় উদ্ভিদ, প্রধানভাবে এর চাষ হয় উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে; যেসব শস্য উৎপন্ন হয়—তার শতকরা ৭০/৭৫ ভাগই হয় এই তিনটি প্রদেশে, আর বাকী ২৫/৩০ ভাগ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হ'য়ে থাকে।

এই যব সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবরে ক্ষেতে ছড়ানো হয়—যেমন ক'রে মুগ, মসুর, গম, ছোলার চাষ হয়। গাছ বেরিয়ে একটু বড় হ'লে আউস ধানের ক্ষেতের মত দেখায়, পাতাও ধানগাছের মত, তবে গাছটি গোল নলাকার, তার পর্ব থেকেই আখের

মত ঐ নলকে আবৃত ক'রে কয়েক ইঞ্চি উঠেই ধানের মত পাতা বেরিয়ে আসে। গাছ ২/৩ ফুট পর্যন্ত উঁচু হ'তে দেখা যায়। পুষ্পদণ্ড সরু লম্বা শক্ত লোমাবৃত; ঐ নলাকার গাছটির অগ্রভাগেই যবের শীষ হয়, তার গায়ের যবগুলি যেন সাজানো থাকে, আর প্রতি যবের মাথায় একটি ক'রে সুচের মত শুঁয়া, যার জন্য যবগুলি শস্যের অবস্থায় এলে অর্থাৎ বীজ হ'য়ে গেলে গরু-ছাগলে আর বড় একটা খায় না। একটা ধানের চারা থেকে চারিদিকে বোয়া বেরিয়ে যেমন ঝাড়ী হয়, যবের এতটা না হ'লেও কয়েকটা বোয়া বেরিয়ে একটু ঝাড়ী হয়; মাঘ মাস প'ড়লেই যব গাছে শীষ বেরোয়, চৈত্রে অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিলে পেকে যায়, তারপর ক্ষেতে গাছগুলি যখন শুকিয়ে যায়, তখনই একে কেটে নেওয়া হয়, তারপর গরু ঘুরিয়ে একে মাড়াই ক'রে যব, আর সুচের মত শুঁয়াকে ঝেড়ে পৃথক ক'রে নেওয়া হয়; আর এই শুকনো গাছগুলি জ্বালানী হয়।

এই গাছটির বোটানিকাল্ নাম Hordeum vulgare Linn., ফ্যামিলি **Gramineae.**

পৃথিবীর যে প্রদেশে অংশবিশেষের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ অর্থাৎ যেখানে শীত ও গ্রীষ্ম সমানভাবে অনুভূত হয়—সেই অঞ্চলেই এর চাষ ভাল হয়। অবশ্য এর সঙ্গে সমভাবে মাটি ও জলের আনুকূল্য থাকার প্রয়োজন হয়। সেটা পরিপূর্ণভাবে বর্তমান উত্তর ভারতে।

ঔষধার্থে ব্যবহার্য অংশ—শস্য ও যবের শুঁয়া (যবশূক)।

কোথায় কিভাবে এটাকে প্রয়োগ করা হয়েছে

যবের কথা ব'লতে গেলে, প্রথমে দুটি কথা ব'লতে হয়— (১) পুরাতন হ'লে হীনবীর্য হয়, (২) এটি কাজ করে রসবহ স্রোতের উপর; সুতরাং রসবহ স্রোত বিকৃত হ'লে যে যে রোগ আসে, সেইসব ক্ষেত্রেই এটি কার্যকর।

১। **প্রাকৃতিক জ্বরেঃ—** অর্থাৎ বর্ষাকালে জল ঘেঁটে জ্বর, অথবা শরতে রৌদ্র লাগিয়ে বা পিত্তপ্রধান দ্রব্য খেয়ে জ্বর, কিংবা হেমন্তকালে ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর; এইসব ক্ষেত্রের জ্বরে ঋতু অনুযায়ী যেসব লক্ষণ দেখা যায়, যেমন শরৎকালে পিত্তবমি, হেমন্তে কফের বিকারে গলা ব্যথা, এই রকম ধরনের ক্ষেত্রে যবকে আধ কুটা (অর্ধ-কুট্টিত) ক'রে, খোসাটা যতদূর সম্ভব ঝেড়ে, খোসা বাদ দিয়ে রান্না করার পর, ছেঁকে আধ ঘণ্টা অন্তর খেতে হবে। পরিমাণটা হবে ৫০ গ্রাম আন্দাজ।

২। **স্থৌল্য রোগেঃ—** এই রোগ নির্বাচনে অনেক সময় চিকিৎসকের বিভ্রান্তি ঘটে মেদোরোগের সঙ্গে। স্থৌল্য রোগ আর মেদোরোগ কিন্তু এক নয়। মেদো রোগে মেদোবহ স্রোতটা বিকৃত হ'য়ে সর্বশরীরটাই মেদঃ স্ফীত হয়; এ'দের বিশেষ লক্ষণ হ'লো—প্রচণ্ড ক্ষিধে (ক্ষুধা), এবং অল্পাহারে তারা সন্তুষ্ট নয়। আর স্থৌল্য রোগে কিন্তু স্থান বিশেষের স্ফীতি ঘটে, যেমন পুরুষের পাছা, রমণীর নিতম্ব ও জঘন (পাছা ও তলপেট), এছাড়া স্তনেরও স্থূলতা আসে এবং অধর ও ওষ্ঠ (উপর ও নিচের ঠোঁট) পুরু হয় আর আঙুলগুলোও থ্যাবড়া হ'য়ে যায়।

এই স্থৌল্য রোগের ক্ষেত্রে যব-প্রধান আহার্য ও পানীয়ের সর্বদা অভ্যাস হিতকর।

৩। **বহুমূত্রেঃ—** এটাও একটা প্রমেহ রোগের ধারা। যাঁদের রসবহ স্রোত বিকার-

গ্রস্ত, তাঁরাই বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হ'য়ে থাকেন।

ছোটবেলায় যারা বিছানায় প্রস্রাব করে সেটাও বহুমূত্র, আবার বৃদ্ধবয়সেও যাঁরা বিছানায় প্রস্রাব ক'রে ফেলেন—অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁদেরও বহুমূত্র; সাধারণতঃ রোগা লোকগুলিই এই রোগে আক্রান্ত হ'তে দেখা যায়। এটা কিন্তু সোমরোগ নয়।

এই রোগের প্রথম কর্তব্য হ'লো—অন্ন বর্জন করা, আর যবের আটার রুটি বা যব-প্রধান দ্রব্য খেতে দেওয়া। এর দ্বারা ঐ রোগটা উপশম হবে।

৪। **প্রমেহ রোগেঃ—** এই রোগ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলি—এ রোগে যাঁরা আক্রান্ত হ'য়ে থাকেন, তাঁদের বিশেষ উপসর্গ হ'লো—গায়ের ঘাম চটচটে হবে এবং সেটাতে একটা গন্ধও থাকবে, আর একটু কোঁথ দিলেই লালার মত কোন কিছুর ক্ষরণ হবে অথবা প্রস্রাবের পূর্বে বা পরে একটু লালা নিঃসরণ হ'য়ে থাকে। এক্ষেত্রে নতুন বা পুরনো কোন চালেরই ভাত খাওয়া উচিত নয়, যবের আটার রুটি বিশেষ উপকারী; যদি শুধু যবের আটায় রুটি না করা যায়—অর্ধেকটা গমের আটা মিশিয়ে নিয়ে রুটি ক'রবেন অথবা খোসা ছাড়ানো যবকে (যাকে আমরা পার্ল বার্লি বলি) আধ কুটা ক'রে ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না ক'রে খাওয়া যায়। আর পানীয় হিসেবে যব সিদ্ধ জল বা বার্লি'র জল খাওয়া উচিত।

৫। **কফের আধিক্যে বা প্রবল্যেঃ—** এক্ষেত্রে সাধারণতঃ লক্ষণ হবে—মাথা ভার, বুকে চাপা সর্দি, গলা ব'সে গেছে বা সর্দিতে বুক ঘড়্‌ঘড়্‌ ক'রছে; এইসব লক্ষণ উপস্থিত হ'লে যবকে আধ কুটা (অর্ধ কুট্টিত) ক'রে রাত্রে জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে, পরের দিন সকালে রগড়ালে তার খোসা উঠে যাবে, তারপর তাকে রান্না ক'রে খেতে দিতে হবে। এইভাবে দুই/একদিন পথ্য দিলে কফের আধিক্য চ'লে যাবে।

৬। **মলক্ষয় হ'লেঃ—** অনেক সময় দেখা যায়, একবার এমন দমকা ভেদ হ'লো যে, চোখের কোল ব'সে গেল, হাত পায়ের বলও ক'মে গেল। এক্ষেত্রে আধ কুটা যবকে সিদ্ধ ক'রে নতুন চালের ফেনের (মাড়ের) মত গাঢ় হ'লে, সেটাকে ছে'কে অল্প অল্প ক'রে খেতে দিতে হবে।

৭। **পিপাসায়ঃ—** অনেকের ধারণা পিপাসা একটি রোগই নয়, কিন্তু তা নয়—বায়ুবৃদ্ধিজনিত রসবহ স্রোত শুষ্কতাপ্রাপ্ত হয়, আর সেই বায়ুটা বৃদ্ধি হয় অতিরিক্ত শ্রমে, রাত্রি জাগরণে, শুক্রক্ষয় হ'লে এবং ভয়ার্ত হ'লে।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, খাদ্য হিসেবে যেটাকে গ্রহণ ক'রছি—সেটার সঙ্গেই তো জল আছে, তাহ'লে পিপাসা হবে কেন? তার উত্তরে বলা যায়—পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য গিয়ে দুটি খাতে প্রবাহিত হয়, একটিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত জলের স্রোত প্রবাহিত হয়—সেইটাই রসবহ স্রোতের অংশবিশেষ; উপরিউক্ত কারণে ঐ স্রোতধারাটি সঙ্কুচিত হ'য়ে যায়, তখনই উপস্থিত হয় শোষ বা পিপাসা; আর কোন গুরুপাক দ্রব্য খেয়ে হঠাৎ যে পিপাসা পায়—সেক্ষেত্রে দেখা যায়, আপনার প্রয়োজনানুপাতে কম জলই খাওয়া হ'য়েছে, তাই এই পিপাসা।

এক্ষেত্রেও যবকে কুটে, ঝেড়ে নিয়ে, তাকে রান্না ক'রে ঘন মাড়ী করতে হবে, তারপর তাকে ছে'কে নিয়ে খেতে দিতে হবে। কিংবা এসব করা সম্ভব না হ'লে বার্লি রান্না ক'রে খেতে দিলেও চ'লবে; অথবা যবের ছাতু জলে গুলে অল্প লবণ মিশিয়ে খেলেও উপকার হবে। মনে থাকে যেন—এর সঙ্গে চিনি আর দই মিশিয়ে সরবত ক'রে খাবেন না, এটাতে পিপাসা আরও বেড়ে যাবে।

৮। **অপত্য লাভের বাধায়ঃ—** সন্তান হ'চ্ছে না, বাধা তার মেদোবৃদ্ধি, সেটা নারী-পুরুষ উভয়ের যেকোন একজনের এ দোষটা থাকলে হ'তে পারে। কারণ এই মেদ (চর্বি) বেড়ে যাওয়াতে শুক্রবহ স্রোতে কার্যকারিতার ব্যাঘাত ঘটে, তাই সন্তান আসছে না; এক্ষেত্রে খাদ্য এবং পানীয় এই দুটোই যবপ্রধান ক'রতে হবে। এটা দুই-একদিনের জন্য ক'রলে চ'লবে না, কয়েক মাস চালাতে হবে, তবেই ঐ মেদের বৃদ্ধি (Excess) যেটা হ'য়েছে—সেটা ক'মে যাবে। তখন সন্তান লাভের আশা করা যাবে।

৯। **দাহ রোগেঃ—** এই রোগটার সৃষ্টি হয় রক্তবহ স্রোত দূষিত হ'লে, আর সেটা দূষিত হয় পানদোষে, অধিক পিত্ত বৃদ্ধিকর দ্রব্য সেবনে, রাত্রি জাগরণে, এবং অজীর্ণ অবস্থায় ভোজনে রক্তবহ স্রোত উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়, তারপর তার উষ্ণতা রক্তবহ স্রোতকে উত্তপ্ত ক'রে ত্বকের (চামড়ার) নিচে যেখানে লসিকা থাকে, সেখানে দাহ সৃষ্টি হয়।

এইবার রক্তবহ স্রোতের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র কোথায় জানাই—এটির স্থান হ'লো—আমাশয়, অগ্ন্যাশয়, পক্কাশয়, ফুসফুস, যকৃৎ (লিভার), প্লীহা, উণ্ডুক (যাকে বর্তমানে বলা হয় এপেন্ডিক্স্ (Appendix) ও মূত্রাশয়।

এই দাহ রোগে যবকে কুটে, ঝেড়ে, সিদ্ধ করে, ছে'কে নিয়ে খাওয়ালে ক'মে যায়।

১০। **অতিসারেঃ—** যবের ছাতু বার্লি'র মত রান্না ক'রে খেতে দিলে ওটা ভাল হয়।

১১। **শ্বাস রোগেঃ—** বিকৃত বায়ু (আহার-বিহারের দোষে) রসবহ স্রোতকে দূষিত ক'রে শ্বাসরোগ সৃষ্টি করে। এ'দের অন্নগ্রহণ অপেক্ষা অন্নবর্জনই সমীচীন, সেইজন্যই শ্বাসরোগে যবের আটার রুটি, যবের ছাতু গুলে খাওয়া এবং পানীয় হিসেবে যবসিদ্ধ জল অথবা বার্লি রান্না ক'রে খাওয়া।

১২। **কাসরোগেঃ—** বারো মাসই কাসি থাকে, অথচ ভ্যাড়্ ভ্যাড়্ ক'রে কফ বেরুচ্ছে তাও নয়, এ সম্বন্ধে একটু সংক্ষেপে জানাই।

আহার-বিহারের দোষে প্রাণবায়ু আর উদানবায়ুতে নিত্য সংঘাত হয় ব'লেই এই কাসি হয়। এক্ষেত্রে পাতলা ক'রে বার্লি রান্না ক'রে খাওয়া অথবা আধ কুটা যব সিদ্ধ ক'রে, ছে'কে সেই জল খাওয়া। এদের কিন্তু কখনও ঠাণ্ডা জল খাওয়া উচিত নয়।

১৩। **উদর রোগেঃ—** যদিও উদর রোগের পরিণামেও উদরী রোগ হয়, তাই ব'লে উদর ও উদরী রোগ এক নয়; এমন ভুল ধারণা কিন্তু অনেকের আছে। অগ্নিমান্দ্যেরই পরিণত অবস্থা উদরী রোগ, তবে এটা প্রচলিত সাধারণ নাম, আয়ুর্বেদোক্ত নাম নয়।

এই রোগে অর্থাৎ উদরের যে কোন পীড়ায় অর্ধকুট্টিত যবকে ঝেড়ে, রান্না ক'রে, ছে'কে, সেইটা বার্লি'র মত খেলে যেকোন প্রকার উদর রোগ সেরে যায়। তবে যবও খাবো আর তেলেভাজাও খাবো—তাহ'লে কি আর উদর রোগ সারবে?

১৪। **প্রচণ্ড অজীর্ণ রোগেঃ—** যবের খোসা ও যব শূক অর্থাৎ সূচের মত শ'ুয়োগুলি পুড়িয়ে ছাই ক'রে সেই ছাইটাকে ৭/৮ গুণ জলে গুলে তারপর তাকে ফিল্টার ক'রে স্বচ্ছ জলটাকে পাক ক'রে লবণাকার ক'রে নিতে হবে। সেই লবণবৎ দ্রব্যটিকে বলা হয় যবক্ষার। যে যবক্ষারের কথা ভৈষজ্যবিধানে গ্রহণ করা হ'য়েছে। এটির আর একটি নাম "যাবশূকজ"।

বর্তমানে যবক্ষার নামে যে দ্রব্যটি বাজারে পাওয়া যায়—সেটি নাইট্রিক এসিডের কিট্ট অর্থাৎ এসিড্ তৈরী হ'য়ে যাওয়ার পর কলসীর তলে যে মলাংশ প'ড়ে থাকে।

যা হোক, উপরিউক্ত যাবশূকেজ আধ গ্রাম মাত্রায় জলসহ খেলে অজীর্ণ রোগ উপশমিত হবে।

আমার বক্তব্য এই যে, বর্তমানে বাংলায় যবের চাষ কিছু কিছু হ'চ্ছে, সুতরাং যবগুলি মাড়াই করার পর ভূষি হিসেবে যবের শুঁয়ো সমেত যা' প'ড়ে থাকে, সেগুলিকে একটা গর্ত ক'রে পুড়িয়ে সেই ছাইটাকে জলে ভিজিয়ে রেখে উপর থেকে পরিষ্কার জলটা নিয়ে আগুনে চড়িয়ে জলটা ম'রে গেলেই লবণবৎ পদার্থটি তৈরী ক'রে নেওয়া যায়। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে এটা অনেকেই তৈরী ক'রে নিতে পারবেন।

১৫। **হৃদ্‌রোগেঃ—** অল্প পরিশ্রমে হৃৎকম্প, সেটা আবার একটু ঠাণ্ডা জল খেলেই ক'মে যায়; একটু ভয় হ'লে, উদ্বেগগ্রস্ত হ'লে বুকে কম্পন হয়; আবার একটু জল খেলেই স্বস্তিবোধ। এর কারণ রসবহ স্রোতের একটি স্থান হ'লো হৃদয়, সেখানেই বায়ুবিকার হয়। এই বিকৃতি আর হবে না—যদি যবকে আধ কুটা ক'রে সেইটা ৪/৫ চা-চামচ নিয়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলে পান করা যায়। খাওয়ার ১০/১২ ঘণ্টা পূর্বে ভিজিয়ে রাখতে হবে, পরের দিন ঐ জলটা ছেঁকে সাধারণ জল না খেয়ে ঐ জলটা খেতে হবে।

এইভাবে কিছুদিন খেতে খেতে ঐ বায়ুবিকার আর হবে না।

অবস্থার গুরুত্ব বুঝে ৮/১০ গ্রাম আধ কুটা যব ২ গ্লাস জলে ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সকালে ও বৈকালে খেতে পারেন।

১৬। **মেদো রোগেঃ—** এই রোগের লক্ষণ সম্পর্কে 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩৩৬ পৃষ্ঠায় বলা হ'য়েছে, তবুও বলি—শরীরের একটি প্রধান স্রোত মেদোবহ স্রোত, এটি রুদ্ধ হ'য়ে গেলে, সেক্ষেত্রে যবপ্রধান খাদ্য—যেমন যবের আটার রুটি, যবের ছাতু প্রভৃতি স্থূল দ্রব্য আর পানীয় হিসেবে বার্লি খেলে মেদোবহ স্রোত শুদ্ধ হ'য়ে স্বাভাবিক হয়।

ছাতু খেলে কি দোষ? না, তা নয়, যে সমাজের লোক ছাতু খেতে অভ্যস্ত—তাঁরা অনেকে ছোলার ও যবের ছাতু একসঙ্গে মিশিয়ে খেয়ে থাকেন, তাদের স্বাস্থ্য খুবই শক্ত এবং নিটোল ও ঘাতসহ হ'য়ে থাকে; কিন্তু যাঁরা শুধু ছোলার ছাতু খেতে অভ্যস্ত—তাঁদের পেটের মেদটা বেড়ে যায়।

বাহ্য ব্যবহার

১৭। **বাতের যন্ত্রণায়ঃ—** যেসব বাতে রসবহ স্রোত দূষিত হ'য়ে গাঁটগুলি ফুলে যায়, আর তার সঙ্গে মাংসপেশীতে যন্ত্রণা হয়; সেক্ষেত্রে যবকে কুটে ভিজিয়ে রেখে তারপর তাকে শিলে পিষে অল্প গরম ক'রে সেইসব গাঁটে যেখানে বিশেষ ব্যথা, সেখানে প্রলেপ দিতে হবে, তবে বেলা ৯টার পর ৩টার মধ্যে প্রলেপ দেওয়ার বিধি। সন্ধ্যা বা রাত্রিতে প্রলেপ দেওয়া নিষেধ করা হ'য়েছে। উপরিউক্ত যন্ত্রণায় প্রলেপ দিলে ব্যথাটার উপশম হবে, এটা চরক সংহিতার ব্যবস্থা।

১৮। **শিবত্রে (শ্বেতিতে)ঃ—** যেসব শ্বেতি সবে সুরু হ'য়েছে বা দেখা যাচ্ছে—এখনও খুব সাদা হয়নি, তখনই বুঝতে হবে যে, এটি এখনও গভীরে অর্থাৎ রসবহ স্রোতকে অতিক্রম ক'রে রক্তবহ ও মাংসবহ এবং মেদোবহ স্রোতকে দূষিত করেনি; সেক্ষেত্রে অর্থাৎ রোগের প্রারম্ভিক অবস্থায় যবকে বেটে গায়ে মেখে খানিকক্ষণ থাকতে

হবে, বিশেষতঃ ঐসব জায়গায়; কয়েক ঘণ্টা বাদে স্নান ক'রে ফেলতে হবে। এইভাবে দুই-তিন মাস ব্যবহার ক'রলে ওটা আর ছড়িয়ে প'ড়বে না।

১৯। **শিরঃপীড়ায়ঃ—** প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যব যখন রসবহ স্রোতে কাজ করে— তখন শিরঃপীড়ায় কি ক'রে কাজ ক'রবে? তার উত্তরে বলা যায় যে—শিরঃপীড়া বহু কারণেই হয়—মনে করুন রাত্রিতে আপনার ভাল নিদ্রা হয় না, সেটাও শিরঃপীড়া নয় কি? যদিও এখানে পীড়া মানে টন্‌টন ঝন্‌ঝন্, যন্ত্রণা নয়; সুতরাং এই যে ক্ষেত্র—এখানে আয়ুর্বেদের চিন্তাধারা হ'লো—"নিদ্রা শ্লেষ্মতমোভবা," সেই শ্লেষ্মার অন্যতম প্রধান স্থান হ'চ্ছে শির (মাথা); এইখানের রসবহ স্রোত বায়ু কর্তৃক শুষ্কীকৃত হ'য়ে যায়, তখন তমোভাব তার অন্তর্হিত হয়, তাই নিদ্রা আসে না—সেও তো ভীষণ শিরঃপীড়া! এক্ষেত্রে খোসা বাদ যবকে ভিজিয়ে তার সঙ্গে কাঁচা শতমূলী (Asparagus racemosus) সমান পরিমাণ নিয়ে একটু শক্ত ক'রে বাটতে হবে, তারপর তাকে চাপাটির মত ক'রে (গরম ক'রে নয় কিন্তু) মাথায় খানিকক্ষণ বসিয়ে রাখতে হয়; এইভাবে ঘণ্টাখানেক মাথায় রেখে নামিয়ে মাথাটা ধুয়ে ফেলতে হয়। এর দ্বারা নিদ্রা আসে। এভিন্ন আর একটা মুষ্টিযোগ ব'লছি—কবিরাজী তেল পাকের পদ্ধতিতে যবের কল্ক দিয়ে তিল তেল পাক ক'রে সেই তেল মাথায় লাগালেও নিদ্রা হয়।

এই যব নিবন্ধটির শেষ পরিচ্ছেদে একটি দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলে থাকতে পারছি না।

আমরা কোন মাঙ্গলিক কার্যকালে (অবশ্য স্মার্তবিধান অনুসারে) বিশ্বদেবতার আবাহন ক'রতে গেলে যবের দ্বারাই সেটা ক'রে থাকি এবং পিতৃকুল ও মাতৃকুলের আবাহন ক'রতে দরকার হয় তিল; তা হোক, আর্যরা সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন যে প্রয়োজনে, সেটা তো ভারতবাসীর কল্যাণকামী হ'য়ে। এখনও বৎসরে চৈত্র সংক্রান্তিতে যাকে বলা হয় ছাতু সংক্রান্তির দিনে স্মারক দিবস হিসেবে তাকে মনে করি এবং ভক্ষণও করি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি—অগ্নিবেশ সংহিতাকার (যেটা চরক সংহিতার মূলভিত্তি) তাকে কাজে লাগিয়েছেন কার্যচিকিৎসার পথ্য হিসেবে। আর সুশ্রুত সংহিতাকার তার রূপকে ব্রীহিমুখ যন্ত্র ক'রে জলোদর রোগের জল নিষ্কাশনের জন্য উদরকে ছিদ্র করার কাজে লাগিয়েছিলেন। এখন সব দিক থেকে তার প্রকৃত উপযোগিতাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। একদিন এই সুবিশাল অশ্বক্রান্তার (এশিয়া) অন্তর্গত বিশাল জম্বুদ্বীপ এখন সংকীর্ণ হ'তে হ'তে এক বিঘা জমিনে এসে গেল; কিছুদিন পরে আমাদের উত্তরসূরী যাঁরা তাঁরা হয়তো দেখবেন সেই আর্য প্রেরিত তিল যব তাঁদেরই সংস্কৃতির পিণ্ডদানের কাজে লাগছে—সেটা কি আর বেশী দূর? তা তো মনে হয় না।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Four classes of proteins, viz., albumin, globulin, prolamin (hordein), and glutein (hordenin). (b) Free amino acid and protein. (c) Fresh barley contains vitamin-A, thiamine and riboflavin, pantothenic acid, folic and vitamin-D and E.

পাঠা (আকনাদি)

আমার মত যাঁরা, তাঁরা যদি ছাঁদনাতলায় গিয়ে থাকেন, তাঁদের কাছে হালকা রসের অবতারণা ক'রে যদি এ গাছটাকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি, তাহ'লে মনে হয় তাঁদেব মনেও এই লতাগাছটি আঁক কেটে রাখবে।

আপনার মনে আছে কি? ছাঁদনাতলায় আপনার শ্বশ্রূমাতা অথবা ঐ স্থানীয়া যিনি, তিনি আপনার হাত দু'খানা একটি লতার বেষ্টনী ক'রে আপনাকে বেঁধেছিলেন, আর আপনিও গরুড়ের মত দু'হাত জোড় ক'রে বেচারা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন; তারপর আপনার হাতে তাঁতবোনা একটা মাকু দিয়ে শ্যালিকারা কি পাঁঠা ডাকতে বলেননি? তাঁরা কি বলেননি—

'কড়ি দিয়ে কিনলাম।
দড়ি দিয়ে বাঁধলাম॥
হাতে দিলাম মাকু।
ভ্যাঁ কর তো বাপু॥'

এই বাঁধনের কাজে যে-লতাটিকে লাগানো হ'য়েছিলো—আজ আমার অবতারণা সেই লতাটিকে নিয়ে।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ-সব সংগ্রহের ভার থাকে এ-কার্যের দ্বিতীয় পুরোহিত নর-সুন্দরের উপর, অবশ্য এই রীতিটা পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল বিশেষেও প্রচলিত। বিবাহ-কালে এই স্ত্রী-আচারের ব্যাপারটা বৌদ্ধতান্ত্রিকদের বশীকরণ প্রক্রিয়ার একটি অনুষ্ঠানের অঙ্গ ব'লে মনে হয়। আর একটি তথ্য আপনাদের জানাই—

আমার গ্রামীণ জীবনে বহু লোককেই দেখেছি—কারুর ফোড়া হ'লে বা কেটে গিয়ে ঘা (ক্ষত) হ'লে এই পাঠা লতার আংটি ক'রে হাতের বা পায়ের আঙুলে প'রতে।

ঔৎসুক্যবশতঃ জিজ্ঞাসাও করেছি, আংটির লতাটির নাম কি এবং কেন প'রেছে? তার উত্তরে ব'লতে শুনেছি—এই ঘা কেউ (কেহ) বাণ মেরে যাতে মন্দ ক'রতে না পারে, তার জন্যই এই "আকন্দি" লতার আংটি পরা।

Stephania hernandifolia

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে—এই লতাটি এককালে প্রাক্-আর্যধারার তান্ত্রিকদেরও ঝাড়-ফুঁক ও বন্ধনের হাতিয়ার ছিল; অবশ্য এসব ক্রিয়াকলাপ অথর্ববেদেরই অন্তর্গত। এখন দেখা যাক—একে অথর্ববেদের কোথায় পাওয়া যাবে—

শ্রেয়সী সহমানা সহস্ব সহস্রবীর্য্যা মা জিন্ব।
ন বা উ এতাম্ম্রিয়সে ন রিষ্যাসি পর্থিভিঃ সুগেভিঃ॥
(অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প—৪৪।৩।২১ সূক্ত)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> ত্বং শ্রেয়সী। শ্রেয়সীতি অম্বিষ্ঠা বা অম্বষ্ঠকী লতা কীদৃশী ত্বং ইতি প্রশ্নে ভিষক্ উবাচ ত্বং সহমানা সহত ইতি অভিভবনশীলা স্বভাবতঃ সহস্রবীর্য্যা বহুসামর্থ্যা। ত্বং মা মাং জিন্ব প্রীণিহি। ন বা উ মৃতিং যায়াঃ নম্রিয়সে। ত্বং পার্থিভিঃ মার্গৈঃ সুর্গেভিঃ সুর্গে ইতি বাতাময় মার্গৈঃ ত্বং শ্রেয়সী বীরনায়াসি।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—এটি অম্বিষ্ঠা বা অম্বষ্ঠকী লতার স্তুতি। অম্বিষ্ঠা বা অম্বষ্ঠকী, বৈদিক সূক্ত-প্রোক্ত নাম শ্রেয়সী।

এই লতাকে যেন প্রশ্ন ক'রেই ভিষক ব'লছেন—তুমি স্বভাবতই সহস্রবীর্যা, বহু শক্তির সামর্থ্য ধারণ কর। তোমার মৃত্যু না হোক, তুমি আমাদিকে প্রীণিত কর। সজ্জনগণ বায়ু জন্য আময় মার্গে (রোগ পথে) তোমাকে নিয়ে যান, তুমি সেইখানেই কল্যাণ ধারণ কর।

বৈদিকসূক্তে এবং তার ভাষ্যে যে লতাটি শ্রেয়সী ও অম্বিষ্ঠা বা অম্বষ্ঠকী নামে উল্লিখিত হ'য়েছে—পরবর্তী সংহিতার কালেও ঐ নামে পরিচিত এবং পাঠাও তার একটি নাম।

এই অম্বষ্ঠকী নামটি পাওয়া যায় বেদভাষ্যকার মহীধরের কাছে, তিনি ধ'রেছেন যাস্কের ব্যাখ্যা থেকে।

> "শ্রেয়স্ কল্যাণং ধারয়তি শ্রেয়সী ততঃ অম্বষ্ঠা অম্বষ্ঠকী বা অম্বা মাতা তস্যা ক্রোড়ে তিষ্ঠতি শিশুরিব অম্বষ্ঠা দেশবাচিত্বমপি"

অর্থাৎ যে লতা কল্যাণ ধারণ করে, তার অপর নাম অম্বষ্ঠা; অর্থাৎ মাতার ক্রোড়ে শিশু যেমন নিরাপদে থাকে, আর এ নামটি দেশবাচীও, কারণ অম্বষ্ঠ একটি দেশের নাম। এইজন্যই এই লতার নাম অম্বষ্ঠা। এই পাঠা নামটিও বৈদিক শব্দাভিধানকার যাস্ক ধ'রেছেন—

> "পাঠঃ নমনীয়ঃ লতেয়ং নম্যা সাশ্রয়া অবিদ্ধ কর্ণীচ"

অর্থাৎ যে লতা খুব নমনীয় আশ্রয়প্রাপ্ত হ'লে বর্ধনযোগ্য এবং যার কান বিদ্ধ নয়, এখানে বিদ্ধ মানে ছিদ্র নয়, এ বিদ্ধ অর্থে বৃত্ত অর্থাৎ পাতার আকৃতি গোল হয়ে থাকে না, তাই সে অবিদ্ধকর্ণী।

বৈদ্যকের নথি

প্রাচীন তথ্য থেকে জানা যায়—সুপ্রাচীনকালে কৌমারভৃত্য চিকিৎসক ছিলেন ঋষি হিরণ্যাক্ষ। তার পরেই ভরদ্বাজ প্রভৃতির আবির্ভাব।

এই তথ্যের সমর্থনে মাধবনিদানের টীকাকার শ্রীকণ্ঠ দত্তও উল্লেখ ক'রেছেন যে, হিরণ্যাক্ষের তন্ত্রের নাম "কুমারতন্ত্র", এই তন্ত্রে শিশু ও প্রসূতি এবং গর্ভিণীর

চিকিৎসা কি ভাবে কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে করা হবে তার বর্ণনা করা আছে; তিনি আরও ব'লেছেন—এই কুমারতন্ত্রের বিধান "অথর্ববেদীয়"।

বেদোত্তর সংহিতা যেটি চরক সংহিতা নামে প্রচলিত, সেটি বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছাপ পুরো বহন ক'রে র'য়েছে; অপরদিকে এটি সুপ্রাচীন অষ্টাঙ্গ চিকিৎসাবিদ্যার একটি সংক্ষিপ্ত পেটিকা।

Cissampelos pereira

এই অষ্টাঙ্গ বিদ্যার অন্য একটি অঙ্গ কুমারতন্ত্র বা কৌমার-ভৃত্য তন্ত্রের ধারাটিকে অথর্ববেদীয় ধারা ব'লেই উল্লেখ করা আছে (চরক শারীরস্থান অষ্টম অধ্যায়), সে ধারায় পরিষ্কার বলা আছে—

> "মন্ত্রাদিকং অথর্ব্ববেদ বিহিতং, পরিদৃষ্ট কর্ম্মণা শল্যহর্ত্তা হরণং চ ইতি কৌমারভৃত্যকং"

অর্থাৎ অথর্ববেদীয় মন্ত্রের দ্বারা এবং দৃষ্টকর্মা শল্যতন্ত্রবিদের দ্বারা কৌমারভৃত্য তন্ত্র জানবে। আলোচ্য ভেষজটি কৌমারভৃত্য বা কুমারতন্ত্র থেকেই সংগৃহীত। সেই কুমারতন্ত্রে কিন্তু অথর্ববেদ থেকেই ভেষজটি আহৃত হ'য়েছে।

অতএব পরিষ্কার দেখা যায়—বৈদিক "শ্রেয়সী"টি আকনাদি বা পাঠা নামেই বৌদ্ধ সংস্কৃতির সময়েই ভারতে পরিচয় পেয়েছে, পরবর্তী সংহিতা রচনার সময় এর আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষাও যে হ'য়েছে—তার প্রমাণ চরক সংহিতায় অতিসার বারণের জন্য (সন্ধারণীয় ব'লে) মুখ্যভাবে উল্লেখ না ক'রে স্তন্য শোধনের ক্ষেত্রেই এর বিশেষ ব্যবহার, তাছাড়া আছে অর্শে। অথর্ববেদীয়গণ যে কৌমারভৃত্য তন্ত্রে (আকনাদিকে) ব্যবহার ক'রতেন, সেখানে স্তন্য শোধনীয় বলেই মনে হয়। এভিন্ন সুশ্রুতে, বাগ্‌ভটে, চক্রদত্তেও এর ব্যবহারের উপদেশ অর্শে।

তারপর আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায়—চরক সংহিতার সূত্রস্থানের ৪র্থ অধ্যায়ের দু' জায়গায় একবার অম্বষ্ঠকী ব'লেছেন—সেখানের টীকাকার চক্রপাণি অম্বষ্ঠকীর অর্থ করেছেন "অকর্ণবিদ্ধা", তার প্রধান কাজ সন্ধারণীয়তা। এই সন্ধারণীয় শব্দের অর্থ "সামান্যেন পুরীষস্য সংগ্রহণঃ" অর্থাৎ ভিন্ন মল সংগ্রহণ; আর পরিষ্কার ক'রে বলতে হ'লে এর অর্থ হয়—সাধারণভাবে মলের সংগ্রহ করে; তার অর্থ ভাংগা মল আঁট করে, যাকে বলে Solid করে।

এ সম্পর্কে ঐ অধ্যায়ে দ্বিতীয়বার স্তন্যশোধক বর্গেও পাঠা নামে একটি লতার উল্লেখ ক'রেছেন।

এদিকে সুশ্রুতের মতেও এটি পক্ক অতিসার দূর করে এবং পিত্তপ্রধান ব্রণের রোপণ করে। অর্থাৎ ঘা পূরণ করে।

ষষ্ঠ শতকের বাগ্‌ভটই পাঠার উল্লেখ ক'রেছেন সর্বাপেক্ষা বেশী, অর্থাৎ পাঠার শাকের গুণ বেতোশাকের তুল্য। তারপর সমগ্র সংহিতায় পাঠার রোগনাশিনী শক্তির আরও পরিচয় বহু স্থানে। বাগ্‌ভটকার কিন্তু অম্বষ্ঠা নামটির ব্যবহার ক'রেছেন ব'লে দেখা যায় না; সর্বত্রই পাঠা।

পরিচিতি

প্রাচীন নিঘণ্টুগ্রন্থে পাঠা ও লঘুপাঠা ব'লে দুই প্রকার গাছের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু অন্য দুটি সংহিতাগ্রন্থে (চরক সুশ্রুত) কেবলমাত্র অম্বষ্ঠা বা পাঠা ব'লে একপ্রকার গাছের উল্লেখ আছে।

যে লতাগাছটি আমাদের দেশে পাঠা বলে পরিচিত, সেটি লতানে গাছ; এটি কোন গাছ বা বেড়াকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠে। পাতা ২—৬ ইঞ্চি লম্বা, বেশ চক্‌চকে, প্রায় ত্রিকোণাকৃতি, অভিন্ন অর্থাৎ পানের মত lobe থাকে না, বোঁটা পাতার প্রায় মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসে, সেইজন্য এর লোক-প্রচলিত নাম নিমুখা বা নিমুখো অর্থাৎ যার মুখ নেই, যেহেতু নিচের অংশটি জোড়া; পাতার নিচের দিকটা গোল ও আগার (অগ্রভাগের) দিকটা সরু—ঠিক যেন আমাদের দেশের প্রচলিত মাটির প্রদীপের মত। বোঁটা (পাতার) ২/৩ ইঞ্চি লম্বা হয়, লতা খুব শক্ত এবং নমনীয়, তবে খুব বেশী মোটা হয় না, বড়জোর কনিষ্ঠাংগুলীর মত। ফুল সবুজ আভাযুক্ত শ্বেত বর্ণ ছোট ছোট; গুচ্ছবদ্ধভাবে বোঁটায় প্রায় লেগে থাকে; ফুলের পাপড়ি ছোট, কিন্তু বিস্তৃত। এই গাছে স্ত্রী ও পুং পুষ্পভেদে দুই রকমের ফুল হয়, স্ত্রী পুষ্পের স্তবক সূচলো। বর্ষাকালে ফুল হয়, ফল শেয়াকুলের মত ছোট, লাল রঙেরও এক একটি হয়, বীজ

কতকটা ঘোড়ার খুরের ন্যায় গোলাকার। বর্ষাকালে ফুল হয় ও শরতের শেষে ফল ধরে।

এটি প্রধানতঃ স্বাভাবিকভাবে জন্মে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, মালয়, আফ্রিকার উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ সব অঞ্চলেই আর বাংলার প্রায় সব জায়গায়ই এই লতাগাছ দেখা যায়, তাছাড়া ভারতের সন্নিহিত দেশ যেমন নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সিন্ধু প্রদেশ সমূহেও এই গণের গাছগুলি পাওয়া যায়।

এটির বোটানিকাল্ নাম Stephania hernandifolia walp., ফ্যামিলি Menispermaceae একে "রাজপাঠা"ও বলে।

মূল সমেত এর সমগ্র গাছই ঔষধার্থে ব্যবহার হয়।

এই গণের আর একটি প্রজাতি আছে—সেটা হিমালয়ের ৫/৬ হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যে এবং সেই পশ্চিম হিমালয়ের গাড়োয়াল থেকে আরম্ভ করে পূর্ব নেপাল পর্যন্ত পাওয়া যায়, এটা কালিম্পং অঞ্চলেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এর এক একটি মূলের ওজন ১২/১৪ কিলো পর্যন্তও হয়। দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের Dioscorea ফ্যামিলির খাম আলুর মত, অথবা ওল কন্দের (Amorphophallus Campanulatus) মত। কিন্তু স্বাদে তিতো (তিক্ত) ও তার রং কাঁচা হলুদের মত শ্বেতাভ হরিদ্রা)।

এটির বোটানিকাল্ নাম Stephania glabra (Roxb) Miers.

বনৌষধির নিঘণ্টুগ্রন্থে লঘু পাঠা ব'লে আর একটি লতাকে গ্রহণ করা হ'য়েছে: সেটির পাতার আকার প্রায় একই রকম, তবে তার বৃন্তের সন্নিবেশটা ঠিক রাজ-পাঠার মত নয়। এটা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় উত্তরাখণ্ডে (হিমাচল প্রদেশে)। এই নিবন্ধে লঘু পাঠার ছবি দেওয়া হ'লো—দুটির পার্থক্য দেখলেই বুঝতে পারবেন: তবে এই গাছের পাতার উভয় দিকেই সূক্ষ্ম রোমাবৃত, এটির বোটানিকাল্ নাম Cissampelos pereira Linn., এরা ফ্যামিলিতে একই।

ঔষধার্থে ব্যবহার হয় মূল সমেত সমগ্র লতা।

পরম্পরায় ব্যবহারিক ক্ষেত্র

এই ভেষজটি প্রধানভাবে কাজ করে আমাশয়ে, পক্বাশয়ে, অগ্ন্যাশয়ে ও শোণিতা-শয়ের ক্ষেত্রে। অপরপক্ষে রসবহ স্রোতেও এর কার্য খুবই লক্ষণীয়। সুশ্রুতের মতে নবম আশয় হ'চ্ছে গর্ভাশয়: এই আশয়ে বাহ্য ও আভ্যন্তর দুই ক্ষেত্রে এটির উপ-যোগিতাও কম নয়।

১। **বিসূচিকায় (কলেরায়):—** এই রোগটির সঙ্গে জোটে দাহ, জলের মত মলনিঃসরণ, প্রচণ্ড বমনভাব, তার সঙ্গে পিপাসা। আয়ুর্বেদের চিন্তাধারায় এটি সান্নিপাতিক অতিসার। এক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ পাঠার মূল বেটে দই-এর সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো মাত্রই সমস্ত উপসর্গগুলি দুই-এক ঘণ্টার মধ্যে উপশমিত হবে; তবে এক্ষেত্রে গোরুর দুধের দই বিশেষ উপযোগী। এটি প্রাচীন বৈদ্যকগোষ্ঠীর ব্যবহৃত যোগ হ'লেও এটি ভাবপ্রকাশে উক্ত আছে। তবে এর মাত্রা ৫ গ্রামের বেশী ব্যবহার করা সমীচীন হবে না, কারণ তখন অগ্নিবল খুবই ক্ষীণ, এক্ষেত্রে মাত্রাটা বিবেচ্য চিকিৎসকের।

২। **অতিসারে:—** আহারের দোষে ও ঋতু পরিবর্তনের সময় অনেকের পাতলা দাস্ত হ'য়ে থাকে, তার সঙ্গে শরীরে থাকে দাহ, প্রস্রাবও ক'মে যায়। এক্ষেত্রে পাঠার

(আকনাদির) পাতা ৩/৪টি বেটে ঘোলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে। (এটা মহিষ দুধের দৈ-এর ঘোল হ'লে ভাল হয়), এর দ্বারা ঐ অতিসারটা বন্ধ হবে।

৩। **পিত্তজ্বরে:—** এই জ্বরে থাকে দাহ, চোখ লাল, বার বার পিত্ত বমি, অসাড়ে পায়খানা, এখানে আকনাদির পাতা বেটে রস ক'রে ২ চা-চামচ নিয়ে বাসি ভাতের আমানির সঙ্গে মিশিয়ে প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর ৩ বার খেতে দিলে এর সমস্ত উপসর্গ ২ দিনের মধ্যে চ'লে যাবে এবং জ্বরও ছাড়বে।

৪। **পাতলা দাস্তের সঙ্গে পেটে ব্যথায়:—** আকনাদি মূল আর পাতা ৫ গ্রাম একসঙ্গে বেটে বাসি ভাতের আমানি অথবা ঘোলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিলে ওটা প্রশমিত হবে। আর পেটে যন্ত্রণার জন্য পাতা ও মূল বেটে পেটে প্রলেপ দিতে হবে।

৫। **গলায় কফের আধিক্যে:—** অনবরত ঘড়ঘড় শব্দ হ'চ্ছে, অথচ গলা টানলেও কিছু বেরোচ্ছে না। এক্ষেত্রে এর কাঁচা পাতা ও মূল সমান পরিমাণে নিয়ে অল্প জল দিয়ে বেটে, ছেঁকে রস ক'রে নিতে হবে। এই মূল ও পাতা নিতে হবে ৭/৮ গ্রাম. এইটা দিনে দু'বার খেতে হবে। এর দ্বারা গলার ঘড়ঘড়ানিটা ক'মে যাবে।

৬। **অর্শ ও আমাশায়:—** দাস্তের পর মলদ্বারে দপ্‌দপানি, আবার মলের সঙ্গে অল্প রক্তও প'ড়ছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না—এটা অর্শ না রক্তামাশা। সেক্ষেত্রে আকনাদির পাতা ও মূল সমপরিমাণে মোট ১০ গ্রাম নিয়ে জল দিয়ে বেটে সেটা ছেঁকে ঐ জলটা অল্প গরম ক'রে রাখুন, ঐ জল অন্ততঃ সিকি কাপ রাখতে হবে; তারপর ৪ ঘণ্টা অন্তর ৩ বারে ঐ জলটা খেতে হবে, এর দ্বারা আমাশাটা ক'মে যাবে। এখানকার বক্তব্য—অর্শে অন্তর্বলি হ'লে সেটা সহজে ধরা যায় না; তাই এই সন্দেহ।

৭। **অজীর্ণজনিত অরুচিতে:—** দীর্ঘদিন অজীর্ণে ভুগতে ভুগতে রসধাতুও ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়, তখন তাদের শরীরের কান্তি চ'লে যায়; সব জিনিসেই আসে অরুচি। এক্ষেত্রে তাদের ঔষধ হ'লো—৩/৪টি আকনাদির পাতা বেটে, সেটাকে এক/দেড় চা-চামচ ঘিয়ে ভেজে ভাত খাওয়ার সময় প্রথমেই ভাতের সঙ্গে খেতে হবে, এর দ্বারা ঐ অরুচি ও অজীর্ণ দুই-ই প্রশমিত হবে।

৮। **অগ্নিমান্দ্যে:—** পক্বাশয়ে শ্লেষ্মণ ধাতু বিকারগ্রস্ত, ক্ষিধে হ'তে চায় না, পেট যেন সর্বদা ভর্তি হ'য়ে আছে অথচ তার কোন অভিব্যক্তি নেই—এই যেমন ঢেকুর, অম্ল, অজীর্ণ এসব কিছুই হয় না; এক্ষেত্রে আকনাদির পাতা বেটে সিকি কাপ জলে গুলে, ছেঁকে একটু গরম ক'রে নিতে হবে, তারপর ভাত বা রুটি খাওয়ার পূর্বে খেতে হবে। এটাতে ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

আর এক প্রকার অগ্নিমান্দ্য—যেটা বায়ুজন্য হয়, এদের বিশেষ লক্ষণ হ'লো—পেট গুড়্‌গুড়় করে, কোঁ কোঁ শব্দ হয়, কিন্তু ভাত ফোটার মত ভুট্‌ভাট্‌ করে না। এক্ষেত্রে আকনাদি পাতা চূর্ণ প্রতিবার আধগ্রাম মাত্রায় নিয়ে সকালে ও বৈকালে ঈষদুষ্ণ জল সহ খেতে হবে। এর দ্বারা বায়ুজন্য অগ্নিমান্দ্যটা চ'লে যাবে।

৯। **গর্ভ নিয়ন্ত্রণে:—** প্রথমেই ব'লে রাখি— এই আকনাদির পাতার ব্যবহারে গর্ভসঞ্চার নিয়ন্ত্রিত হয়। মাসিক ঋতুর প্রথমদিন থেকে আরম্ভ ক'রে ৫ দিন প্রত্যহ সকালে খালিপেটে এই পাতা বাটার সরবত খেতে হবে। পাতা চাই ৭/৮টি আর ছোট হ'লে দুই-একটা বেশী। এইগুলি মাখনের মত ক'রে বেটে জলে গুলে একটু চিনি

বা মিছরি মিশিয়ে সরবতের মত খেতে হবে। এর ফলে ঐ মাসে আর গর্ভসঞ্চার হবে না। তবে প্রতি মাসেই এটা খেতে হবে।

১০। **গ্রহণী রোগে:—** এই রোগের বিশিষ্ট লক্ষণ হ'লো—দাস্ত যা হওয়ার তা দিনেই হবে, রাত্রিতে হয় না। এক্ষেত্রে মূল সমেত সমগ্র গাছ ১০/১২ গ্রাম নিয়ে একটু থে'তো ক'রে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রতে হবে, সেটার জল আন্দাজ এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে, সকালে ও বৈকালে দু'বারে ঐ জলটা খেতে হবে। আর কাঁচা সংগ্রহ ক'রতে পারলে মূল সমেত সমগ্র গাছ ১৫/২০ গ্রাম একটু থে'তো ক'রে জলে বেটে ওটাকে ছে'কে নিয়ে ঐ জলটা একটু গরম ক'রে সকালে ও বৈকালে দু'বারে খেতে হবে।

১১। **স্তন্য শোধনে:—** যেখানে শিশুর একমাত্র আহার বুকের দুধ, সেখানে স্তন্য দূষিত হ'লে শিশু দুধ তোলে, বমি করে; দমকা দাস্ত হয়, পেট ফাঁপে ও যন্ত্রণা হয়। এক্ষেত্রে মায়েরই চিকিৎসা করা দরকার। সেজন্য সমূল আকনাদি গাছ ও পাতা রস ক'রে সেইটা দু' চা-চামচ ক'রে দু'বেলা খেতে দিতে হবে। যদি কাঁচা সংগ্রহ করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে গাছ-পাতা মূলে ১২ গ্রাম (শুষ্ক) নিয়ে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, সকালে ও বৈকালে দু'বারে খেতো হবে। এটি সিদ্ধযোগ ব'লেই আমাদের তিনটি সংহিতাগ্রন্থ—চরক, সুশ্রুত ও বাগ্ভটে এটির উল্লেখ আছে।

১২। **অন্তর্বিদ্রধিতে:—** এ ফোড়া পেটের মধ্যে হয়, এগুলি তাড়াতাড়ি পাকেও না আবার ফাটেও না, এক্ষেত্রে আকনাদির মূল ৫ গ্রাম জল দিয়ে বেটে, তাকে ছে'কে রস ক'রে ২ চা-চামচ সকালে ও বৈকালে ২ বার খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ ফোড়া ফেটে পু'জ রক্ত ঐ দাস্তের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। এটা প্রাচীন সংহিতাগ্রন্থগুলির ব্যবস্থা।

১৩। **প্রস্রাবে জ্বালায়:—** এটা নানা কারণে আসতে পারে। তার লক্ষণ হ'লো—প্রস্রাব ধ'রে রাখলে পাত্রের তলায় খড়ি গোলার মত ব'সে যায়। এক্ষেত্রে ৫/৬টি পাতা বেটে এক কাপ জলে গুলে, ছে'কে, সেই জলটাতে একটু চিনি বা মিছরি দিয়ে সরবতের মত সকালের দিকে খালিপেটে খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা ৫/৭ দিনের মধ্যে চ'লে যাবে।

১৪। **শ্বেত প্রদরে:—** এই রোগ সাধারণতঃ প্রথম রজোদর্শনের পর থেকেই দেখা যায়। এক্ষেত্রে আকনাদির পাতা ৫/৬টি চিনি বা মিছরির সঙ্গে মিশিয়ে সরবতের মত সকালে খালিপেটে খাওয়া। এটি ব্যবহার ক'রলে এক সপ্তাহের মধ্যেই উপশম হবে।

বাহ্য ব্যবহারিক ক্ষেত্র

১৫। **সুখ-প্রসবের জন্য:—** সামনে এসেও ভূমিষ্ঠ হ'চ্ছে না, অথচ ব্যথা জোর আসছে; এক্ষেত্রে শুধু আকনাদির মূল বেটে (১০ গ্রাম আন্দাজ) প্রসবদ্বারে লেপে দিলে সুখপ্রসব হবে। এটা চক্রদত্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা।

১৬। **মচকানো ব্যথায়:—** উ'চু-নীচু জায়গায় পা প'ড়েই হোক আর যে কোন কারণেই হোক, মচ্‌কে গিয়ে ব্যথা হ'য়েছে; এমন-কি সেখানটার হাড়টায় চিড় খেয়েছে—

এই যে ক্ষেত্র, এখানে আকনাদির মূল সমেত সমগ্র গাছ বেটে অল্প গরম ক'রে ঐ মচ্‌কানো জায়গায় প্রলেপ দিয়ে তার উপর একটা পাতা বা যে কোন জিনিস ঢাকা দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে। যতক্ষণ ব্যথা বা ফুলো না কমে, ঐ বাঁধাটা খুলে ফেলা সমীচীন হবে না। তবে তিন দিন বাদে খুলে আবার লাগানো যেতে পারে। এর দ্বারা ওটা সেরে যাবে।

এইবার একটা অথর্ববেদিগণের তান্ত্রিক টোটকা ঔষধ লিখছি—দাঁতের গোড়া ফুলেছে, যন্ত্রণা হ'চ্ছে—এক্ষেত্রে আকনাদির লতাকে দুই হাতে তাগার মত ক'রে ধারণ ক'রলে যন্ত্রণার উপশম হয়।

এই নিবন্ধের শেষে শুধু এইটাই মনে হ'চ্ছে—যেদিন উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়েছিলাম, সেদিন এই লতা দিয়ে আমায় বেঁধেছিলেন; এখন দেখছি—এটা আমার যত কাজে লাগুক আর নাই লাগুক, রমণীদের প্রতি পদক্ষেপেই অনুভূত হবে—এটা না হ'লে আমার চ'লবে কি ক'রে? কারণ প্রথম সাংসারিক জীবনে যদি লক্কা পায়রা হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে চাই, তাহ'লে প্রতি মাসে তাকেই দরকার; আবার সন্ন্যাসী চোর বুঁচকীতে ঘটিয়ে দিলে সেই গ্রন্থিটা কাটার জন্যেও হয়তো বা দরকার হ'তে পারে। আবার মা হ'য়ে শিশুর স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গেলেও এটা দরকার। এই লতা দিয়ে বিয়ের সময় হাত বাঁধার উদ্দেশ্য—"তবে কি ধর রে লক্ষণ?"

CHEMICAL COMPOSITION

Saponin.

চরক-সুশ্রুতে জ্যোতিষী-পন্থা

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকরা কি ক'রে রোগ ও রোগীর প্রকৃতির আদি্য নাড়ী ব'লতে পারেন এইবার সেই টেক্‌নিক্‌টা বলি।

এই সমীক্ষা আজও সেই চরকীয় যুগ থেকে অব্যাহত, অর্থাৎ আয়ুর্বেদীয় দৃষ্টিতে মানবের প্রকৃতি-বিজ্ঞান অনুযায়ী কোথায় কিভাবে তার মন আর দেহবিকারগুলি প্রকাশ পায়—আদি সংহিতাগ্রন্থ চরক ও সুশ্রুতে যেসব ইঙ্গিত দেওয়া আছে সেই-গুলিকেই নিরীক্ষণ করা আর উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এদের প্রকৃতিগত পার্থক্য কি ধরনের হ'য়ে থাকে এবং তার লক্ষণই বা কি—এটা শুধু চিকিৎসক কেন, সাধারণ মানুষও যাতে বুঝতে পারে—এই গঠনের লোকের এই প্রকৃতি, তারই জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা—কারণ অজ্ঞানের বিভ্রান্তি ঘটা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি জ্ঞানীর পক্ষেও বিশেষ অভিজ্ঞান বোধ না থাকলে প্রকৃতি এবং রোগের বল কতটুকু, সেটুকু বিচার করা খুব কঠিন। এছাড়া অনেক সময় বাহ্য আকর্ষণীয় নধর নিটোল গড়ন দেখে তার রোগ ও রোগের বলাবল বোঝা যায় না, এইজন্য তাঁকে অবশ্যই যেটুকু জানতে হবে, সেই অংশটুকুই এখানে আলোচ্য।

এগুলিকে অধিগত ক'রতে গেলে প্রাথমিক স্তরে যেটুকু অভিজ্ঞানের প্রয়োজন তা হলো—

১। প্রবীণতা লাভ করতে হবে—(ক) বুদ্ধিতে, (খ) বিদ্যায়, (গ) বয়সে, (ঘ) চরিত্রে, (ঙ) ধৈর্যে, (চ) স্মৃতিতে, (ছ) স্থৈর্যে।

২। বহুশ্রুত পুরুষের উক্তিকে বার বার শুনে নিয়ে তাকে অনুশীলন করতে হবে।
৩। লোক-চরিত্রগুলিকে তুলনা-মূলক বিচার ক'রে দেখারও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে।
৪। সুস্থ দেহী, সুস্থ মন, প্রসন্ন-চিত্ত ব্যক্তিই হবেন প্রকৃতি ও রোগ-সমীক্ষক; অর্থাৎ এসব দক্ষতা থাকলে বা অর্জন ক'রলে, তবে হবে বিচার করার ক্ষমতা, আর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ রোগ ও রোগীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তার শুভাশুভ বিজ্ঞানে দক্ষতা আসবে।

মানুষের প্রকৃতি দেখে ও মন বুঝে রোগ চেনা

প্রথমেই বলে রাখি—আপনি কুমারিকা অন্তরীপ থেকে আরম্ভ ক'রে সেই হিমালয়ের পেটে ঢুকে যান, আটটি প্রকৃতির অর্থাৎ ৮ প্রকারের প্রকৃতির বেশী নবম প্রকৃতির লোক দেখতে পাবেন না। যে কোন দেশের মানুষ হোক এই ৮ প্রকার প্রকৃতির মধ্যে প'ড়বেই—

(১) শোণিত-প্রকৃতি
(২) পিত্ত-প্রকৃতি
(৩) বাত-প্রকৃতি
(৪) শ্লেষ্মল-প্রকৃতি
(৫) মৃদু-প্রকৃতি
(৬) রুক্ষ-প্রকৃতি
(৭) বাত-শ্লেষ্ম-প্রকৃতি
(৮) ক্ষীণ-প্রকৃতি।

(১) প্রথমেই আলোচনা করা যাক—**শোণিত-প্রকৃতির মানুষ সম্পর্কে**—এ'রা সব সময়েই স্ফূর্তিতে থাকেন, স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন আর না দিন, রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাতজনিত কোন রোগ আসে না, এ'দের দেহের রঙের ঔজ্জ্বল্য থাকবে—তা সে কালো ফর্সা যে রঙই হোক আর সে সাঁওতাল, কোল, ভিল, নিগ্রো, দ্রাবিড়ী, পাঞ্জাবী, কাবুলী বা আরবীয়ান, ইওরোপীয়ান যেকোন শ্রেণীর লোকই হোন-না। এই প্রকৃতির লোকের অঙ্গ বেশ গোলগাল নিটোল আর গঠনও বেশ মজবুত। শরীরের যেখানেই নাড়ীর স্পন্দন থাকবে সেইখানেই বেশ জোরের সঙ্গে স্পন্দিত হবে, আর শরীরে থাকে চাপা তাপ। যেকোন শ্রমের কাজই আসুক, উৎসাহ তাঁদের থেকেই যাবে।

এই প্রকৃতির লোকের কি অসুবিধে আসে।

এ'দের ব্লাড্-প্রেসার হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, কোন কোন ক্ষেত্রে মুখে দুর্গন্ধ—লোকে ভাবে এটা বুঝি লিভারের দোষ। মেয়ে হ'লে গুল্ম রোগ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। এভিন্ন রক্তপিত্ত রোগ, হঠাৎ হঠাৎ ফোড়া ওঠা, মাঝে মাঝে অগ্নিমান্দ্য, শিরঃ-পীড়া (যেকোন রকমের মাথার রোগ), কণ্ডূ (চুলকণা), অত্যন্ত নিদ্রালুতা, ক্রোধের আধিক্য, বয়সের বাড়তিতে ভুল হওয়া, মাঝে মাঝে স্বরভঙ্গ। এমনকি এক্‌জিমা, হাঁপানিও হ'তে পারে। হাতে পায়ের তলায় ঘাম হওয়া, চোখ ওঠা, বাতরক্তে আক্রান্ত হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়।

(২) **পিত্ত-প্রকৃতির লোকের কি কি লক্ষণ থাকে—** এ'দের প্রকৃতিটাই এমন অদ্ভুত ধরনের যে—কোন উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, কোন জায়গায় যাওয়ার তাড়া, নতুন কোন স্থানে যাওয়া, অপরিচিত খাদ্য অর্থাৎ যা কোনদিন খাওয়া অভ্যেস নেই বা কখনও দেখেননি এমন খাদ্য খাওয়া, এই ধরনের কোন কারণ ঘটলেই এ'দের যকৃৎ বা যকৃতের প্রাচীর বা যকৃতের ক্রিয়া এবং যকৃৎখণ্ডের অভ্যন্তরে চাঞ্চল্য আসে, পায়খানার বেগ হয়—হ'লে যেতেও হয়। খাওয়ার ইতর বিশেষ হ'লেই অম্বল বা অপরিপাক বা কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ ক'ষেও যায়, এ'দের দেহে পিত্তের প্রধান স্থানগুলিকে জানা দরকার। প্রধান স্থান আমাশয়, অপ্রধান স্থান রসবহ স্রোত। এ'দের নাড়ীর বেগে কোন কোন সময় ঝিরঝির ক'রে জল ঝরার মত সূক্ষ্মতা থাকে। (চিকিৎসক প্রকৃতি-বিজ্ঞান জানার জন্য এসব প্রকৃতির মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি কিনা তা আগে জেনে রাখেন; কারণ বায়ু-প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে এ'দের পার্থক্য জানা কঠিন হয়।)

(৩) **এইবার বাত-প্রকৃতির লোক যাঁরা তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করা যাক—** এ'দের সঙ্গে পিত্ত-প্রকৃতির মানুষের মিল থাকলেও যেটা বৈশিষ্ট্য থাকে, সেটা হ'লো—অল্প আবেগে উত্তেজিত হ'য়ে পড়েন, মনের প্রবৃত্তি চেপে রাখতে পারেন না, আর এ'দের পেটে কথাও থাকে না। কারুর দুঃখে সত্বর দুঃখিতও যেমন হন, তেমনি পরের জন্য নিজের ক্ষতির শঙ্কা না ক'রেও উত্তেজিত হ'য়ে থাকেন অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে পড়েন। আর নাড়ীর স্পন্দনের স্থানগুলিতে বস্তি, পক্বাশয়, কটি, নিতম্বদ্বয়ে চঞ্চল ও দ্রুততার সঙ্গে স্তব্ধতাও দ্রুত, অর্থাৎ নাড়ীর স্পন্দনটি সর্বদা ব্যক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

এইসব প্রকৃতির লোক বায়ু জন্য অর্থাৎ অপ্রকৃতিস্থতার মতই পীড়ায় আক্রান্ত হন। এ'দের মূর্ছা, কাঁপুনি, শরীরের যেখানে সেখানে ব্যথা কামড়ানি হয়। এ'দের গা-হাত-পা টিপে দিলে বা ডলাই-মলাই ক'রলে আরাম পান।

(৪) **শ্লেষ্মল-প্রকৃতি যাঁরা**—এ'দের বৈশিষ্ট্য হ'লো শরীরের ভিতর বা বাইরে যে কোন অসুখ হোক, সেটা সহজে সারতে অর্থাৎ আরোগ্য হতে চায় না। অল্প ঠাণ্ডা লাগলে বা ঠাণ্ডা কিছু খেলে গাল-গলা ফোলে। আর যে কোন রোগই আসুক সেই রোগের সঙ্গে শ্লেষ্মার যোগের সম্বন্ধ থাকবেই অর্থাৎ কফবিকৃতির লক্ষণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকবেই। এ'দের শরীরের গঠনটি কিন্তু মাংসবহুল, তবে বেশ কোমল, যাকে বলে নাদুস-নুদুস আর একটু ঢিলে-ঢালা; প্রায় সারা শরীরটা যেখানে মাংসপ্রধান সেইখানটাই নিটোল ধরনের। এ'রা সর্বদাই ঠাণ্ডা লাগার শঙ্কাতেই থাকেন। এ'দের আবার লেগেও যায়। নাড়ীর গতি নির্ভর করে প্রকৃতির গতি অনুযায়ী অর্থাৎ যেহেতু শ্লেষ্মল প্রকৃতির মানুষের শরীরের উষ্ণতা অপেক্ষা শৈত্য থাকে অর্থাৎ সর্বদাই শরীরটা স্পর্শশীতল, তার কারণ তাঁর রক্তবহ শিরাগুলিও শ্লেষ্মল প্রকৃতির জন্য মন্দগতিতে থাকে, সেইহেতু নাড়ীর গতিও মন্দ হয়। এ'দের বক্ষস্থল, মস্তক, গ্রীবা, পর্বসমূহ (গাঁটগুলি), আমাশয় ও মেদের স্থানেই শ্লেষ্মা জ'মে ব্যাধির আশঙ্কা।

(৫) **মৃদু-প্রকৃতির লোক যাঁরা**—এখন এই প্রকৃতির লোকের বিচার ক'রতে গেলেই প্রথম বক্তব্যে যেটির বর্ণনা দেওয়া হ'য়েছে (শোণিত প্রকৃতির), সেটাকে খুবই আয়ত্ত ক'রতে হবে। তখন সহজেই ধরা যাবে এর বিপরীত প্রকৃতিতে যে সব লক্ষণ হবে তাই হবে মৃদু প্রকৃতির লোকের। এই প্রকৃতির লোকের অল্পেই ক্লান্তি বোধ

হয়, এ'দের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন পড়ে। দেহযন্ত্রের সাবধানতা পালন না ক'রলে কখনও পেটের দোষ, কখনও বা প্রস্রাব কম-বেশী হওয়া—যাকে বলা যায় মূত্রগ্রন্থিতে পীড়া হওয়া স্বাভাবিক।

এক কথায় বলা যায়—এ'রা রক্তপিত্ত প্রকৃতি অর্থাৎ শোণিত প্রকৃতির কিছুটা আর পিত্ত প্রকৃতির কিছুটা নিয়ে হন। সবচেয়ে লক্ষণীয় যে—এ'রা কাজে একটা শৃঙ্খলা রক্ষা ক'রতে পারেন না।

(৬) **এবার রুক্ষ বা শুষ্ক-প্রকৃতির লোকের সম্পর্কে আলোচনা ক'রছি—** এ'দের গায়ের রং খুব বড় একটা গৌরবর্ণ হয় না। হাত-পায়ের ও আঙ্গুলের গড়ন (গঠন) কেউ যেন চেপে বসিয়ে দিয়েছে, খুব পুষ্ট বা পুরুষ্টু নয়, তবে এ'দের সবদিকে নজর খুব তীক্ষ্ন, যাকে বলে হুঁশিয়ার। এ'দের গায়ের চামড়া শুক্‌নো শুক্‌নো (শুষ্ক) এবং খস্‌খসে ও কড়া, গায়ে মাংসও কম আর গাল, চোয়াল, কোমর আর হাতের পায়ের গাঁট সর্বত্রই উঁচু-নীচু। এ'দের চলা-বসাও চটপট। প্রস্রাব পায়খানা বেশী হয় না কিন্তু বিচিত্র হ'লো—নাড়ীর স্পন্দনটা হবে স্পষ্ট কিন্তু মনে হবে একটা সরু তারের মাধ্যমেই যেন বিদ্যুতের স্পর্শ লেগে চ'লছে, তবে তা দ্রুত গতিতে।

(৭) **এবার বাত-শ্লেষ্ম-প্রকৃতির লোকের কথা বলি—** এ'দের গঠন, এ'দের প্রকৃতি প্রায় শ্লেষ্ম-প্রকৃতির মত, তফাত হ'লো—এ'দের চামড়ায় এমন একটা অবস্থা থাকে যেন নিস্তেজ। এ'দের মাংসপেশীতে বাত হ'লে খুব স্বাভাবিক কারণেই হয় এবং যে কোন বয়সেই সেটা হ'তে পারে।

(৮) **এবার ক্ষীণ-প্রকৃতির লোকের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি বলি—** এ'রা যখন গর্ভে ছিলেন—তখন থেকেই যেন হাড়ে-মাসে (মাংসে) জড়িয়ে আছে। সাধারণতঃ এ'রা অসময়ে প্রসূত হ'য়ে থাকেন। প্রায়ই দেখা যায় এ'রা যমজ। এই প্রকৃতির লোকের মাথার গড়নটা হয় কপালের উপর থেকে মাথার দিকটা নারকোলের ধরনের অর্থাৎ কলি কলি মুখের আকৃতি, থ্যাব্‌ড়ামুখো হয় না, আর প্রকৃতির মধ্যে উক্ত সাতটির যে কোন প্রকৃতির প্রাধান্য লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। আবার অনেক সময় জড়-বুদ্ধিও হ'তে দেখা যায়। এই দৃষ্টিটি সুশ্রুত সংহিতার শারীরপ্রকৃতি নিয়ে। কারণ বাস্তববাদী সুশ্রুত সংহিতার চিকিৎসকগণের দৃষ্টিতে যে কোন মানুষকে সহজেই চেনা যায় সন্তানের পিতার দিকটায় বায়ু বা পিত্ত অথবা শ্লেষ্মার বলটা কিভাবে বহন ক'রছে, এমতে সন্তানের দেহটা আসে পিতার কয়েকটা প্রাধান্য নিয়ে এবং মায়ের কাছ থেকেও অনেক কিছু নিয়ে।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মাতৃসত্ত্বায় অভিন্নতা

মায়ের কাছ থেকে পাওয়া যায় রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র, মলাশয় প্রভৃতি কোমল অংশ এবং মনও। মায়ের মনোবহ স্রোত যদি দূষিত থাকে তখন গর্ভস্থ সন্তানেও তাঁর সেই সম্পত্তি বর্তাবে। এই মনোবহ স্রোত দূষিত হ'লে সাধারণতঃ রোগ হয় অপস্মার (Epilepsy), উন্মাদ (Insanity), অর্ধাবভেদক, মূর্ছা প্রভৃতি। এ ভিন্ন আর একটি মারাত্মক রোগও মায়ের কাছ থেকে সন্তানে বর্তায়—তার মধ্যে শুচিবায়ুতাও একটি, যাকে চলতি কথায় আমরা "ছুঁচিবাই" বলি। আর একটা অবস্থা আমরা প্রায়ই দেখতে পাই—কল্পিত কোন কারণ বা অকারণে মানসিক বিষাদ, কারুর প্রতি সন্দেহ, শঙ্কা প্রভৃতি। এ রোগের প্রধান উপসর্গ হ'লো—

ধৈর্যের অভাব ঘটে এবং মনোবহ স্রোতটার স্বাভাবিকতা রুদ্ধ থাকে—যে হেতুটাকে সরিয়ে দিলে এই রোগ নিরাময় হয়. সেই ধৈর্য ও স্মৃতির কেন্দ্রীভূত স্রোত বা কোষগুলি অবসন্ন থাকে, যার জন্য তাকে উন্মাদের সমপর্যায়ভুক্তও করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ মায়ের রসবহ স্রোতে যদি কোন রোগ থাকে—যেমন এলার্জি, মূত্রক্ষয়, কৃমি, অম্লপিত্ত প্রভৃতি—তা থেকেও সন্তান কোন না কোনটা পেতেও পারে।

তৃতীয়তঃ মায়ের রক্তবহ স্রোতে যদি কোন রোগ থাকে—যেমন অর্শ, ব্লাড্-প্রেসার, এ থেকেও সন্তান রেহাই পায় না। তারপর মাংসবহ স্রোতের কোন গলদ থাকলে সন্তান তা থেকেও রেহাই পায় না. যেমন অর্বুদ (টিউমার)।

এইখানেই বুঝতে হবে—এটি মায়ের বংশ থেকে অর্থাৎ মাতৃকুল থেকে পাওয়া।

আসল কথা হ'লো—খানদানী হ'য়ে অর্থাৎ উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হ'য়ে যে রোগ দেখা দেবে সেটা সারানো খুবই কষ্টসাধ্য। একেবারে নিরাময় তো হবেই না. তবে যাপ্য ক'রে রেখে দেওয়া যায়। আর কোনদিন এ রোগে আক্রান্ত হবেন না, একথা বলা যায় না। তবে হ্যাঁ—মায়ের কাছ থেকে আমরা দেহের অভ্যন্তরস্থ যেসব মৌল উপাদান বা যন্ত্রগুলি পাই. সন্তানের এসব অংশ সুস্থ থাকলে মাতারও যে সেগুলি সুস্থ ছিল (সন্তানের জন্মকালীন সময়ে) এইটাই নির্দেশ করে।

গর্ভ সাত্ম্য

এভিন্ন আরও একটা জিনিস গর্ভস্থ সন্তান গ্রহণ করে. সেটা হ'লো মায়ের অভ্যস্ত খাদ্যের অভ্যাস—সেটা তার সাত্ম্য হয়ে যায়. যাকে বলে তার কন্‌ষ্টিটিউশন সেটাকে সে আপন ক'রে নিল। এই যেমন মা ছাতু খেতে অভ্যস্ত বা গর্ভাবস্থায় সর্বদা খেতেন। সন্তানও সেইটাকে নিজের ক'রে নিলো—একেই বলা হয় সাত্ম্য।

মায়ের কাছ থেকে আমরা আমাদের দেহের মৌল উপাদান অনেকই পেলাম. অবশ্য ছিটেফোঁটা ক'রে।

এইবার বাবার কাছ থেকে আমরা কি কি পেয়ে থাকি. সেইটাই আলোচনা করছি. সেটা হ'লো—মাথার চুল. লোম (রোম). অস্থি. নখ. দাঁত. শিরা. স্নায়ু. ধমনী ও পরে উপলব্ধ শুক্র। এ'দের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই জানিয়ে দেয় পিতারও ঐ সব অংশ কতটা সুস্থ কতটা রোগাক্রান্ত ছিল (সেই সন্তানের জন্মকালীন সময়ে) অর্থাৎ সন্তানের এইসব অংশগুলি সুস্থ থাকলেই বুঝতে হবে পিতারও ঐ সব অংশই সুস্থ।

সুশ্রুত সংহিতোক্ত আরও একটি অনুশীলন

মাতার ও পিতার শোণিত ও শুক্রের সংযোগের সময় বায়ু, পিত্ত ও কফের মধ্যে যেটির আধিক্য থাকে—তার ক্রিয়া সন্তানে উপচিত হয়। এই যেমন বাত প্রকৃতিটি জন্মসূত্রে এসেছে ; এ'দের প্রকৃতি হবে—সর্বদা আমুদে (আমোদপ্রিয়), আমোদ করার ব্যাপারে আকৃষ্ট এবং তাতে জড়িত. পরের উৎকর্ষ ঐশ্বর্য দেখলে নিজের মনে একটা ঈর্ষার ভাব আসা, অল্প অসুবিধে হ'লেই অস্বস্তি. ক্রোধ ; ধৈর্যের দৃঢ়তা নেই, কারুর বন্ধুতায় অকপট প্রত্যয় করে না অর্থাৎ সকলের প্রতি অবিশ্বাস. কারোর কাছে বৃহৎ উপকার পেয়েও তাঁর প্রতি কোন কৃতজ্ঞতা তাঁর থাকে না। চিত্তও চঞ্চল, অর্থ ও বন্ধু সংগ্রহে উদাসীন. এক ধরনের কথাবার্তা বলেন না।

এ'দের দেহটা সাধারণতঃ পাতলা হয়, কণ্ঠের ধ্বনিতেও কোমলতা কম, শরীরের

শিরাগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। তাছাড়া এ'রা স্বপ্নের মধ্যে এমন সব দেখে থাকেন যেন উড়ে যাচ্ছেন; কেউ হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়লেও ম্যাজিকখেলা দেখতে খুব আগ্রহ-শীল, অথবা নিজেরও অমনি করার প্রবণতা থাকে।

এদিকে আর একটি স্বভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়—ছাগল, খরগোস, ইঁদুর, কুকুর, কাক, গাধা—এই রকম ধরনের প্রাণীদের উপর টান। এ সবের দ্বারা মনে ক'রতে হবে, এদের জন্মকালীনই বায়ুর আধিক্য ছিল।

পিত্তাধিক্যে

যাঁদের দেহে অল্পতেই ঘাম হয়, বগলে বা অন্য আবৃত জায়গার ঘামে একটা গন্ধ হয়, ঘামের রঙটা হ'লদে, চোখের কোণা, তালু, জিভ, ঠোঁট, হাত-পায়ের তলার রঙ একটু লালচে কিংবা তামাটে, অল্প শ্রমেই শ্রীহীন হ'য়ে পড়ে, অল্প বয়সেই বলি দেখা দেয় অর্থাৎ মুখের ও গায়ের চামড়া কুঁচকে যায়। ভাল পুষ্টিকর যত কিছু খাওয়াদাওয়া ক'রেও গায়ে মাংস লাগে না, এ'রা গরম কোন কিছু খাওয়া পছন্দ করেন না, কোন কারণে হঠাৎ রেগে যান, অথচ পরকে সান্ত্বনা দিতে তাঁর যোগ্যতা থাকে এবং কোন কারণ ঘ'টলে অন্যে কেউ তাকে সান্ত্বনা দিলে তাঁর স্বস্তি হয়; এ'রা খুব বলিষ্ঠ হন না, কিন্তু মেধাবী, নিপুণ বুদ্ধি, বিশেষ ক'রে বিগৃহ্য অর্থাৎ উচিতবক্তা, তেজস্বী, আর কেউ অন্যায় ক'রলে কিংবা অন্যায় বললে ঝগড়া ক'রতে ওস্তাদ। এ'দের বৈশিষ্ট্য হ'লো শরণাগত ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে অভয় দিতে পারে।

সাপ দেখা ও সাপের খেলায়, বিড়াল পোষায় ও আদর করায়, বাঘ-ভালুকের খেলা দেখায় এবং বানরের প্রতিও এ'দের খুব টান। এ'দের স্বপ্ন দেখার মধ্যে আগুন লাগার ঘটনা অথবা সোনার বা সোনার মত উজ্জ্বল ধাতুর অলংকারও তারা দেখতে পায়। এসবে পিত্তপ্রধান বিকারের দ্বারা উদ্ভূত কারণ থাকে।

শ্লেষ্মাধিক্যে

যাঁদের জন্মের প্রাক্ক্ষণে শুক্রশোণিতের মধ্যে শ্লেষ্মাধাতুর আধিক্য থাকে তাঁদের বর্ণটা একটা কোন বিশেষ রঙকে প্রকাশ করে না, আবার অস্বাভাবিক কালোও হ'তে পারে। তবে যেকোন রং হোক রং-এ লাবণ্য থাকবে, চরিত্রের মধ্যে সহিষ্ণুতা, লোভ কম, এটা থাকবে দৃঢ়ভাবে কিন্তু বোঝার শক্তি হবে অনেক পরে, আর তৎক্ষণাৎ ভুলে যাওয়ার ত্রুটি থাকবে না। তবে এসব মানুষের সঙ্গে শত্রুতা ক'রলে এরা শেষ নিশ্বাস ছাড়া তক্ তার পাল্টা জবাব দেবার চেষ্টা ক'রে যাবে, সে যেকোন প্রকারেই হোক।

এ'দের চোখের ভিতরের আভা হবে ঝক্‌মকে সাদা, মাথার চুল কালো এবং বেশ কোঁচকানো, গলার আওয়াজ গম্ভীর : কাউকে ধমক দিলে, সে ধমক হবে পিলে-চমকানো।

এ'রা স্বপ্ন দেখলে দেখবে পুকুর, নদী-নালা, ফুল, হাঁস প্রভৃতি। এ'দের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা, গুরুজনের সম্মান করার প্রবৃত্তিও এগুলি থাকবেই।

এ'রা গোরু পুষতে ভালবাসবেন আবার ঘোড়ায় চড়ার সখ হবে, হাঁস বা মুরগীর মাংস বা ডিম খেতে আগ্রহী হবেন। এ'রা আত্মপরিজনকে সুখী করার জন্য চেষ্টা ক'রবেন। অর্থের সঞ্চয়ে, শাস্ত্রজ্ঞানের আহরণে এ'রা সর্বদা যত্ন নেবেন।

এই তিনটি মৌল সূত্র মাত্র। এদের অংশাবিভেদ-ক্রম অর্থাৎ সংকর অংশেও মানব-সৃষ্টির যোগ থাকে।

আদি মৌল তত্ত্ব হিসেবে বায়ু অগ্নি (পিত্ত) ও জলেরই (কফের) একটা দিক বলা হ'লো আর বাকী দুটি হ'লো আকাশ ও পার্থিব শক্তির সারভাগ নিয়ে যারা জন্মে।

এ দু'টির প্রাধান্য আছে কিনা তা জানা যাবে এই ভাবে—আকাশ-প্রাধান্য থাকলে শুচিতা রক্ষা করা এমনকি শুচিবায়ুও তাদের মধ্যে সর্বদা থাকবে।

আর পার্থিব সত্ত্বার প্রাধান্য থাকলে তারা হবে বিশেষ ধরনের লম্বা এবং চওড়া শরীরের এবং তারা অল্পবাক্‌ও যেমন হয় অর্থাৎ অল্পভাষী, আবার তেমনি তাদের বোঝা তোলার ক্ষমতাও থাকবে। (দ্বৈধ মত)

সুশ্রুত সংহিতার এই বিশেষ অভিমতের সঙ্গে চরকীয় ধারায় চিন্তাধারার বিশেষ মিল যে, যারা যে মৌলবিকারে জন্মলাভ করে তারা সেই বিকারের অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে আর সেই ধাতুপ্রধান বিকারে আক্রান্ত হয় না। আর তা হ'লে তাকে বাঁচানো দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়ে। কারণ সেটা তার মৌলধাতুর ক্ষয় হ'য়েছে।

একটি প্রাণীর উপমা দেওয়া আছে—কুকুর বায়ুপ্রধান বিকারে জন্মলাভ করে। এর বায়ুবিকার হয় না। এর যখনই বায়ুবিকার হয় তখন সে ক্ষিপ্ত হয়, তখন সে আর বাঁচে না, এইটাই প্রাচীন চিন্তাধারার সিদ্ধান্ত।

মানুষের ক্ষেত্রেও এইটি বিশেষ লক্ষণীয় যে—কোন্ ধাতুর প্রাধান্য নিয়ে জন্মেছে, আর যে পীড়াটি হ'য়েছে সেটা কোন্ ধাতুর প্রাধান্য থেকে!

আরও এক পথে—

মানব বা মানবীর মধ্যে এইগুলি লক্ষ্য করতে হয়, তা হ'লো পিত্তকে প্রধান ক'রে কিংবা শ্লেষ্মাকে প্রধান ক'রে এর জন্ম হয়েছে কিনা সেটা পরিষ্কার জানা যাবে। এমন কি অন্য যে কোন পশুপক্ষীর মধ্যে এর কিছু কিছু লক্ষণ উপলব্ধি হয়।

প্রতিটি দেহের মধ্যেই কতকগুলি এমন বৈশিষ্ট্য থাকে, যেগুলি অন্য দেহে থাকে না। তবে সেই লক্ষণগুলি সেই ৮টি ক্ষেত্রেই প্রকাশ পাবে, এর বেশী নয়—

অর্থাৎ কোন দেহে ত্বক্ বা চামড়াটাই সব চেয়ে লক্ষণীয়—এই রকম, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও ওজ এইসব ধাতুগত প্রাধান্যের বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকট হয়।

(ক) যাঁরা **ত্বক্-প্রধান** বা ত্বকসার

তাঁদের দেহ সর্বদা স্নিগ্ধ, কোমল, চিক্কণ (চক্‌চকে), পাতলা, অল্প ছোড়ে গেলেই ফুলে ওঠে, লসিকা অর্থাৎ সাদা কসানি বেরোয়। গায়ের লোমগুলিও কোমল। এরা বুদ্ধিমান, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অপরের অনুগ্রহ বা সুপারিশ সহজে আকর্ষণ করে এবং পায়ও। এদের রোগ কম হয়, আয়ুও দীর্ঘ হয়, ভোগী, ঐশ্বর্যশালী, এদের হাতের ও পায়ের তলা কোমল (নরম) হয়। তবে কিছু তাপযুক্ত হয়, নুন ঝাল মিষ্টিতে এদের ঝোঁক বেশী। তেতো (তিক্ত), কষা (কষায়), টক্ এদের তত প্রিয় নয়। সব সময়ে গরম গরম খাবার পছন্দ করে না, কারণ এদের পিত্তশ্লেষ্মা-প্রধান দেহ, বায়ুপ্রধান রোগ হয়। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা দেখা দেয়।

এবার বলি, সাধারণ ব্যক্তিও বুঝতে পারবেন, মানুষের দেহে "সারবত্তা" বলতেও

এক একটা দিক আছে, সেটা হ'লো সেই ধাতুর প্রাধান্য।

(খ) রক্তসার

এরা পিত্তপ্রধান অথবা শ্লেষ্মাপ্রধান অথবা পিত্তশ্লেষ্মাপ্রধান কিংবা শ্লেষ্মাবায়ু-প্রধান যাই হোক, এদের শরীরে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয়—সর্বত্র থাকবে রক্তাভা, অর্থাৎ কষ্টসহিষ্ণুতা, শোনা মাত্র গম্ভীর হওয়া, আত্মসুখে বেশী তৎপরতা, উন্নতি করার জন্য বেশী চেষ্টা দেখলে শুনলে অবশ্যই বুঝতে হবে, এদের চেহারার মধ্যে নিশ্চয়ই সর্বাঙ্গে রক্তাভ রূপের একটা আভাস থাকবেই। এরা কিন্তু অর্শ এবং গুদজাত রোগে অর্থাৎ নিম্নমার্গের রোগে আক্রান্ত হয়, এদের ঝাল নুনে টান খুব, কিন্তু তার দ্বারাই এই সব শোণিতজ রোগ আরও বৃদ্ধি পায়। আবার মিষ্ট দ্রব্য খেলে মল সংঙ্কোচও হতে থাকে। কিন্তু এরা সুখী ব্যক্তি। এদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে রক্তজাত ব্যাধির প্রসর্পণ ঘটে।

(গ) মাংসসার

এদের চোখ দুটি কোটরে ঢোকা হয় না, বেশ ড্যাবড্যাবে হয়, ঘাড় ছিনে পড়া হয় না, গাল দুটি চড়ায় না, বুড়ো বয়সেও চোয়ালের হাড় বেরোয় না, ঘাড়ে শিরা দেখা দেয় না, গলার হাড় বেরোয় না। বুকের মাংস কাঠ হয় না, বগলে গর্ত হয় না, হাতের পায়ের চেটো মাংসল হয়, এরা ক্রুদ্ধ হ'লে ক্ষমাশালী ধৈর্যশালী হয়, লোভ কম, লোভ হলেও ক্ষুদ্রে হয় না, বিদ্যা যতটুকুই হোক বেশ গভীর, গড়নও নিটোল, বলও থাকে ভাল, আয়ুও স্বল্প হয় না। এরা কিন্তু যে কোন প্রকৃতির হোক বাতরোগের যে কোন একটি হবেই, এমন কি মাংসপেশীতে বাত, মূত্রগ্রন্থির স্ফীতি, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, ঘুমিয়ে ভুল বকা, মহিলা হলে রজঃ রোগে আক্রান্ত, সর্বাঙ্গে মাঝে মাঝে কম্পন, মাথা ভার, সর্বাঙ্গে বেদনা রোগ হয়। আর এরা গা টেপানো পছন্দ করে।

(ঘ) মেদসার

এদের মধ্যে লক্ষণীয়—

গলার স্বরটি মিষ্টি, সর্বাঙ্গে একটা চিক্কণতা এবং স্নিগ্ধতা থাকে।

এরা দানকার্যে প্রায়ই মন দিতে চায়; এদের চুল পাকে সাদা হ'য়েই; প্রথমে তামাটে, তারপর সাদা হয় না। চোখের ভিতরের অংশ খুব রাগ হলেও লাল হয় না, হাসলেও এদের চোখে জল আসে। এদের মূত্র নিঃসরণে শব্দ খুব কম হয়(পুরুষ ও নারীর), এরা আচার-আচরণ প্রিয় হয়। মননশীলতা অপেক্ষা আচারশীলতায় টান বেশী হয়।

এরা যে সব রোগে আক্রান্ত হয় তার মধ্যে শূল রোগ প্রধান। এরা অল্প শ্রমে ক্লান্তিবোধ করে, তা ছাড়া হৃদ্‌রোগ, যকৃৎ রোগ, আমাশয়জাতরোগ এবং মলদ্বার সংক্রান্ত পীড়ায় এরা আক্রান্ত হয়। অর্থাৎ এই সব রোগ হলেই বুঝতে হবে এরা মেদসার ব্যক্তি।

(ঙ) অস্থিসার

এদের গড়নে লক্ষণীয় হবে গোড়ালি, হাঁটু, কনুই, কণ্ঠাস্থি, চিবুক, মাথা, আঙ্গুলের

গাঁট, দেহের হাড়, নখ এবং দাঁত, প্রায়ই এইসব স্থান উঁচু শক্ত এবং মোটা মোটা হয়।

এরা সর্বদা কাজ করতে তৎপর হয়, পরিশ্রম সহ্য করতে পারে, দীর্ঘায়ুও হয়। এরা কিন্তু বেশীর ভাগ বায়ু রোগে আক্রান্ত হয়, গাঁটে গাঁটে ব্যথা বেদনা, হঠাৎ হঠাৎ শরীরটা পাতলা হয়ে যায়, রসধাতুর ক্ষয় হয়, ঘুম কম হয়, আর যখন-তখন গা হাত পা টেপাতে চায়।

(চ) **মজ্জসার**

এই মজ্জপ্রধান ব্যক্তিদের দেহের গঠন হবে বেশ চিক্কণ, নিটোল। দেহের বল হবে বেশ স্থায়ী প্রবৃত্তি জাগার, শরীরের বর্ণ কখনও খর হবে না, আব গলার আওয়াজও মধুর হবে। এদের শরীরের গাঁটগুলি বেশ গোলগাল এবং লম্বা-চওড়া হবে। এরা অল্পায়ু হয় না। বুঝতে হবে এদের মজ্জধাতু বেশ জোরালো।

(ছ) **শুক্রসার**

এইসব নরনারীর গড়ন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এদের চাউনিও সুন্দর, আর সর্বদাই একটা খুসী খুসী মনোভাবে এরা ভরপুর হয়ে থাকে। এরা যে কখনও দুর্ভাবনায় ক্লান্ত হয় সেটা বোঝাই যায় না। এদের দাঁতগুলি কবি মহাকবিদের বর্ণনার "শিখরি দশন" অর্থাৎ হাসলেই ওপরের দাঁতগুলির অগ্রভাগ যে বেশ সরু, সেটা দেখা যাবে। পান বা অন্য কিছু মুখশুদ্ধি করলেও—এদের দাঁতে ছোপ পড়বে খুব দেরীতে। এদের কণ্ঠধ্বনিও যেমন মিষ্টি তেমনি প্রসন্ন ও গম্ভীর। এদের নিতম্ব (পাছা) হবে খুব আকর্ষণীয়, কারণ কোমর সরু হবে। এই শুক্রসার পুরুষ বা রমণীই পরস্পরের আকর্ষণীয় হয়। অথবা যেই শুক্রসার হবে সেই হবে আকর্ষণীয়। যদি উভয়েরই হয় তবে বলা হয় রাজযোটক।

(জ) **সত্ত্বসার**

আর এক প্রকার দেহ হয়—যাকে বলা হয় **সত্ত্বসার**, অর্থাৎ পূর্বের এক এক প্রকার সারপ্রধান দেহের যতগুলি আকর্ষণীয় রূপ গুণ থাকবে, সবারই সারাংশ নিয়ে যে দেহ, তাকেই বলা হয় সত্ত্বসার দেহ। রমণী হলে বলা হয় "তিলোত্তমা" আর পুরুষ হলে বলা যায়—"নবকার্তিক"। সত্ত্বসার সন্তান খুব কমই জন্মগ্রহণ করে।

ভিন্ন কোণ থেকে—

(রোগের মতই এক ধরনের উপসর্গ দেখে দেহের ক্ষয়-ক্ষতি বিচার করার একটা দিক)

প্রথমেই জানা দরকার—আমাদের দেহটা কি নিয়ে ধারণ ক'রে আছে— (১) রস, (২) রক্ত, (৩) মাংস, (৪) মেদ, (৫) অস্থি, (৬) মজ্জা, (৭) শুক্র, (৮) ওজ, (৯) বিষ্ঠা, (১০) মূত্র। যদি কোন কারণে একটির ক্ষয় হতে থাকে, তা লক্ষণ দেখে উপলব্ধি করা যায়—শরীরের কোন্ ধাতুর ক্ষয় চলছে।

কথাটা এই যে, বাইরের আলো-বাতাস-জল-আগুন-মাটির হ্রাস-বৃদ্ধি দেখে যেমন বোঝা যায়—এখানের কোন্‌টা বাড়ছে, কোন্‌টা কমছে, আলো ক'মলে বুঝে

ফেলি মেঘ, মেঘলার সমাগম, জল কমলে উষ্ণতা, আর বাতাস কমলে অগ্নির দাহিকা, মৃত্তিকার ক্ষয়ে গর্ত, অথবা জলের বৃদ্ধি। এমনি দেহের মৌল উপাদান ক্ষিতি, অপ্ (শ্লেষ্মা), তেজ ও মরুৎ (পিত্ত) এগুলির একটির ক্ষয়ে অপরের বৃদ্ধি, একটির বৃদ্ধিতে অপরের ক্ষয় অবশ্যই হচ্ছে। আর এদের নিয়েই মনেরও যখন অবস্থান, তখন তাদের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে মনের গতিরও উল্লাস, স্তব্ধতা, বিমর্ষ, বিষাদ, উচ্ছ্বাস, আবেগ, সঙ্কোচ, বিরক্তি প্রভৃতি বৃত্তিগুলির কমতি-বাড়তি অবশ্যই হয়। এটা অহরহ চ'লেছে।

কতকগুলি এমন ব্যাধি দেখা দেয় এবং এমন সময়ে হয় যাতে সহজে ধারণা করা যায় এ ব্যাধি এই সময়েই আসবে এবং এইরূপই হবে আর এই কারণেই হবে, যেমন— বায়ুটা ক্ষীণ হয়েছে, পিত্তটা শ্লেষ্মার সঙ্গে অসহায় হ'য়ে মিশে গিয়েছে, তখন বাড়বে প্রথমে আলস্য, তন্দ্রা, জড়তা আর ঠিক দুপুরেই আসবে জ্বর; অথবা পেটের দোষ। এ কখনও বৈকালে ও সন্ধ্যায় দেখা দেয় না।

একের ক্ষয়ে অপরের বৃদ্ধিতে

পিত্ত ক্ষীণ হ'য়ে গিয়ে শ্লেষ্মা এসে বায়ুতে যেই মেশা, অমনি সর্বাঙ্গ ব্যেপে বায়ুর গতিটা ব্যাহত হয়, তখন শরীরে শীতও হয় আর প্রস্রাবের বেগও ঘন ঘন হয়। ঠিক সেই সময়ে আসে জ্বর অর্থাৎ এ অবস্থায় সন্ধ্যায় জ্বর হয়। সারারাত জ্বরের তাপ। অতএব ধরে নিতে হয় এর পিত্ত ক্ষয় হয়েই এই জ্বর।

আবার বায়ুটা ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে কোন কারণে, অথচ শ্লেষ্মাটার ক্ষয় হ'চ্ছে না, সে এসে পিত্তকে ব্যাকুলিত করে—তখন সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় অম্বল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, মাথার যন্ত্রণা, ঝিমুনী আর বুকে চাপ বোধ, এই ধরনের ক্ষেত্রে একটা শঙ্কার কারণ থাকে, এদের আসতে পারে জ্বর, পেটের দোষ; কখন ফুটে উঠবে বলা যায় না।

মোটকথা, বায়ু-পিত্ত-কফের প্রকৃতি স্বরূপ আর দেহের কোথায় এরা নিত্য থেকেও অপরের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে রোগ সৃষ্টি করে, তা জানতে হ'লে বেশ গভীর মনস্বিতার প্রয়োজন।

তবে এমন কতকগুলি অবস্থা দেখা দেয় যেগুলিকে দেখে বলা যায় এর দেহে এই ধাতুটির স্রোতে বেশ বিপত্তি দেখা দিয়েছে। যেমন বুক ধড়ফড়ানি, কোন কিছু দুমদাম শব্দ শুনলে বুকে অস্বস্তি, বুক খালি খালি, এগুলি দেখা দিলেই বুঝতে হবে এর রসবহ স্রোতে বিপত্তি।

রসধাতু ক্ষয়ের সাধারণ লক্ষণ কি কি

উচ্চ শব্দ শুনতে ভাল লাগে না (চেঁচামেচি, কলহ, ক্রোধ প্রভৃতি), সেটা শুনলেই বুকটা ধক্‌ধক্ ক'রছে কিংবা ধড়্‌ফড়্ ক'রছে, বেশ অস্বস্তি বোধ হ'চ্ছে— এগুলি রসধাতু ক্ষয়ের লক্ষণ। তখন মানুষ স্বাভাবিক প্রেরণায় ঠাণ্ডা জল খেতে চায় বা ঠাণ্ডা জল তার ভাল লাগে, এটাতে স্বস্তিও বোধ করে, এমনকি জলের ছিটে চোখেমুখে দিলেও ভাল লাগে। এইসব লক্ষণ দেখার পর অর্থাৎ রসধাতুর ক্ষয় চ'লতে থাকলে পরিশ্রম করার শক্তি হারাতে থাকবে এবং অল্প কোন কারণ ঘটলেই চোখে অন্ধকার দেখবে। সামান্য শ্রম ক'রলেই এরা যেন অন্ধকার দেখে।

এদের রসবহ স্রোতের ক্ষয়েই এটি ঘটেছে নিশ্চয়। এদের আর উপবাস এবং শুষ্কতা ঘটানো কোন আহার ঔষধ দিতে নেই।

কি কি লক্ষণে রক্তধাতু ক্ষয়ের ইঙ্গিত বোঝা যায়

যখন কোন ব্যক্তির টকে ঝালে বেশ টান এবং জলপিপাসা, ঠান্ডা ঠান্ডা জিনিষ খেতে, ঠান্ডা হাওয়া লাগাতে, ঠান্ডা ঘরে থাকতে বেশ ভাল লাগছে, আর যতই তেল গায়ে মাখুক গায়ের চামড়ার রুক্ষতা যেন ক'মছেই না, হাত-পায়ের তলায়, গায়ে মাথায় তেল দিলে আরাম বোধ হয়, আর রুক্ষতা সে তুলনায় ক'মছে না, শরীরের শিরা আরও স্পষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, চামড়াও একটু থল্‌থলে ভাব, এ সব কিন্তু রক্তবহ স্রোত দুষ্ট হওয়ার লক্ষণ ; যে কারণে রক্তের বল কমে যাবে এবং তার জন্য দুর্বলতাও আসবে। আর যদি অর্শ থাকে সেটাও বেড়ে যাবে।

এভিন্ন রক্তধাতুর আর একটি আভ্যন্তরীণ ক্ষয় এবং রক্তবহ স্রোতটাতে ক্ষয়মূলকতা সুরু হ'য়েছে, তার লক্ষণের আর একটা ইঙ্গিত দিই—যে কোন বয়সে, কিবা শীত কিবা গ্রীষ্ম অথবা যে কোন ঋতুতেই পা ফাটছে, শরীরের চামড়ায় কর্কশতা দেখা দিচ্ছে, সারা শরীর ব্যেপে যেন লাবণ্যটা কমে যাচ্ছে। এইগুলিই তার বিশিষ্ট লক্ষণ।

শরীরের মাংস ধাতুর ক্ষয়ের ইঙ্গিত কি কি লক্ষণে বোঝা যায়

শরীরের মধ্যে পাছার মাংস প্রথমেই শুকোতে থাকবে, গালও চ'ড়িয়ে যাবে। ঠোঁট, বুক, নাভি, উদর, ঘাড় (গ্রীবা) এগুলি সরু হ'তে থাকবে বা হ'য়ে যাবে। তাছাড়া সামান্য কারণেই ঐসব জায়গায় একটু ব্যথা বোধ হবে। সারা শরীরে একটা অবসাদও আসবে মাঝে মাঝে, আর ধমনীগুলোর মধ্যেও ক্রমেই শৈথিল্য আসতে থাকবে ; তখন বুঝতে হবে এদের শরীরের মাংসবহ স্রোত বিকারগ্রস্ত হ'য়ে প'ড়েছে।

মেদ ধাতুর ক্ষয় হ'তে থাকলে কি কি বিশিষ্ট লক্ষণ নজরে আসে

তাদের খাওয়াতে ঝোঁক বাড়ে ডিম, নরম হাড়সহ মাংস। এদের গাঁটগুলিতে নাড়া-চাড়ায় কট্ কট্ আওয়াজ শোনা যাবে। শরীরটা যেন ফাঁকা ফাঁকা, আর গায়ের চামড়ার রুক্ষতা আসছে দেখা যাবে, প্লীহা বা যকৃৎটাও একটু বৃদ্ধি হয়েছে এবং হাতেও ঠেকবে। হঠাৎ মনে হ'লো চোখ দুটোয় যেন টান ধরেছে, দৃষ্টিতে ঝাপসা লাগছে, উজ্জ্বল আলো দেখতে অস্বস্তি বোধ হ'চ্ছে, কিংবা অল্প হাঁটাচলা, লেখাপড়া বা অন্য কোনপ্রকারের শ্রম এলেই একটা গ্লানি আসছে, আলস্য তন্দ্রায় দেহটা নেতিয়ে প'ড়ছে, আর পেটের মাংসও যেন ক'মে যাচ্ছে, পুষ্টিকর খাদ্যেও তার বৃদ্ধি হ'চ্ছে না, সেখানে অবশ্যই বুঝতে হবে ঘৃত বা ভাল স্নেহজাতীয় দ্রব্যের অভাবে মেদঃক্ষয় সুরু হ'য়েছে, মেদোবহ স্রোতও ক্রমে শুকিয়ে আসছে।

অস্থিধাতুর ক্ষয়ের বিশিষ্ট লক্ষণ কি কি হয়

অসময়ে দাঁতের যন্ত্রণা, দাঁত নড়া, দাঁত প'ড়ে যাওয়া, গাঁটের হাড় বা দেহের হাড়গুলিতে ব্যথা, জোরে টিপলে আরাম, নখের বাড় ক'মে যাওয়া এবং নখ বাড়তে

দেরী, তার সঙ্গে দেহেও রুক্ষতা আসছে, সব সময়ে মনে হয় চলা-ফেরাটা কমালে ভাল, আবার দেখছেন মাথার চুলও বেশ উঠে যাচ্ছে, গোঁফের বাড়-বাড়ন্তও নেই, মাথায় টাক পড়ার মত মাথার অবস্থা, মাঝে মাঝে দাঁতের যন্ত্রণা, দাঁত নড়া, অল্প শক্ত জিনিস খেতেও ভয়; তারপর এই ব'ললেন অথবা পড়াশুনো ক'রলেন, কোথায় কোন্‌টা রাখলেন কিন্তু সেটা মনে থাকছে না। তখুনি কিন্তু সাবধান হবেন। বুঝতে হবে আপনার অস্থিক্ষয় সুরু হ'য়েছে।

এটা উপেক্ষা ক'রলে আরও প্রবল হবে এবং এগুলো তো হ'তেই থাকবে, তার সঙ্গে বাড়তি হবে শরীরের হাড়গুলোও ক্রমশঃ মজ্জহীন হবে। বুঝবেন অস্থিক্ষয় উপেক্ষা করার পরিণতিতে এবার মজ্জাক্ষয় শুরু হয়ে যাবে।

মজ্জধাতুর ক্ষয় হ'লে তার বিশিষ্ট লক্ষণ কি কি হয়

যৌনসঙ্গের প্রবৃত্তি বেশই রয়েছে, কিন্তু পরস্পর একত্র হ'লেই কেমন একটা অস্বস্তি, আর সবই যেন নিমেষ, অপরদিকে আধার যাঁর কাছে, তার মজ্জধাতুর অভাব হ'তে থাকলে আধারের পিচ্ছিলতা ক'মে যায়। এদিকে ক্ষিধে আছে অথচ খাওয়ায় রুচি নেই। আর এক উপসর্গ হ'লো—অস্থির মধ্যে একটা ব্যথা, জোরে টিপলে এমন কি নাড়িয়ে দিলে আরাম অনুভূত হবে।

শুক্রধাতুর ক্ষয় হ'য়ে গেলে তার বিশিষ্ট লক্ষণ কি কি

এ ঠিক যেন তরণী আছে কিন্তু মাঝির অসমর্থতায় তীরে ব'সে হা-হুতাশ করার মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। সঙ্গবাস থেকে স'রে থাকার চেষ্টা, দ্বিতীয়তঃ শারীরিক দিক থেকে মুষ্কে (অণ্ডকোষে) মাঝে মাঝে ব্যথা; এমনকি মিথুনদণ্ডের মূলেও ব্যথা, আর স্বেচ্ছাকৃত ক্ষরণে যে শুক্র নির্গত হবে সেটা কাপড়ে লাগলে দেখা যাবে একটু লালচে। তাছাড়া শরীরের উত্তেজনাও তো বিশেষ থাকে না, তবুও যেন অভ্যেসের বশে এগিযে যাওয়া।

আর রমণীর ক্ষেত্রে আধারের শুষ্কতা, সুখানুভবের থেকে জ্বালাই বেশী, মাঝে মাঝে স্রাব।

আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে—

চরকীয় চিন্তাধারায় আচরণ দেখে প্রকৃতি বিচার

বৃহৎ শরীর দেখে অপরে মনে ক'রতে পারে এ বলবান পুরুষ, আর ছোট এবং পাতলা দেখে মনে হবে এ দুর্বল ব্যক্তি, কিন্তু তা নয়—ছোট আকার আর পাতলা হলেই দুর্বল হয় না। এ বিষয়ে চরক সংহিতাকারের (বিমান অষ্টম) অভিমত হলো, পিঁপড়ের (পিপীলিকার) ভার বহনশক্তি, অনলস জীবনীশক্তি তার জন্মশক্তির মধ্যে কোন্‌টির প্রাধান্য তা লক্ষ্য করে দেখতে হবে।

আর একদিক থেকেও চেনা যায়—সেটি হলো আচরণ। মানুষ মাত্রেরই আচরণ তার মনের প্রেরণায়, সেই মন বস্তুটি কেমন তা তো তার আচরণের দ্বারাই অনেকটা বোঝা যায়।

আয়ুর্বেদের সংহিতায় মানুষের মনের আচরণকে তিনটি ভাগে বিভক্ত ক'রেই সংজ্ঞা দেওয়া আছে (১) প্রবর মন (২) মধ্যমন (৩) অবর মন।

(১) **যারা প্রবর মন-প্রধান**—তাদের আচরণে বেশ স্নিগ্ধতা, মৃদুতা, প্রসন্নতা, সুক্ষ্মতা, অল্প গভীরতা (বৈষয়িক ব্যাপারে) এবং যাতে নীরোগ থাকা যায় তার চেষ্টা, আর সর্বদা হাসিখুসীভাব থাকবেই। কারোর দুঃখকষ্ট দেখলেও মুষড়ে পড়ে না।

(২) **যারা মধ্যমনের ব্যক্তি**—তারা সর্বদা চেষ্টা করে প্রথমোক্ত প্রবর মনের মত হ'তে বা আচরণ ক'রতে। অপরের ব্যথা বেদনা দেখে ভিতরে ভিতরে চিন্তিত হয়, কতকটা বিচলিতও হয় কিন্তু প্রবর মনের আদর্শকে মনে ক'রে সে তৎক্ষণাৎ উদাসী হয়, আবার সহ্যও করে।

(৩) **অবর মনের ব্যক্তির আচরণ**—তারা প্রায়শঃ চঞ্চল প্রকৃতির, অধৈর্য হয়, কারোর উপদেশ কিংবা কারোর সাহায্যেও ধৈর্যধারণ করতে পারে না, এরা বিরাট শরীর, প্রচুর শিক্ষা, অনেক সম্পদের অধিকারী হলেও সামান্যতেই কাতর হয়ে পড়ে। ভয়, শোক, লোভ, মোহ, অভিমান এদের যেন কাছেপিঠেই থেকে যায়। এরা তা গ্রহণ করে। উৎকট কিংবা ভয়াবহ বীভৎস কথা বা এইরকম কোন সংবাদ শুনলেই বিষাদ ও বিবর্ণগ্রস্ত হয়। তা ছাড়া মানসিক যেসব ব্যাধি তাতেও আক্রান্ত হয়; যেমন মূর্ছা, উন্মাদ, ঝাঁপ দেওয়া, আত্মহত্যা এবং মরণ সম্পর্কেও এরা এমন মনের প্রেরণায় চালিত হয় যে, যেন ওসব বিষয়ে এরা ভয় পায় না। আসলে এরা খুবই ভয়গ্রস্ত।

রোগানুসারিণী সূচী

পণ্ডিত স্বর্গত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের পুত্র শিবকালী ভট্টাচার্য জন্মেছেন ১৯০৮ সালে, অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলায়।

ছাত্রজীবনে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ঘটনা প্রবাহে এসে পড়েন কলকাতায়; অগ্রজ স্বর্গত কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্যের উৎসাহে তিনি আয়ুর্বেদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রখ্যাত আয়ুর্বেদবিশেষজ্ঞ ৺শচীন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৺জ্যোতিষ সরস্বতী, ৺হারাণ চক্রবর্তী, ৺গণনাথ সেন, ৺নলিনীরঞ্জন সেন প্রমুখের সান্নিধ্য লাভ করেন।

পরবর্তীকালেও বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডঃ পি. কে. বসু, ডঃ অসীমা চ্যাটার্জি, ডঃ বিষ্ণুপদ মুখার্জী, ডঃ এ. কে. বড়ুয়া, ডঃ বি. সি, কুণ্ডু, ডঃ আর. এন. চক্রবর্তী প্রমুখ মনীষীবৃন্দের সৌহৃদ্য লাভ করেন তিনি।

১৯৩৬—৪০-এর মধ্যে আয়ুর্বেদ ভেষজের ৩টি প্রদর্শনীর পরিকল্পনা এবং পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে তিনি সফলকাম হন, আবার ১৯৬৪ সালে শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে আয়ুর্বেদ প্রদর্শনী শাখার ভারপ্রাপ্ত হ'য়ে সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৪২—৪৭ পর্যন্ত রসায়ণশাস্ত্রের অধ্যাপনা এবং ১৯৬৭ থেকে ৫ বৎসর ভৈষজ্যবিজ্ঞানেও অধ্যাপনা করেন। ঐ সময় তিনি নিজেও উদ্ভিদবিজ্ঞানে জ্ঞানপিপাসু ছাত্র হ'য়ে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সান্নিধ্যে এসেছেন। তাঁর নিষ্ঠিত জীবনের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৬৯ সালে স্টেট্ আয়ুর্বেদ ফ্যাকাল্টি বোর্ড আয়ুর্বেদাচার্য উপাধি দান করেন।

আয়ুর্বেদের ভৈষজ্য বিষয়ে এবং রসতান্ত্রিক চিকিৎসা সম্পর্কে গবেষণামূলক কয়েকখানি গ্রন্থের যুগ্ম-সম্পাদনায় তিনি প্রধান অংশ গ্রহণ ক'রেছেন এবং সম্প্রতিকালে 'আয়ুর্বেদীয় পরিভাষা পরিক্রমা' নামক একটি বিশিষ্ট গ্রন্থও তাঁর দ্বারা সম্পাদিত হ'য়েছে এবং সেটি পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে গৃহীতও হয়েছে।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড